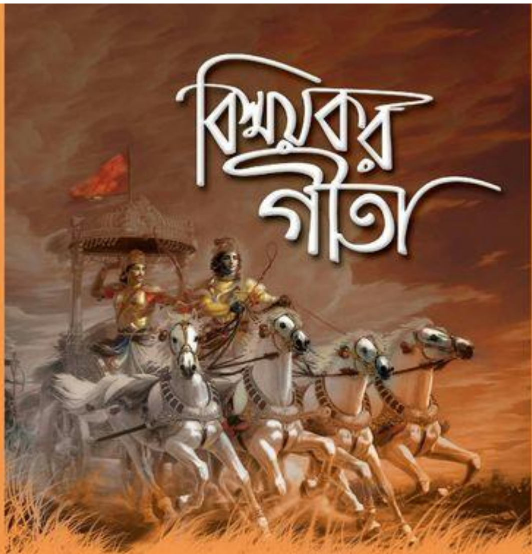


বিস্ময়কর গীতা

এ জেড এম আলমগীর

বিস্ময়কর গীতা • এ জেড এম আলমগীর

লেখকের আরও

- কোরআন বাং
- বাইবেল কোর
- সত্য
- দ্যা মেসেজ

বিস্ময়কর গীতা

Marvelous Gita

এ জেড এম আলমগীর

আইডিয়াস এন ভিউস পাবলিকেশন

গ্রন্থস্বত্ব : এ জেড এম আলমগীর

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০২১
দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৪ (পরিবর্ধিত)

প্রকাশক : এ জেড এম আলমগীর
আইডিয়াস এন ভিউস পাবলিকেশন
রোড-৬, ব্লক-এ, মিরপুর-১০, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : এ জেড এম আলমগীর
প্রচ্ছদ পরিস্ফুটন : তাজ মোহাম্মদ

মুদ্রণ : ইরানী প্রিন্টার্স
১৪৯-১৬১, গাউসুল আজম মার্কেট, ঢাকা।

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি.কম
www.rokomari.com

Marvelous Gita : by A Z M Alamgir

(Understanding Gita and Religion)

Published : by A Z M Alamgir
Publication : Ideas n views publication
Country : Bangladesh

মূল্য : টাকা ১০৮০
Price : BDT 1080.

ISBN : 978-984-34-9754-3

Facebook page : www.facebook.com/ideasnviews.

সূচী

	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা	পৃষ্ঠা নং
	পূর্বকথা		৪
১.	রণক্ষেত্র পরিদর্শন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব	৪৬	১০
২.	সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ	৭২	২২
৩.	কর্মযোগ	৪৩	৭৬
৪.	জ্ঞানযোগ	৪২	১০৮
৫.	সন্ন্যাসযোগ	২৯	১৪৯
৬.	ধ্যানযোগ	৪৭	১৬৭
৭.	বিজ্ঞানযোগ	৩০	১৮৭
৮.	অ-ক্ষর ব্রহ্মযোগ	২৮	২১৫
৯.	রাজবিদ্যা গুহ্যযোগ	৩৪	২৩৪
১০.	বিভূতি বিস্তারযোগ	৪২	২৬৩
১১.	বিশ্বরূপ দর্শনযোগ	৫৫	২৯০
১২.	ভক্তিযোগ	২০	৩০৭
১৩.	ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ	৩৫	৩১৭
১৪.	গুণত্রয় বিভাগযোগ	২৭	৩৫২
১৫.	সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা	২০	৩৭১
১৬.	দৈবাসুর সম্পদ বিভাগযোগ	২৪	৩৮৭
১৭.	শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ ও ওঙ্কার	২৮	৪০১
১৮.	মোক্ষ ও সন্ন্যাসযোগ	৭৮	৪১৫
	একটি উপসংহার		৪৬৪

(গীতা বেদান্তের অন্তর্গত কর্মযোগ মার্গের গ্রন্থ। এ বিষয়টি বোঝাতেই এর সকল অধ্যায়ের শেষে যোগ শব্দটি ব্যাবহার করা হয়।)

পূর্বকথা

মহাভারত, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও ভগবদ গীতা

কুরুক্ষেত্র! যুদ্ধের ময়দান!! বর্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিমে হরিয়ানা রাজ্যে অবস্থিত। একদিকে পান্ডব এবং অপরদিকে কৌরবরা সৈন্য সমাবেশ করেছে। ভরত রাজার নাম থেকে 'মহাভারত' নামটি এসেছে। মহাভারতে উদ্ধৃত এ ঘটনা ইতিহাস কিনা জানা যায়নি। তবে মানবজীবনের জন্য সম্পূর্ণ কথ্য বিষয়টি খুবই শিক্ষনীয়।

ক্ষুদ্র বলে অবহেলা করার মতো বিষয়গুলি মানবজীবনে একসময় জটিলরূপ ধারণ করে। অতঃপর কষ্ট, মহাদুর্দশা এবং সমাজ-সভ্যতা ও সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়ায়। একসময় ক্ষুদ্র আঙ্গিকে পরিবার থেকে শুরু হলেও তা সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি সমগ্র মানবজাতিকেও নাড়া দেয়। ক্ষুদ্র আসলেই ক্ষুদ্র নয়। পরমাণুর মধ্যেও যেমন প্রচন্ড শক্তি লুকিয়ে থাকে তেমন। বিষয়গুলি শিক্ষনীয় এবং গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাক্তি, পরিবার, সমাজ তথা মানবজীবনের জন্য বিবেচ্য।

এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল ইসরাইলের সন্তানদের মধ্যে। একদিনের ছোট্ট পারিবারিক বলে মনে করা ঘটনা পরবর্তীতে মহা ইতিহাসে পরিণত হয়েছিল। বাইবেল এবং কোরআনে সে ঘটনার উৎপত্তির কারণ ও পরিণতি বিবৃত হয়েছে। যার রেশ আজও শেষ হয়ে যায়নি। ক্ষণস্থায়ী জীবনের অযাচিত বাসনা, হিংসা, লোভ কিংবা অহমবোধ থেকে এসবের সৃষ্টি [লেখকের বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল বইতে বিষয়গুলি উঠে এসেছে]।

হস্তিনাপুর। উত্তর ভারতে দিল্লীর আশেপাশে অবস্থিত। হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু। শান্তনু মৎস্যকন্যা সত্যাবতীর রূপে আকৃষ্ট হন। তাঁকে বিবাহ করেন। পুত্র ভীষ্মকে সিংহাসনের উত্তরাধীকার মনোনয়ন করেন। কিন্তু সত্যাবতী ভীষ্মকে সিংহাসনে না বসতে প্রতিজ্ঞা করান। পরিবর্তে বিচিত্রবীর্য সিংহাসনে বসবে। আকাঙ্খা নিজের গর্ভজাত সন্তান হবে সিংহাসনের উত্তরাধীকার। অন্যথায় তিনি রাজা শান্তনুকে ছেড়ে যাবেন। ভীষ্ম পিতার কষ্ট বুঝতে পারেন। তিনি সত্যাবতীর শর্ত মেনে নেন। এ কষ্ট বুকে ধারণ করে রাজা শান্তনুর মৃত্যু হয়।

পূর্বকথা

কাশিরাজের দুই কন্যা আম্বিকা ও আম্বালিকা। সত্যাবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ হয়। কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধীকার না রেখে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। সিংহাসনের উত্তরাধীকারের বিষয়টি অমিমাংসীতই থেকে যায়। সত্যাবতীর লালিত স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

বিখ্যাত ঋষি ব্যাসদেব। বেদকে চারটি ভাগে বিভাজন বা ভেদ করেছেন বিধায় ভেদব্যাস বা বেদব্যাস নামেও পরিচিত। ব্যাসদেব সত্যাবতীর আরেক পুত্র। তবে রাজা শান্তনু তাঁর পিতা নন। পরাশর মুনির ঔরষজাত সন্তান। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর রাজমাতা সত্যাবতী ব্যাসদেবকে 'নিয়োগ' দান করেন। আম্বিকা ও আম্বালিকা সন্তানের জন্ম দেন।

ভরত রাজার বংশের ধারা থেকে কুরুবংশে ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু দুই ভাইয়ের জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্র বড়, পান্ডু ছোট। সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধীকার!

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। আকাঙ্খা থাকা সত্বেও নিয়মানুযায়ী সিংহাসনে বসতে পারেননি। ছোট ভাই পান্ডু সিংহাসনে আরোহন করেন। তবে পান্ডুর অকাল মৃত্যুর কারণে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসন লাভ করেন। পান্ডুর পাঁচপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্ম এর স্নেহ ও তত্ত্বাবধানে রাজ পরিবারে লালিত-পালিত হন।

ধৃতরাষ্ট্রের শত সন্তান। সবার বড় দুর্যোধন। পান্ডুর পাঁচপুত্র পঞ্চপান্ডব। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহাদেব। পরিবারের বড় হিসেবে নিয়মানুযায়ী যুধিষ্ঠির সিংহাসনের উত্তরাধীকারী। কিন্তু দুর্যোধন কূটচাল চালে। সে পান্ডবদের সহ্য করতে পারত না। দুর্যোধনের অহমবোধ, পান্ডবদের প্রতি করা তার দুর্ব্যাবহার, সিংহাসন লাভের অন্যায় বাসনা ও নানান কূটচাল- যার পরিণতি কুরুক্ষেত্রে আজকের সমরসজ্জা।

দুর্যোধন পান্ডবদের এক জুয়া খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানায়। খেলায় পান্ডবরা পরাজিত হন। এর মাধ্যমে দুর্যোধন ও তার ভাইয়েরা পান্ডবদের পত্নী দ্রৌপদীকে অধিকার করে নেয় এবং সমবেত রাজন্যবর্গের সামনে তাঁকে বিবস্ত্র করে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম, শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য উপস্থিত সকলে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পান্ডবদের ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীকৃষ্ণের হস্তক্ষেপে দ্রৌপদী রক্ষা পান।

চাতুর্য্যপূর্ণ এ খেলার মাধ্যমে পান্ডবদেরকে তাদের রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং তের বছরের বনবাসে যেতে বাধ্য করা হয়।

বনবাস থেকে ফিরে এসে রাজ্যের অধিকার পেতে চাইলে দুর্যোধন অসম্মতি জানায়। পান্ডবরা কেবল পাঁচটি গ্রামের অধিকার পেতে চায়। কিন্তু বিনা যুদ্ধে দুর্যোধন সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও ছেড়ে দিতে সম্মত হয় না। এ দ্বন্দ্বে ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ দুর্যোধনের পক্ষ নেয়, কেউ পান্ডবদের পক্ষ নেয়।

শ্রীকৃষ্ণ পান্ডবদের জননী কুন্তি দেবীর ভ্রাতুস্পুত্র। দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ শান্তির প্রস্তাব নিয়ে গমন করেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন। ফলে পান্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

মানবজীবনের নানাবিধ শিক্ষনীয় ঘটনার মহাসমাবেশ হচ্ছে ‘মহাভারত’। তবে অবশ্যই যদি কেউ মূল জ্ঞান আহরণ করতে, গ্রহণ করতে বা শিখতে চায় তার জন্য। কিন্তু ভক্তি ও সত্যান্বেষনের অন্তর ভিন্ন প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা যায় না।

ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ! শৈশবে সকলে একসাথে খেলেছে, একসাথে খেয়েছে, বন্ধু ও সহচর তাদের একই, একই তাদের পূর্ব-পুরুষ, একই শিক্ষা ও সমরাস্ত্র বিদ্যাশিক্ষার গুরু! একই পিতামহ! আজ একে অন্যকে সংহার করতে অস্ত্রহাতে বিশাল বাহিনী নিয়ে মুখোমুখী দন্ডায়মান! চারিদিকে যুদ্ধের দামামা বাঁজছে। সমগ্র ভারত এতে অংশ নিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ কোন দলভূক্ত নন। তাঁর হাতে অস্ত্র নেই। তিনি সকলের শুভাকাঙ্খীস্বরূপ। তবে যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী বন্টনে তাঁর বিশাল বাহিনী কৌরবদের অংশভূক্ত। কিন্তু তিনি নিজে সুদক্ষ ধনুর্ধার ও মহাযোদ্ধা পান্ডুপুত্র অর্জুনের বন্ধু ও রথের সাঁরথী। তাঁর কাজ অর্জুনের নির্দেশ মতো রথ চালনা করা এবং যুদ্ধে তাঁকে সুপরামর্শ দেয়া।

এ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্য মৃত্যুবরণ করেছে। অংশগ্রহণকারী সকল বীর যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। কেবল পঞ্চপান্ডব, শ্রীকৃষ্ণ এবং আরও ছয়জন যোদ্ধা জীবিত ছিলেন। মানব ইতিহাসে এটি একটি অন্যতম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

যুদ্ধপূর্ব অবস্থা। অর্জুন বিরোধী শিবিরের গতিবিধি পর্যবেক্ষনের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ দুই শিবিরের মাঝামাঝি রথ টেনে নিয়ে যান। অর্জুনকে শত্রু শিবির

অবলোকন করতে বলেন। সবকিছু দেখে অর্জুনের দেহ অবশ হয়ে আসে। হাত থেকে ধনুক খসে পড়ার উপক্রম হয়।

এ কি করছে তারা! যাদের সাথে শৈশবে খেলেছে, যারা তাঁকে লালন-পালন করেছেন, অস্ত্রচালনা বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন, যাদের হাতে খেয়েছেন- সবাই বিরোধী শিবিরে অস্ত্র হাতে উপস্থিত। দুর্যোধনের পক্ষে জীবন বিসর্জন দিতে তারা প্রস্তুত। শ্রদ্ধাভাজন পিতামহ ভীষ্ম, শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য এবং আরও অনেক। কিভাবে এমন গুরুজনদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করা যায়? যাদের বিপক্ষে যুদ্ধ- সবাই তারা রক্ত কিংবা বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কিত।

মহাভারতের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পান্ডব শিবিরের অন্যতম সেনানায়ক অর্জুনের অন্তরে বিষাদের ছাঁয়া নেমে আসে। এমন স্বজন ও গুরুজনদের বিপক্ষে তীর চালনা করতে তাঁর অন্তর অনীহা প্রকাশ করে। হতাশ ও উদাস হয়ে তিনি রথে বসে পড়েন। যুদ্ধ করবেন না বলে মনস্থির করেন।

সব সত্বেও কেন যুদ্ধ করতে হবে শ্রীকৃষ্ণ তার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। সে আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে কর্ম, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, ন্যায়-অন্যায়বোধ, জন্ম, মৃত্যু, আত্মা, জীবন ও জগত এমনকি মহাজগত সম্পর্কিত নানান বিষয় তুলে ধরে। যুদ্ধের ময়দান পরিদর্শনে গিয়ে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যকার সে কথোপকথনই হচ্ছে 'গীতা'।

এ আজকের জ্ঞান নয়। হাজার হাজার বছর পূর্বে এমন জ্ঞানসম্মত আলোচনা 'বিস্ময়কর'! আজও মানুষকে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড, জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে শুরু করে জীবনের নৈতিকতা ও করণীয় হয়ে আত্মা-পরমাত্মা ও বিধাতা পর্যন্ত সকল ধারণা মানুষের সামনে তুলে ধরে। মানবজীবনে কিরূপে স্থায়ী শান্তি লাভ করা যায় তা যৌক্তিকতা ও সত্যের আলোকে ব্যাখ্যা করে।

বাইবেল, কোরআনের দিক-নির্দেশনার মূল সুরের সাথে গীতায় আলোচিত বিষয়ের ধারণাগত সাযুজ্যতা আছে। বস্তুত বিধাতা সকল সমাজে একই বার্তা প্রেরণ করেছেন- যেমনটি কোরআনে বলা হয়েছে। গীতার আলোচিত বিষয়, আলোচনার ধরণ ও ধারাবাহিকতা এবং এর উপস্থাপনা অত্যান্ত চমৎকার ও অতুলনীয়!

পূর্বকথা

একজন মুসলিম হিসেবে গীতা সম্পর্কে শৈশব থেকে সম্পূর্ণ ভূল ধারণা নিয়ে বড় হয়েছি। পড়তে গিয়ে আজ বিস্মিত হয়েছি! ব্যাক্তিগত অনুভূতি থেকে উচ্ছসিত হয়ে তাই 'বিস্ময়কর গীতা' নাম দিয়েছি। গীতা বিষয়ে মুসলিম সমাজে দুঃখজনকভাবে ভ্রান্ত ধারণা আছে। গীতার দর্শন বিষয়ে ধারণা নেয়ার জন্য সকলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ রইল।

সঞ্জয় অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রথচালক এবং ঋষি ব্যাসদেবের শিষ্য। ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দান করেন। দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে বসে কুরুক্ষেত্রের সকল ঘটনা অবলোকন করেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অবহিত করেন। এভাবে সঞ্জয়ের বর্ণনায় সমগ্র গীতা উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

রণক্ষেত্র পরিদর্শন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব

(শ্লোক সংখ্যা ৪৬)

সারকথা : যুদ্ধে কাদের সাথে লড়তে হবে অর্জুন সেটি দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সখা, সুপরামর্শদাতা ও রথের সাঁরথী। তিনি দুই শিবিরের মাঝে রথ স্থাপন করেন। অর্জুন দেখেন যাদের সাথে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে তাঁরা সকলেই কোন না কোনভাবে তাঁর স্বজন, আত্মীয় ও গুরুজন। অর্জুনের অন্তর কুলনাশক এমন যুদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করে।

কি করে স্বজন ও গুরুজনদেরকে হত্যা করা সম্ভব? গুরুজনদেরকে হত্যা করা হলে পাপ হবে। এমন যুদ্ধ পরিবারের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনবে। পারিবারিক ঐতিহ্য ধ্বংসের কারণ হবে।

রণক্ষেত্র পরিদর্শনে গিয়ে অর্জুন যুদ্ধের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেন। কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করতে গিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আরেক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মুখোমুখী হন। তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাই এ অধ্যায়ের নাম 'বিষাদযোগ'।

['রণক্ষেত্র পরিদর্শন' এমন শিরোনাম দেখে মনে হতে পারে যে ধর্মশাস্ত্রের সাথে রণক্ষেত্র পরিদর্শনের আবার সম্পর্ক কি? বস্তুত গীতা শাস্ত্রের দিক-নির্দেশনামূলক সকল আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে এই রণক্ষেত্র পরিদর্শন থেকে। তাই শুরুটা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। পূর্বকথায় সংক্ষেপে মহাভারতে উদ্ধৃত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমি তুলে ধরা হয়েছে। গীতা পাঠের পূর্বে পূর্বকথাটি অবশ্যই অবশ্যই পড়ে নিতে হবে।]

শ্লোক নং	উদ্ধৃত শ্লোক
১	ধৃতরাষ্ট্র বলেন: ও-হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে সমবেত হয়ে আমার পুত্র ও পান্ডুর পুত্ররা যুদ্ধে অতি উৎসাহী হয়ে কি করছে?

• **১.১** অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি অবলোকন করেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে অবহিত করেন। দিব্য কথাটির অর্থ হচ্ছে দেবতাতূল্য। দেবতা হচ্ছেন তারা যারা ভগবানের অতিশয় ভক্ত। এখানে ধর্মক্ষেত্র দ্বারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রকে বোঝান হয়েছে। যেখানে ধর্ম তথা নিয়ম, নীতি এবং সত্য ও ন্যায় রক্ষার্থে যুদ্ধ সংঘটিত হতে চলেছে। সঞ্জয় বলেন,

২	হে রাজন! পান্ডব সৈন্যদের ব্যূহাকারে সমরসজ্জিত দেখে রাজা দুর্যোধন গুরুর কাছে গমন করে এবং এই কথাগুলি বলে-

• **১.২** সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন, দুর্যোধন সেনাপতি দ্রোণাচার্যের কাছে যায় এবং শত্রু পক্ষের শক্তি, কৌশল ও সৈন্য সমাবেশ বিষয়ে অবহিত করে। উল্লেখ্য যে, দ্রোণাচার্য কৌরব শিবিরের সেনাপতি হলেও তিনি পান্ডব ও কৌরব উভয় দলের সেনাপতিদের শিক্ষাগুরু। ফলে তিনি সাধারণ সেনাপতিদের মতো নন। তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করতে হলেও অর্জুনও তাঁর অত্যান্ত প্রিয় শিষ্য। বিষয়টি দুর্যোধনও জানে। দুর্যোধন আচার্যের নিকট গমন করে এবং বলে,

৩	হে আচার্য্য! পান্ডবদের বিশাল সৈন্য সমাবেশ দেখুন; আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র অত্যান্ত দক্ষতার সাথে ব্যূহের আকারে সাঁজিয়েছে।
৪	এখানে ভীম-অর্জুনের মতো অনেক বীর ও ধনুর্ধারী আছে এবং যুযুধান, বিরাট ও দ্রুপদের মতো মহাযোদ্ধা আছে।
৫	সেখানে ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্যের মতো মহাশক্তিশালী যোদ্ধারাও আছে।
৬	সেখানে অসম্ভব শক্তিশালী যুধামন্যু, প্রবল পরাক্রমশালী উত্তমৌজ, সুভদ্রার পুত্র ও দ্রৌপদীর পুত্ররা আছে। যারা সবাই এক একজন মহারথী।

● **১.৩-৬** দুর্যোধন শিক্ষাগুরু ও সেনাপতি দ্রোণাচার্যকে শত্রু শিবিরের সকল বীর যোদ্ধাদের সম্পর্কে অবহিত করে। সবকিছু বিবেচনা করে তাঁকে যথাযথভাবে সমরসজ্জা করার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পঞ্চ পান্ডবের পত্নী দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ রাজের সঙ্গে সেনাপতি দ্রোণাচার্যের দ্বন্দ্ব ছিল। সে কারণে দ্রুপদ এক যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং এরূপ বর লাভ করেন যে তার এক পুত্রসন্তান হবে যে দ্রোণাচার্যকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। বিষয়টি দ্রোণাচার্যও অবহিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও দ্রুপদ যখন তাঁর সেই পুত্র ধৃষ্ঠাদুম্নকে সমর ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে প্রেরণ করেন, দ্রোণাচার্য তাঁকে উদারভাবে সকল প্রকারের সামরিক কলা-কৌশল, অস্ত্রবিদ্যা এমনকি গুপ্ত বিষয়সমুহও শিক্ষাদান করেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধৃষ্ঠাধুম্ন পান্ডবদের পক্ষে যোগ দেন এবং পান্ডবদের সৈন্যসজ্জা পরিচালনা করেন। যে শিক্ষা তিনি তাঁর গুরু দ্রোণাচার্যের নিকট থেকে লাভ করেছিলেন।

'আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদ পুত্র ..' এভাবে বলে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে সে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। যেন তিনি সতর্কতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

পান্ডব সেনাপতিরাও তাঁরই শিষ্য। তারা তাঁর সকল কৌশল বিষয়ে অবহিত। বিশেষত অর্জুন তাঁর অত্যান্ত মেধাবী ও প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি যেন তাদের বিষয়ে কোন প্রকার নমনীয়তা বা শিথীলতা প্রদর্শন না করেন- এ কথার মধ্য দিয়ে দুর্যোধন তাঁকে সে বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দেয়। দুর্যোধন বলে,

৭	হে দ্বিজত্তম! আমাদের বাহিনীকে পরিচালনার জন্য যে সকল বিশিষ্ট সেনা নায়কেরা আছেন আপনার অবগতির জন্য তা আমি বলছি।
৮	আপনি স্বয়ং, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ; অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র এবং জয়দ্রথ যারা সমরে সর্বদা বিজয়ী হয়ে থাকে।
৯	এছাড়া আরও অনেক বীর আছেন যারা আমার জন্য জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তারা সবাই নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত এবং সকলে সমর বিশারদ।

১০	ভীষ্মের দ্বারা সুরক্ষিত আমাদের শক্তি অপরিমেয়। ভীমের দ্বারা রক্ষিত তাদের শক্তি পরিমিত।
১১	আপনারা সবাই সকল ব্যূহ প্রবেশ পথে স্ব স্ব অবস্থানে অবস্থান করে ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

● **১.৭-১১** অতঃপর দুর্যোধন নিজ শিবিরের সৈন্যদের সম্পর্কে দ্রোণাচার্যকে ধারণা দেয়। সেখানে দ্রোণাচার্য নিজে উপস্থিত। যিনি পান্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষের সেনানায়কদের অস্ত্র ও সমরবিদ্যা বিষয়ক শিক্ষাগুরু। আছেন ভীষ্ম যিনি পান্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষের পিতামহসম।

আরও যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন- কর্ণ, পান্ডবদের বৈপিত্রিয় ভাই। পান্ডবদের মাতা কুন্তীদেবী রাজা পান্ডবের সাথে বিবাহের পূর্বে কর্ণের জন্ম হয়। আছেন কৃপাচার্য যার জমজ দুই বোনের সাথে দ্রোণাচার্যের বিবাহ হয়। অশ্বত্থামা হচ্ছেন দ্রোণাচার্যের ছেলে। বিকর্ণ দুর্যোধনের ভাই। জয়দ্রথ সিন্ধু দেশের রাজা এবং দুর্যোধনের ভগ্নিপতি।

এছাড়াও নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত অভিজ্ঞ ও সামরিক বিশারদ অনেক বীর যোদ্ধা আছেন যারা দুর্যোধনের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

পিতামহ ভীষ্মদেবের তত্ত্বাবধানে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী দুর্যোধনের। অপরদিকে পান্ডবদের সৈন্য বাহিনী সীমিত ও ভীমের দ্বারা সুরক্ষিত। শৌর্য-বীর্য, অভিজ্ঞতা ও সুনামে ভীষ্মের তুলনায় যা অতি নগন্য। জয়ের বিষয়ে দুর্যোধন আশাবাদী।

যুদ্ধে দুর্যোধনের জয়লাভ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের পূর্ণ সহযোগীতা প্রাপ্তির ওপর ভীষনভাবে নির্ভর করছে। দুর্যোধনের বিশ্বাস ছিল যে এ দু'জন মহারথী তাকে পূর্ণ সহযোগীতা দেবেন। কেননা তারা ধর্মের রক্ষক। অর্থাৎ তারা নিয়ম-বিধি বা অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেন। বিধি ভঙ্গ করেন না।

হস্তিনাপুরের রাজ্যসভায় সমস্ত রাজ পুরুষগণের সামনে যখন পঞ্চ পান্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করা হচ্ছিল, তখন পাশা খেলার নিয়ম অনুযায়ী অসহায় দ্রৌপদীর আকুল আবেদন সত্বেও তারা দু'জন কোন প্রকার সাড়া দেননি। যদিও দুর্যোধন জানত যে তারা উভয়ে পান্ডবদের বেশ স্নেহ করেন। ফলে তার বিশ্বাস ছিল যে এ দু'জন নিয়ম তথা ধর্ম মেনে চলবে এবং যুদ্ধে তাকে পূর্ণ সহযোগীতা দেবে।

ভীষ্ম বড় যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বয়স হয়েছে। কিন্তু তাঁর ভাবমূর্তীর উচ্চমূল্য আছে। কৌরবদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি সৈন্যদের মনবলকে উচ্চে উন্নীত রাখতে যথেষ্ট। আবার শত্রুপক্ষের মনবলকে দুর্বল করে দিতেও গুরুত্বপূর্ণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের জয়লাভ পিতামহ ভীষ্মের টিকে থাকার ওপর ভীষনভাবে নির্ভর করছে। তাই তাঁকে সুরক্ষা দেয়া অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজ নিজ কৌশলগত অবস্থানে সমরসজ্জায় থেকে পিতামহ ভীষ্মকে পূর্ণ সুরক্ষা দেয়ার বিষয়টি তাই দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সময়ে,

১২	কুরুবংশের প্রতাপশালী বৃদ্ধ পিতামহ উৎফুল্লতা প্রকাশ করে সিংহের গর্জনের মতো অতি উচ্চ নাদে তাঁর শঙ্খ বাজালেন।
১৩	অতঃপর সহসা শঙ্খ, ভেপু, মৃদঙ্গ, ঢাক, রণ শঙ্খসমুহ একত্রে বেজে তুমুল হয়ে উঠল।

● **১.১২-১৩** সঞ্জয় বলেন, এ সময়ে কুরুবংশের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম উৎফুল্লতা প্রকাশ করে তাঁর শঙ্খ বাজালেন। তাঁর সাথে সকলে নিজ নিজ শঙ্খ বাজিয়ে ময়দানে তুমুল শব্দের সৃষ্টি করল।

যুদ্ধ সহজ বিষয় নয়। জীবন-মরণ খেলা। হৃদকম্প হবে। তুমুল নাদ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে সাধারণত সকলের মনে সাহস সঞ্চার ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করা হয়। একইসাথে এ নাদ প্রকান্ড সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতিকে জানান দেয়। শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মনবলকে দুর্বল করতেও এটি কাজ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সৈন্যদের মনোজগতের ওপর এ ধ্বনির ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রভাব আছে।

উভয়পক্ষের সৈন্যসজ্জা বিষয়ে দুর্যোধন অবহিতকরণের অব্যবহিত পরে পিতামহ ভীষ্মের এ শঙ্খ বাজাবার আরও একটি মনস্তাত্বিক কারণ আছে। এর মাধ্যমে তিনি দুর্যোধনের পক্ষে সততার সাথে তাঁর কর্তব্য পালনের বিষয়ে তাকে আশ্বস্ত করেন। কেননা পান্ডবরাও তাঁর অত্যান্ত প্রিয়। পান্ডবরা তাঁরই তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। তথাপি কর্তব্য পালনে তাঁর নিষ্ঠার বিষয়টি এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করেন। দুর্যোধনের সংশয় দুর করার চেষ্টা করেন। সঞ্জয় বলেন,

১৪	তখন সাদা ঘোড়ার বিখ্যাত রথে স্থিত মাধব ও পান্ডব দিব্য শঙ্খ বাজালেন।

১৫	হৃষিকেশ তাঁর পাঞ্চজান্য, ধনঞ্জয় তাঁর দেবদত্ত, ভোজন প্রিয় ও কর্মোৎসাহী ভীম তাঁর পৌন্ড্র নামক ভয়ংকর শঙ্খ বাজালেন।
১৬	কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয়া, নকুল ও সহাদেব সুঘোষ ও মুণপুষ্পক, মহান ধনুর্ধর কাশিরাজ ও মহাযোদ্ধা শিখন্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নো, বিরাট, অপরাজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সুভদ্রার মহা বলবান পুত্র- হে মহারাজ! সকলে পৃথকভাবে নিজ নিজ শঙ্খসমুহ বাজালেন। [১৬-১৮]
১৯	সেই তুমুল শব্দ স্বর্গ-মর্ত্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিল।
২০	হে মহারাজ! এ সময়ে হনুমান চিহ্নিত পতাকা শোভিত রথে অধিষ্ঠিত পান্ডব, ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়দের যুদ্ধাবস্থানের দিকে ধনুক উত্তলন করে অস্ত্র নিক্ষেপে উদ্যত হয়ে হৃষিকেশকে এ কথাগুলি বলেন-

[শ্রীকৃষ্ণকে এখানে মাধব নামে অভিহিত করা হয়েছে। মাধব হচ্ছেন সৌভাগ্যের প্রতীক লক্ষী দেবীর পতি। তাই তাঁকে এ নামে ডাকা হয়েছে। তাঁকে 'হৃষিকেশ' বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। হৃষিকেশ হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিশ্বর। পান্ডব শব্দে পান্ডুপুত্র অর্জুনকে বোঝান হয়েছে। অর্জুনকে ধনঞ্জয় নামেও সম্বোধন করা হয়েছে। যিনি ধন বা দৈবী সম্পদ জয় করেছেন।]

● **১.১৪-২০** সঞ্জয় আরও বলেন যে, কৌরব শিবিরে নাদের সৃষ্টি হলে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির সহ পান্ডব শিবিরেও প্রতিউত্তরে সকলে নিজ নিজ শঙ্খ বাজাতে শুরু করেন। নানান শঙ্খের সেই নাদে আকাশ, বাতাস, ধরিত্রী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে।

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে বসে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে কুরুক্ষেত্রের পরিস্থিতি অবলোকন করছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে অবহিত করছেন। সঞ্জয় বলেন, অর্জুন উত্তেজিত হয়ে রথে দাড়িয়ে শত্রুদের প্রতি তীর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হন। এ সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিচের কথাগুলি বলেন। অর্জুন বলেন,

২১	হে অচ্যুত! উভয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যস্থানে আমার রথ স্থাপন কর। যতক্ষণ না আমি দেখি যুদ্ধে অভিলাষী উপস্থিত কাদের সঙ্গে আমাকে এই রণে যুদ্ধ

	করতে হবে। [২১-২২]
২৩	আমি দেখতে চাই ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রের পক্ষে যুদ্ধের বাসনা নিয়ে কারা এখানে সমবেত হয়েছে।

[শ্রীকৃষ্ণকে এখানে অচ্যুত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অচ্যুত হচ্ছেন যিনি নীতি বা কর্তব্য তথা নিয়ম বা ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন না।]

• **১.২১-২৩** দুর্যোধনের পক্ষে কুরুবংশের ও ভারতবর্ষের কারা যুদ্ধ করতে এসেছে অর্জুন তা দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। শত্রুদের সৈন্যবল ও সমরসজ্জা বিষয়েও একটি ধারণা নিতে চান। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উভয় সৈন্যদলের মধ্যখানে রথ স্থাপন করতে বলেন। সঞ্জয় বলেন,

২৪	হে ভারত! গুড়াকেশ এভাবে বললে হৃষিকেশ উভয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যখানে রথ স্থাপন করেন।
২৫	ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত নৃপতিদের দেখিয়ে বলেন: হে পার্থ! দেখ এদেরকে; কুরু বংশের সকল সদস্য যারা সমবেত হয়েছে।
২৬	অর্জুন সেখানে উপস্থিত পিতৃব্য, পিতামহদের, গুরুদের, মাতুল, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রদের, বন্ধুদের, শ্বশুরদের এবং শুভাকাঙ্খিদের উভয় সেনাদলে অন্তর্ভূক্ত দেখতে পেলেন।
২৭	বন্ধু প্রতীম সকলকে যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখে কুন্তীপুত্র শোকে অত্যান্ত কাতর ও বিষন্ন হয়ে বলেন-

[ধৃতরাষ্ট্রকে এখানে ভারত নামে সম্বোধন করা হয়েছে। কোথাও আবার অর্জুনকেও বলা হয়েছে। তাঁরা সকলে ভরত রাজার বংশধর তাই এভাবে বলা হয়েছে। সঞ্জয় অর্জুনকে 'গুড়াকেশ' নামে সম্বোধন করেন। গুড়াকেশ হচ্ছেন যিনি নিদ্রা বা অজ্ঞতাকে জয় করেছেন। অর্জুন ছিলেন তেমনই একজন। অর্জুন হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বাসুদেবের ভগ্নী কুন্তি দেবী বা পৃথার পুত্র। তাই অর্জুনকে 'পার্থ' নামেও সম্বোধন করা হয়েছে।]

• **১.২৪-২৭** শ্রীকৃষ্ণ দুই শিবিরের মাঝে রথ স্থাপন করেন। বলেন, দেখ এদেরকে কুরু বংশের সকল সদস্য যারা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে

পান্ডুর উত্তরাধীকারীদেরকে পান্ডব এবং ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয়দের কুরু বংশের উত্তরাধীকারী হিসেবে কৌরব নামে অভিহিত করা হয়েছে।

অর্জুন উভয় শিবিরে বন্ধু-শুভাকাঙ্খী, আত্মীয়-পরিজনদের দেখতে পেলেন। কে নেই সেখানে? পিতামহ ভীষ্ম যার স্নেহে তারা বড় হয়েছেন। শিক্ষাগুরু দ্রোণ যার কাছে তাঁরা সমরবিদ্যা ও অস্ত্রচালনা বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেছেন। সেখানে নিজের পরিবার, মামার পরিবার, শ্বশুড়ের পরিবার, সুহৃদ ও গুরুজনদের দেখতে পেলেন। বন্ধু প্রতীম সকলকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত দেখে অর্জুন শোকে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। বিষন্নচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,

২৮	হে কৃষ্ণ! যুদ্ধের অভিলাষী সকল স্বজনদেরকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে আমার শরীর অবশ হয়ে আসছে- মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে।
২৯	আমার শরীর কাঁপছে এবং পশম দাড়িয়ে যাচ্ছে, হাত থেকে গান্ডীব খসে পড়ছে- ত্বক যেন পুড়ে যাচ্ছে।
৩০	আমি স্থির থাকতে পারছি না। আমার মন উদভ্রান্ত হচ্ছে। হে কেশব! এর মাঝে কেবল অমঙ্গলের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

[শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন কেশী দানব হন্তা তাই তাঁকে এখানে কেশব নামে অভিহিত করা হয়েছে।]

● **১.২৮-৩০** যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় শিবিরে এত এত স্বজন ও গুরুজনদেরকে দেখে অর্জুনের দেহ অবশ হয়ে আসে। দেহে কম্পন শুরু হয়। তাঁর মুখ শুকিয়ে আসে। শরীরে জ্বালা-যন্ত্রনা শুরু হয়। হাত থেকে ধনুক গান্ডীব খসে পড়ার উপক্রম হয়। অর্জুন নিজেকে স্থির রাখতে পারছেন না। নিমেষেই উদাস ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে যান। তিনি যুদ্ধের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেন।

এতসব আয়োজন ও কর্মকান্ডের মধ্যে তিনি ব্যাক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি বংশের কোন মঙ্গল দেখতে পেলেন না। সকল আয়োজন ও কর্মকান্ডের মধ্যে কেবল অমঙ্গলের ছাঁপ দেখতে পেলেন। এ অবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,

৩১	হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে স্বজনদের হত্যা করে আমি কোন মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি না। না

	এর মধ্য দিয়ে আমি কোন বিজয়, না কোন সুখ আকাঙ্খা করতে পারি?
৩২	হে গোবিন্দ! রাজ্যে আমাদের কি প্রয়োজন কিংবা বেঁচে থেকে সুখ ভোগে? যখন যাদের জন্য আমাদের রাজ্য জয় কিংবা সমস্ত সুখভোগ সেই আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ, কুটুম্বগণ সকলে ধন-সম্পদ ও জীবনের মায়া ত্যাগ করে এখানে এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে? হে মধুসূদন! আমাকে হত্যা করলেও আমি তাদেরকে হত্যা করতে চাই না। [৩২-৩৪]
৩৫	পৃথিবীর তো কথাই হয় না এমনকি ত্রিভূবনের রাজ্যের বিনিময়েও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিধন করে কি সুখ প্রাপ্তি হবে আমাদের, হে জনার্দন!
৩৬	এই সকল আততায়ীদের হত্যা করলে পাপ আমাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। তাই সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করা আমাদের উচিত হবে না। হে মাধব! স্বজনদের হত্যা করে কিভাবে আমরা সুখী হব?

[শ্রীকৃষ্ণ গরু ও ইন্দ্রিয়সমুহকে আনন্দ দিতেন বলে তাঁকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করা হয়েছে। মধু নামের এক অসুর, দানব বা দুষ্ট চরিত্রের লোককে হত্যা করেছিলেন বলে তাঁকে মধুসূদন নামেও অভিহিত করা হয়েছে। জনার্দন নামেও ডাকা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত জীবের পালনকর্তা।]

● **১.৩১-৩৬** অর্জুন বলেন, যুদ্ধে স্বজনদের হত্যা করে কোন মঙ্গল হতে পারে না। না এতে কোন সত্যিকারের বিজয় বা সুখ আছে। আপনজনদেরকে হত্যা করে কোন কিছু প্রাপ্তিতে তৃপ্তি নেই। সারাজীবন সে শোক অন্তরে বয়ে বেরাতে হবে। মানুষ জীবন বিসর্জন দেয় স্বজনদেরকে রক্ষা করার জন্য। অথচ এ যুদ্ধে স্বজনরাই স্বজনদেরকে হত্যা করতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে! যুদ্ধ যদি করতে হয় তবে সেটি করতে হবে বাইরের শত্রুর সাথে। ঘরের লোকের সাথে নয়।

অর্জুন বলেন, আমাকে হত্যা করলেও আমি তাদেরকে হত্যা করতে চাই না। পৃথিবী তো দুরের কথা এমনকি স্বর্গরাজ্য পেলেও স্বজনদেরকে হত্যা করে রাজ্য সুখ লাভ করতে চাই না। স্বজনদেরকে হত্যা করলে পাপ হবে। কার্যকারণ সূত্রে তা বহুদুর পর্যন্ত গিয়ে গড়াবে। স্বজনদের হত্যা করা উচিত হবে না। একজন সুস্থ্য-

স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ হিসেবে এবং বাস্তবতার নিরিখে অর্জুনের এমন ভাবনা মোটেও অমূলক নয়। অর্জুন আরও বলেন,

৩৭	যদিও লোভে মোহাবিষ্ট চিত্তে কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহে তারা কোন পাপ দেখছে না, কিন্তু কুল ক্ষয়জনিত দোষ লক্ষ্য করেও আমরা কেন সেই পাপ থেকে নিবৃত হব না? [৩৭-৩৮]
৩৯	কুলক্ষয় হলে চিরাচরিত কুলধর্ম বিনষ্ট হয় এবং ধর্ম নষ্ট হলে অধর্ম সমগ্র বংশকে গ্রাস করে।
৪০	হে কৃষ্ণ! অধর্মের প্রাদুর্ভাব হলে কুল বধুগণ ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়; স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্রা হলে- হে বাঞ্চেয়! বর্ণসঙ্কর বা অবাঞ্চিত প্রজাতি উৎপন্ন হয়।
৪১	বর্ণসঙ্কর কুলনাশকারী ও কুল উভয়ের জন্য নরকের কারণ হয় এবং পিন্ডদান ও তর্পনক্রিয়া লোপ পাওয়ার ফলে তাদের পিতৃপুরুষেরাও অধঃপতিত হয়।
৪২	কুলনাশকদের অপকর্মে উৎপন্ন এইসব অবাঞ্ছিত সন্তানাদির কারণে সনাতন বা শাশ্বত জাতিধর্ম ও কুলধর্ম উচ্ছন্নে যায়।
৪৩	হে জনার্দন! পরম্পরায় শুনেছি যে, মানুষের মধ্যে যাদের কুলধর্ম উচ্ছন্নে যায় তারা সর্বদা নরকে বাস করে।

[বৃষ্ণি বংশদ্ভূত বিধায় শ্রীকৃষ্ণকে এখানে বাঞ্চেয় নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্ণসঙ্কর হচ্ছে বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রনে উৎপন্ন সন্তানাদি। জাতিধর্ম হচ্ছে বর্ণ অনুযায়ী স্ব স্ব ধর্ম। কুলধর্ম হচ্ছে কুলের উপাসনা পদ্ধতি ও আচার নিয়মাদি। অর্থাৎ পূর্ব-পুরুষদের পরম্পরাগত ধর্ম।]

● **১.৩৭-৪৩** ক্ষমতা ও রাজ্য লোভে মোহাবিষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহে কোন পাপ দেখছে না। তারা অবিবেচক। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, জেনে-বুঝেও আমরা কেন একই কাজ করব? কেন অমঙ্গলকর কর্ম থেকে নিবৃত হব না?

কুলক্ষয় তথা কুলের বয়োজেষ্ঠ, গুরুজন বা কুলের সদস্যদের নাশ হলে যারা বংশে বা সমাজে নিয়মের ধারক তেমন মানুষের অভাব হবে। ধর্ম বা নিয়ম ধ্বংস হবে। বংশে ও সমাজে অধর্ম প্রবেশ করবে।

ধর্ম নষ্ট হলে স্ত্রী জাতি অধর্মের কাজে লিপ্ত হয়। এতে অবাঞ্চিত প্রজাতির সৃষ্টি হয়। বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হয়। বর্ণসঙ্কর নরকের কারণ হয়।

বিধি অনুসারে পিতৃপুরুষের আত্মাদের জন্য পিন্ডদান ও জল উৎসর্গ করা হয়। এতে তাদের পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং তারা শান্তিলাভ করেন। কিন্তু এমন অপকর্মে সেসব বিনষ্ট হয়ে যায়। পিতৃপুরুষগণ অধঃপতিত হন।

কুলনাশকদের অপকর্মে উৎপন্ন অবাঞ্ছিত সন্তানাদির কারণে জাতিধর্ম ও কুলধর্ম উচ্ছন্নে যায়। যারা পারিবারিক ঐতিহ্য ধ্বংস করে তারা সর্বদা নরকে বাস করে।

অর্জুন বলেন, কুলক্ষয়জনিত দোষ লক্ষ্য করেও আমরা কেন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মতো একই পাপকর্মে লিপ্ত হব? তাহলে জ্ঞানী-নির্জ্ঞানী, ভাল-মন্দের পার্থক্য কোথায়? অর্জুন হতাশা প্রকাশ করে বলেন,

৪৪	হায়! কি আশ্চর্য্য! রাজ্যসুখ ভোগের লালসায় আমরা স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি!
৪৫	যদি কোনরূপ প্রতিরোধ ছাড়া অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা রণক্ষেত্রে নিরস্ত্র অবস্থায় আমাকে হত্যা করে, তবে সেটি আমার জন্য অধিকতর মঙ্গলকর হবে।
৪৬	শোকাকুল চিত্তে এভাবে বলে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে তীর-ধনুক ত্যাগ করে রথের ওপর বসে পরেন।

- **১.৪৪-৪৬** ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার লাভের বাসনা ও রাজকীয় সুখ ভোগের জন্য অবিবেচকেরা স্বজনদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। অর্জুনের মনে হচ্ছে এমন পাপ কাজ করার চেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কোনরূপ প্রতিরোধ ছাড়া যদি নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁকে হত্যা করে তবে সেটিই বরং শ্রেয়।

রণক্ষেত্রে শত্রুসৈন্য পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আপনজনদেরকে দেখে অর্জুনের হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়। এমন যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না বলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর অভিমত তুলে ধরেন। বিষন্নচিত্তে ধনুক ত্যাগ করে ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে রথে বসে পড়েন। অর্জুনের ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত আরেক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা হয়।

হস্তিনাপুরে বসে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের পরিস্থিতি অবলোকন করেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধক্ষেত্রের সকল বিষয় এভাবেই অবহিত করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেশে দেশে এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে ক্ষমতার কারণে সন্তান পিতা-মাতাকে কিংবা পিতা-মাতা নিজ সন্তানকে হত্যা করেছে। ভাই ভাইকে হত্যা করেছে। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজন তো আরও অনেক দুরের কথা।

কেউ খুন করেছে, কেউ দেশ থেকে আপনজনদেরকে বিতাড়িত করেছে। বস্তুত যারা এসব করেছে এসবের মধ্য দিয়ে তারা কি অর্জন করেছে? ক'দিনের জন্য? কিসের জন্য? তাদের জীবনে চিরস্থায়ী কি প্রাপ্তি ঘটেছে? এখন কোথায় তাদের অন্তরের সেইসব বাসনা, খায়েস বা ক্ষোভের আগুন?

ভূল মানুষেরা চিরকালই এভাবে অপ্রয়োজনীয় জাগতিক কর্মের বন্ধনে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। অতঃপর মহাব্যাস্ততা নামক গুরুত্বপূর্ণ (!) সব কর্ম করে জীবন অতিবাহিত করে। অথচ তাদের যথাযথ কর্ম (?) করার কথা ছিল। কিন্তু তারা তা না করে অপ্রয়োজনীয় পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে। তারা জানে না বা বিশ্বাস করে না বা মোহবশত ভূলে যায় যে কর্মের ফল একদিন ভোগ করতে হবে। এমনই কোন এক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিচের কথাগুলি বলা হয়েছে,

"আমি তোমাদের নিকট থেকে এই বলে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করবে না এবং নিজেদের লোকদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করবে না। .... তথাপি তোমরা পরস্পর খুনোখুনি করেছ এবং একে অপরকে পাপ ও অন্যায় কাজে সহায়তা করার মাধ্যমে তোমাদেরই একদলকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছ। .... যারা এরূপ করেছে পার্থিব জীবনে কেবল দূর্গতি ছাড়া তারা আর কি পুরস্কার লাভ করেছে? পুনরুত্থান দিবসে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত নন। এরাই হচ্ছে তারা যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করে। এদের শাস্তি লঘু হবে না এবং তাদেরকে কোনরূপ সহায়তাও প্রদান করা হবে না।" (আল-কোরআন ২:৮৪-৮৬)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ৭২)

সারকথা : রণক্ষেত্র পরিদর্শনে গিয়ে অর্জুন শত্রুপক্ষে স্বজন ও গুরুজনদেরকে দেখে যুদ্ধের স্পৃহা হারিয়ে ফেলেন। যুদ্ধে স্বজন ও গুরুজনদেরকে হত্যা করতে হবে এমন ভাবনা তাঁকে শোকে আচ্ছন্ন করে। গুরুজনদেরকে হত্যা করা হলে পাপ হবে। অমঙ্গলকর কুলনাশক এমন যুদ্ধ করতে তিনি অনীহা প্রকাশ করেন। শোকাহত অর্জুন সংসার নামক এমন যাতনা থেকে মুক্তি চান। তিনি যুদ্ধ করবেন না বলে স্থির করেন। সন্ন্যাস জীবন যাপনের ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এমন সংকটময় মুহূর্তে কর্তব্যকর্ম পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেন। যুদ্ধ করার জন্য তাঁকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। শোক ও পাপের বোধ থেকে তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। কারও মৃত্যুতে শোক করার কোন যৌক্তিক কারণ নেই সাংখ্যের আলোকে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর কর্মযোগের আলোকে কিভাবে কর্ম করলে পাপ ও কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায় সে আলোচনা করেন।

জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কর্ম বা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। তবেই শোক, পাপ সকল যাতনা থেকে সত্যিকারের মুক্তি লাভ হয়। অন্য কোনভাবে নয়। কর্মত্যাগেও নয়।

কিভাবে কর্ম করেও পাপের বোধ থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের শান্তি লাভ করা যায় অধ্যায়ে সে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

১	সঞ্জয় বলেন: অর্জুনকে এভাবে অশ্রুসিক্ত চোখে ব্যাকুল ও শোকসন্তপ্ত দেখে মায়ায় আবিষ্ট হয়ে মধুসূদন এই কথাগুলি বলেন।
২	হে অর্জুন! এই মহা সংকটকালে অনার্যের মতো স্বর্গ ও কীর্তি হানিকর এমন মোহ কোথা থেকে তোমার মধ্যে উপস্থিত হল!
৩	ক্লিবত্ব গ্রহণ কর না হে পার্থ! এটি তোমার জন্য উপযুক্ত নয়। চিত্তের এমন নিচু পর্যায়ের দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। উত্থিত হও, হে পরন্তপ!

● **২.১** রণাঙ্গন পরিদর্শনে গিয়ে শত্রু শিবিরে স্বজনদের দেখে অর্জুন শোকে মূহ্যমান হন। সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন, অর্জুনকে অশ্রুসিক্ত চোখে উদাস ও ব্যাকুল দেখে শ্রীকৃষ্ণের মায়া হয়। তিনি তাঁকে নিচের কথাগুলি বলেন।

● **২.২** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সংকটকালে এমন শোকের প্রকাশ যথাযথ নয়। চিত্তের এমন দুর্বলতা মানুষকে উচ্চতর লোকে বা পর্যায়ে উন্নীত করে না। নিজ কীর্তিকেও বিনষ্ট করে। বাস্তব জীবনে তো নয়ই এমনকি আধ্যাত্মিক জীবনেও মানুষ অগ্রসর হতে পারে না।

অর্জুনের মতো মহান যোদ্ধার চিত্তে এমন নিচু পর্যায়ের অনুশোচনার আবির্ভাব হতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ আশ্চার্যান্বিত হন! কেননা অর্জুন নিজেই এ যুদ্ধের পেছনের কারণ তথা ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে সবিশেষ অবগত।

এখানে 'অনার্যের মতো' কথাটি ব্যাবহার করা হয়েছে। তৎকালে আর্যরা অনার্যদেরকে তাদের চেয়ে নিচু পর্যায়ের জ্ঞান ও মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলে মনে করত। অজ্ঞতা ও নিচু পর্যায়ের ভাবনা ও মানসিকতা বোঝাতে তাই অনার্য কথাটি উদাহরণস্বরূপ ব্যাবহার করা হয়েছে । এর মানে এই নয় যে অনার্য মাত্রই জ্ঞানসম্পন্ন নয়।

বস্তুত সব মানুষ একইরকম। কারও প্রতি কারও বিরোধীতা বা কোন একসময়ে পূর্ব-পুরুষদের একের প্রতি অপরের শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে মানুষ এভাবে বলে থাকে। সময়ে সেটি একটি সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়। এটিও তেমন প্রচলিত উদ্ধৃতির উদাহরণ।

● **২.৩** চিত্তের দুর্বলতা মানুষকে অচল করে দেয়। এই অচলত্বই হচ্ছে ক্লিবত্ব বা বন্ধ্যাত্ব। অর্জুনের মতো যশোশীল যোদ্ধার কাছে এমন আচরণ প্রত্যাশা করা যায় না। অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে চিত্তের এমন দুর্বলতা কাটিয়ে অস্ত্র হাতে উঠে দাড়াতে বলেন। প্রতিটি সমাজে সংকটকালে দয়াময় এমনিভাবে অনুপ্রেরণা হয়ে মানুষকে জাগিয়ে তোলেন। যেমন বলা হয়েছে,

"তুমি বস্ত্র দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদন করে রেখেছ। জেগে ওঠ! সতর্ক কর! তোমার প্রতিপালকের মহাত্ম ঘোষণা কর। পোষাক পরিচ্ছন্ন কর। অশুচি পরিত্যাগ কর।

পার্থিব কোন কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করো না। তোমার প্রতিপালকের কারণে ধৈর্য্যধারণ কর।" (আল-কোরআন ৭৪:১-৭)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য হোক কিংবা না হোক এর মাধ্যমে মানবজাতিকে বহুবিধ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সবচেয়ে বড় যে বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে অন্যায়কে ছেড়ে দিতে নেই। তাহলে জগত অন্যায়ে ছেঁয়ে যাবে। জগত-সংসার বিশৃংখল হবে। অন্যায় আচরণের প্রতিষ্ঠা সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ হবে। তাই এভাবে বলা হয়েছে,

"যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি একান্তই দয়াশীল।" (আল-কোরআন ২:২৫১)

দয়াশীল বলে তিনি একদলকে দিয়ে অপরদলের অন্যায়কে প্রতিহত করেন এবং জীবন ও জগতে সত্য ও ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। জীবন ও জগতকে সুশৃংখলভাবে চলমান রাখা ধর্মের মূল কাজ। আর সে কারণে মানুষকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখতে উপাসনা থেকে শুরু করে নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-বিধান পালনের প্রয়োজন হয়। অন্যথায় ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

মানুষ বাহিরকে দেখে ভেতরকে বুঝতে শেখে। ভেতরকে উপলব্ধি করে বাহিরকে বুঝতে শেখে। আবার যেটিকে বাহির বলি সেটিও কোন এক ভেতর। যেটিকে ভেতর বলি সেটিও কারও কাছে বাহির। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যেমন বাহিরে সংঘটিত হয়েছে তেমনি অন্তরেও রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন বলেন,

৪	হে মধুসূদন! ভীষ্ম ও দ্রোণের মতো পূঁজনীয়দের যুদ্ধে আমি কিভাবে বাণের দ্বারা প্রতি-আক্রমন করতে পারি, হে অরিসূদন?
৫	মহানুভব গুরুজনদের হত্যা না করে ভিক্ষে করে ইহলোক ভোগ করাও শ্রেয়। গুরুজনদের হত্যা করলে রক্তমাখা ভোগ্যসমুহ ভোগ করতে হবে।
৬	যদি আমরা জয়ী হই অথবা যদি আমাদেরকে জয় করা হয়, এ দুয়ের মধ্যে কোনটি আমাদের জন্য শ্রেয় এটাও আমরা জানি না। যাদেরকে হত্যা করে বেঁচে থাকতে চাই না ধৃতরাষ্ট্রের সেই পুত্রগণই সম্মুখে উপস্থিত।

● **২.৪** একদিকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অস্ত্র হাতে উঠে দাড়াতে বলছেন। অন্যদিকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে, পিতামহ 'ভীষ্ম' যার স্নেহ ও সুরক্ষায় তারা বড় হয়েছেন, শিক্ষাগুরু 'দ্রোণাচার্য' যার হাতে তাদের সমরবিদ্যার শিক্ষা লাভ- যুদ্ধে এমন গুরুজনদের প্রতি কিভাবে তাঁর পক্ষে তীর নিক্ষেপ করা সম্ভব যখন তারা শত্রুপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন?

● **২.৫** অর্জুন মনে করেন এমন মহানুভব পরম পূঁজনীয়দের হত্যা করে জীবন ভোগ করার চেয়ে, বরং কোন কিছু না পেয়ে ইহজীবন ভিক্ষে করে কাটিয়ে দেয়াও উত্তম। গুরুজনদের হত্যা করে জাগতিক কোন লাভ কামনা করলে সেটি তাদের রক্তে রঞ্জিত হবে। জয়ী হলেও মানসপটে সে দাগ থেকে যাবে। শান্তি আসবে না।

● **২.৬** মানুষ যুদ্ধ করে শত্রুর হাত থেকে আপনজনদেরকে রক্ষা করার জন্য। তদুপরি যুদ্ধ জয়ের ফলে যা কিছু অর্জন হয় সে আনন্দ স্বজনদের সঙ্গে ভাগাভাগী করে নেয়। এগুলিই হচ্ছে জাগতিক আনন্দ। সে কারণে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বীরত্বও প্রদর্শন করে। কিন্তু এ যুদ্ধে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের আনন্দ ভাগাভাগী করে নিতে হবে সেই তারাই বিপক্ষ শিবিরে উপস্থিত। অস্ত্র হাতে একে অন্যকে সংহার করতে উদ্যোত হয়েছে।

অর্জুন বলেন, মানুষ জানে না যে কোন কাজটি তাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং কোনটি অমঙ্গলকর। এমতাবস্থায় যে কোন একটি সিদ্ধান্ত নেয়া যেতেই পারে। অর্জুন যুদ্ধ না করে ভিক্ষে করার মতো বিষয়কে বেছে নিতে চাইছেন। বলা হচ্ছে,

"তোমাদের ওপর যুদ্ধ নির্দেশিত হয়েছে যদিও এটি তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। কিন্তু হতে পারে যে তোমরা কোন একটি বিষয়কে অপছন্দ করছ, কিন্তু সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর; আবার হতে পারে যে কোন একটি বিষয়কে পছন্দ করছ, অথচ সেটি তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।" (আল-কোরআন ২:২১৬)

এখানে ভিক্ষে করা বলতে সর্বকর্ম ত্যাগ করে প্রচলিত অর্থের সন্ন্যাস জীবন বেছে নেয়াকে ইংগীত করা হয়েছে। অর্জুন যুদ্ধ করবেন নাকি যুদ্ধ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করবেন, সংকটকালে কর্তব্য নির্ধারণে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,

৭	চিত্তের দীনতায় আহত, ধর্ম তথা কর্তব্য বিষয়ে হতবুদ্ধি আমি। তোমার কাছে জানতে চাই যা আমার জন্য ভাল হবে তা নিশ্চিত করে বল। এখন আমি তোমার শিষ্য। তোমার স্মরণাপন্ন। আমাকে পরামর্শ দাও।
৮	পৃথিবীতে দেবতাদের মতো আধিপত্য নিয়ে সমৃদ্ধ নিষ্কন্টক কোন রাজ্য লাভ করলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে শুকিয়ে দিচ্ছে তা নিবারণ করতে পারে তেমন কিছু দেখছি না।

● **২.৭** শত্রু শিবিরে স্বজন ও গুরুজনদের দেখে অর্জুন মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন। এ অবস্থায় 'যুদ্ধ নাকি সন্ন্যাস' কি করা উচিত বা কি করা উচিত না তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। ধর্ম তথা কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণ বিষয়ে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে অর্জুন তাঁর পরামর্শ কামনা করেন।

● **২.৮** শোকে বিহ্বল অর্জুন নিজেকে স্থির রাখতে পারছেন না। বিনা যুদ্ধে দেবতাদের মতো কোন স্বর্গরাজ্য পেলেও তাঁর এ শোক দুর হবার নয়। এ অবস্থা থেকে তিনি পরিত্রানের কোন উপায় দেখছেন না। ওপরে উদ্ধৃত সকল আলোচনা বস্তুত সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করছিলেন। সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন,

৯	পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষিকেশকে বলেন, 'গোবিন্দ, আমি যুদ্ধ করব না', এভাবে বলে নিরব হয়ে গেলেন।

● **২.৯** সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন, এমন অবস্থায় অর্জুন যুদ্ধ করবেন না বলে স্থির করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, 'গোবিন্দ, আমি যুদ্ধ করব না'। অতঃপর নিশ্চুপ হয়ে যান।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপরের কথোপকথন থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়। যে বিষয়গুলিকে আলোচনায় প্রাধান্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ম তথা যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। গীতার সামগ্রীক আলোচনাও বিষয় তিনটিকে প্রধান্য দিয়েই আবর্তীত হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে আরও আলোচনা এসেছে। বিষয় তিনটি হচ্ছে,

১. শোক। এ যুদ্ধে স্বজন ও গুরুজনদেরকে হত্যা করতে হবে। অর্জুন এ শোক নিতে পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে শোক করার যথাযথ কোন কারণ নেই।

২. পাপবোধ। যুদ্ধে স্বজন ও গুরুজনদেরকে হত্যা করা হলে পাপ হবে। এ পাপবোধকে অর্জুন মেনে নিতে পারছেন না। কিভাবে কর্ম করলে পাপ স্পর্শ করে না শ্রীকৃষ্ণ সে বিষয়টি তুলে ধরেন এবং

৩. সন্ন্যাস। জগতের এতসব যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে অর্জুন সন্ন্যাস জীবন বেছে নিতে চাইছেন। তবুও কুলনাশক এমন অমঙ্গলকর যুদ্ধ করতে তিনি ইচ্ছুক নন। শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্রনা বা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির উপায় আলোচনা করেন। বলেন, এর জন্য সন্ন্যাস বা কর্ম পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। কর্ম করেও জাগতিক সকল যন্ত্রনা তথা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের উপায় আছে। সঞ্জয় বলেন,

১০	এ সময় উভয় সৈন্যদলের মধ্যখানে ঈষৎ হাসি হেসে হৃষিকেশ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে বলেন-
১১	হে ভারত! যে বিষয়ে শোক করা উচিৎ নয় তুমি সে বিষয়ে শোক করছ, অথচ প্রজ্ঞাবানদের মতো কথা বলছ। পন্ডিতগণ মৃত কিংবা জীবিত কারও জন্যই শোক করেন না।

- **২.১০** যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে অর্জুন যুদ্ধ করবেন না বলে মনস্থির করেন। অর্জুনের এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণের কি করণীয় থাকতে পারে? সব শুনে তিনি নিজেকে শান্ত ও স্থির রাখেন। ঈষৎ হাসি হেসে অর্জুনকে নিচের কথাগুলি বলেন।

- **২.১১** শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, যুদ্ধে স্বজন ও গুরুজনদের হত্যা করা হলে পাপ হবে, কুলক্ষয় হলে কুলধর্ম ও পারিবারিক ঐতিহ্য বিনষ্ট হবে, নারীরা অধর্মের কাজে লিপ্ত হবে, বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হবে, পূর্বপুরুষগণ নরকে পতিত হবে, পরিবারের অনিষ্ট হবে এমন যুদ্ধ করা সমীচীন নয়- তোমার এ সবই বিজ্ঞচিত কথা! অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিৎ নয় তুমি সে বিষয়ে শোক করছ!

প্রতিপক্ষে স্বজনদের দেখে তুমি শোকে কাতর হয়েছ। যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে চাইছ। এমনকি সন্ন্যাস জীবনও বেছে নিতে চাইছ। কিন্তু যাদের জন্য তুমি শোকে

মুহ্যমান হয়েছ তারা কি তোমার কথা ভেবে শোক করছে? উপরন্তু তুমি যুদ্ধের মূল কারণ ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনাও করছ না?

অন্যায়ের কাছে ন্যায় পরাজিত হলে জগতে অন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে। সাময়িক বিভ্রম ও মিথ্যে মায়ায় আবিষ্ট হয়ে তুমি কর্তব্যকর্ম পরিহার করতে চাইছ। অথচ তুমি নিজ সিদ্ধান্তে নয়, বিধাতার সিদ্ধান্তে আপনজনদের সংস্পর্শে এসেছ।

আপনজনদের কেউই তোমার আপন ছিল না এবং থাকবেও না। জগতে এসে কিছুদিনের সংস্পর্শে মায়ায় জড়িয়েছ। স্মৃতি তোমাকে শোকে কাতর করেছে। স্মৃতি এক মায়া। বন্ধনের কারণ। এক সময় থাকবে না। কিন্তু সত্য ও ন্যায় পথ থেকে তোমার বিচ্যুতির ইতিহাস থেকে যাবে চিরকাল। তার ফল পরবর্তীতে ভোগ করতে হবে সকলকে। পরবর্তী প্রজন্মকে। জগতে অন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে। স্বজন কিংবা গুরুজন হলেও তারা অন্যায়কারী। যেমন বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক ... যদি তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা অথবা আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষেও যায়। ধনী হোক কিংবা দরীদ্র হোক আল্লাহ উভয়ের জন্যই নিকটতম। অতএব তোমরা কারও জন্য ব্যাথিত হয়ো না। কেননা তাতে তোমাদের সত্য থেকে বিচ্যূত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর যদি তোমরা সত্য থেকে বিচ্যূত হও কিংবা তাতে পতিত হও, তবে নিশ্চয়ই! তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবগত।" (আল-কোরআন ৪:১৩৫)

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, জীবন ও জগত সম্পর্কে যাদের সঠিক ধারণা আছে তারা মৃত কিংবা জীবিত কারও জন্যই শোক করেন না। তারা শোকের উর্ধ্বে উঠে কর্তব্যকর্ম পালন করেন। যে মহৎ কারণে সৃষ্টিকর্তা জগতে প্রেরণ করেছেন তারা সেই সৃষ্টির সুরক্ষাকে সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেন।

এতসব জ্ঞানের আলোচনা সত্বেও মানুষের মনে আপনজনদের মৃত্যু ভাবনায় শোক কিংবা দুঃখের উদয় তো হবেই। যারা শোক করেন না তারা কিভাবে শোক না করে থাকতে পারেন? কোন জ্ঞানে?

বস্তুত এখান থেকেই গীতার দার্শনিক আলোচনার শুরু হয়েছে। অর্জুনের শোক নিবারণের জন্য পাপ-পূণ্য থেকে শুরু করে বিবিধ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানসম্মত,

যৌক্তিক ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা তুলে ধরেন। সে আলোচনাই মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা হয়ে বিদ্যমান রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন-

১২	আমি ছিলেম না বা তুমি ছিলে না বা এই নৃপতিগণ ছিলেন না এমন নয়; বা ভবিষ্যতেও আমরা কেউ থাকব না তাও নয়।
১৩	দেহধারীদের এই দেহে যেমন শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য আসে- তেমনই দেহান্তর প্রাপ্তি হয়; স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন তাতে বিচলিত হন না।

● **২.১২** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কখনই এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি বা এখানে উপস্থিত নৃপতিগণ অস্তিত্বশীল ছিলেন না বা না ভবিষ্যতে আমাদের কারও অস্তিত্ব থাকবে না। প্রতিটি জীব ছিল, আছে এবং থাকবে।

মানুষের নিজের ভেতরের কোন জ্ঞানই চিত্তকে দুর্বল করে দেয়, আবার জাগিয়েও তোলে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শোকাবহ অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর ভেতরে ভাবনার আলোড়ন সৃষ্টি করে দেন। জীবন ও জগত সম্পর্কিত চরম সত্য দর্শন তুলে ধরেন। যুগে যুগে সৃষ্টিকর্তা এমনিভাবে কোন কারণ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দান করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"যুগে যুগে মানুষের দিক-নির্দেশনারূপে তিনি গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন এবং অবতীর্ণ করেছেন সঠিক ও ভূলের নির্দেশক।" (আল-কোরআন ৩:৪)

এ কেমন কথা? আমরা তো জানি যে মানুষ মৃত্যুবরণ করে এবং একসময় এ ধরায় আর থাকে না। চিরতরে হারিয়ে যায়। তাহলে এভাবে বলা হল কেন?

আমরা যে মৃত্যুবরণ করি কিংবা নিহত হই তবে কি আমরা মৃত্যুবরণ করি না? নিহত হই না? সে দর্শনই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সামনে তুলে ধরেন। এ দর্শন এত চমৎকার এবং জ্ঞান ও যুক্তিসম্মত যে সকল মানুষের এ বিষয়ে জানা থাকা প্রয়োজন।

● **২.১৩** বলা হচ্ছে, জীবদেহে সর্বদা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। শৈশব, শৈশবের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্ধক্য আসছে। এসব পরিবর্তনের কারণে কেউ কখনও শোক করে না। মৃত্যু হচ্ছে তেমনি আরেক স্তরের পরিবর্তন।

বস্তুত জীবের মৃত্যু হয় না। মৃত্যু হলে জীব দেহান্তরীত হয়। এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরীত হয়। নতুনভাবে জন্ম লাভ করে। বুদ্ধি যার এ জ্ঞানে স্থির মৃত্যুজনিত কারণে তিনি বিচলিত হন না। শোক করেন না।

মৃত্যু হলে বা নিহত হলে জীবের দেহটাই কেবল নির্জীব হয়ে যায়। পঁচনশীল নিস্প্রাণ একটি জড় দেহের জন্য শোক করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

দেহের রূপ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি সে রূপের পরিবর্তন করে দিতে পারেন। রূপের পরিবর্তন হলে দেহ অপরিচিত হয়ে যাবে। দেহ অপরিচিত হলে সেই দেহের জন্য মায়াও চলে যাবে। পরিচিত কিংবা সুনির্দিষ্ট আকৃতির একটি দেহের জন্য মায়াটিও সাময়িক। একসময় ছিল না আবার একসময় থাকবে না। জীবন জীবনের মতো চলে যেতে থাকবে। জ্ঞানবানরা এমন মিথ্যে মায়ার অপ্রয়োজনীয়তা বোঝেন এবং সবকিছুর পরিণামও জানেন। তারা ক্ষণস্থায়ী জীবনে সাময়িক সময়ের জন্য পরিচিত একটি জড় দেহের সুনির্দিষ্ট রূপের মায়ায় জড়িয়ে শোক করেন না এবং সে কারণে কর্তব্যচ্যূতও হন না। আজকের কর্তব্যচ্যূতির ফল প্রজন্মকে মন্দভাবে ভোগ করতে হবে। জগত-সংসারকে বিশৃংখল করবে। সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ হতে পারে। এ বিষয়গুলি বরং অধিক গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখার বিষয়। অতএব অনর্থক শোক নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৪	হে কৌন্তেয়! শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ তো কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি মাত্র। এগুলির গমনাগমন অস্থায়ী। হে ভারত! এগুলিকে সহ্য করার চেষ্টা কর।
১৫	হে মানব শ্রেষ্ঠ! সুখে-দুঃখে সমদর্শী স্থিরচিত্ত মানুষ যিনি এ সকল বিষয়স্পর্শে বিচলিত হন না তিনি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হন।

[অর্জুনকে এখানে কৌন্তেয় ও ভারত নামে অভিহিত করা হয়েছে। কৌন্তেয় হচ্ছে কুন্তিপুত্র এবং ভারত হচ্ছে ভরত রাজার বংশধর।]

- **২.১৪** প্রকৃতিতে একবার শীত আসে আবার উষ্ণ ভাব আসে। শীত কি? কিংবা উষ্ণতাই বা কি? শীত-উষ্ণ যাই হোক না কেন বস্তুত আমরা এগুলিকে চিনি-জানি বা উপলব্ধি করি আমাদের ইন্দ্রিয়ের কারণে। কেবল ইন্দ্রিয় না থাকলেই এই অনুভূতিগুলিকে আমরা জানতাম না। তখন শীত কি, গরম কি বুঝতাম না।

দেহে কখনও সুখের অনুভূতি জাগে আবার কখনও দুঃখের অনুভূতি জাগে। শীত-উষ্ণের মতো এ সবই হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। একবার আসে আবার চলেও যায়। যেমন বলা হয়েছে,

"কষ্টের পরে আল্লাহ সুখ দেবেন।" (আল-কোরআন ৬৫:৭)

"এ দিনগুলিকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি।" (আল-কোরআন ৩:১৪০)

শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এগুলির গমনাগমন অনিত্য-অস্থায়ী। কোনটিই জীবনে চিরস্থায়ী হয় না। অস্থায়ী বিষয়গুলি প্রত্যেকের জীবনেই পালাক্রমে ঘটে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ক্ষণস্থায়ী এমন বিষয়গুলিকে কিছু সময়ের জন্য সহ্য করতে জানতে হয়। যথাসময়ে দুর হয়ে যায়।

অর্জুন যে শোকে আজ মূহ্যমান সে শোকও চিরস্থায়ী কোন বিষয় না। এটিও ক্ষণস্থায়ী বিষয় এবং ইন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে উৎপন্ন। ইন্দ্রিয় না থাকলে বিষয়গুলি ঠিকই থাকত কিন্তু জীব কিছুই অনুভব করত না। জীবন জীবনের মতো চলে যেত। এমনকি নিজের জীবনটিও একসময় থাকবে না। অতএব মূল্যহীন আজকের এ শোক। কিছু সময়ের জন্য সহ্য করতে হবে। শোকে মূহ্যমান হয়ে সে কারণে কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন বলা হয়েছে,

"তবে কি যুদ্ধে মোহাম্মদ মৃত্যুবরণ কিংবা নিহত হলে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে?" (আল-কোরআন ৩:১৪৪)

অর্থাৎ কারও মৃত্যুজনিত কারণে বা চিন্তায় বিচলিত বা শোকগ্রস্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম পরিহার করা সঠিক বিচার নয়।

● **২.১৫** শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এমনসব বৈপরীত্য বা দ্বান্দ্বিক ভাবসমুহে যিনি সমদর্শী হয়ে স্থিরচিত্তে অবিচল থাকতে পারেন, বলা হচ্ছে তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তেমন জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হতে বলছেন। অমৃতত্ব কি? সে আলোচনা আসবে।

দুঃখ যদি চিরস্থায়ী বা নিত্য হত তবে অবশ্যই সেটি ভাবনার বিষয় ছিল। কিন্তু এগুলি তো ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য। অনিত্য বিষয়ে শোক করা কি প্রজ্ঞাবানের কাজ হতে পারে? দেখি তো নিত্য-অনিত্য বিষয়ে পন্ডিতগণ কি বলেন? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৬	অসৎ বস্তুর কোন স্থায়ীত্ব নেই। সৎ বস্তুর কখনও বিনাশ নেই। তত্ত্বদ্রষ্টাগণ উভয় প্রকৃতির শেষ পর্যন্ত দর্শন করেছেন।

● **২.১৬** যা কিছু অসৎ বা অনিত্য তা কখনই স্থায়ী হয় না। নিঃশেষ হয়ে যায়। বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে সৎ বা নিত্য বস্তুর বিনাশ নেই। চিরস্থায়ী। রূপান্তর ঘটে মাত্র। এটিই সিদ্ধান্ত।

বলা হচ্ছে যে, নিত্য-অনিত্য উভয় প্রকৃতির স্বরূপ শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে তত্ত্বদ্রষ্টাগণ এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। নিত্য-অনিত্য বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে প্রথমে তত্ত্বদ্রষ্টাগণের এ সিদ্ধান্তটি তুলে ধরেন। কেন তুলে ধরেন? বলা হচ্ছে,

১৭	যা দ্বারা এই সমগ্র ব্যাপ্ত তাঁকে তুমি অবিনাশী বলে জানবে। কেউই এই অব্যয় স্বরূপের বিনাশ করতে পারে না।
১৮	নিত্য, অবিনাশী, ইন্দ্রিয়াতীত-অনুপলব্ধ আত্মার আশ্রয়রূপ দেহ সকলই কেবল বিনাশশীল বলে বলা হয়েছে। অতএব হে ভারত, যুদ্ধ কর!

● **২.১৭** ওপরোক্ত সিদ্ধান্ত উদ্ধৃতির পর বলা হচ্ছে যে, যার দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তাকে তুমি অবিনাশী বলে জানবে। এই অব্যয়-অক্ষয় স্বরূপের বিনাশ নেই। তত্ত্বদ্রষ্টাগণের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানার পরে তোমার মনে যেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে।

● **২.১৮** মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখনও তার নিথর দেহ বিদ্যমান থাকে। শূন্যে বিলীন হয়ে যায় না। কিন্তু সেই দেহে কোন সচলতা বা চেতনা থাকে না। প্রশ্ন হচ্ছে, দেহ থেকে এমন কি উধাও হয়ে গেল যার কারণে সে নিরব-নিথর ও নির্জীব হয়ে গেল? তাকে মৃত বলা হচ্ছে?

দেহ কেবলি একটি জড় প্রকৃতি সম্বলিত বহিরাবরণ মাত্র। ভেতরে যার উপস্থিতি দেহকে সচল করে রাখে সে চলে গেলে দেহ মৃত এবং পঁচে-গলে নিঃশেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ দেহ থেকে 'আমি' চলে গেলে 'আমার' বাহিরের খোলসটি পড়ে থাকে। তাহলে এ জড়দেহটি 'আমি' নই। দেহ আমার প্রকৃত সত্ত্বা নয়।

বলা হচ্ছে, যার দ্বারা এই সমগ্র দেহও পরিব্যাপ্ত হয়ে সচল ও চেতনাসম্পন্ন হয়ে আছে সে নিত্য ও অবিনাশী এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর নিজের কোন দেহ নেই; জড়দেহকে আশ্রয় করে থাকে। তাঁকে 'আত্মা' বলে।

আত্মা হচ্ছে দেহে চৈতন্যের কারণ। জড় দেহের সাথে নয় আত্মার সাথেই 'আমি'র সম্পর্ক। আত্মাই 'আমি'র প্রতিনিধিত্ব করে। আত্মা হচ্ছে জীবসত্ত্বার প্রকৃত স্বরূপ।

মৃত্যু কিংবা নিহত হলে আত্মার আশ্রয়রূপ দেহটি কেবল বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই। অতএব আমার মৃত্যু নেই। মৃত্যু কিংবা নিহত হলে আত্মা দেহান্তরীত হয়। ধ্বংস হয় কেবল জড়দেহ। তাই পূর্বেই তত্ত্ব দ্রষ্টাগণের সিদ্ধান্ত বলে নেয়া হয়েছে যে অনিত্য বস্তুর কোন স্থায়ীত্ব হয় না। অর্থাৎ অনিত্য জড় দেহের কোন স্থায়ীত্ব নেই। এটি বিনাশশীল। অন্যদিকে নিত্য বস্তুর কখনও বিনাশ হয় না। আত্মা নিত্য। কখনও বিনাশ হয় না। অতএব 'আমার' বা 'আমাদের' মৃত্যু নেই। অতএব কারও মৃত্যু ভাবনায় শোকাবহ হওয়া প্রজ্ঞাবানের কাজ নয়।

আত্মার উপস্থিতি দেহে চেতনার সৃষ্টি করে। চেতনা হচ্ছে আত্মার প্রকাশ। ওপরে যখন সৎ-অসৎ বিষয়ে তত্ত্ব দ্রষ্টাগণের সিদ্ধান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে তখন এই জড় দেহ ও চেতন আত্মাকে লক্ষ্য রেখেই সেটি বলা হয়েছে। আত্মা সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালনে যত্নবান হও, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা থেকে এবং এটি থেকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন এর সঙ্গিনীকে এবং তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করেছেন অগনিত পুরুষ ও নারী।" (আল-কোরআন ৪:১)

যার ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই তাঁর জন্য শোকের প্রয়োজনীয়তা কি? ভীষ্ম, দ্রোণ নিহত হলেও শোক করার কারণ নেই। তাঁর হাতে যাদের বা যেসব গুরুজনদের মৃত্যু হবে মনে করে অর্জুন শোকাহত, প্রকৃতপক্ষে তাঁর হাতে তাদের মৃত্যু হবে না।

যিনি বিষয়গুলি যথাযথভাবে জানেন তিনি কখনও পঁচনশীল জড় দেহের জন্য শোক করেন না। তাই এভাবে বলা হয়েছে যে, পন্ডিতগণ মৃত কিংবা জীবিত কারও জন্যই শোক করেন না [দ্রষ্টব্য গীতা ২:১১]। কিংবা বলা হচ্ছে যে, আমি ছিলেম না বা তুমি ছিলে না বা এই নৃপতিগণ ছিলেন না এমন নয়; বা ভবিষ্যতেও আমরা কেউ

থাকব না তাও নয় [দ্রষ্টব্য গীতা ২:১২]। কোন না কোন অবস্থায় প্রত্যেকের বিদ্যমানতা থাকবে। তাই অপ্রয়োজনীয় শোক না করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বলেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষনীয়। বলা হচ্ছে, 'যা দ্বারা এই সমগ্র ব্যাপ্ত'। 'সমগ্র ব্যাপ্ত' বলতে যা দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত বিষয়টিকে এভাবে ধরে নেয়া হচ্ছে। পরে আবার বলা হচ্ছে, 'আত্মার আশ্রয়রূপ দেহ সকলই কেবল বিনাশশীল'। এক্ষেত্রে কিন্তু সমগ্র জগত নয় বরং স্বতন্ত্র জীবের দেহকে বোঝান হচ্ছে।

অতএব যখন আত্মাকে সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্তরূপে বলা হচ্ছে তখন আমাদের দেখা সমগ্র মহাবিশ্বও এক বিশ্বরূপ দেহের অভ্যন্তর। বাইরে আমরা যে জড় প্রকৃতিকে দেখি তা এক প্রকান্ড দেহের অন্তরস্ত জড় প্রকৃতি। বিষয়টিকে সেভাবে বুঝতে হবে।

আবার যখন ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র জীবের প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে দেখি তখন স্বতন্ত্র জীবের দেহের জড় প্রকৃতিকে বুঝি। সমগ্র জগত যার দ্বারা জীবন্ত ও চৈতন্যময় সেটি হচ্ছে পরমাত্মা। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ! .. তিনিই জীবন্ত। চিরঞ্জীব। সর্বসত্ত্বার ধারক।" (আল-কোরআন ২:২৫৫)

ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র জীব সত্ত্বাসমুহ মূল উৎস তথা পরমাত্মার সাথে সম্পর্কিত। সে কারণে সকলে প্রাণবন্ত ও চেতনাসম্পন্ন। ভগবানই জীবন্ত এবং সর্বসত্ত্বার ধারক। জগতের সকল সত্ত্বাসমুহকে তিনি একাই ধারণ করে রেখেছেন।

প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের আত্মাকে জীবাত্মা এবং সমগ্র জগতব্যাপী দেহের আত্মাকে পরমাত্মা বলা হচ্ছে। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশরূপে পরমাত্মার বৈশিষ্ট বা গুণেই গুণান্বিত। যেমন সোনার একটি খন্ডও পরিপূর্ণ সোনা, কিংবা অগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গও অগ্নি বিষয়টি তেমন। আত্মা সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

১৯	যে আত্মাকে হত্যাকারী বলে জানে কিংবা যে মনে করেন যে সে নিহত হয়েছে; তারা উভয়েই জানে না যে- না সে হত্যাকারী, না সে নিহত হয়।

২০	না কখনও জন্ম হয়, না মৃত্যু হয় বা না কখনও উৎপন্ন হয়েছে, না হবে। জন্মরহিত, নিত্য, চিরন্তন বা সনাতন। দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হলেও আত্মার বিনাশ নেই।
২১	যিনি আত্মাকে অবিনাশী, সর্বদা বর্তমান, জন্মরহিত এবং অব্যয়-অক্ষয় বলে জানেন, হে পার্থ! কিরূপে তিনি কাউকে বধ করাতে পারেন বা করতে পারেন?

● **২.১৯** কেউ যদি মনে করে যে সে কাউকে হত্যা করেছে, অথবা কেউ যদি মনে করে যে সে নিহত হয়েছে তারা উভয়ে প্রকৃতপক্ষে বিষয়গুলি জানে না। তারা কেউই আত্মতত্ত্ব বা 'আমি' বা দেহ ও আত্মা সম্পর্কিত জ্ঞানে যথাযথভাবে অবগত নয়।

যে নিহত হয় বলে মনে করা হয় সে নিহত হয় না। কেননা আত্মা অবিনাশী। সে দেহান্তরীত হয়। যে হত্যা করে সেও হত্যাকারী নয়। কেননা আত্মাকে বিনাশ করা যায় না। যেমন বলা হয়েছে,

"যারা ... নিহত হয় তাদেরকে 'মৃত' বল না। তারা জীবিত; তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।" (আল-কোরআন ২:১৫৪)

প্রশ্ন হচ্ছে, তাই যদি সত্যি হয় তবে কি হত্যায় কোন পাপ নেই? তবে তো ধর্ম-কর্ম, পাপ-পূণ্য, বিধি-নিষেধ, পুরস্কার-শাস্তি, স্বর্গ-নরক এসবের আর কোন প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতা থাকে না। সমগ্র গীতা অধ্যায়নে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

● **২.২০** আত্মা কখনও জন্ম নেয় না; আত্মা জন্মরহিত। আত্মা নিত্য বা সনাতন। আত্মার মৃত্যু নেই। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি জন্ম দেনও না, জন্ম নেনও না।" (আল-কোরআন ১১২:৩)

যখন কেউ নিহত হয় বা মৃত্যুবরণ করে, তখন কেবল তার জড়দেহটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মা নিত্য। তার কোন বিনাশ নেই। যেমন বলা হয়েছে,

"ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল; কেবল থেকে যাবে তোমার মহিমাময় মহানুভব স্রষ্টার সত্ত্বা।" (আল-কোরআন ৫৫:২৬-২৭)

জীব বা জীবাত্মা হচ্ছে পরমেশ্বরের অংশ বা স্পর্শস্বরূপ। পরমেশ্বরের বৈশিষ্টই তার মধ্যে বিদ্যমান। জীবাত্মারও মৃত্যু নেই।

● **২.২১** আত্মা বিষয়ে কেউ যদি ওপরোক্ত জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হন এবং তাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন, তবে তাকে এটিও বিশ্বাস বা স্বীকার করে নিতে হবে যে কেউই কাউকে বধ করতে পারে না কিংবা করাতেও পারে না। 'আমি' বা আত্মা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বিনাশই যার নাই তাঁকে কিভাবে বিনাশ করা যাবে? কিংবা সে বিনাশই বা হবে কিভাবে? তাই বলা হচ্ছে কেবল জড় দেহের জন্য শোক করা উচিত নয়।

আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। আত্মা অব্যায়-অক্ষয় ও বিকারহীন। তাই বৃদ্ধকালেও আমরা মনের ভেতরে শৈশব-কৈশোরের মতোই সমান আনন্দ-উদ্যাম অনুভব করি। আত্মা একই রকমভাবে চির বিরাজমান। কেবল জড়দেহ ক্ষয় ও লয় প্রাপ্ত হয়। আত্মা শাশ্বত, সনাতন ও চিরস্থায়ী। আত্মা সম্পর্কে আরও বলা হচ্ছে,

২২	মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য একটি নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে আত্মা একটি নতুন দেহ ধারণ করে।
২৩	এই আত্মাকে কোন অস্ত্র ছেদ করতে পারে না, না অগ্নি দহন করতে পারে, না পানি দ্বারা সিক্ত করা যায়, না বায়ু তাকে শুষ্ক করতে পারে।
২৪	আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। আত্মা নিত্য, সর্বব্যাপ্ত, স্থির, নিশ্চল ও সনাতন।
২৫	আত্মাকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চিন্তার অতীত, অপরিবর্তনীয় বলা হয়। অতএব এই আত্মাকে এরূপ জেনে শোক করা উচিৎ নয়।

● **২.২২** মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অপর একটি নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনই জীর্ণ বা ব্যাবহার অনুপযোগী দেহ পরিত্যাগ করে আত্মা ব্যাবহার উপযোগী একটি নতুন দেহ ধারণ করে। এটিই দর্শন। এ দর্শনে এটি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

প্রকৃতিতে রয়েছে সৃষ্টিকর্তার অনেক নিদর্শন! যা মানুষকে সৃষ্টি সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করে। কিছু জীব আছে যারা খোলস বা দেহের চামড়া পরিবর্তন করে। নতুনের মতো হয়ে যায়। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শনসমুহ এবং তোমাদের সৃষ্টিতে ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে রাখা জীব-জন্তুর মাঝেও রয়েছে নিদর্শনাবলী।" (আল-কোরআন ৪৫:৩-৪)

● **২.২৩-২৫** আত্মা সম্পর্কে আরও বলা হচ্ছে যে আত্মাকে কোন অস্ত্র ছেদ করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না, পানি দ্বারা সিক্ত করা যায় না, বায়ু তাকে শুষ্ক করতে পারে না। আত্মা অচ্ছেদ্য- তাকে ছেদ করা যায় না, অদাহ্য- তাকে পোড়ান যায় না, অক্লেদ্য- আত্মাকে ভেজান যায় না, অশোষ্য- তাকে শুষে নেয়া যায় না। আত্মা নিত্য ও শাশ্বত, সর্বব্যাপ্ত, অপরিবর্তনীয়, নিশ্চল এবং সনাতন বা আদি ও চিরন্তন। আত্মা অব্যাক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চিন্তারও অতীত এবং বিকারহীন। আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না।

আত্মা সম্পর্কে যারা এ দর্শনে বিশ্বাসী হবে, এতসব জানার পরে তারা কারও মৃত্যুজনিত কারণে শোক করবে না। তারা জানে যে যুদ্ধে আপনজন কেউ নিহত হলেও এটিই তার জীবনের সমাপ্তি নয়। বরং নতুন জীবনের সূচনা। একটা দৈহিক পরিবর্তন মাত্র। যেমন শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন আসে তেমন। অতএব শোক করা অর্থহীন। বলা হচ্ছে,

"যারা আল্লাহর পথে তথা সত্য ও ন্যায়ের পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে প্রয়োজনীয় সকল কিছু।" (আল-কোরআন ৩:১৬৯)

কোন জ্ঞানই মানুষকে অচল করে দেয়, আবার কোন জ্ঞানই মানুষকে সচল করে। কোন দর্শনে বিশ্বাসী না হলে সে দর্শন থেকে ফল পাওয়া যায় না। কেননা মনের ভেতরে সে দর্শন শক্তির সঞ্চার করতে পারে না। অথচ দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিশ্বাসের মাধ্যমে অন্তরে শক্তির সঞ্চার করা যা জীবকে চলতে সহায়তা করে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন। জীবের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মা। জড়দেহ নয়। আত্মা অবিনাশী। মৃত্যু হলে কেবল জড়দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব কারও মৃত্যুজনিত কারণে ভাবিত হয়ে শোক না করে যুদ্ধ কর।

এতসব আলোচনা সত্ত্বেও অর্জুনের অন্তর যদি ওপরোক্ত ধারণায় বিশ্বাসী হতে না পারে? তবে কি ফল লাভ হবে? শ্রীকৃষ্ণ তাই তাঁকে আরেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন। বলেন,

২৬	আর যদি এই আত্মাকে সর্বদা জন্মশীল ও মরণশীল মনে কর, তবুও হে মহাবাহো! এই আত্মার জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়।
২৭	যার জন্ম হয়েছে, মৃত্যু তার নিশ্চিত এবং মৃতেরও জন্ম নিশ্চিত। অতএব যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্য শোক করা উচিৎ নয়।
২৮	হে ভারত! জীব সত্ত্বাসমুহ পূর্বে অপ্রকাশিত ছিল, মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, বিনাশের পর আবার অপ্রকাশিত হয়ে যাবে- তাতে শোকের কি আছে?

[অর্জুনকে এখানে মহাবাহো বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মহাবাহো হচ্ছে বাহুদয় যার মহা শক্তিসম্পন্ন।]

● **২.২৬** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যদি তুমি আত্মাকে নিত্যস্থায়ী ও অবিনাশী বলে ভাবতে না পার এবং সর্বদা দেহের সঙ্গেই জন্মশীল ও দেহের সঙ্গেই মরণশীল বলে মনে কর, তবুও তোমার এই আত্মার জন্য শোক করা উচিত নয়। কেন?

● **২.২৭** বলা হচ্ছে, সকলেরই একদিন মৃত্যু হবে। কারও মৃত্যু চিন্তায় আজ যে ব্যাথিত হচ্ছে ক'দিন পর সে নিজেও থাকবে না। পার্থিব হিসেবে কিছু সময়ের ব্যাবধান মাত্র। জাগতিক হিসেবে সেটি অতি নগন্য। তাহলে এ শোক করার কি মূল্য আছে? কিছুদিন মন বিষন্ন থাকবে তারপর সকলেই আবার স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবে। যুদ্ধ না করলেও পরিবারের সদস্যদের অর্জুন মৃত্যুর হাত থেকে চিরতরে রক্ষা করতে পারবেন না। মৃত্যু একদিন হবেই। যেমন বলা হয়েছে,

"প্রতিটি জীবকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে ... পার্থিব জীবনের আনন্দ কেবল মিছে মরিচীকা।" (আল-কোরআন ৩:১৮৫)

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবেই, এমনকি যদি তোমরা কোন সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর।" (আল-কোরআন ৪:৭৮)

যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্য শোক করা নিরর্থক। অতএব কর্তব্যকর্ম করে যেতে হবে। কর্তব্যকর্ম পরিহার করা যাবে না। অর্জুনকে যুদ্ধ করতে হবে।

● **২.২৮** রণক্ষেত্রে আজ যারা উপস্থিত একটা সময়ে তারা কেউই এ জগতে ছিল না। সকলেই ছিল অব্যাক্ত-অপ্রকাশিত। বর্তমানে বা মাঝখানের সময়টিতে একটি দেহ বা রূপ পরিগ্রহ করার কারণে কিছুদিন প্রকাশিত অবস্থায় আছে। আবার নিশ্চিতভাবে পরিচিত এ রূপটিও অপ্রকাশিত হয়ে যাবে মৃত্যুর পরে। জগতের সকল জীবের ক্ষেত্রে সব সময়ের জন্য কথাটি একইভাবে সত্য ও প্রযোজ্য। ক'দিন আগে আর পরের ব্যাবধান মাত্র। যুদ্ধ ছাড়াও মৃত্যু হবে। রূপটি থাকবে না। জীবের উপাদানগুলির বৈশিষ্ট বা ভাব ও তার অন্তর্নিহিত শক্তি থেকে যাবে। সেই সকল উপাদানকে কাজে লাগিয়ে আবার একটি বা একই রূপ গড়ে তোলাও সম্ভব হবে। তাহলে শোকের প্রয়োজনীয়তা কি? যেমন বলা হয়েছে,

"যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যা, অবশ্যই তিনি তা পারেন।" (আল-কোরআন ৩৬:৮১)

আত্মা, জীব, জীবসত্ত্বা, প্রাণ এসব বিষয়ে সত্যিকার অর্থে কারই কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই। অথচ আত্মাই জীবনের কারণ! স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে আত্মা আসলে কি? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৯	কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্য্যজনকভাবে দেখে, সেভাবেই অন্য কেউ আবার বিস্ময়কররূপে বর্ণনা করে, আবার কেউ আশ্চর্য্যজনকরূপে আত্মার বিষয়ে শুনে থাকে, কেউ শুনেও আত্মাকে জানতে পারে না।
৩০	হে ভারত! দেহ বিশিষ্টদের দেহে আত্মা সর্বদা অবধ্য। অতএব কোন জীবের জন্য তোমার শোক করা উচিৎ নয়।

● **২.২৯** যদিও আত্মার বিষয়ে ওপরে অনেক কথা বলা হয়েছে তথাপি আত্মাকে নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না। সূক্ষতা হেতু আত্মাকে জানা ও বোঝাও সহজ না। আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত, ধারণাতীত। আত্মাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, বোঝা যায়

না; বস্তুত আত্মা কি এ বিষয়ে মানুষ জানে না। যখন এ বিষয়ে আলোচনা করা হয় তখন আত্মাকে বিস্ময়কর বোধ হয়। আত্মা সকলের কাছে বিস্ময়ের বিষয় মাত্র। এর প্রকৃত স্বরূপ কেউ অবগত নয়।

মানুষ এতটুকু বুঝতে পারে যে দেহ থেকে কিছু একটা চলে গেলে দেহ কেবল পঁচনশীল একটি জড় বস্তুতে পরিণত হয়। সুতরাং এ দেহটি 'আমি' বা আমার সত্ত্বা নয়। বিভিন্ন সমাজে এ বিষয়ে বিভিন্ন রকম মতবাদ বা দর্শন প্রচলিত আছে। সূক্ষ সূক্ষ পার্থক্য থাকলেও মোটা দাগে আলোচিত বিষয় বা দর্শনগুলি একইরকম।

তাই বলা হয়েছে যে, আত্মাকে কেউ আশ্চর্য্যজনকভাবে দেখে, কেউ আবার বিস্ময়করররূপে বর্ণনা করে, আবার কেউ আশ্চর্য্যজনকরূপে আত্মার বিষয়ে শুনে থাকে, কেউ শুনেও আত্মাকে বুঝতে পারে না।

● **২.৩০** এই দেহে যে 'আমি'র বসবাস- সেই আত্মা শাশ্বত, অব্যয়, অক্ষয়, সনাতন বা চিরন্তন। পানিকে কাঁটলে যেমন কাঁটা যায় না, আগুনকে কাঁটা যায় না, বাতাসকে কাঁটা যায় না তেমনি আত্মাকেও বধ করা যায় না। আত্মার মৃত্যু হয় না। তবে কি নিহত হলে পঁচনশীল নির্জীব একটি জড়দেহ নামক পদার্থের জন্য মানুষ শোক করবে? বস্তুত কোন জীবের জন্যই শোক করা উচিৎ নয়। অতএব পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ ও বহু স্বজন নিহত হবে ভেবে অর্জুনের শোকাবহ হওয়া উচিত নয়। শোকাবহ হয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করাও সমীচীন নয়।

আত্মাই আমি। আত্মা অবিনাশী। অতএব কারও মৃত্যুতে শোকের কিছু নেই। দেহ বিনাশ হলেও জীবের মৃত্যু নেই। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এভাবে বোঝালেন। অতঃপর বলছেন, যদি মনে কর যে আত্মা সর্বদা জন্ম ও মৃত্যুশীল তবুও শোকের কারণ নেই। মৃত্যু সকলের জন্য অনিবার্য। অতএব যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্য শোকের কি আছে? শ্রীকৃষ্ণ এবার আরও একভাবে অর্জুনকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। বলেন,

৩১	স্বধর্মের কথা বিবেচনা করেও তোমার দ্বিধা করা উচিৎ নয়। ক্ষত্রিয়ের জন্য ধর্মের কারণে যুদ্ধ করা অপেক্ষা অন্য আর কোন শ্রেয়তর কর্ম নেই।
৩২	হে পার্থ! ক্ষত্রিয় তাতেই সুখী, যুদ্ধের সুযোগ লাভ করার কারণে আপনা থেকে যার জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়।

● **২.৩১** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, স্বধর্মের কথা বিবেচনা করে হলেও তোমার যুদ্ধ করা উচিৎ। এখানে স্বধর্ম বলতে বর্ণভিত্তিক সমাজে যার জন্য যে কর্ম সুনির্দিষ্ট সে কর্মকে বোঝান হয়েছে। সত্যি বলতে কর্মই ধর্ম।

অর্জুন হচ্ছেন ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বা কর্ম হচ্ছে রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, তাদের সুরক্ষা দেয়া ইত্যাদি। প্রয়োজনে তাদেরকে যুদ্ধের মোকাবেলা করতে হয়। এক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ হচ্ছে ধর্ম বা নীতি রক্ষা, আত্মরক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, প্রজারক্ষা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। ক্ষত্রিয়রা অস্ত্র চালনা বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে। রাজ্য শাসন ও প্রজাপালনে এককালে এ বিদ্যা ছিল অপরিহার্য।

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হচ্ছে সময়ে ও প্রয়োজনে যুদ্ধ করা। কর্ম বা ধর্মযুদ্ধ থেকে ফিরে যাওয়া অধর্ম। এমনই শাস্ত্রের বিধান। নিয়মানুযায়ী ক্ষত্রিয় সরাসরি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে না। অথচ শোকের কারণে অর্জুন সে পথও অবলম্বন করতে চাচ্ছেন।

নিজ কর্তব্যকর্ম পালন করা হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম পালন। কর্তব্যকর্ম তথা ধর্ম থেকে বিচ্যূত হলে সেটি অন্যায় বা পাপরূপে বিবেচিত হয়। পাপরূপে বিবেচিত হয় কারণ সেটি ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলারূপে গণ্য হয়। ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব পালন বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়?

জাগতের শৃংখলা ধরে রাখা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন, জগতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব পালন, সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন, জগতের ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা ধরে রাখা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব পালন- সত্যিকার অর্থে এগুলিই ঈশ্বরের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনরূপে বিবেচিত হয়।

এ যুদ্ধের পেছনে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন জড়িত। ধর্মের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় বিষয়টি মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখাই হচ্ছে ধ্বংসের হাত থেকে সৃষ্টি ও জগতকে রক্ষা করা। এ কাজগুলি পরমের সেবা করা হিসেবে বিবেচিত হয়। কেউ বলেন আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা।

অন্যায়কে প্রতিরোধ করা থেকে বিরত থাকলে সমাজে অন্যায় প্রতিষ্ঠা পায়। সেক্ষেত্রে কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত থাকা ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলারূপে বিবেচিত হয়। এমন দায়িত্বহীনতা জগত ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়াতে পারে। সে

অন্যায়ের পাপের ফলের বোঝার অংশীদার দায়িত্বশীল সকলকে নিতে হবে। ক্ষত্রিয়ের জন্য তাই ধর্মের কারণে যুদ্ধ করা অপেক্ষা শ্রেয়তর আর কোন কর্ম নেই। কেননা এভাবেই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে পরমের সেবা বা তাঁর প্রতি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়। তাই বলা হয়েছে,

"আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে যত্নবান হও এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে অবস্থান গ্রহণ কর।" (আল-কোরআন ৯:১১৯)

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালন কর। যারা এ দুনিয়াতে ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ভাল ফলাফল।" (আল-কোরআন ৩৯:১০)

পাঠক, এসব যুক্তি কেবল অর্জুনকে বোঝাবার জন্য নয়। মানবজাতিকে সময়ে সত্য ও সঠিক পথে চলতে সিদ্ধান্ত নিতে বিধাতা এভাবে সত্যের জ্ঞান সকলের মাঝে তুলে ধরেন। এগুলি কঠিন ও চরম সত্য।

● **২.৩২** ক্ষত্রিয় যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। এগুলি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। প্রাণে উদ্দীপনা ও প্রেরণা সঞ্চার করা বাণী। এমন যুদ্ধের সুযোগ প্রাপ্ত হলে ক্ষত্রিয় আপনাতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। উচ্চতর লোকে গমনের সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে এটিকে গণ্য করা হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"পরকালের প্রত্যাশায় যারা পার্থিব জীবনকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত তাদেরকে আল্লাহর পথে তথা সত্য ও ন্যায়ের পথে যুদ্ধ বা জেহাদ করতে দাও।" (আল-কোরআন ৪:৭৪)

জীবের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মা নিয়ে ওপরে যত কথা বলা হয়েছে, সে সবে চিত্ত তুষ্ট না হলেও অর্জুনের উচিত ক্ষত্রিয় হিসেবে স্বধর্ম পালন করা তথা যুদ্ধ করা।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্বধর্মোচিত কর্তব্যকর্ম বিবেচনা করে হলেও যুদ্ধ করতে বলছেন। সংকটকালে অর্জুন কর্তব্য অবহেলা করতে পারেন না। কেননা তাঁকে সেভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে।

অর্জুন যদি যুদ্ধ না করেন, উপরন্তু যুদ্ধ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর পরিণাম যেমন হতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক করে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩৩	যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তবে তোমার স্বীয় ধর্ম ও খ্যাতি হারিয়ে পাপ অর্জন করবে।
৩৪	তাছাড়া সমস্ত লোক চিরকাল তোমার কীর্তিহীনতা সম্পর্কে কথা বলবে। কোন মর্যাদাবান লোকের জন্য অসন্মান মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক।
৩৫	মহারথী যাদের কাছে তুমি অত্যান্ত সন্মানিত, তারা তোমাকে ভয়বশত রণক্ষেত্র থেকে নিবৃত্ত মনে করবে এবং তুমি হীনতা প্রাপ্ত হবে।
৩৬	তোমার শত্রুরা বহু অকথ্য কথা বলবে। তোমার সামর্থের নিন্দা করবে। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে?

● **২.৩৩-৩৬** শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ পরিত্যাগের বাস্তব পরিণতি বিবেচনা করে অর্জুনকে বলেন, একজন ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা হিসেবে তোমার সুখ্যাতি আছে। যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে তা ভূ-লুণ্ঠিত হবে। তুমি ভীরু ও কাপুরুষরূপে চিরকাল পরিচিতি পাবে। শত্রুরা তোমার মনের ব্যাকুলতা বুঝবে না। স্বীকারও করবে না। তারা কুৎসা রটনা করবে। যাদের কাছে তুমি অত্যান্ত সন্মানিত তারা তোমাকে ভয়ের কারণে রণক্ষেত্র থেকে নিবৃত মনে করবে এবং তুমি হীনতা প্রাপ্ত হবে। শত্রুরা অকথ্য কথা বলবে এবং তোমার সামর্থের নিন্দা করবে। এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে?

মর্যাদাবান লোকের জন্য অসন্মান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। যুদ্ধ পরিত্যাগ করার চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করা তাই তোমার জন্য উত্তম।

কুলধর্ম নষ্ট হওয়া, গুরুজনদের হত্যা করা ইত্যাদি কারণে তুমি যে পাপের ভয় করেছ স্বধর্ম ত্যাগে সে একই পাপ হবে। কেননা ধর্মযুদ্ধ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ক্ষত্রিয়ের জন্য মহাপাপ। বিষয়টি সেভাবেই প্রতিষ্ঠিত। সে বিবেচনায় হলেও তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে।

যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার মন্দ দিকসমুহের বিচার-বিশ্লেষণ শেষে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বাস্তব সুবিধাগুলি তুলে ধরেন। বলেন,

৩৭	নিহত হলে স্বর্গ লাভ করবে, অথবা জয়লাভ করলে জগত ভোগ করবে। অতএব উত্থিত হও, হে কৌন্তেয়! নিশ্চিত হয়ে যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প কর।

● **২.৩৭** যুদ্ধে জয়লাভ করলে রাজ্যসুখ বা জড় জাগতিক সুখ ভোগ করার সুযোগ লাভ করবে। অপরদিকে স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে মৃত্যু হলে বিধাতার বিধান অনুসারে স্বর্গ বা মৃত্যু পরবর্তীতে ভাল ফল বা উচ্চতর জীবন লাভ করবে। যুদ্ধ তথা স্বধর্ম পালন করা তাই উভয়দিক বিবেচনায় তোমার জন্য উত্তম।

যেমন বলা হয় জেহাদীদের জন্য স্বর্গ বা বেহেশত অবধারিত। সত্যের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই হচ্ছে 'জেহাদ'। বস্তুত এটিকেই ধর্মযুদ্ধ বলে। হিন্দু-মুসলিম-ইহুদি-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানের পারস্পরিক যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধ নয়। সেগুলি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা অহমবোধের কারণে সৃষ্ট যুদ্ধ। ক্ষত্রিয়ের জন্য স্বধর্ম পালন হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যিনি জেহাদ করেন তিনি 'মুজাহিদ' নামে পরিচিত হন। নামে কি এসে যায়? কাজ ও বক্তব্য এক। ক্ষত্রিয় বা মুজাহিদের জন্য স্বর্গ অবধারিত। অতএব এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে বলছেন। যেমন বলা হয়েছে,

"যে আল্লাহর পথে তথা সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে লড়াই বা জেহাদ করে সে মৃত্যুবরণ করুক কিংবা বিজয় অর্জন করুক তার প্রতি আমি বিশাল পুরস্কার বর্ষন করব।" (আল-কোরআন ৪:৭৪)

স্বধর্ম পালন বিষয়টিকে এখানে যথাজ্ঞানে বুঝতে হবে। কেননা যাদের বিপক্ষে যুদ্ধ হচ্ছে তারাও ক্ষত্রিয়। তাদের বিবেচনায় তারাও স্বধর্ম পালন করছে। যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে তবে কি তারাও একই ফলাফল লাভ করবে অর্থাৎ স্বর্গ লাভ করবে? যদি তাই হয় তবে ন্যায়-অন্যায় বিবেচনার কি হবে?

ক্ষত্রিয় হিসেবে স্বধর্ম পালন কথাটি এ জন্যই স্বর্গ প্রাপ্তির সঙ্গে যুক্ত যে ক্ষত্রিয় অন্যায় পথে নয় সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে বা কারনে যুদ্ধ করে। এটিই হচ্ছে সত্যিকার অর্থে ভগবানের বা আল্লাহর কারণে কর্তব্য পালন করা। তবেই সে স্বর্গ প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। অতএব ধর্ম কথাটির সাথে ন্যায়-অন্যায় বোধের সম্পর্ক গভীর এবং এটি ধর্ম শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যে প্রবিষ্ট। তাই ধর্ম শব্দটি উচ্চারিত হলে ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়টিকে পৃথকভাবে আর বলে দিতে হয় না। বলা হচ্ছে,

“যদি বিশ্বাসীদের দুই দল যুদ্ধে বা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর অন্যায় আচরণ করে, তবে তোমরা আক্রমনকারী দলের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর তথা শান্তি ও ন্যায্যতার নির্দেশের মধ্যে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং সমতার ভিত্তিতে কাজ করবে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ন্যায়পরায়নদের ভালবাসেন।” (আল-কোরআন ৪৯:৯)

ধর্ম বিষয়টি বস্তুত মন্দিরে, মসজিদে বসে নিছক কিছু ব্যাকরণ মেনে চলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সাথে বাস্তব জীবনে ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে চলার গভীর সম্পর্ক আছে। সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা ও সমুন্নত রাখা, জীবন ও জগতের উন্নতি বিধান ও কল্যাণ সাধন করা, জগতে শৃংখলা বজায় রাখা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা- এসব মূল উদ্দেশ্যই যদি ধর্মের মাধ্যমে অর্জিত না হয়, তবে মানব সমাজে ধর্মের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

পান্ডবদের সাথে যেহেতু অন্যায় ও নিপীড়ন-নির্যাতন করা হয়েছে এবং তারা অন্যায়কে প্রতিরোধ ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠায় লড়াই করছে তাই সুনির্দিষ্টভাবে তাদের ক্ষেত্রেই ওপরোক্ত বক্তব্যটি প্রযোজ্য। যেমন বলা হয়েছে,

“নিপীড়ন-নির্যাতন করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।” (আল-কোরআন ২:১৯১)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে অজুর্নের চিত্তের দুর্বলতা দেখে শ্রীকৃষ্ণ আশ্চার্যান্বিত হয়েছিলেন। এমন আচরণকে তিনি অনার্যচিত বলেছিলেন [দ্রষ্টব্য গীতা ২:২]। অর্জুনের মতো বীরের পক্ষে এমন আচরণ করা শোভা পায় না। তিনি তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নানাভাবে অনুপ্রাণীত করার চেষ্টা করে নিচের যুক্তিসমুহ তুলে ধরেন। বলেন,

১. দেহ ও আত্মা এক নয়; পৃথক। দেহ বিনাশ হলেও জীব, আত্মা বা আমি'র মৃত্যু নেই। অতএব কারও মৃত্যু হবে ভেবে শোক করার কোন কারণ নেই।

২. যদি মনে কর যে, দেহের সাথেই আত্মার জন্ম ও মৃত্যু হয় তবুও শোক করার কারণ নেই। কেননা মৃত্যু সকলের জন্য অনিবার্য। যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্য শোক করার কি আছে?

৩. স্বধর্মের কথা বিবেচনা করে হলেও তোমার যুদ্ধ করা উচিৎ।

৪. বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় যুদ্ধ না করার মন্দ পরিণাম ভেবেও যুদ্ধ করা উচিত।

৫. যুদ্ধ করলে উভয় দিক বিবেচনায় লাভ। নিহত হলে স্বর্গ লাভ, জয়লাভ করলে জগত ভোগ। অতএব সকল দিক বিবেচনায় যুদ্ধ করাই উত্তম সিদ্ধান্ত।

আত্মতত্ত্ব, স্বধর্ম মহাত্ম, ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি এতসব যুক্তি তুলে ধরা সত্ত্বেও অর্জুনের মনের মধ্যে শঙ্কা বিদ্যমান। যুদ্ধে স্বজন ও গুরুজনদেরকে হত্যা করা হলে যদি পাপ হয়? সে প্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩৮	সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়কে সমান বিবেচনা করে কেবল যুদ্ধের কারণে যুদ্ধ কর তাতে পাপ হবে না।

● **২.৩৮** শ্রীকৃষ্ণ বলেন ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়কে সমান বিবেচনা কর। দ্বান্দ্বিক যে কোন অবস্থায় চিত্তকে সর্বদা সমভাবাপন্ন রাখ এবং তাতেই নিজেকে অটল-অবিচল রাখ। খুশীতে আত্মহারা হয়ো না কিংবা দুঃখেও বিমর্ষ বা হতাশ হয়ে যেও না। যেমন বলা হয়েছে,

"যেন তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখ না পাও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লসিতও না হও।" (আল-কোরআন ৫৭:২৩)

সূত্রগুলি সর্বত্র একই রকম। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ফলাফল নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই। ফলাফল যাই ঘটুক না কেন ক্ষত্রিয় হিসেবে কেবল নিজের ধর্ম পালন কর। কর্তব্যকর্ম কর। যুদ্ধের প্রয়োজনে যুদ্ধ কর সমগ্র মেধা ও শক্তি দিয়ে। এদিকেই চিত্তকে একাগ্র কর।

মন-প্রাণ দিয়ে একাগ্রতার সাথে নিজ কর্তব্যকর্ম, স্বধর্ম পালন বা নিয়তকর্ম করলে পাপ হয় না। অতএব যুদ্ধ কর। প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে কর্ম করলে পাপ হবে না কেন? পাঠক, সমগ্র গীতা অধ্যায়নে সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে।

অর্জুন প্রথম থেকে বলে আসছেন যে যুদ্ধে গুরুজনদেরকে হত্যা করা হলে পাপ হবে। শ্রীকৃষ্ণ তাই পাপজনিত বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে বলেন যে, লাভ-ক্ষতি বিবেচনা না করে কর্তব্য মনে করে যুদ্ধের প্রয়োজনে যুদ্ধ কর তাতে পাপ হবে না।

অতঃপর তিনি কর্মযোগের ওপর আলোকপাত করেন। যে জ্ঞানে কর্ম করলে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় না। ফলে পাপ-পূণ্য কিছুই স্পর্শ করে না। পাপ থেকে মুক্ত থাকা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩৯	এতক্ষণ তোমাকে সাংখ্য বিষয়ে বলা হল, হে পার্থ! এবার যোগ বিষয়ে শোন। যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হলে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে।
৪০	এই যোগে কোন নিস্ফলতা নেই, ত্রুটি-বিচ্যুতিজনিত কোন পাপও হয় না। এই ধর্ম বা নিয়মের সামান্য পরিপালনও মহাভয় থেকে উদ্ধার করে।
৪১	হে কুরু নন্দন! এই যোগে বুদ্ধি বা জ্ঞান সুনিশ্চিত ও একনিষ্ঠ হয়। কিন্তু অনিশ্চিত বুদ্ধি বা জ্ঞান বহু শাখাবিশিষ্ট ও অনন্তরূপ হয়।

● **২.৩৯** শোকাহত অর্জুনকে বোঝাতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ সাংখ্যের আলোকে বিষয়সমুহের বিচার-বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাতে যদি অর্জুনের অন্তর তুষ্ট না হয়? তাই তিনি যোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

প্রশ্ন হচ্ছে অর্জুনকে বোঝাতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কেন সাংখ্যের আলোকে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন? সাংখ্য কি? কেনই বা আবার যোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে যাচ্ছেন? যোগ কি?

যুদ্ধে স্বজন ও গুরুজনদেরকে হত্যা করা হলে পাপ হবে। সে পাপের ফল ভোগ করতে হবে। নরকে গমন করতে হবে। এমন পাপের বোধ বা নরকের ধারণা অর্জুনের ভেতরে কোথা থেকে এল?

উত্তর হচ্ছে 'বৈদিক দর্শন'। ভারতবর্ষে মানুষের জীবন ও ভাবনার জগত বৈদিক দর্শন দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। পাপ-পূণ্য, স্বর্গ-নরক এসব ধারণা মুলত বৈদিক দর্শন থেকে এসেছে। যে বিশ্বাস অন্তরের গভীরে গেঁথে আছে তা সহজেই দুর হওয়ার নয়। বিষ দিয়েই বিষ নামাতে হবে। অতএব বৈদিক শাস্ত্রের আলোচনা দিয়েই

অর্জুনের পাপবোধকে দুর করতে হবে। তাঁকে মানসিক বৈকল্য থেকে উদ্ধার করে কর্মে তথা যুদ্ধে নিয়োজিত করতে হবে।

বস্তুত কোন জ্ঞানই মানুষকে পঙ্গু করে দেয়। আবার কোন জ্ঞানই মানুষকে উজ্জীবিত করে তোলে। জ্ঞান অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথাযথ জ্ঞান এবং সে জ্ঞানে বিশ্বাস ও আস্থার অভাবই অর্জুনকে শোকে মূহ্যমান করেছে। সংকটকালে সিদ্ধান্তহীনতায় ফেলে দিয়েছে। তিনি করণীয় নির্ধারণ করতে পারছিলেন না। যুদ্ধ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই সাংখ্য ও যোগ বিষয়ে আলোচনা তুলে ধরেন।

সাংখ্য কিংবা যোগ এ সবই হচ্ছে বৈদিক দর্শনেরই এক একটি শাখা-প্রশাখা। বিষয়গুলি ভালভাবে বুঝতে হলে বৈদিক দর্শন সম্পর্কে মৌলিক কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক। কেননা বেদ হচ্ছে এসব দার্শনিক আলোচনার মূল উৎস। সাংখ্য বলি, যোগ বলি সকল আলোচনা বেদকেন্দ্রিক। গীতার আলোচনা মূলত বৈদিক দর্শনকে কেন্দ্র করেই আবর্তীত হয়েছে।

বেদ শাস্ত্র গ্রন্থ হচ্ছে চারটি। এগুলি হচ্ছে ঋকবেদ, সামবেদ, যযুর্বেদ ও অথর্ববেদ। ঋকবেদ সনাতন বা আর্য ধর্মের প্রথম গ্রন্থ। এর সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০ বছর পূর্বের বলে মনে করা হয়। প্রতিটি বেদ আবার ব্রাক্ষণ, সংহিতা, আরণ্যক ও উপনিষদ এ চারটি ভাগে বিভক্ত।

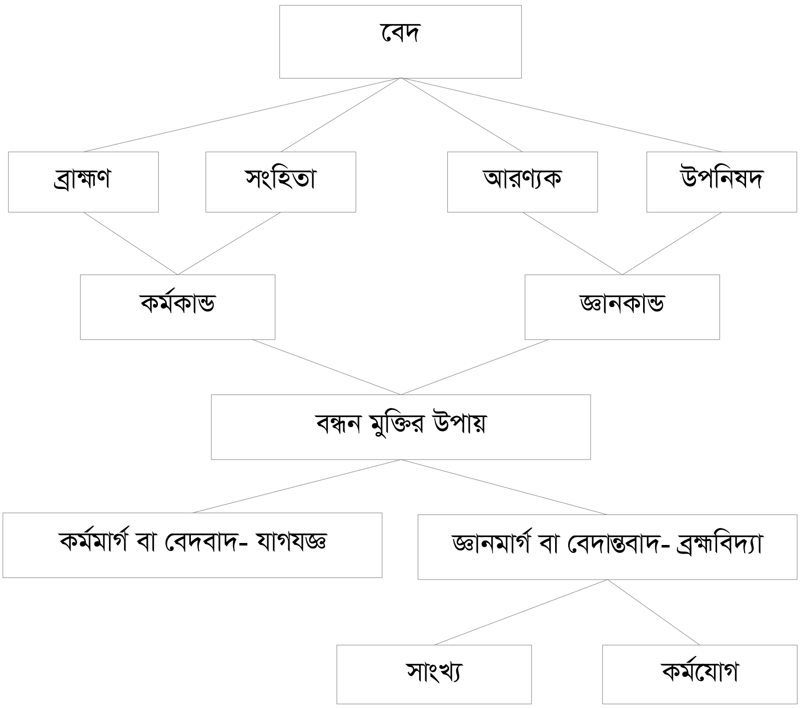
ব্রাক্ষণ ও সংহিতাকে বেদের 'কর্মকান্ড' এবং আরণ্যক ও উপনিষদকে 'জ্ঞানকান্ড' বলে। কর্মকান্ডে বিবিধ মন্ত্র ও যাগযজ্ঞের বিধানাবলী আছে। জ্ঞানকান্ডে ব্রক্ষবিদ্যার আলোচনা করা হয়েছে।

বৈদিক দর্শন বস্তুত জড় প্রকৃতিতে বন্ধনে আবদ্ধ জীবের মোক্ষ বা মুক্তি লাভের উপায় নিয়ে আলোচনা করে। কর্মকান্ড ও জ্ঞানকান্ড দুটোই বন্ধন মুক্তির ভিন্ন ভিন্ন দুটি পন্থা বা উপায় প্রদর্শন করে।

কর্মকান্ড থেকে 'কর্মমার্গ' এবং জ্ঞানকান্ড থেকে 'জ্ঞানমার্গ' সৃষ্টি হয়েছে। 'কর্মমার্গ' মতে বেদবিহিত কর্ম বা যাগযজ্ঞই হচ্ছে জীবের একমাত্র ধর্ম। এতেই মুক্তি, এতেই অমৃতত্ব লাভ হয়। এ ছাড়া মুক্তি লাভের উপায় নেই।

অপরদিকে 'জ্ঞানমার্গ' বলে পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যাতিত কেবল যাগযজ্ঞের কর্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না। কর্মমার্গে স্বর্গ লাভ হলেও মোক্ষ লাভ হয় না। স্বর্গ লাভ ও মোক্ষ লাভ এক বিষয় নয়। ব্রহ্মই হচ্ছেন সবকিছুর মূল। অতএব জ্ঞানযোগে ব্রহ্মকে জানতে হবে। ব্রহ্মের ভাব প্রাপ্ত হতে হবে। তবেই মুক্তি। কেননা ব্রহ্ম মুক্ত। এটিই উপনিষদের ব্রহ্মবাদ।

ব্রহ্ম কি? বলা হচ্ছে যার মধ্যে সমস্ত কিছু স্থিত, যিনি সবকিছুর মধ্যে আছেন, যা সর্বব্যাপি, যার সত্ত্বায় সবকিছু সত্ত্বাবান, যিনি এক ও নিত্য তিনিই ব্রহ্ম।



উল্লেখ্য যে, কর্মমার্গকে 'বেদবাদ'ও বলা হয়। অপরদিকে জ্ঞানমার্গকে 'বেদান্তবাদ'ও বলা হয়। জ্ঞানমার্গের সৃষ্টি হয়েছে বেদের উপনিষদ থেকে। উপনিষদ

বেদের অন্তভাগে বিধায় তাকে বেদান্ত বলা হয়। বস্তুত দুটোই বেদবাদ। কেননা বেদান্ত বা উপনিষদও বেদেরই অন্তর্ভূক্ত।

জ্ঞানমার্গে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে আবার দু'টি মার্গের সৃষ্টি হয়েছে। একটি হচ্ছে 'সাংখ্য' এবং অপরটি হচ্ছে 'যোগ'।

'সাংখ্য' মতে কর্মই হচ্ছে সংসার বন্ধনের কারণ। অতএব কর্মত্যাগ করতে হবে। কর্মত্যাগ ব্যাতিত মোক্ষ লাভ সম্ভব না। কর্ম দ্বারা জীব আবদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়। তাই তারা কর্মত্যাগ করে জ্ঞানের সাধনা করেন। এটিকে 'সন্ন্যাসমার্গ'ও বলে। বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গ বা সন্ন্যাসমার্গই হচ্ছে 'সাংখ্য'। সংসার যাতনা থেকে মুক্তি লাভের জন্য অর্জুন কর্মত্যাগ করে এই সন্ন্যাসমার্গকেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

অপরদিকে যোগ বলে বন্ধনের মূল কারণ কর্ম নয়। বন্ধনের মূল কারণ হচ্ছে বিষয়ে আসক্তি ও কর্মফল ভোগের বাসনা। অতএব সন্ন্যাস বা কর্ম ত্যাগের প্রয়োজন নেই। বিষয় আসক্তি ও কর্মের ফলভোগের বাসনা ত্যাগ করে কর্ম করলেই মোক্ষ লাভ করা সম্ভব। এটিই 'যোগ' বা 'যোগমার্গ'। যোগমার্গই হচ্ছে বৈদান্তিক 'কর্মযোগ' বা 'কর্মযোগ'।

গীতা আবির্ভাবের পূর্বেও এ সকল ধারণা সমাজে প্রচলিত ছিল। তবে গীতায় বিশাল বৈদিক জ্ঞানের নির্যাস অত্যান্ত সুন্দরভাবে ও সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে যেখান থেকে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, বেদের কর্মমার্গ হচ্ছে যাগ-যজ্ঞাদির কর্ম। এটি হচ্ছে 'বৈদিক কর্মমার্গ'। বৈদিক কর্মমার্গ হচ্ছে 'কাম্য কর্ম' বা 'স্বকাম কর্ম'। অপরদিকে গীতায় উদ্ধৃত কর্মমার্গ হচ্ছে 'কর্মযোগ'। এটিকে 'বৈদান্তিক কর্মযোগ' বলে। বৈদান্তিক কর্মযোগ হচ্ছে 'নিষ্কাম কর্ম'।

ফলভোগের বাসনা ত্যাগ করে যখন কর্ম করা হয় তখন সেটিকে 'নিষ্কাম কর্ম' বলে। নিষ্কাম কর্মই হচ্ছে কর্মযোগ। নিষ্কামকর্মে বন্ধন হয় না। নিষ্কামকর্মে বন্ধন হয় না কেন? গীতার সামগ্রীক আলোচনায় বিষয়গুলি স্পষ্ট হবে।

অপরদিকে ফলভোগের বাসনা নিয়ে যখন কোন কর্ম করা হয় তখন সেটিকে বলে 'স্বকাম কর্ম'। বৈদিক কর্মমার্গ হচ্ছে স্বকাম কর্ম। কেননা যাগ-যজ্ঞাদির মাধ্যমে বস্তুত

জাগতিক বিষয়াদি কিংবা স্বর্গাদি কামনা করা হয়। এ ধরণের সাধনা বা কর্মের পেছনে কাম্য বস্তু লাভ করার বাসনা কাজ করে। তাই 'কাম্য কর্ম'।

যোগ শব্দটি দ্বারা সাধারণত আসন-প্রাণায়ামাদি, অষ্টাঙ্গযোগ বা সমাধিযোগকে বোঝায়। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দটি সে অর্থে ব্যাবহৃত হয়নি। গীতায় কর্মযোগ বা যোগ বলতে নিষ্কাম কর্মকে বোঝান হয়েছে। এটিই বৈদান্তিক কর্মযোগ। বৈদান্তিক কর্মযোগই গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

গীতা বেদান্ত শাস্ত্রের অন্তর্গত যোগ বা কর্মযোগ মার্গের গ্রন্থ এ বিষয়টি বোঝাতেই এর সকল অধ্যায়ের শেষে যোগ শব্দটি ব্যাবহার করা হয়।

যোগ শব্দটির নানাবিধ ব্যাবহার আছে। ফলে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা থেকে এর যথাযথ অর্থটি বুঝে নিতে হয়। কেননা যোগ হচ্ছে কর্মের কৌশল। কিংবা বলা যায় যে কর্মে কৌশলী হওয়াই হচ্ছে যোগ।

শোক করা অর্থহীন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথমে সাংখ্যের আলোকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। জয়লাভে জগত ভোগ, মৃত্যুতে স্বর্গলাভ। দু'দিক থেকে লাভ। যুদ্ধ না করলে কীর্তিনাশ। সকল আলোচনাই জ্ঞান ও বাস্তবতার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে করা হয়েছে। কোন বিষয়ে জ্ঞানসম্মত চুলচেরা এ বিচার-বিশ্লেষণের পথই হচ্ছে সাংখ্য।

গীতা মতে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান ছাড়া মোক্ষ লাভ সম্ভব হয় না। তাই দেহ থেকে আত্মা পৃথক, আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ, আত্মার মৃত্যু নেই অতএব শোক করার কারণ নেই এভাবে আত্মতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

সাংখ্যের বিশ্লেষণ শেষে শ্রীকৃষ্ণ যোগের আলোচনা উত্থাপন করেন। বলেন, যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করলে কর্মের বন্ধন হয় না। ফলে পাপ-পূণ্য কিছুই স্পর্শ করে না। বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায়। অর্জুনকে তিনি সে জ্ঞানে কর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাই এভাবে বলেন যে, এবার যোগ বিষয়ে শোন। যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হলে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে [দ্রষ্টব্য গীতা ২:৩৮-৩৯]।

উল্লেখ্য যে, জন্ম ও কর্ম হচ্ছে জড় জাগতিক বন্ধনের কারণ। এ বন্ধন হচ্ছে সকল যন্ত্রনার কারণ। জীব যতক্ষণ জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ তাকে এ যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে। বন্ধনই অর্জুনকে শোক ও যন্ত্রনায় ক্লিষ্ট করছে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগাচ্ছে। করণীয় নির্ধারণে তিনি দ্বিধান্বিত হয়েছেন।

কর্ম করলে ভাল-মন্দ ফল সৃষ্টি হয়। যুদ্ধও একটি কর্ম। সেখানেও ন্যায় পরিপন্থী কর্ম করলে মন্দ ফল সৃষ্টি হবে। পাপ হবে। গুরুজনদেরকে হত্যা করা হলে সে পাপের ফলও ভোগ করতে হবে।

ফল ভোগের জন্য দেহ ধারণ করতে হবে। দেহ প্রাপ্তির জন্য জন্ম নিতে হবে। জন্ম নিলে আবার কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। জড়দেহ বা জড় প্রকৃতি থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে কর্মের বন্ধনে জন্ম-মৃত্যুর সংসার বন্ধন চলতেই থাকবে। তাই জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে এ জড় বন্ধন, কর্ম বন্ধন বা জন্ম-মৃত্যু চক্রের বন্ধন থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বৈদিক দর্শনের যোগমার্গের সে মর্মবাণীই শুনিয়েছেন।

যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করলে কর্মের বন্ধন হয় না। পাপ-পূণ্য কিছুই স্পর্শ করে না। জড় বন্ধন থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি লাভ করা যায়। অতএব কর্ম ত্যাগ বা সন্ন্যাস নয় অর্জুনকে তিনি যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করতে বলছেন। যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করার সুবিধা কি?

• **২.৪০** স্বর্গাদি লাভের আশায় কিংবা মনোবাঞ্ছনা পূরণের লক্ষ্যে বৈদিক যাগযজ্ঞ করা হয়। এসব যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান শুরু করে যদি সুসম্পন্ন করা না হয় তবে ফল লাভ হয় না। এমনকি কোন ক্রুটি-বিচ্যূতি হলে তাতেও পাপ হয়। এমনই প্রচলিত ধারণা। কিন্তু কর্মযোগে পাপজনিত তেমন মহাভয় নেই।

কর্মযোগের সাধনা আপনা থেকে সাধককে আত্মন্নোতির পথে নিয়ে যায়। এখানে কিছুই করতে হয় না। কেবল জ্ঞানটি ভেতরে প্রবেশ করাতে হয় এবং সে জ্ঞানে সন্তুষ্ট চিত্ত হয়ে অবিচল থাকতে হয়। এক অর্থে নিজেকেও সন্তুষ্ট চিত্ত হতে হয় না। জ্ঞানই অন্তরকে আপনা থেকে তুষ্ট করে তোলে।

জ্ঞানে তুষ্ট হলে এই যোগসাধনা কখনও ব্যার্থ হয় না। কেননা জ্ঞান কখনও হারিয়ে যায় না। জীবনের কোন না কোন সময়ে এ জ্ঞান ফল প্রদান করবেই। কর্মের বন্ধনজনিত মহাভয় থেকে জীবকে কখনও না কখনও উদ্ধার করবেই।

স্বকাম কর্মে যে কাজ করা হয় নিষ্কাম কর্মেও সে একই কাজ করা হয়। পার্থক্য কেবল নিয়তে, জ্ঞানে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে। এ জ্ঞানে চলতে জানতে হয়। মনকে

অনুধাবিত জ্ঞানে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত রাখতে হয়। এই যোগে কাজ করার আরও গুরুত্বপূর্ণ উপকারীতা আছে।

• **২.৪১** একনিষ্ঠতা ভিন্ন কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করা যায় না। গভীরভাবে মনোনিবেশ ব্যাতিত কাজে সফলতা আসে না।

চিত্ত যখন লক্ষ্যে একনিষ্ঠ হয় তখন মানুষ সুখ-দুঃখ, সফলতা-বিফলতা, শুভ-অশুভ এসব নিয়ে ভাবে না। কর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এক মনে এক ধ্যানে গভীর মনযোগের সাথে কাজের প্রয়োজনে কাজ করে। অন্তর দিয়ে কাজ করে। নিজ আগ্রহে কাজ করে। তখনই কাজে সফলতা আসে। কাজে একনিষ্ঠ হওয়া তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যোগ চিত্তকে লক্ষ্যে একনিষ্ঠ হতে সহায়তা করে। কিভাবে? সে আলোচনা আসবে।

কর্মে যাদের একনিষ্ঠতা নেই বস্তুত তাদের সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকার কারণে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তারা মনোনিবেশ করতে পারে না। লক্ষ্যহীন বিক্ষিপ্ত চিত্তে তারা সবকিছুতে মনোনিবেশ করতে চায়। সবকিছু পেতে চায়। তাই বলা হয়েছে, অনিশ্চিত বুদ্ধি বা জ্ঞান বহু শাখাবিশিষ্ট ও অনন্তরূপ হয়। এভাবে কোন কর্মেই সফলতা আসে না। কোন কর্মেই আগ্রহ বা আন্তরীকতা থাকে না। এ বিষয়ে বেদের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪২	হে পার্থ! বেদবাক্যে অনুরক্ত স্বল্প জ্ঞানের কিছু মানুষ স্বর্গসুখ ভোগ, জন্মরূপ কর্মফল, ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপ এই সমস্ত শ্রুতি সুখকর বচনে অধিক আসক্ত। তারা মনে করে এর অধিক আর কিছু নেই। [৪২-৪৩]
৪৪	তাদের এসব কথায় ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যাক্তিগণের চিত্ত বিমোহিত হয়। ফলে তাদের বুদ্ধি নিশ্চিতভাবে কোন বিষয়ে একনিষ্ট হতে পারে না।

• **২.৪২-৪৪** ধর্ম বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ বেদ বাক্যকে প্রামাণ্য মনে করে। বেদের বাণী অনুসরণ করে তাই তারা বৈদিক কর্মমার্গে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। বেদে নানাবিধ যাগযজ্ঞের বিধান আছে। বলা হয় এসব যাগযজ্ঞ পালনে ইহকাল ও

পরকালে নানাবিধ ফল লাভ হয়। যেমন ইহকালে ধনৈশ্বর্য্য লাভ, পরকালে স্বর্গ ও উর্বশী লাভ হয় ইত্যাদি।

যাগযজ্ঞের এসব কর্ম অনুষ্ঠান হচ্ছে কাম্যকর্ম। অর্থাৎ কামনা-বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়ে করা কর্ম। তারা এসবের মধ্য দিয়ে এ জগতে প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ কিংবা পরজীবনে স্বর্গাদি লাভ কামনা করে। তাই কাম্যকর্ম।

সাধারণ মানুষ এগুলিকেই প্রকৃত ধর্মকর্ম মনে করে। মনে করে যে ধর্মে এর অধিক আর কিছু নেই। অথচ মোক্ষলাভ ও স্বর্গাদি লাভ এক নয়। সমগ্র গীতা অধ্যায়নে বিষয়গুলি সুস্পষ্ট হবে।

সত্যি বলতে কাম্যকর্ম ভোগের বাসনাকে অধিকতর তীব্র করে তোলে। বেদের মনোমুগ্ধকর ফলপ্রদ এসব বাণী চিত্তকে চঞ্চল, অস্থির ও বিক্ষিপ্ত করে তোলে। এভাবে কর্মে একাগ্রতা বা একনিষ্ঠতা আসে না।

বেদে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞের বিধানাবলী আছে সেসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে ক্রমে আত্ম-উপলব্ধির পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং পরমেশ্বরকে জানা। কিন্তু মানুষ বস্তুত লোভ ও বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়। তারা মূল বিষয়ে মনোনিবেশ করে না। তারা তাৎক্ষণিক কাম্য বস্তু লাভ করতে চায়। তাই বলা হয়েছে,

“ধনৈশ্বর্য্য ও সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের আকৃষ্টকারী শোভা। কিন্তু ভাল কাজ যা স্থায়ী- পুরস্কার প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার জন্য পালনকর্তার দৃষ্টিতে সেটিই উত্তম।” (আল-কোরআন ১৮:৪৬)

চঞ্চল চিত্তে ঈশ্বরে মনোনিবেশ হয় না। তাই এমন মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ ভগবানকে পায় না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বেদোক্ত চমকপ্রদ এমন সব কথায় আকৃষ্ট হতে নিরুৎসাহিত করেন। বলেন,

৪৫	হে অর্জুন! বেদ বস্তুত ত্রৈগুণ্য বিষয়ক। তুমি এই ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হও। দ্বন্দ্বভাব রহিত, সর্বদা সত্ত্বস্থ, যোগক্ষেম রহিত ও আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হও।
৪৬	ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের মাধ্যমে যে সমস্ত প্রয়োজন পুরণ হয়, অতি বৃহৎ

	জলাশয়ের মাধ্যমে তা একবারে সর্বতোভাবে সম্পন্ন হয়; তেমনই বেদোক্ত কাম্য কর্মসমুহে যে ফল লাভ হয়, পরব্রহ্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানবান ব্যাক্তির সে সমস্তই লাভ হয়।

● **২.৪৫** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বেদ মূলত ত্রৈগুণ্য বিষয়ক। অর্থাৎ স্বভাবের সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে প্রাধান্য দিয়ে বেদ বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। এই তিন গুণের প্রভাবে জীব সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ত্রিগুণের প্রভাব বিবেচনায় জীবের স্বভাব অনুসারে বেদ এক এক জনের জন্য এক এক রকম সাধনা পদ্ধতি ও যাগযজ্ঞের বিধান দিয়েছে। যেন প্রত্যেকেই তার স্বভাব অনুসারে আরাধনা করে মোক্ষ লাভ করতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে বলছেন। তাহলে ত্রিগুণের প্রভাবে জড় বন্ধনেই আর আবদ্ধ হতে হবে না। ফলে মোক্ষ লাভের প্রয়াসে বেদের নানাবিধ রীতি-বিধিও পালনের আর প্রয়োজন হবে না। কিভাবে ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলেন, এর জন্য দ্বন্দ্বভাব রহিত, সর্বদা সত্ত্বস্থ, যোগক্ষেম রহিত ও আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হতে হবে।

সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভাল-মন্দ এমনসব বৈপরীত্য ভাবই হচ্ছে দ্বন্দ্বভাব। দ্বন্দ্ব ভাব থেকে মুক্ত হয়ে সমভাবাপন্ন হতে হবে। সুখেও উদ্বেলিত হওয়া যাবে না, দুঃখেও কাতর হওয়া চলবে না। সকল পরিস্থিতিতে একই রকম স্থির-অবিচল থাকতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে প্রকৃতির গুণসমুহ প্রভাবিত করতে পারছে না। এ ভাবই হচ্ছে ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হওয়া।

ত্রিগুণের উর্ধ্বে নির্গুণ পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে তমঃ ও রজঃগুণ পেরিয়ে সর্বদা সত্ত্বগুণে বা শুদ্ধ সত্ত্বায় অধিষ্ঠিত থাকতে হবে। তাহলে নিজেকে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সংযত রাখা সম্ভব হবে। মন্দ গুণ অযাচিতভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না। চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা পাবে এবং উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সহজ ও সম্ভব হবে।

যোগ-ক্ষেম পরিত্যাগ করতে হবে। 'যোগ' হচ্ছে অলব্ধ বস্তুর উপার্জন এবং 'ক্ষেম' হচ্ছে লব্ধ বস্তুর সংরক্ষন। যোগক্ষেম পরিত্যাগ হচ্ছে উপার্জন ও তা রক্ষার চিন্তা পরিত্যাগ করা। এসব চিন্তা-দুঃশ্চিন্তা জাগতিক আসক্তি ও বন্ধনের কারণ। অতএব

এসব ভাবনা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তবেই ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হবে।

গীতা মতে আত্ম তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া মোক্ষ লাভ হয় না। গীতায় তাই কর্মের সাথে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেয়া হয়েছে। আত্মজ্ঞান হচ্ছে আত্মা বা পরমাত্মা তথা পরমেশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান। অর্থাৎ নিজেকে চিনতে ও বুঝতে শেখা। আত্মা কি, জীবন কি, দেহ কি, জড় ও জীব বা দেহ ও আত্মার পার্থক্য কি; কোথা থেকে এলাম, কোথায় চলে যাব, কার সাথে সম্পর্ক বিষয়গুলি জানার চেষ্টা করা। পরমেশ্বরের সাথে সম্পর্ককে নিরবিচ্ছিন্ন রাখা। তাতেই একনিষ্ঠ হওয়া। এ জ্ঞানই মুক্তির পথ উন্মোচন করে দেয়। এ জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয়েই ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে হবে।

● **২.৪৬** বলা হচ্ছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জলাশয়ের মাধ্যমে যে সমস্ত প্রয়োজন পূরণ হয়, অতি বৃহৎ জলাশয়ের মাধ্যমে তা একবারেই সর্বতোভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। ঠিক তেমনি যিনি পরব্রেহ্মার জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয়েছেন তিনি সবকিছু জেনে-বুঝেই তেমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। বেদের প্রতিটি দিক-নির্দেশনা যে কারণে পরিপালন করতে হয় তিনি তার মর্ম ও অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি সব জানেন। তিনি বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ। বৈদিক শাস্ত্রে ও ব্রহ্ম বিষয়ে তেমন মানুষ পূর্ণ জ্ঞানবান। ব্রহ্মনিষ্ঠ তেমন ব্যাক্তির বেদে আর প্রয়োজন থাকে না। বেদোক্ত নানাবিধ কাম্যকর্ম বা যাগযজ্ঞ করে যে ফল লাভ হয়, পরব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞানবান ও অভিজ্ঞ ব্যাক্তির সে সমস্ত একবারেই লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তেমন পর্যায়ে উন্নীত হতে বলছেন।

উল্লেখ্য যে, জগতের একটি বৃহৎ অংশের সাধারণ মানুষের ব্যাবস্থাপনার জন্য ফলপ্রদ বৈদিক বিধি-বিধানসমুহ পালনেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। এটিকেও অস্বীকার করা যাবে না। কেননা কিছু মানুষের অবুঝ মন কামনা-বাসনায় উত্তাল। যেমন বলা হয়েছে,

“তোমরা তো পার্থিব জীবনকেই অধিক ভালবাস এবং পরবর্তী জীবনকে অবহেলা কর।” (আল-কোরআন ৭৫:২০-২১)

উদ্বেলিত সেসব মানুষের অন্তরসমুহকেও শান্ত রাখতে হবে। জগতে তেমন মানুষের সংখ্যাই বেশী। তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সে পথে যেতে বারণ করছেন। তাহলে কি করতে হবে বা কিভাবে চলতে হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪৭	কর্মেই তোমার অধিকার; কর্মফলে নয়। কর্মফল যেন তোমার কর্ম প্রবৃত্তির হেতু না হয়। কর্মত্যাগে তোমার আসক্তি না হোক।
৪৮	আসক্তি পরিত্যাগ করে যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে তোমার কর্ম কর, হে ধনঞ্জয়! সাফল্য-ব্যার্থতায় সমভাবাপন্ন হও। এরূপ সমবুদ্ধিকে যোগ বলে।
৪৯	নিকৃষ্ট কর্ম পরিত্যাগ কর; বুদ্ধিযোগে কর্ম কর, হে ধনঞ্জয়! সেই প্রকার চেতনার স্মরণাপন্ন হও। হীন মানসিকতাসম্পন্নরাই ফলাকাঙ্খী হয়।

● **২.৪৭** প্রত্যেকেরই তার নিজ কর্তব্যকর্ম বা স্বধর্ম পালন করার অধিকার আছে। তবে এমনকি নিজ কর্মের ফল ভোগ করার অধিকারও সত্যিকার অর্থে কারই নেই। ফলভোগ কিংবা তা বন্টনের সত্যিকারের অধিকার কেবল তাঁর যিনি জীবন, জগত ও কর্ম সৃষ্টির পেছনের কারণ। বলা হচ্ছে,

"সকল কারণই আল্লাহর হাতে।" (আল-কোরআন ৩:১৫৪)

সকল কারণের কারণ হচ্ছেন ভগবান। ফলভোগ ও তা বন্টনের অধিকার কেবলমাত্র ভগবানের। ক্ষত্রিয় হিসেবে অর্জুনের স্বধর্মোচিত কর্তব্যকর্ম হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের কারণে যুদ্ধ বা জেহাদ করা। সে কর্মে তাঁর অধিকার আছে। যেখানে তাঁর অধিকার আছে সে কর্ম তিনি পালন করতেই পারেন। কিন্তু কর্মফল ভোগের বাসনা নিয়ে সে কাজ করা যাবে না। তাই বলা হয়েছে কর্মফল যেন তোমার কর্ম প্রবৃত্তির হেতু, কারণ বা প্রেরণা না হয়।

অর্জুন যুদ্ধ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। প্রচলিত অর্থে সন্ন্যাস বলতে সর্বকর্ম ত্যাগ করাকে বোঝায়। কিন্তু সর্বকর্ম ত্যাগ কখনই জীবন ও জগতের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সকলেই যদি সে পথ অনুসরণ করতে চায় তবে সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কর্মত্যাগে তথা সন্ন্যাসেও যেন তোমার আসক্তি না হয়।

গীতা বেদের আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞের মাধ্যমে বাসনা লাভের মনোবৃত্তি নিয়ে কর্ম করাকে উৎসাহিত করে না। আবার পূর্ণ কর্মত্যাগ বা তথাকথিত সন্ন্যাসকেও সমর্থন করে না। কর্ম করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে কর্ম করতে হবে?

• **২.৪৮** বলা হচ্ছে, কর্মের ফলভোগের বাসনা ও বিষয় আসক্তি বন্ধনের প্রকৃত কারণ। শ্রীকৃষ্ণ তাই আসক্তি পরিত্যাগ করে কর্ম করতে বলেন। কিন্তু ফলভোগের বাসনা ও বিষয় আসক্তি পরিত্যাগ করা সহজ না। চাইলেও ত্যাগ করা যায় না। এগুলির আকর্ষন তীব্রভাবে টানে। তাই সাধনার প্রয়োজন হয়।

সাফল্য-ব্যার্থতা, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এমনতর সকল প্রকার বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্বিক ভাবসমুহের ক্ষেত্রে মনের অবস্থাকে সমভাবাপন্ন রাখতে হবে। যেমন সুখে বা আনন্দে অতি উচ্ছসিত হওয়া যাবে না, তেমনি দুঃখেও বিচলিত বা উদ্বেলিত হয়ে হতাশ হওয়া যাবে না।

ভাল-মন্দ উভয় অবস্থায় সমবুদ্ধিসম্পন্ন তেমন মানসিক অবস্থাই হচ্ছে 'যোগ'। একটা স্থির ও স্থিতিশীল অবস্থা। চাঞ্চল্য রহিত। মানসিক অবস্থাকে এভাবে স্থির রেখে কর্ম করতে বলা হচ্ছে। কিন্তু এমন মানসিক অবস্থা অর্জন করাও কোন সহজ বিষয় না। মানুষ উদ্বেলিত হবেই।

যোগের গুরুত্ব ও মহাত্ম এখানেই! যোগ এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। মানসিক অবস্থাকে তেমন পর্যায়ে উন্নীত হতে সহায়তা করে। তাই যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করতে বলা হয়েছে।

• **২.৪৯** বলা হচ্ছে যে, হীন ও নিচু মানসিকতাসম্পন্নরাই ফলাকাঙ্খী হয়। ফলভোগের আশা নিয়ে করা কর্মের পেছনে লোভী মনোবৃত্তি কাজ করে। এ ধরণের মানুষ ধর্মকর্ম করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ঈশ্বরে মনোনিবেশ করে না বা করতেও পারে না। তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে ফলের প্রতি। বস্তুত এরা লোভী।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিকৃষ্ট মানের এমন কর্ম পরিত্যাগ করতে বলেন। ফলভোগের বাসনা এবং লোভী ও নিচু মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে বুদ্ধি বা জ্ঞানের আলোকে কাজ করতে বলেন। বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে বুঝে সেই চেতনায় জীবন, জগত, সৃষ্টি ও মানব কল্যাণে নিষ্কাম হয়ে কাজ করতে বলেন।

একই কাজ স্বকাম মনোবৃত্তি নিয়ে করা যায় আবার নিষ্কাম মনোভাবেও করা যায়। জ্ঞানের আলোকে বুদ্ধি প্রয়োগ করে বন্ধন মুক্ত হয়ে করা হয় বিধায় নিষ্কামকর্ম বা কর্মযোগকে বুদ্ধিযোগও বলা হয়।

কাম্যকর্ম বা স্বকাম কর্ম এবং নিষ্কামকর্ম কখনই সমপর্যায়ের নয়। নিষ্কামকর্মীর স্থান অনেক অনেক উঁচু স্তরে। বুদ্ধিযোগে কাজ করার উপকারীতা কি? বলা হচ্ছে,

৫০	যিনি বুদ্ধিযোগে যুক্ত, এ জীবনেই তিনি পাপ-পূণ্য উভয়টি থেকে মুক্ত হতে পারেন। অতএব যোগে যুক্ত হও। কর্মে কৌশলই হচ্ছে যোগ।
৫১	বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মজাত ফল পরিত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এইভাবে তারা উপদ্রবহীন অবস্থা লাভ করেন।

● **২.৫০** নিষ্কামকর্মই হচ্ছে গীতোক্ত কর্মযোগ বা বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগে কর্ম করলে কর্মের বন্ধন হয় না। ভাল-মন্দ কোন ফল সংযোজন হয় না। পাপ-পূণ্য উভয়টি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকা যায়। ফলে যেমন স্বর্গ লাভ হয় না, তার চেয়েও বড় কথা যে নরকও প্রাপ্ত হতে হয় না।

বলা হচ্ছে, বুদ্ধিযোগই হচ্ছে কর্ম করার প্রকৃত কৌশল এবং কর্মে কৌশলী হওয়াই হচ্ছে যোগ। অতএব কৌশলী হয়ে যোগে যুক্ত হয়ে কর্ম করতে বলা হচ্ছে। কৌশলটি কিভাবে কাজ করে?

● **২.৫১** দর্শনটি হচ্ছে, জড়দেহ থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবকে তার কর্মের ফল ভোগ করতে সংসারে ফিরে আসতে হয়। সংসারে ফিরে আসতে হলে তাকে জন্ম নিতে হয়। জন্ম নিয়ে সে আবার নতুনভাবে জড়দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অতীত কর্মের ফলানুযায়ী নির্দিষ্ট জড়দেহ প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্ত দেহের স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে সে ভাল-মন্দ ফল ভোগ করে। জন্ম নিলে মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। এভাবে সে পরিপূর্ণভাবে জড় প্রকৃতির এ বন্ধন থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর জীবন চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। এই হচ্ছে জন্মরূপ বন্ধন বা কর্ম বন্ধন।

জড় জগতে পতিত হলে কর্মফল ভোগের বাসনা ও বিষয় আসক্তি জীবকে অতিষ্ট করে রাখে। বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে হতাশা ও যন্ত্রনা দেখা দেয়। আবার পেলেও হারিয়ে যাওয়ার আশংকা কাজ করে। স্বস্তি আসে না। আকাংখা একটি শেষ হলে আরেকটির

উদয় হয়। এগুলি অর্জনে প্রাণান্তকর কষ্ট করতে হয়। এভাবে কামনা ও বাসনা থেকে সৃষ্ট যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়। উপরন্তু আছে নোংরা প্রতিযোগীতা ও হিংসা-হানাহানি। সব মনের শান্তি কেড়ে নেয়।

কর্ম হচ্ছে জন্মের কারণ। কেননা কর্মের ভাল-মন্দ ফল ভোগ করতে জীবকে জন্ম নিতে হয়। জন্ম নিলে জীব জড় প্রকৃতির বন্ধনে বাধা পড়ে। আর বন্ধনই হচ্ছে সকল যন্ত্রনার মূল কারণ। অতএব জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু কিভাবে?

বলা হচ্ছে, কর্মের ফলভোগের বাসনা জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে। অতএব ফলভোগের বাসনা ত্যাগ করতে হবে। কর্মজাত ফল পরিত্যাগ করা হলে কর্ম সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় হয়ে যায় বা লয় প্রাপ্ত হয়। সে কর্ম থেকে ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য কোনরূপ ফল সঞ্চয় হয় না [দ্রষ্টব্য গীতা ২:৩৮-৩৯]। ফল সঞ্চিত না হলে ফলভোগ হেতু পুনর্জন্মও হয় না। জন্ম নেয়ার কারণ নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। এগুলি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

বুদ্ধিমান মনীষিগণ তাই কর্মজাত ফল পরিত্যাগ করেন। ফল পরিত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং উপদ্রবহীন যন্ত্রনামুক্ত জীবন লাভ করেন। এটিই হচ্ছে নিষ্কামকর্ম বা কর্মযোগ থেকে প্রাপ্ত ফল। তাই কর্মযোগে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে বলা হয়। যোগে অধিষ্ঠিত তেমন সফল যোগীকে চেনা যাবে কিভাবে? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৫২	যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গভীর অরণ্য অতিক্রম করবে, তখন তুমি যা শুনেছ এবং যা শুনতে হবে সেসব বিষয়ে নিস্পৃহ-নিরপেক্ষ হতে পারবে।
৫৩	যখন তোমার বুদ্ধি লৌকিক কিংবা বৈদিক নানারূপ ফলকথা শ্রবনে বিভ্রান্ত না হয়ে সমাধিতে স্থির-অবিচল থাকবে তখন তুমি যোগে অধিষ্ঠিত হবে।

● **২.৫২-৫৩** স্বকাম কর্মীর বুদ্ধি বা জ্ঞান ধন-সম্পদ প্রাপ্তি, সন্তানাদি লাভ, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করা এমনসব জাগতিক বিষয়ে মোহগ্রস্ত থাকে। ফলে পারমার্থিক জ্ঞান লাভে বা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিষয়ে ধ্যান দিতে পারে না।

যখন কারও বুদ্ধি জাগতিক এ সকল মোহ-মায়া ও আসক্তি অতিক্রম করে উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে পারবে, তখনই একজন মনোনিবেশ সহকারে গভীরের জ্ঞানে প্রবেশ করতে পারবে।

যখন গভীরের জ্ঞানে প্রবেশ করতে পারবে তখন বৈদিক বা লৌকিক ফল লাভজনক যে সমস্ত চমৎকার কথা অতীতে শ্রবন করেছে, কিংবা ভবিষ্যতে আরও যেসব শুনতে হবে সেসব বিষয়ে মানুষ আর বিভ্রান্ত হবে না। সব বিষয়ে নিস্পৃহ ও নিরপেক্ষ হতে পারবে। তাই গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে,

"হে মানুষ! .. পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে মোহিত করতে না পারে এবং কোন মোহিতকারী যেন আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ভূলভাবে বিমোহিত না করে।" (আল-কোরআন ৩৫:৩৫)

"জেনে রেখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা।" (আল-কোরআন ৮:২৮)

বলা হচ্ছে, বুদ্ধি যখন লৌকিক বা বৈদিক নানারূপ ফলকথা শ্রবনে আর বিভ্রান্ত হবে না এবং চিত্তও যখন আর অস্থির হবে না কেবল তখনই সমাধিতে স্থির-অবিচল থাকা সম্ভব হবে। মন যখন সমাধিতে স্থির-অবিচলভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারবে তখন একজন যোগে অধিষ্ঠিত হয়েছে বলে বলা যেতে পারে। অর্জুন জানতে চেয়ে বলেন,

৫৪	হে কেশব! সমাধিস্ত স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যাক্তির লক্ষণ কি? কিভাবে কথা বলেন? কিভাবে অবস্থান করেন? কিরূপে বিচরণ করেন?

- **২.৫৪** অর্জুন যোগে অধিষ্ঠিত সমাধিস্ত স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যাক্তির লক্ষণসমুহ জানতে চান। বলেন, তিনি কিভাবে কথা বলেন? কিভাবে অবস্থান করেন? কিরূপ বিচরণ করেন? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৫৫	মনের সকল বাসনা পরিত্যাগ করে যখন কেউ আপনাতেই আপনি তুষ্ট থাকেন তখন তাঁকে স্থিতপ্রাজ্ঞ বলা হয়।
৫৬	দুঃখ-বেদনাতেও যে চিত্ত উদ্বেগহীন, সুখেও যে স্পৃহাশূন্য, অনুরাগ-ভয় ও ক্রোধ থেকে যে মুক্ত তাকেই স্থিতপ্রাজ্ঞ মুনি বলা হয়।

৫৭	সর্ববিষয়ে যিনি আকর্ষন বর্জিত, প্রিয়-অপ্রিয় কোন কিছুর প্রাপ্তিতে না উচ্ছসিত না অসন্তুষ্ট। তাঁরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

• **২.৫৫** যোগে সফলভাবে অধিষ্ঠিত সমাধিস্ত ব্যাক্তিই হচ্ছেন স্থিতপ্রাজ্ঞ। অর্থাৎ ধীর-স্থির স্থিতি অথচ প্রজ্ঞাসম্পন্ন।

মনের কামনা-বাসনা চিত্ত চাঞ্চল্যতার কারণ। কামনা-বাসনা মুক্ত হলে চিত্তের চাঞ্চল্যতা দুর হয়। চিত্ত চাঞ্চল্য দুর হলে নিবিষ্টচিত্তে একনিষ্ঠভাবে ধ্যানমগ্ন হওয়া সম্ভব হয়। বহির্মূখী চিন্তা উপদ্রব করতে পারে না। তেমন অবস্থায়ই একজন আপন চেতনার সঙ্গে অত্যান্ত ঘনিষ্টভাবে মিশে যেতে পারেন। এ আপন কে? এ আপন হচ্ছেন নিজে অর্থাৎ আত্মা। তিনি আত্মার সঙ্গে বা নিজের সঙ্গেই অত্যান্ত ঘনিষ্ট হয়ে একাত্ম হয়ে যান। মনের তেমন অবস্থায় আত্মার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও দৃঢ় সম্পর্কের বন্ধন গড়ে ওঠে। এটিই হচ্ছে সমাধিস্ত হওয়া।

এটিও বুঝতে হবে যে স্বতন্ত্র আত্মারও কোন অস্তিত্ব নেই যদি না তার সাথে পরমেশ্বরের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। অতএব যিনি সমাধিস্ত অর্থাৎ আত্মার সাথে যিনি সার্বক্ষণিক নিবিড় সম্পর্ক অনুভব করেন বস্তুত তিনি পরমেশ্বরে মগ্ন থাকেন।

উল্লেখ্য যে, সমাধিস্ত হওয়ারও কিছু নিয়ম-বিধি আছে। উপনিষদের জ্ঞানকান্ডে জীবন-জগত ও ব্রক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে যখন গবেষনা শুরু হয় তখন তারা স্থির করেন যে পরব্রক্ষ্মই হচ্ছেন ব্রক্ষ্মান্ডের মূল। দেহমধ্যে অন্তর্যামীরূপে তিনিই বিদ্যমান। ধ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁকে জানতে ও পেতে হবে। তার জন্য আত্মাতে সমাধিস্ত হতে হবে।

সমাধিস্ত হওয়ার সেই যোগ প্রণালী অষ্টাঙ্গযোগ, রাজযোগ বা সমাধিযোগ বিবিধ নামে পরিচিত। উপনিষদের জ্ঞানমার্গ থেকে এভাবে সমাধিযোগের উদ্ভব হয়। পতঞ্জলি মুণি এগুলিকে শৃংখলাবদ্ধ করেন। এর মাধ্যমে আত্মাতে সমাধিস্ত হয়ে পরমেশ্বরের সাথে চিত্তকে নিবিড়ভাবে সংযোগের সাধনা করা হয়।

যোগ হচ্ছে সমাধিস্ত হয়ে পরমের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পন্থা। আত্মায় চিত্তকে নিবিষ্ট করে আত্মস্থ হওয়াই হচ্ছে সমাধিস্ত হওয়া। যোগের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা হয়। যোগ মনের চঞ্চলতা দুর করে। চিত্তকে শান্ত করে। সকল চিন্তা ও ভাবনাকে একমুখে প্রবাহিত করা হয়। চিত্তকে কেবলমাত্র

ঈশ্বরমুখী হয়। তাই বলা হয়েছে, 'এই যোগে বুদ্ধি বা জ্ঞান সুনিশ্চিত ও একনিষ্ঠ হয়' [দ্রষ্টব্য গীতা ২:৪১]।

সম্পর্ক যার জগতের মহান অধিশ্বর ঈশ্বরদেরও ঈশ্বর পরমেশ্বরের সাথে, অপরাপর সকল কিছু তখন তার কাছে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ও মূল্যহীন মনে হয়। জাগতিক বিষয়গুলি তখন আর তেমন একজনের জন্য প্রেরণা হয়ে কাজ করে না।

কাজ করতে প্রেরণা লাগে। স্বকাম কর্মে কর্মের প্রেরণা হচ্ছে ফল ভোগের বাসনা। সব মানুষই কর্মের ফল ভোগ করতে চায়। এটিই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু কর্মযোগ বা নিষ্কামকর্মে ফল ভোগ নেই। তাহলে মানুষ নিষ্কামকর্ম করবে কেন? এখানে প্রেরণা কোথায়?

নিষ্কাম কর্মীর বা কর্মযোগীর কর্মের প্রেরণা হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান! স্বকাম কর্মে যে কাজ করা হয় নিষ্কাম কর্মেও সে একই কাজ করা হয়। এখানেই দু'জনের কর্মজনিত নিয়ত ও জ্ঞানের পার্থক্য।

যোগে ঈশ্বর ভাবনা বা ঈশ্বর প্রীতিই হচ্ছে কর্মফল ত্যাগের একমাত্র প্রেরণা! ঈশ্বরের কারণে সাধক কর্মের ফলকে ত্যাগ বা উৎসর্গ করেন। কত বড় ত্যাগ ভাবা যায়! কেননা ফলকে কেন্দ্র করেই জগতের সকল মানুষ কর্ম করে। কেবল যোগীই ঈশ্বরের কারণে কর্মের ফল ত্যাগ করেন। লক্ষ্য-কোটিতে তেমন মানুষ একজন।

কর্মযোগে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করায় কোন লোভ বা স্বার্থ কাজ করে না। নিষ্কামকর্ম মহৎ হৃদয়, মহৎ প্রাণ মানুষদের কাজ। সৃষ্টির কল্যাণ বিবেচনায় এ ধরণের কাজ করা হয়ে থাকে। বস্তুত এ ধরণের কাজ করাই হচ্ছে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা। তাই বলা হয়েছে, নিকৃষ্ট কর্ম পরিত্যাগ কর; বুদ্ধিযোগে কর্ম কর। সেই প্রকার চেতনার স্মরণাপন্ন হও। হীন মানসিকতাসম্পন্নরাই ফলাকাঙ্খী হয় [দ্রষ্টব্য গীতা ২:৪৯]।

সফল যোগী পরমেশ্বরে মগ্ন হয়ে আপন চেতনাতে নিজেই নিজের ভেতরে অনাবিল আনন্দ অনুভব করেন। যেটি জাগতিক বা বস্তুগত যে কোন প্রাপ্তি অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। তাই তিনি নিজের ভেতরে নিজেই তুষ্ট থাকেন। যথার্থ যোগী ব্যাতিত এর স্বাদ আর কেউই অবগত নয়। তেমন জ্ঞান ও উপলব্ধিসম্পন্ন মানুষই স্থিতপ্রাজ্ঞ।

- **২.৫৬-৫৭** স্থিরচিত্ত মানুষ দুঃখ-বেদনাতে উদ্বিগ্ন বা বিমর্ষ হয়ে যান না। নিজেকে স্থির রাখেন। সুখ বা আনন্দেও অতি উচ্ছ্বসীত হন না। স্পৃহাশূন্য থাকেন।

বিষয়গুলিকে তিনি ক্ষণস্থায়ী ভাবরূপে দেখেন। তাই প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন না। তিনি জানেন এসবের কিছুই স্থায়ী নয়। আজ আছে কাল নাও থাকতে পারে। এমনকি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি রাগ-অনুরাগ, বিষয় হারানর ভয় কিংবা ক্রোধ থেকেও তারা মুক্ত। তাদের ধ্যান সবকিছুর নিয়ন্তা পরমেশ্বরে। পরমেশ্বরই তাদের একমাত্র প্রেরণা! তাদেরকে তাদের লক্ষ্য থেকে কোন কিছুই টলাতে পারে না।

একই কারণে সব বিষয়ে তিনি আকর্ষন বিবর্জিত হন। তাই প্রিয় কোন বস্তুর প্রাপ্তিতে যেমন অতি উচ্ছসিত হয়ে যান না, আবার অপ্রিয় কোন কিছুর প্রাপ্তিতেও অসন্তুষ্ট, মনক্ষুন্ন কিংবা হতাশও হন না। অনুকুল-প্রতিকুল সব পরিস্থিতিতে সমভাবাপন্ন থাকেন।

এমন মানুষকে কোন কিছুই উন্নীত করে না। কেননা তিনি জ্ঞানের উচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করেন। আবার কোন কিছুই তাকে ক্ষয় বা অধঃপতিতও করতে পারে না। কেননা তিনি নিশ্চিত জ্ঞানে জানেন যে তিনি যথাযথ স্থানে স্থিত। জ্ঞান ও মানসিক অবস্থা তাঁর পূর্ণতাপ্রাপ্ত। তাই কিছুই তাঁকে স্বরূপ থেকে বিচ্যূত করতে পারে না। তেমন মানুষেরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলা যায়। তেমন মানুষই স্থিতপ্রাজ্ঞ। এমনই তাদের লক্ষণ। স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যাক্তি কিভাবে অবস্থান করেন? বলা হচ্ছে,

৫৮	কচ্ছপের অঙ্গসমুহের মতো যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমুহকে সর্বতোভাবে গুটিয়ে নিতে পারেন তিনিই প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত বা স্থিতপ্রাজ্ঞ।
৫৯	যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ করেন না তার বিষয়ভোগ নিবৃত হয়, কিন্তু বিষয় তৃষ্ণা থেকে যায়। তবে পরমের দর্শনে স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যাক্তির বিষয় বাসনাও নিবৃত হয়।

• **২.৫৮** ইন্দ্রিয়সমুহ যখন বিষয়ের সংস্পর্শে আসে তখন বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তির কারণে জীব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হচ্ছে সমুহ বিপদ।

কচ্ছপ তার কঠিন আবরণের ভেতরে হাত-পা গুটিয়ে নিয়ে বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। ইন্দ্রিয়সমুহকে যিনি কচ্ছপের মতো তেমনিভাবে বিষয় থেকে গুটিয়ে নিতে পারেন, ইন্দ্রিয়ের বিষয় তাহলে চিত্তকে আর চঞ্চল বা উপদ্রব করতে পারে

না। তেমন প্রজ্ঞাপূর্ণ মানুষেরই চিত্ত শান্ত ও স্থির হয়। তিনিই স্থিতপ্রাজ্ঞ। যোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমুহকে দমন করার পন্থা। তাই যোগে অধিষ্ঠিত হতে বলা হয়।

● **২.৫৯** নানাবিধ নিয়ম-বিধি অনুসরণ করে কিংবা যোগ সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিগুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে নিবৃত রাখা যেতে পারে। তাতে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা থেকে নিজেকে নিবৃত রাখা যায়। তবে এগুলি হচ্ছে কৃত্রিম উপায়। আপনা থেকে বা মনের স্বতঃস্ফুর্ত ইচ্ছে থেকে বিষয়টি ঘটে না। ফলে মনের ভেতরে জল্পনা-কল্পনায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি যে প্রবল আকর্ষন তা থেকে যায়।

এভাবে ইন্দ্রিয়কে দমন করতে জীবেরও কষ্ট হয়। চিত্তে চঞ্চল ভাব থেকে যায়। এমন মানুষকে সত্যিকারের স্থিতপ্রাজ্ঞ বলা যায় না। বস্তুত ভেতর থেকে বাসনার নিবৃতি না হলে স্থিতপ্রাজ্ঞ হওয়া যায় না।

বলা হচ্ছে, আত্মাতে নিমগ্ন হতে পারলে অনাবিল আনন্দ ও অপার তৃপ্তির অনুভব আসে। আত্মাতে নিমগ্ন হতে পারাই হচ্ছে পরমের দর্শন। একমাত্র এভাবেই বিষয় বাসনা থেকে সত্যিকার অর্থে নিবৃত থাকা যায়। আর কোনভাবেই বিষয় বাসনা দুর করা সম্ভব হয় না।

ঈশ্বর ভাবনায় প্রাপ্ত সুখ স্থায়ী হয় এবং সেটি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করা অপেক্ষাও অনেক বেশী সুখপ্রদ ও নিরাপদ হয়। উচ্চতর তেমন স্বাদ যিনি গ্রহণ করতে পেরেছেন তিনি নিজ জ্ঞানের কারণে স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করা থেকে নিবৃত হন। তেমন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাছে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ ক্ষণস্থায়ী, নিম্ন পর্যায়ের ও অনিরাপদ সুখ মনে হয়। তেমন একজনকে জোরপূর্বক ইন্দ্রিয় দমন করতে হয় না। পরমের দর্শনে স্থিতপ্রাজ্ঞ তেমন ব্যাক্তির বিষয় বাসনা আপনাতেই নিবৃত হয়। তাই বলা হয়েছে,

"হে মানুষ! .. পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে মোহিত করতে না পারে এবং কোন মোহিতকারী যেন আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ভূলভাবে বিমোহিত না করে।" (আল-কোরআন ৩৫:৩৫)

উল্লেখ্য যে, জ্ঞান ও বোধের তেমন পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের জন্য কর্মে নিযুক্ত থাকা ভাল। নিজেকে ব্যাস্ত রাখা উচিত। যেন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মন

প্রবেশ করতে না পারে। কেননা ইন্দ্রিয়সমুহকে বিষয় থেকে নিবৃত করা সত্যিই কঠিন। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও বলেন,

৬০	হে কৌন্তেয়! যত্নশীল হওয়া সত্বেও, চিত্ত বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়সমুহ এমনকি বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনকেও বলপূর্বক হরণ করে।

● **২.৬০** ইন্দ্রিয়সমুহ হচ্ছে চিত্ত বিক্ষেপকারী। বিষয়ের সংস্পর্শে এসে বিষয় সম্পর্কিত এমনসব জ্ঞান ভেতরে প্রবেশ করায় যা অবগত হয়ে বিষয় বাসনায় চিত্ত অস্থির-চঞ্চল হয়ে ওঠে।

বিষয় বাসনায় অস্থির চিত্ত ভাল-মন্দ কর্ম করতে প্ররোচিত ও বাধ্য হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো বটেই, বলা হচ্ছে এটিই সত্য যে এমনকি অতি যত্নশীল বিচার-বিবেকসম্পন্ন মানুষও তাতে বিচলিত হন। মন একেবারেই দুর্দমনীয়। তাকে দমন করা কঠিন। তাহলে করণীয় কি? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৬১	সকল ইন্দ্রিয় সংযত করে আমাতে সমাধিস্ত হয়ে যিনি অবস্থান করেন, তেমন সমাহিত চিত্ত ব্যাক্তির ইন্দ্রিয়সমুহ যখন বশীভূত হয়, তখন প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা পায়।

● **২.৬১** কেউ যদি ইন্দ্রিয়সমুহকে গুটিয়ে নিয়ে অবস্থান করেন এবং বিষয়ভোগ না করেন তবে হয়ত তার বিষয়ভোগ নিবৃত হয়, কিন্তু মনে মনে বিষয় তৃষ্ণা থেকে যায়। চিত্ত শান্ত হয় না। সত্যিকারের লক্ষ্য অর্জন হয় না।

যোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমুহকে দমন করার পন্থা। একই সাথে পরমের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উপায়। তাই ইন্দ্রিয় সংযত করে যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে যিনি ঈশ্বর ভাবনায় সমাধিস্ত হতে পারেন, বলা হচ্ছে তেমন সমাহিত চিত্ত ব্যাক্তির ইন্দ্রিয়সমুহ যখন বশীভূত হয় তখনই সত্যিকারের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা পায়। এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায়ে সত্যিকারভাবে ইন্দ্রিয়সমুহকে দমন করা যায় না। অশান্ত চিত্তকে শান্ত করা যায় না। সত্যি বলতে জীবের কর্ম যখন ঈশ্বরমুখী হয় তখনই নিষ্কাম কর্মযোগ হয়। কর্মযোগীই সত্যিকারের স্থিতপ্রাজ্ঞ।

পরমের সাথে সম্পর্কের অপ্রাকৃত আনন্দের স্বাদ একবার যে গ্রহণ করেছে জড় জগতের সুখ ভোগের প্রতি তাঁর আর কোন আকর্ষন থাকে না। সবকিছুকে গৌন ও তুচ্ছ বোধ হয়। তাই বলা হয়েছে,

"মন্দ ও ভাল সমান নয়, যদিও অসংখ্য মন্দ তোমাকে আকর্ষন করে। অতএব হে, বুঝ সম্পন্ন মানুষ! আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালনে মনযোগী হও, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আল-কোরআন ৫:১০০)

যদি পরমেশ্বরে চিত্তকে সমাধিস্ত করা না যায় তবে সেক্ষেত্রে কি হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৬২	বিষয়ের প্রতি ধ্যন করতে করতে মানুষের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মায়। আসক্তি থেকে কাম সিঞ্চিত হয়, কাম থেকে ক্রোধ জন্ম নেয়। ক্রোধ থেকে পূর্ণমোহ সৃষ্টি হয়, সম্মোহ থেকে স্মৃতির বিভ্রম ঘটে; স্মৃতিভ্রংশ হওয়ার ফলে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হলে মানুষ অধঃপতিত হয়। [৬২-৬৩]

● **২.৬২-৬৩** বলা হচ্ছে, মনকে যদি পরমেশ্বরের ধ্যানে নিয়োজিত করা না যায়, তাহলে মন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি মনযোগী হওয়ার সুযোগ পায় এবং বিষয়ের প্রতি ধ্যন করতে করতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি তার আসক্তি জন্ম নেয়।

আসক্তি থেকে কামনা বা বিষয় লাভের ইচ্ছে জাগে। কাম্য বিষয় কোন কারণে পেতে বাধাপ্রাপ্ত হলে সেই প্রতিবন্ধকের প্রতি ক্রোধের সৃষ্টি হয়। ক্রোধ থেকে মোহ অর্থাৎ বিবেক নষ্ট হয়। মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টির বিস্মৃতি বা কার্যকারণ সম্পর্কের বিস্মৃতি ঘটে। ফলে কি করা উচিত বা কি করা উচিত নয় সেটি নির্ণয় করা যায় না। বিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ হয়। এমনকি এমতাবস্থায় মানুষ নিজের ভালও বুঝতে পারে না। বুদ্ধি নাশ হলেই জীবরে বিনাশ ঘটে। জীব অধঃপতিত হয়। বলা হচ্ছে,

"পার্থিব ভালবাসা থেকে উৎসারিত আনন্দকে মানবের জন্য আকৃষ্টকারী করা হয়েছে, যা আসে নারী ও সন্তান-সন্ততি থেকে এবং স্তুপিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য, বিশেষভাবে চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি-পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামার থেকে। এসবই পার্থিব

জীবনের স্বস্তি। কিন্তু আল্লাহ! তাঁর কাছে আছে অতি উত্তম আবাস।" (আল-কোরআন ৩:১৪)

জাগতিক বিষয়ে মগ্ন না হয়ে পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করতে বলা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে তাই মনকে দুরে রাখতে হবে। কর্মে ব্যাস্ত থাকতে হবে। কল্যাণকল্পে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে হবে। সে কারণে পরমের ধ্যানে বা যোগে যুক্ত হতে হবে। এটিই বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্মত আচরণ। তাই বুদ্ধিযোগ। তবে যে ব্যাক্তি নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সৌভাগ্যবান। বলা হচ্ছে,

৬৪	কিন্তু মন যার নিজের বশীভূত তেমন সংযতমনা মানুষ রাগ-দ্বেষ থেকে বিমুক্ত থেকে ইন্দ্রিয়সমুহ দ্বারা বিষয় উপভোগ করেও নির্মল আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।
৬৫	আত্মতৃপ্তি জন্মালে তার সকল প্রকার দুঃখের নিবৃতি হয়। তেমন প্রসন্নচিত্ত ব্যাক্তির বুদ্ধি অতিশীঘ্রই যথাস্থানে স্থিত হয়; তিনিই স্থিতিপ্রাজ্ঞ।

● **২.৬৪-৬৫** বিষয়ভোগ নিষিদ্ধ নয়। তবে বিষয় যেন বলপূর্বক মনকে মন্দ পথে টেনে নিয়ে যেতে না পারে সে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আবার টেনে নিয়ে গেলেও নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রনে রাখতে হবে।

যিনি সংযতমনা, রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত, ইন্দ্রিয় যার নিজের বশীভূত তেমন ব্যাক্তি স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করতে পারেন। বস্তুত এতেই সত্যিকারের তৃপ্তি লাভ হয় এবং চিত্ত নির্মল ও প্রশান্ত হয়। সকল প্রকার দুঃখ ও মানসিক কষ্টের অবসান ঘটে।

চিত্ত প্রসন্ন হলে অস্থিরতা দুর হয়। মানুষ শান্ত হয়। শান্ত চিত্ত ধীর-স্থির হয়। ধীর-স্থির, শান্ত ও জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের আচরণ হয় বিবেচনাপ্রসূত। তারা ভেবে-চিন্তে, বুঝে-শুনে নিজেকে নিয়ন্ত্রনে রেখে কাজ করেন। রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত থেকে কাজ করেন। অতিরঞ্জিত কিছু করেন না। তাগুদের বশীভূত হন না। ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত হয়ে যান না।

আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রসন্ন চিত্ত মানুষ সাময়িক বিচ্যূত হলেও যথাসময়ে যথাজ্ঞানে স্থিত হন। জ্ঞান ও বোধের তেমন পর্যায়ে মানুষকে স্থিতপ্রাজ্ঞ বলা হয়। পারমার্থিক ভাবনা

বা ঈশ্বরের স্মরণ মানুষকে এমন নিয়ন্ত্রিত মানসিক শক্তিতে বলিয়ান করে তোলে। তাই বলা হয়েছে,

"কাম-রাগ বিবর্জিত বলবানের শক্তি আমি।" (গীতা ৭:১১)

"নিশ্চয়ই! নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে; তবে অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" (আল-কোরআন ২৯:৪৫)

অপরদিকে যিনি যোগযুক্ত নন; পরমার্থিক ভাবনাহীন তেমন ব্যাক্তির অবস্থা কিরূপ হয় সে বিষয়ে বলা হচ্ছে,

৬৬	অযুক্ত বা পারমার্থিক ভাবনাবিহীন ব্যাক্তির আত্ম-বিষয়ক ভাবনা আসে না, ইন্দ্রিয় অবশীভূত। তেমন অশান্তচিত্ত ব্যাক্তির শান্তি নেই। তাহলে সুখ কোথায়?
৬৭	ইন্দ্রিয়ের বিচরণকালে মন যেটিকে অনুসরণ করে, সেই একটি ইন্দ্রিয়ই বায়ু যেমন জলে নৌকাকে আন্দোলিত করে তেমনি তার প্রজ্ঞাকে হরণ করে।
৬৮	অতএব হে মহাবাহো! যার ইন্দ্রিয়সমুহ ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত হয়েছে তাঁরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে- তিনিই স্থিতপ্রাজ্ঞ।

● **২.৬৬-৬৮** যিনি যোগে যুক্ত নন কিংবা বলা যায় যার ভেতরে পারমার্থিক ভাবনা নেই, তার ভেতরে আত্মবিষয়ক ভাবনা আসে না। তেমন মানুষ নিজেকে চিনতে ও বুঝতে শেখেনি। ফলে পরমেশ্বরের সাথে সম্পর্ক বিষয়েও জ্ঞানহীন। অথচ পরমেশ্বরের আশ্রয় কিংবা ভাবনা ছাড়া ইন্দ্রিয় সত্যিকারভাবে বশীভূত হয় না। ইন্দ্রিয় যার অবশীভূত তার শান্তি নেই।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়। মন হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমুহের কেন্দ্রস্থল। ইন্দ্রিয়জনিত সকল জ্ঞান মনে অনুভূত হয়। তাতেই মন আন্দোলিত হয়। জীবের চিত্ত বিষয় বাসনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় হচ্ছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। মন যদি এগুলির একটি বিষয়েও মনযোগী হয় তবে বিষয় তার প্রজ্ঞাকে হরণ করে। বায়ু যেমন নৌকাকে জোরপূর্বক গন্তব্য থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যায় বিষয়টি তেমন।

ইন্দ্রিয়ের অধীন মন এবং মনের অধীন প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা অপহৃত হলে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়। চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং মানুষ পথচ্যূত হয়। ইন্দ্রিয় যার নিজের বশীভূত নয় বিষয় বাসনার ভাবনায় চিত্তে তার কখনই শান্তি আসে না। তাহলে তার প্রকৃত সুখ কোথায়?

অতএব ইন্দ্রিয়সমুহ যার ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত হয়েছে তাঁরই চিত্ত স্থির হয়েছে বলা যায়। স্থির চিত্তেই সমাধিস্ত হওয়া সম্ভব। যিনি সমাধিস্ত হতে পারেন তাঁরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা পায়। তিনিই স্থিতপ্রাজ্ঞ। তেমন মানুষ কিভাবে অবস্থান করেন? বলা হচ্ছে,

৬৯	সমস্ত জীবের জন্য যখন রাত্রি, আত্ম-সংযমী তখন জাগ্রত থাকেন। জীবসমুহ যখন জাগ্রত থাকে, তত্ত্বদর্শী মুনির জন্য তখন রাত্রিস্বরূপ।
৭০	সমুদ্রে যেমন জলরাশি প্রবেশ করা সত্বেও সর্বদা পূর্ণ- স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত; ঠিক তেমনই পরমাত্মায় স্থিতিপ্রাজ্ঞ ব্যাক্তি। কামসমুহ প্রবেশ করেও বিচলিত করতে পারেনা; বিলীন হয়ে যায়। তিনিই শান্তি লাভ করেন। কিন্তু কামাতুর ব্যাক্তি কখনই শান্তি লাভ করে না।

● **২.৬৯** আত্ম-সংযমী বা তত্ত্বদর্শী মুনিগণ সাধারণত জনাকীর্ণতা পছন্দ করেন না। তাই রূপক অর্থে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জীবের জন্য যখন রাত্রি হয় আত্ম-সংযমী তখন জাগ্রত থাকেন। রাত্রিতে, নিরবতায় বা নির্জনতায় এমন সাধুজনেরা আধ্যাত্মিক চর্চায় অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করেন। তাদের তখন ভাবনার সময়। কর্মের সময়। আত্মায় নিমগ্ন হওয়ার সময় কিংবা পরমেশ্বরে ধ্যান করার সময়। এ সময়গুলি তাদের জন্য অত্যাধিক আনন্দের। অন্যরা যা ভাবতেও পারবে না। অথচ সংসারী লোক তখন ঘুমিয়ে থাকে।

আবার জীবসমুহ যখন জাগ্রত থাকে তত্ত্বদর্শী মুনির জন্য তখন রাত্রিস্বরূপ। অর্থাৎ তাঁরা সে সময় বিশ্রাম গ্রহণ করেন। জনাকীর্ণতা পরিহার করেন।

রূপক এ কথা দ্বারা আরও কিছু অর্থ বুঝে নেয়া যায়। যেমন- পারমার্থিক ভাবনা যাদের মধ্যে নেই তেমন লোকেরা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভে নিদ্রিত, কিন্তু জাগতিক বিষয়-বাসনায় জাগ্রত। সংযমী যোগী আত্মনিষ্ঠায় জাগ্রত কিন্তু বিষয় ভোগে নিদ্রিত।

আবার অধিকাংশ মানুষের জন্য আত্মা-পরমাত্মা বিষয়গুলি অন্ধকার রাত্রিস্বরূপ। তারা এ বিষয়ে কিছুই দেখতে পায় না। অথচ সংযমী পুরুষ বা যোগী সব দেখতে পান। কেননা সে জগতে তাঁর প্রবেশ আছে।

সাংসারিক সুখ ভোগের জন্য যে মানুষ দিনরাত্রি পরিশ্রম করে যোগীর জন্য তা আঁধারস্বরূপ। তিনি সংসারে থাকেন কিন্তু তাঁর ওপর সংসারের কোন প্রভাব পড়ে না।

পারমার্থিক পথে যিনি নিরন্তর সজাগ তেমন মানুষ কিভাবে অবস্থান করেন রূপক উদাহরণের মাধ্যমে এখানে তাই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

- **২.৭০** ইন্দ্রিয়ের কারণে জীবের ভেতরে অনবরত নানান বিষয় ভাবনা প্রবেশ করছে। এতে কামনা-বাসনা বা আকাংখার সৃষ্টি হচ্ছে। শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে। কিন্তু স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যাক্তিকে তা বিচলিত করতে পারেনা।

স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যাক্তি সমুদ্রবৎ। বিশাল হৃদয় এবং গভীর জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন। সমুদ্রে যেমন অনবরত পানি প্রবেশ করলেও একইভাবে স্থির থাকে; কমেও না বাড়েও না, তেমনই স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যাক্তি। কামসমুহ ভেতরে প্রবেশ করেও তাদেরকে আন্দোলিত বা বিচলিত করতে পারে না। বিষয় ভাবনা তাদের ভেতরে প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যায়। সকল উপদ্রব থেকে স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যাক্তি মুক্ত থাকেন। নিজ জ্ঞানে নিজেকে স্থির-অবিচল রাখতে জানেন। তেমন শান্ত ও স্থিরচিত্ত মানুষই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।

অপরদিকে কামাতুর ব্যাক্তির কামনা-বাসনার অন্ত নেই। একটি বাসনা পূর্ণ হতেই নতুন বাসনার সৃষ্টি হয়। ভেতরে একইভাবে হাহাকার সৃষ্টি হয়। বাসনা পূর্ণ না হলে হতাশার অন্ত নেই। জীবন এভাবেই চলতে থাকে। জীবনে কখনই পরিপূর্ণ তৃপ্তি আসে না। কামনা থেকে হাহাকার, অন্তর্জালা বা না পাওয়ার বেদনায় সারাক্ষণ অন্তর পুড়তে থাকে। মনে শান্তি আসে না। তাদের ভেতরে শুকরিয়া নেই। কামাতুর ব্যাক্তি জীবনে শান্তি পায় না। কেননা তাদের বাসনা কখনও শেষ হয় না। তাহলে প্রকৃত শান্তি কে পায়? তাঁরা কিভাবে বিচরণ করেন? বলা হচ্ছে,

৭১	যে ব্যাক্তি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করে নিস্পৃহ হয়ে এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত ও অহমবোধশূন্য হয়ে বিচরণ করেন কেবল তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।

৭২	এটিই ব্রহ্মস্থিতি, হে পার্থ! যা প্রাপ্ত হলে কেউ আর মোহগ্রস্ত হয় না। এমনকি অন্তিম কালেও এ অবস্থায় স্থিত হলে ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষ লাভ হয়।

• **২.৭১** শান্তি হরণ করে কিসে? প্রতিনিয়ত নানাবিধ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের চিন্তা শান্তি হরণ করে। মায়ার বন্ধন ও বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাওয়ার যাতনা জীবের শান্তি হরণ করে। অহম বা আমিত্ববোধ যন্ত্রনার আরেকটি বড় কারণ।

সব 'আমি' করেছি বা সবকিছু 'আমার' এই বোধগুলি থেকে মানসিক যন্ত্রনার শুরু হয়। আর যখন তা অস্বীকৃতি কিংবা বিরোধীতার মুখে পড়ে তখন তো যন্ত্রনার শেষ নেই। জীবনের শান্তি কেড়ে নেয়।

যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় বাসনার প্রতি নিস্পৃহ থেকে বিচরণ করতে পারেন, বিষয় বাসনা তাকে উপদ্রব করতে পারে না। তিনিই প্রকৃত সুখ লাভ করেন। যিনি মিথ্যে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারেন তিনি যন্ত্রনা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। তিনিই প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করেন।

যিনি আমিত্বভাব পরিত্যাগ করতে পারেন তিনিই সুখী। 'আমি' 'আমার' এ জাতীয় যন্ত্রনা থেকে তাঁর মুক্তি লাভ হয়। মুক্ত স্বাধীন হয়ে বিচরণ করে তেমন মানুষ অপার সুখ ও আনন্দ লাভ করেন।

ঈশ্বর ভাবনা বা ঈশ্বর প্রীতিজনিত প্রেরণা ছাড়া সত্যিকারভাবে এ অর্জন সম্ভব নয়। তাই সমাধিস্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরে মনোনিবেশের সাধনা করতে হয়। সফল যোগী সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আপনাতেই আপনি তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করেন। প্রসন্ন ও সতুষ্ট চিত্ত তেমন সাধকই প্রকৃত সুখী।

• **২.৭২** বিষয় বাসনা ত্যাগ করা, মায়ার বাঁধন ছিন্ন করা কিংবা অহম বা আমিত্ববোধ ভেতর থেকে দুর করা এগুলির কোনটিই অর্জন করা খুব সহজ কাজ না। বাস্তবে কেউই তা করতে পারে না। যারা পারেন তাঁরা অতি উঁচু স্তরের মানুষ। সে কারণেই যোগী এত সন্মানের আসনে আসীন! পরমেশ্বরের সাথে আত্মিক সম্পর্ক ব্যাতিত এ অসাধ্য সাধন করা সম্ভব না। যোগী সর্বক্ষণ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বসবাস করেন। যেমন বলা হয়েছে,

".. যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা ... রাত্রিদিন তাঁর উপাসনা বা মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না।" (আল-কোরআন ২১:১৯-২০)

যোগী সকল প্রকারের জড় জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে অপার সুখ ও আনন্দ লাভ করেন। প্রশান্তিময় এ সুখী অবস্থাই হচ্ছে ব্রহ্মস্থিতি। এ অবস্থায় জীব ব্রহ্ম বা ভগবানে বাস করেন। অর্থাৎ ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হন। অমৃতসম সুখ লাভ করেন। এ অবস্থাকেই অমৃতত্ব লাভ বলে বলা হয়েছে [দ্রষ্টব্য গীতা ২:১৫]।

উপনিষদের ব্রহ্মবাদ এ অবস্থাতেই স্থিত হতে বলে। এ দর্শনে এটিই পরম পাওয়া। যারা তেমন জ্ঞানে বিচরণ করেন সত্যি বলতে তারাই প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করেন।

ব্রহ্ম হচ্ছে পরমেশ্বরের নির্গুণ ভাব। এ অবস্থায় স্থিত হওয়া সম্ভব হলে জড় প্রকৃতির গুণসমুহ জীবকে কোনভাবেই প্রভাবিত বা আন্দোলিত করতে পারে না। ফলে বিচ্যূতিরহিত হয়ে জীব স্বরূপে বা নিজ ধর্মে অবস্থান করে।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে ভগবানের মধ্যে সব এবং সকলের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধ হয়। সকলের মধ্যে একইজনকে দেখতে পেয়ে জীব অন্যের দুঃখে দুঃখ ও অন্যের সুখে সুখ অনুভব করে। সকলের প্রতি প্রেম-ভালবাসা জন্মে। সকলের প্রতি সমান আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হন। ভেদাভেদ বিদুরীত হয়ে সমবুদ্ধির উদয় হয়। সে প্রেরণায় নিষ্কাম হয়ে সকলের কল্যাণে ব্রত হন। ইতিপূর্বে সমবুদ্ধি, নির্গুণ স্তরে উন্নীত হওয়া ইত্যাদি যা কিছু বলা হয়েছে ব্রহ্মের ভাব প্রাপ্ত হলে তার সব অর্জন হয়ে যায় [দ্রষ্টব্য গীতা ২:১৫]।

তেমন মানসিক অবস্থায় জীবের নিজের ইচ্ছে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ব্যাক্তিক কোন কর্ম থাকে না। পরমের কর্ম তখন তেমন মানুষের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। বস্তুত নিষ্কামকর্ম মানবীয় কর্ম নয়। ঐশ্বরীক কর্ম। এর জন্য ঐশ্বরীক ভাব লাভ করতে হয়। সে ঐশ্বরীক ভাবই হচ্ছে ব্রহ্মভূত অবস্থা।

এ পর্যায়ে একবার উন্নীত হলে কেউ আর মোহগ্রস্ত হয় না। ফলে কোন কিছুই তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। কেননা যে জ্ঞানের কারণে মানুষ এ অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরম প্রশান্তি লাভ করে, প্রথমত: সে জ্ঞানটি তার ভেতরে থেকে যায় যা কখনই হারিয়ে যায় না। দ্বিতীয়ত: এ স্থিতিতে যে প্রশান্তি লাভ হয় তার চেয়ে উচ্চতর আর কোন প্রশান্তি ত্রিভূবনে আছে বলে তিনি মনে করেন না। ফলে তেমন

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে কখনই নিজের অর্জিত সে সুখ হারাতে চাইবেন না। তাই কেউ বা কোন কিছুই এ সুখী অবস্থা থেকে তাঁকে বিচ্যূত করতে পারে না।

জগতের সকল মানুষ তথা পথচ্যূত মানুষও একটুখানি সুখের পেছনে ছুটে চলেছে। কিন্তু নিরাপদ সুখকে বিসর্জন দিয়ে ভূল পথে ছুটছে। সুখ বলি, স্বাধীনতা বলি সবকিছু নিজের হাতের মুঠোয়। সেটি অর্জন করতে হলে কেবল নিজের প্রাপ্তি নয় ত্যাগের মনোভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

বলা হচ্ছে, এমনকি অন্তিম কালেও কেউ যদি এ অবস্থায় স্থিত হতে পারে তবে তারও ব্রক্ষনির্বাণ বা মোক্ষ লাভ হয়। অর্জুন যদি এ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হতে পারেন এবং সে অনুযায়ী কর্তব্যকর্ম পালন করেন তথা যুদ্ধ করেন, তবে তাঁর জীবনে অন্তিম সময় চলে এলেও তিনি 'নির্বান' প্রাপ্ত হবেন। 'নির্বান' হচ্ছে 'জড় জীবনের সমাপ্তি'। নির্বানের ফলে জড় প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি ও পরম ধাম লাভ হয়। আর কখনই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। যেমন বলা হয়েছে,

"যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা বা দাস তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ব্যাবস্থা। ... তারা বলবে, এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না ... নিশ্চয়ই! এটিই মহাসাফল্য।" (আল-কোরআন ৩৭:৪০-৬০)

পরিশেষে ব্রক্ষভাব বিষয়ে কিছু আলোচনা করি। জীব বা জীবাত্মা হচ্ছে ব্রক্ষেরই অংশ কণা। সোনার একটি কণাও যেমন সোনা; প্রকৃতিগতভাবে জীবাত্মাও তেমনই ব্রক্ষভূত। অর্থাৎ ব্রক্ষের ভাব প্রাপ্ত। পূত-পবিত্র, সহজ-সরল ও আনন্দময়। প্রেরণার উৎস। শিশু যেমন। সকলের প্রেরণার উৎস। জন্মকালে জীব তেমন ভাব নিয়েই জড় জগতে আগমন করে।

জড় জগতে এসে জীবাত্মা প্রকৃতির ত্রিগুণের মুখোমুখী হয়। তার শুদ্ধ চেতনা ত্রিগুণের প্রভাবে অজ্ঞতার আবরণে ঢাকা পড়ে। সে স্বরূপ থেকে বিচ্যূত হয়। বস্তুত এটিই হচ্ছে তার ধর্মচ্যূতি। ধর্মচ্যূত জীব জড় বন্ধনে বাধা পড়ে। অতএব বন্ধনমুক্ত হয়ে তাকে স্বরূপে বা নিজ ধর্মে ফিরে যেতে হবে। ব্রক্ষের ভাব প্রাপ্ত হতে হবে। এটিই লক্ষ্য।

ব্রক্ষভাব কি বা কেমন? ব্রক্ষের ভাব বা স্বভাব হচ্ছে আনন্দময়তা। ব্রক্ষ হচ্ছে 'আনন্দময়'! সুখ, আনন্দ, অপার শান্তি বা তৃপ্তির অবস্থাটিই হচ্ছে ব্রক্ষভাব বা

ব্রহ্মভূত অবস্থা। এটিই হচ্ছে ধর্মীয় সকল সুখের একান্ত কাম্য বিষয়। ব্রহ্মের এই আনন্দময় ভাবের মধ্যেই সুখ, শান্তি ও সকল শক্তি নিহিত। এ ভাব অর্জন করতে পারাকেই অমৃতত্ব লাভ বলে বলা হয়েছে [দ্রষ্টব্য গীতা ২:১৫]। ব্রহ্মের এই আনন্দময় ভাবকে একটু বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করি।

ব্রহ্মের আনন্দভাবের মধ্যে জগতের সকল শক্তি নিহিত আছে। সে শক্তিতেই জগত চালিত হয়। ব্রহ্মের আনন্দ ভাবের পেছনে তিনিট শক্তি কাজ করে। এগুলি হচ্ছে,

১. কর্মশক্তি : কর্মশক্তির কারণে জীব কর্তা। জীবের সৃষ্টিশীল কর্মশক্তির বিকাশ হয় তার প্রচেষ্টায় (Action)। কর্মেই আনন্দ!

২. জ্ঞানশক্তি : জ্ঞানশক্তির কারণে জীব জ্ঞাতা। চেতনাময় জ্ঞানশক্তির বিকাশ হয় জীবের ভাবনায় (Thought)। জ্ঞানের মধ্যেই অপার আনন্দ এবং

৩. ইচ্ছেশক্তি : ইচ্ছেশক্তির কারণে জীব ভোক্তা। ইচ্ছেশক্তির বিকাশ হয় জীবের কামনায় (Desire)। ইচ্ছে পুরণের মধ্যেই জীবের সকল আনন্দ নিহিত!

জীবের কর্মশক্তি যখন উচ্চমাত্রায় প্রকাশ পায় তখন সেটিই তার সক্ষমতা (Power) বলে বিবেচিত হয়। জ্ঞানশক্তি যখন উচ্চমাত্রায় পৌঁছে সেটি হচ্ছে তার প্রজ্ঞা (Wisdom) এবং ইচ্ছেশক্তির উচ্চমাত্রা হচ্ছে প্রেম (Love)।

ঈশ্বর ভাবনায় সাধনার দ্বারা জীব এই শক্তিগুলিকে উচ্চমাত্রায় জাগিয়ে তুলতে পারে। শক্তিসমুহ জাগ্রত হলে জীব ঐশ্বরীক ভাব প্রাপ্ত হয়। জীবের এই তিন শক্তিকে জাগিয়ে তুলতেই সাধনার তিনটি উপায় বা মার্গ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

জীবের কর্ম ঈশ্বরমুখী হলে নিষ্কাম 'কর্মযোগ' হয়। জীবের জ্ঞান ঈশ্বরমুখী হলে 'জ্ঞানযোগ' হয়। জীবের আনন্দ ঈশ্বরমুখী হলে প্রেম বা 'ভক্তিযোগ' হয়। এই তিনের পূর্ণ বিকাশে জীব সত্যিকারের আনন্দময় বা ব্রহ্মভূত অবস্থায় স্থিত হয়। ব্রহ্মের সমপর্যায়ের ভাব প্রাপ্ত হয়। জীবের এই তিন শক্তি ব্রহ্মশক্তিরই অনুরূপ। তবে মাত্রায় ব্রহ্মের সমপর্যায়ের নয়।

তৃতীয় অধ্যায় : কর্মযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ৪৩)

সারকথা : অর্জুন রণক্ষেত্র পরিদর্শনে গিয়ে শোকে আচ্ছন্ন হন। সংসার যন্ত্রনা থেকে মুক্তি লাভের অভিপ্রায়ে কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন বেছে নিতে চান। কিন্তু সত্য হচ্ছে কর্ম না করে নৈষ্কর্মও লাভ হয় না এবং কর্ম ত্যাগ করেও সিদ্ধি লাভ হয়না।

সংসার যাতনা ও বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে কর্ম করতে হবে। কর্ম করে নৈষ্কর্ম লাভ করতে হবে। বুঝতে হবে যে কোন কর্মটি করতে হবে এবং কিভাবে কর্ম করতে হবে। অতএব সন্ন্যাস বা কর্মত্যাগ নয়। অর্জুনকে কর্ম তথা যুদ্ধ করতে হবে। যে জ্ঞানে কর্ম করলে পাপমুক্ত থাকা যায় এবং বন্ধন থেকেও মুক্তি লাভ হয় তেমন জ্ঞানে কর্ম করতে হবে। অধ্যায়ে সে জ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১	অর্জুন বলেন: যদি তোমার মতে কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেয়তর হয়, হে জনার্দন! তবে কেন আমাকে ঘোরতর কর্মে নিযুক্ত করতে চাইছ, হে কেশব!
২	তোমার দ্ব্যার্থবোধক কথায় আমার বুদ্ধি যেন লোপ পাচ্ছে। দয়া করে আমাকে নিশ্চিতভাবে একটি পথ বল যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি।

● **৩.১-২** অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, যদি তোমার মতে 'কর্ম' অপেক্ষা 'বুদ্ধি' শ্রেয়তর হয়, তবে কেন তুমি আমাকে যুদ্ধের মতো ঘোরতর কর্মে নিযুক্ত করতে চাইছ? 'কর্ম' বলতে এখানে বিশেষভাবে বৈদিক কর্মমার্গ, কাম্যকর্ম বা স্বকাম কর্মকেই বোঝান হয়েছে এবং 'বুদ্ধি' বলতে বুদ্ধিযোগ বা কর্মযোগ তথা নিষ্কামকর্মকে বোঝান হয়েছে।

বৈদিক কর্মমার্গে যাগযজ্ঞ করে জাগতিক ঐশ্বর্য্য কিংবা স্বর্গাদি কামনা করা হয়। সাধারণভাবে যে কোন কর্মই স্বকাম কর্ম। কেননা সব কর্ম থেকেই ফলভোগের প্রত্যাশা করা হয়। ফলভোগই হচ্ছে কর্মের প্রেরণা। যুদ্ধও এক অর্থে বা সাধারণভাবে স্বকাম কর্মেরই অন্তর্ভূক্ত। কেননা যুদ্ধ জয় করে মানুষ ক্ষমতা লাভ করে রাজ্যসুখ ভোগ করতে চায়।

অর্জুন পূর্ব থেকেই বলে আসছেন যে কুলনাশক এমন যুদ্ধ তিনি করতে ইচ্ছুক নন। এর চেয়ে বরং তিনি ভিখেরীর মতো জীবন-যাপন তথা সর্বকর্ম ত্যাগ করে

সন্ন্যাস ধর্ম পালন করাকে শ্রেয় গণ্য করেন। লাভজনক হলেও তিনি কুলনাশক হীন প্রকৃতির যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক নন।

শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বে অর্জুনকে বুদ্ধিযোগে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কেননা নিষ্কাম কর্মে মোক্ষ লাভ হয়। ব্রহ্মস্থিতি লাভ হয়। সুখ ও শান্তি লাভ হয়। আবার তিনি অর্জুনকে যুদ্ধ করতেও উৎসাহিত করছেন যা স্বকাম কর্মের অন্তর্ভূক্ত। যদি কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেয় হয়, তবে কেন তিনি তাঁকে যুদ্ধের মতো এমন ঘোরতর কর্মে নিযুক্ত করতে চাইছেন?

শ্রীকৃষ্ণ একবার নিষ্কামকর্ম করতে বলছেন। আবার স্বকাম কর্মেও উদ্বুদ্ধ করছেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্ব্যার্থবোধক কথায় অর্জুন বিভ্রান্তিতে পড়েন। তিনি তাঁর কাছে নিশ্চিতভাবে একটি পথ সম্পর্কে জানতে চান যে পথ অবলম্বন করলে সত্যিকার অর্থে মঙ্গল হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩	হে নিষ্পাপ! ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে, লক্ষ্য অর্জনে জগতে সাধনার দুইটি উপায় বা পথ আছে। সাংখ্যদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং যোগীদের জন্য কর্মযোগ।
৪	কর্ম না করে মানুষ নৈষ্কর্ম লাভ করে না। না কেবল কর্ম ত্যাগের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করে।
৫	ক্ষণকালের জন্যও কেউ কখনও কর্ম না করে থাকতে পারে না। প্রকৃতিজাত গুণের প্রভাবে সকলে অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়।

● **৩.৩** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে কর্মবন্ধন বা জড় প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। মোক্ষ বা মুক্তি লাভে সাধনার দু'টি মার্গ আছে। সাংখ্যদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং যোগীদের জন্য কর্মযোগ। সাংখ্যগণ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজ জ্ঞান ও সামর্থের ওপর নির্ভর করে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হন।

যোগীগণ সকল কারণের কারণ পরমেশ্বর ভগবানে বিশ্বাসী হয়ে কর্ম করার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হন। পন্থাটি উচ্চতর এবং পরমেশ্বরের কাছেও অধিক পছন্দনীয়। তিনি তাকেই অধিক ভালবাসেন যে তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখে ও নির্ভর করে। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর ওপর ভরসা করে।" (আল-কোরআন ৩:১৫৯)

- **৩.৪** শোক ও যন্ত্রনায় দগ্ধ অর্জুন সর্বকর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করাকে শ্রেয় গণ্য করছেন। সন্ন্যাস হচ্ছে সাংখ্য বা জ্ঞানমার্গের পথ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কেবল কর্ম ত্যাগে সিদ্ধি লাভ হয় না। কেননা কর্ম না করে নৈষ্কর্ম লাভ হয় না। নৈষ্কর্ম লাভ না হলে বন্ধন মুক্তি হয় না। তাই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলেও কর্ম করতে হবে। কর্মের মধ্য দিয়েই নৈষ্কর্ম লাভ করতে হবে।

নৈষ্কর্ম হচ্ছে কর্মহীন অবস্থা বা ভাব। অর্থাৎ কর্ম করা সত্ত্বেও কোন কর্ম সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে হবে না। সে কর্ম থেকে কোন ফলাফল আসবে না। অতএব সাংখ্য বা যোগ যে পথেই অগ্রসর হও না কেন সিদ্ধি লাভ করতে হলে কর্ম করতে হবে।

- **৩.৫** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সিদ্ধি লাভ তো দুরের কথা এমনকি ক্ষণকালের জন্যও কেউ কখনও কর্ম না করে থাকতে পারে না। সচেতনভাবে হোক কিংবা অবচেতনে হোক প্রতি মুহুর্তে জীব কোন না কোন কর্মে রত।

যখন কেউ ভাবে যে সে কর্ম করছে না তখনও তার দেহ কোন না কোন কর্ম করে চলেছে। মস্তিষ্ক ক্রিয়া করছে। অনিয়ন্ত্রিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ক্রিয়া করছে। এমনকি ঘুমও একটি ক্রিয়া। দেহ ক্রিয়া না করলেও আত্মা কর্ম করছে। আত্মার ধর্মই হচ্ছে সর্বক্ষণ কর্মে রত থাকা। যেমন বলা হয়েছে,

"প্রত্যহ তিনি তাঁর কর্মে রত।" (আল-কোরআন ৫৫:২৯)।

জীব কর্ম করতে না চাইলেও ব্যাহ্য প্রকৃতির প্ররোচনায় সে অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়। ব্যাহ্য প্রকৃতির কোন ক্রিয়ায় দেহ স্বভাব অনুসারে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়। তাতেই সে কর্মে জড়িয়ে যায়। এমনিভাবে প্রতি মুহুর্তেই জীব কোন না কোন কর্মে রত। যতক্ষণ জীবন আছে কর্ম তাকে করতেই হবে। সম্পূর্ণ কর্ম কখনই পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় না। অতএব কর্মই যখন করতে হয় তখন এমনভাবে কর্ম করা উচিত যেন তা মোক্ষ লাভের অনুকূল হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৬	ইন্দ্রিয়সমুহ সংযত করেও যে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করে সে বস্তুত ভ্রান্তমতি।

৭	কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমুহকে সংযত করেন, হে অর্জুন! আসক্তিরহিত হয়ে ইন্দ্রিয়সমুহকে কর্মে নিয়োজিত করেন তিনি উচ্চতর।

• **৩.৬-৭** অর্জুন সংসার যাতনা থেকে মুক্তি লাভের জন্য কর্মত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কর্ম ত্যাগ করা সত্ত্বেও কেউ যদি মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমুহকে স্মরণ করে তবে সেই একই সমস্যা থেকে যাবে। বিষয় আসক্তি যন্ত্রনার কারণ হবে। মোক্ষ লাভ হবে না। অতএব কর্মত্যাগ কোন উত্তম উপায় নয়। এটি একটি ভ্রান্ত পথ।

বলা হচ্ছে, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত করা সত্ত্বেও বিষয়ে আসক্তিহীন হয়ে ইন্দ্রিয়সমুহকে কর্মে নিয়োজিত করতে হবে। ইন্দ্রিয়সমুহ কর্মে ব্যাস্ত থাকলে যেমন বিষয়ের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাবে না, তেমনি জল্পনা-কল্পনা করারও সুযোগ পাবে না। পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকবে এবং ইন্দ্রিয় সংযত করাও সহজতর হবে।

এভাবে মন থেকে বিষয় আসক্তি রহিত হয়ে ইন্দ্রিয়সমুহকে যিনি কর্মে নিয়োজিত করেন তিনি উচ্চতর পর্যায়ের। অতএব কর্ম ত্যাগ নয়; কর্মই বন্ধন মুক্তির যথাযথ উপায়। প্রশ্ন হচ্ছে কোন কর্ম করতে হবে? যথাযথ কর্ম কোনটি? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৮	তুমি তোমার বিধি অনুসারে কর্ম কর, অবশ্যই কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেয়। এমনকি কর্ম না করে দেহ ধারণও যথাযথ হয় না।
৯	যজ্ঞের জন্যই কেবল কর্ম; তা ছাড়া কর্ম এ জগতে শুধু বন্ধনেরই কারণ। অতএব সে অর্থেই কর্ম কর, হে কৌন্তেয়! আসক্তি রহিত হয়ে।

• **৩.৮** কর্ম ত্যাগই যদি মোক্ষ লাভের যথাযথ পথ হয় এবং সকলেই যদি সে পথ অবলম্বন করে তবে কি সৃষ্টি টিকে থাকতে পারবে? কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়। এমনকি দেহের সুস্থতার জন্য হলেও কর্ম করতে হয়। অতএব কর্মের কোন বিকল্প নেই। প্রশ্ন হচ্ছে কোন কর্ম করতে হবে?

অর্জুন এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়েছেন যে করণীয় নির্ধারণ করতে পারছেন না। বাইবেলে বলা হয়েছে, সিংহাসন লাভ করার পর গড সলোমনকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। তিনি তাকে তাঁর কাছে কিছু চাইতে বললেন।

সলোমন ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, দীর্ঘায়ু কিছুই চাইলেন না। চাইলেন শুধু জ্ঞান। যে জ্ঞান ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে। সলোমনের বুদ্ধিদীপ্ত ও জ্ঞানসম্মত প্রার্থনায় গড অত্যান্ত খুশি হন। তিনি তাঁকে জ্ঞান ও সম্পদ উভয়টিই অকাতরে দান করেন। কোরআনে এ কথাটিকে এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে,

"আমি সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম কোন ঘটনা তথা ভাল-মন্দ অনুধাবন করার।" (আল-কোরআন ২১:৭৯)

হযরত সোলায়মান রাজ্য পরিচালনায় গডের কাছে ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারার জ্ঞান প্রত্যাশা করেন। সাধারণভাবে খুব সহজ বোধ হলেও ভাল ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করার বিষয়টি সবক্ষেত্রে খুব সহজও না। কর্ম কোনটি, কোনটি অকর্ম কিংবা বিকর্মই বা কোনটি এমনিভাবে করণীয় নির্ধারণে ক্ষেত্র বিশেষে মানুষকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে হয়।

বোধের পার্থক্যের কারণে মন্দ কর্মকেও যথাযথ মনে করার সুযোগ থাকে। যেমন কুরুক্ষেত্রে যাদের কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে সেই দুর্যোধন ও তার সহযোগীরাও তাদের বিচারে কর্তব্যকর্ম করে চলেছে। তাহলে যথাযথ কর্ম কোনটি?

বিষয়গুলির সাথে নিজ নিজ স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা থাকে। যথাযথ কর্ম ও করণীয় নির্ধারণ করা তাই সবক্ষেত্রে সহজ বিষয় নয়। ভাল-মন্দ পার্থক্য জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য বাইবেল ও কোরআন থেকে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করে কর্ম কর। মানুষ নিজ স্বার্থে ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল দেখতে পায়। সুবিধামতো বিধি প্রণয়ন করে। সত্য থেকে বিচ্যূত হয়। কিন্তু শাস্ত্রের বিধান আসে ভগবান থেকে। তিনি কারও স্বার্থে নয়, বরং সামগ্রীকভাবে সৃষ্টির কল্যাণে সকল নির্দেশনা জারি করেন। কোন শাস্ত্রই কখনও কোন মন্দ বা অপকর্মকে সমর্থন করে না। ন্যায়পরায়তার কথা বলে। যেমন বলা হয়েছে,

"বল, আল্লাহ অবশ্যই মন্দ কাজের আদেশ দেন না। ... বল, আমার প্রতিপালক ন্যায় ও সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন।" (আল-কোরআন ৭:২৮-২৯)

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে তার করণীয় বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নয়। তুমি তোমার বিধি অনুসারে কর্ম কর। শাস্ত্রের

বিধি অনুসারে ক্ষত্রিয় হিসেবে তোমার কর্তব্যকর্ম হচ্ছে ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ বা জেহাদ করা। সেটিই তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম।

কর্ম না করে জীব একটি মুহূর্তও থাকতে পারে না। সর্বকর্ম ত্যাগ করা জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। কর্মই যখন করতে হয়, তখন সর্বদা বিধি মোতাবেক কর্ম করাই শ্রেয় ও বুদ্ধিমানের কাজ। যার ফলাফল সর্বদিক থেকে হিতকর। কর্মের মাধ্যমে জীবন ও জগতেরও কল্যাণ সাধন হয়। সকলে কর্মত্যাগী হলে জগত চলবে কিভাবে? কর্মত্যাগের পথ একটি ভ্রান্ত পথ।

স্বধর্ম আচরণে পাপ হয় না যখন সেটি ন্যায়ের পথে করা হয়। কেননা স্বধর্মের কাজ সমাজ দ্বারা স্বীকৃত। আবার নিজ অন্তরের ইচ্ছে ও প্রবৃত্তি দ্বারাও গৃহীত। বস্তুত এ বিধান ঈশ্বর দ্বারা প্রবর্তীত। ফলে পাপের বোধ আসে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সে জ্ঞানে কাজ করতে বলেন।

কর্তব্যকর্ম নির্ধারণে মানুষ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দ্বিধা ও মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে তখন শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করে কর্ম করাই হচ্ছে উত্তম উপায়।

- **৩.৯** মানুষ কর্মের মধ্য দিয়ে কিছু পেতে চায়। কর্মের ফল ভোগ করতে চায়। এটিই জাগতের মানুষের স্বাভাবিক আচরণ। কিন্তু ফল ভোগের বাসনা বন্ধনের কারণ হয়ে দাড়ায়। তাই আসক্তি রহিত হয়ে ফলভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে নিষ্কাম হয়ে কাজ করতে বলা হচ্ছে।

তবে বলা যত সহজ অর্জন করা তত সহজ নয়। কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করা মোটেও কোন সহজ বিষয় না। কর্মের ফলভোগের বাসনাই হচ্ছে সে প্রেরণা যাকে আশ্রয় করে মানুষ উৎসাহের সাথে কর্ম করে। নিষ্কাম কর্মে প্রেরণা কোথায়? নিষ্কামকর্ম করতে হলে অবশ্যই স্বকাম কর্মের চেয়ে আরও উচ্চতর কোন প্রেরণা লাগবে।

পরমেশ্বর ভগবান! তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণা! একমাত্র তাঁকে আশ্রয় করে সবকিছু পরিত্যাগ করে কর্ম করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তার জন্য প্রয়োজন পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস, ভক্তি ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের বাসনা। ধারণায় সেটিই হচ্ছে জগতের সর্বোচ্চ প্রেরণার স্তর। সর্বোচ্চ স্তরকে পরিত্যাগ করে জ্ঞানী

কখনই গৌন কিছুকে গ্রহণ করবেন না। সাধারণ মানুষের কথা ভিন্ন। এখানেই স্তরভেদের যৌক্তিকতা। যেমন বলা হয়েছে,

"প্রত্যেকের জন্য তাদের কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তারা যা করে সে বিষয়ে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।" (আল-কোরআন ৬:১৩২)

কর্ম করতে হবে নিজের প্রাপ্তির বাসনায় নয়। পরমেশ্বরের ভাবনায় বা তাঁর কারণে। কেউ বলেন আল্লাহর রাহে বা রাস্তায়। তা করতে না জানলে জগতে সকল কর্মই কেবল বন্ধনের কারণ হবে।

অর্জুনকেও তাই যুদ্ধ করতে হবে নিজের লাভের বা প্রাপ্তির বাসনায় নয়। ভগবানের কারণে তথা সৃষ্টি সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে। ভগবানের সেবা করার মানসে। এটিই পরমেশ্বরের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন।

এভাবে বা এ জ্ঞানে কাজ করলে বিষয় আসক্তি ও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায়। তেমন মানুষ মুক্ত স্তরে অবস্থান করেন। কোন লোভ কিংবা মোহ বা মায়াই তখন আর তাকে জগত সংসারে আবদ্ধ করতে পারে না। কর্ম সম্পাদনের এটিই হচ্ছে সবচাইতে উত্তম কৌশল। তাই যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করতে বলা হয়। কর্মের কৌশলই হচ্ছে যোগ।

পরমেশ্বর ভগবানের তিনটি প্রকাশ হচ্ছে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরম জীবসত্ত্বা স্বয়ং ভগবান। যজ্ঞ বা বিষ্ণু হচ্ছেন পরমাত্মা বা ভগবানেরই প্রতীকী নাম। তাই বলা হয়েছে, যজ্ঞের জন্যই কেবল কর্ম অর্থাৎ ভগবানের জন্যই সকল কর্ম। এটিই মুক্তির একমাত্র পথ। এ ছাড়া আর সকল কর্মই আমিত্ববোধ ও আসক্তি থেকে করা হয় যা কেবল জাগতিক বন্ধনের কারণ হয়। যজ্ঞের কর্মই হচ্ছে যথাযথ কর্ম।

উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে যজ্ঞ বলতে সকলে বেদোক্ত যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপকে বুঝে থাকে। কিন্তু গীতায় যজ্ঞের মর্ম অর্থ হচ্ছে ত্যাগ। ভগবানের কারণে ত্যাগ বা উৎসর্গ। বস্তুত সকল কর্মই কর্ম, কিন্তু যজ্ঞ হচ্ছে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে করা কর্ম। নিজের ভাবনায় নয়। ভগবানের তরে উৎসর্গীকৃত যে কোন কর্মই যজ্ঞে রূপান্তরীত হয়। কেউ বলেন আল্লাহর তরে করা কর্ম। অর্থাৎ নামে বা সঙ্গায় পার্থক্য; মূল বিষয় কিন্তু এক।

জীবন ও জগতের যিনি স্রষ্টা, সমস্ত সৃষ্টি ও কর্ম মূলত তাঁরই কারণে। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কোন কর্ম নয়। এখানে নিজের বলতে কিছুই নেই। এমনকি না নিজের জীবন, না নিজের কর্ম। তাই অত্যান্ত দৃঢ়তার সাথে এভাবে বলা হয়েছে যে, 'যজ্ঞের জন্যই কেবল কর্ম'। আর কোন কারণেই কোন কর্ম নেই বা হতেও পারে না। তাই এভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে,

"বল: আমার উপাসনা, আমার আরাধনা বা ভজনা; আমার উৎসর্গ বা আমার ত্যাগ বা যজ্ঞ; আমার বেঁচে থাকা ও আমার মরণ সবই আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব-জগতসমুহের প্রতিপালক।" (আল-কোরআন ৬:১৬২)

কেউ যখন এ নিয়মের ব্যাত্যয় করবে সে কখনই প্রকৃত শান্তির নাগাল পাবে না। তেমনই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির বিধান। সে সংসার যাতনার বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং বারংবার তাকে জন্ম নিয়ে জড় জগতে ফিরে আসতে হবে। পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য তাকে পুনরায় সাধনা করতে হবে। অতএব অর্জুনকে সে অর্থেই কর্ম করতে হবে। আসক্তি রহিত হয়ে ভগবানের ভাবনায় ত্যাগের মনোভাব নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

কর্ম কেন যজ্ঞের জন্য করতে হবে? কিভাবে এ নিয়ম প্রবর্তীত হল? এসবেরও যৌক্তিক ভিত্তি আছে। কিন্তু সব যুক্তিকে মন থেকে গ্রহণ করার পূর্বে সবকিছুর পেছনে একটা কারণ আছে এবং সর্বকারণের কারণ ভগবান আছেন সর্বপ্রথম সেটি বিশ্বাস করতে হবে। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১০	সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি যজ্ঞের সাথে প্রজাকুল সৃষ্টি করে বলেছিলেন- এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ করুক।

● **৩.১০** যজ্ঞ কেন করতে হবে শ্রীকৃষ্ণ সে দর্শন তুলে ধরেন। বলেন, সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি যজ্ঞের সাথে প্রজাকুল সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি হচ্ছেন ব্রহ্মা। সমস্ত প্রজা তথা জীবের পতি। জগতের প্রথম সৃষ্ট জীব। ভগবানের প্রতিনিধি। সকলের ত্রাণকর্তা। প্রজাপতি প্রজা সকলকে সৃষ্টি করে বলেন, 'এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ করুক।'

প্রজাপতি যখন প্রজা সৃষ্টি করেন তখন তিনি সৃষ্টি রক্ষার্থে পরিচালনা বিধিও প্রণয়ন করেন। সেটিই হচ্ছে যজ্ঞ। যা সমাজ ও সৃষ্টিকে সুরক্ষা দেয় ও শৃংখলার সাথে ধরে রাখে।

অভিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছেন 'বিষ্ণু'। যজ্ঞ করা হয় বিষ্ণুর জন্য। বিষ্ণু হচ্ছে পরমাত্মার প্রতীকী নাম। পরমাত্মা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। যজ্ঞের মধ্য দিয়ে বিষ্ণু বা পরমাত্মা তথা ভগবানকেই তুষ্ট করা হয়। ভগবান তুষ্ট হলে প্রজাকুল সমৃদ্ধি লাভ করে, আধ্যাত্ম চেতনা লাভ করে এবং পরমের গুণে গুণান্বিত হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, বেদে উদ্ধৃত যাগযজ্ঞাদির কর্ম ফলপ্রদ। কোন না কোন বাসনা পুরণার্থে সেসব যজ্ঞ পালন করা হয়। বেদের পালন করা যাগযজ্ঞ হচ্ছে কাম্যকর্ম বা স্বকাম কর্ম। কিন্তু গীতায় উদ্ধৃত যজ্ঞ মোক্ষপ্রদ। গীতা নিষ্কাম কর্মের কথা বলে। গীতা মতে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ত্যাগ বা উৎসর্গ করে যা কিছু করা হয় তাই 'যজ্ঞ'। যদিও বেদের যাগযজ্ঞের পেছনের কারণ বা দর্শনও কিন্তু একই। তবে স্বভাবের ত্রিগুণ বিবেচনায় বেদ প্রত্যেকের জন্য উপযোগী করে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। যেন স্বভাব অনুসারে যাগযজ্ঞ পালন করে প্রত্যেকেই ধীরে ধীরে পরমের পথে অগ্রসর হতে পারে। সেজন্যই বেদকে ত্রৈগুণ্য বিষয়ক বলা হয় [দ্রষ্টব্য গীতা ২:৪৫]। কিন্তু মানুষ গভীরের জ্ঞানে প্রবেশ করে না। তারা বাসনা পুরণার্থে ফল লাভের আশায় বেদোক্ত যাগযজ্ঞ পালন করে।

পরমেশ্বরের সঙ্গে জীবের রয়েছে শাশ্বত সম্পর্ক। কিন্তু জড় জগতে মায়ার কবলে পড়ে জীব ভগবানের সাথে সে সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হয়। কর্তব্যকর্ম ভূলে ভূল পথে চলে। জীব যেন আধ্যাত্ম চেতনা লাভ করে এবং পরমের গুণে গুণান্বিত হতে পারে মূলত সে কারণে যজ্ঞ পালন করা হয়। স্বরূপে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে লক্ষ্য। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহর সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (আল-কোরআন ১১:৪)

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে আন্তরীক হও এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে কঠোর পরিশ্রম কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আল-কোরআন ৫:৩৫)

বাইবেলে বলা হয়েছে স্বর্গ থেকে বিতাড়নকালে গড অ্যাডামকে বলেন, "তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে। ... যতদিন না ফিরিয়ে আনা হবে।"

বাইবেলের উদাহরণ এখানে কেন তুলে ধরা হল? অর্থাৎ বাইবেল, কোরআন, গীতা সর্বত্রই পরমের সান্নিধ্যে ফিরে যাবার বিষয়ে ইংগীত রয়েছে সে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। সমগ্র বেদের মূল উদ্দেশ্যও হচ্ছে পরমেশ্বরকে জানা ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করা।

জগতে আসক্ত মানুষ ঈশ্বর প্রাপ্তির চেয়েও ধন-সম্পদ লাভে অধিক আগ্রহী। তাই তারা বেদের চিত্তাকর্ষক বাণী সম্বলিত ফলপ্রদ যাগযজ্ঞ পালনে আগ্রহী। সেগুলিকেই তারা প্রকৃত ধর্মকর্ম মনে করে। বস্তুত এগুলি মানুষের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত লোভ ও বাসনাকে অধিকতর জাগিয়ে তোলে এবং জড় জগতের বন্ধনে শক্ত করে আবদ্ধ করে। সত্যিকারের মোক্ষ লাভ হয় না। যজ্ঞ পালনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলা হচ্ছে,

১১	যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট কর, দেবতারাও তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করবে। পরস্পরের তুষ্টি বিধানের মধ্য দিয়ে পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবে।
১২	যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদেরকে বাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তু দান করবে। অতএব তাদের দ্বারা প্রদত্ত বস্তুসকল দেবতাদেরকে নিবেদন না করে যে ভোগ করবে সে নিশ্চিতভাবেই চোর।
১৩	ভক্তগণ যজ্ঞ অবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করে; এভাবে তারা সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু যে কেবল নিজের জন্য রন্ধন করে বস্তুত সেই পাপিগণ পাপ ভক্ষণ করে।

● **৩.১১-১৩** জীবের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় আলো, বাতাস, পনি থেকে শুরু করে সবকিছু আসে ভগবান থেকে। মানুষ কিছুই সৃষ্টি করে না। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে? তোমরা সেটি সৃষ্টি কর না আমি করি? তোমরা যে বীজ বপন কর সে বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলন কর সে বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা এর বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? তোমরা ভেবে

দেখেছ কি, যদি সব পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্ধান হয়ে যায়, তবে কে তোমাদের জন্য পনির স্রোতধারা বয়ে নিয়ে আসতে পারবে?" (আল-কোরআন ৫৬:৫৮-৫৯, ৬৩-৬৪, ৭১-৭২, ৬৭:৩০)

জড় জগত পরিচালনা করার জন্য ভগবান তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ বিভিন্ন দেব-দেবীদের ওপর দায়িত্বভার ন্যাস্ত করেন। এক এক দেবতা এক একটি বিষয়ের দেখভাল করেন। মুসলিম দর্শনেও এমনিভাবে জিবরাইল, আজরাইল, মিকাইল এক একজন ফেরেশতা এক একটি কাজের দায়িত্বভার প্রাপ্ত বলে বলা হয়। তাদেরকে দেবতা না বলে ফেরেশতা বলা হয়। যেমন জলকে পানি বলা হয়।

দেবতাদেরকে উদ্দেশ্য করে যজ্ঞ করা হলে দেবতারা তুষ্ট হন। তারা সন্তুষ্ট হলে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য দান করেন। পরস্পরের এ তুষ্টি বিধানের মধ্য দিয়ে পরম কল্যাণ লাভ হয়। জীবন ও জগত সমৃদ্ধ হয়।

মানুষের কাজ হচ্ছে ভগবান বা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তিনি তুষ্ট হলে দেবতারাও তুষ্ট থাকেন। কিন্তু তাঁকে কিভাবে তুষ্ট করা যাবে? তিনি কিসে তুষ্ট হন?

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তিনি সর্বোচ্চ তুষ্ট হন। তাই যে কোন কাজই করা হোক না কেন, কিংবা যা কিছুই গ্রহণ করা হোক না কেন ভগবানকে নিবেদন করে বা তাঁকে স্মরণ করেই সেটি করা উচিত। এটিই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। এটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটি শিক্ষা। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার বা প্রকাশ করে না।" (আল-কোরআন ৪০:৬১)

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না কর, তথাপি আল্লাহ তোমাদের থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ; যদিও তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতায় সন্তুষ্ট নন। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তোমাদের জন্য সেটিই পছন্দ করেন।" (আল-কোরআন ৩৯:৭)

ভগবানের দেয়া অনুগ্রহ ভগবানকে নিবেদন না করে যারা ভোগ করে তারা বস্তুত চুরি করে। এটি অকৃতজ্ঞ আচরণ। পাপি অন্তরের প্রকাশ।

অকৃতজ্ঞতা একটি চরম পর্যায়ের অপরাধ। মানুষ নিজেকে দিয়ে বিচার করলেও এই অপরাধের মাত্রা উপলব্ধি করতে পারবে। বলা হচ্ছে, যারা ভগবানের কথা স্মরণ

না করে কেবল নিজের ভোগের জন্য রন্ধন করে তারা পাপ ভক্ষণ করে। তাই বলা হয়েছে,

"তোমরা খাদ্য হিসেবে সেটি গ্রহণ কর যার ওপরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে ... তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ পরিত্যাগ কর; ... যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা থেকে আহার কর না; সেটি ঘৃণিত কাজ।" (আল-কোরআন ৬:১১৮-১২১)

শাস্ত্রের বিধান অনুসারে সকল ধর্মের মানুষ স্রষ্টাকে নিবেদন বা স্মরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে। এমনকি সকল কাজ শুরু করার পূর্বে স্রষ্টাকে স্মরণ করে। বস্তুত সকল দর্শনগুলির মর্ম কথা একই।

উল্লেখ্য যে, যজ্ঞ পালন করলে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়তবা হয়, কিন্তু এ প্রাপ্তিই যজ্ঞ পালনের মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। যজ্ঞ পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যজ্ঞপতি বিষ্ণু বা ভগবান যখন তুষ্ট হন তখন তিনি জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

অর্জুনকে তাই কর্ম করতে হবে বিষ্ণুর প্রতি সমর্পিত হয়ে। নিজের লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে নয়। এ কথোপকথন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে হলেও গীতার এ জ্ঞান জগতের সকল মানুষের জন্য পথ-নির্দেশনা।

সমস্ত যজ্ঞের প্রকৃত ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভক্তগণ তাই পরমেশ্বরকে স্মরণ করে সকল কাজ করেন বা খাদ্যও গ্রহণ করেন। এ কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশে অন্তরের পাপ প্রবৃত্তি দুরীভূত হয়ে সকল কার্যকলাপ শুদ্ধ বা পবিত্র হয়। মনোজগতে এসব কার্যকলাপের প্রভাব আছে।

যজ্ঞ করার ফলে খাদ্য সমাগ্রী পরিশুদ্ধ হয় এবং সেখান থেকে আহার করার ফলে দেহ, মন, সত্ত্বা সব শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। মানসিক তৃপ্তি দান করে। কিন্তু যজ্ঞ করতে করতে যে উপলব্ধিবোধ ও জ্ঞান লাভ হয় সেটিই হচ্ছে যজ্ঞ পালন করা থেকে প্রাপ্ত সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এ জ্ঞান মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় প্রকৃতির স্তর অতিক্রম করে ধীরে ধীরে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়া। বন্ধন মুক্ত হওয়া। যজ্ঞের গুরুত্ব তুলে ধরে আরও বলা হচ্ছে,

১৪	জীবসকল উৎপন্ন হয় অন্ন থেকে, অন্ন উৎপন্ন হয় মেঘ থেকে। মেঘ হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কারণে এবং যজ্ঞের উৎপত্তি কর্ম থেকে।
১৫	কর্ম ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত, ব্রহ্ম অক্ষর থেকে উদ্ভূত বলে জানবে। অতএব সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
১৬	হে পার্থ! ইহলোকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত এ চক্র যে অনুসরণ করে না, কেবল ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপপূর্ণ সে জীবন বৃথাই জীবন ধারণ।

• **৩.১৪** বলা হচ্ছে, দেহ পুষ্ট হয় খাদ্য গ্রহণ করে। সেভাবেই জীব বেঁচে থাকে। জীবের খাদ্য উৎপাদনে পানির প্রয়োজন হয়। পানি আসে মেঘ বা বৃষ্টি থেকে। দর্শনটি হচ্ছে বৃষ্টি হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কারণে। বৃষ্টির দেবতা যজ্ঞের কারণে তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি বর্ষন করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন। এ পানি তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। নিশ্চয়ই! এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (আল-কোরআন ১৬:১০-১১)

সকল দেবতারাই ভগবানের আজ্ঞাবহ ভৃত্য বা দাস। যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবানকে তুষ্ট করা হলে তারাও তুষ্ট হন এবং পৃথিবীবাসীর অভাব মোচন করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে কেউ নেই যে দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না।" (আল-কোরআন ১৯:৯৩)

যজ্ঞের উৎপত্তি হচ্ছে কর্ম থেকে। কেননা কর্মের কারণে সকল নিয়ম-বিধির প্রবর্তন হয়েছে।

• **৩.১৫** প্রথমত এটি বুঝতে হবে যে জীবের নিজের জীবনটিও নিজের না। নিজে নিজেকে সৃষ্টি করে নাই। ধরায় আগমনও নিজের ইচ্ছেতে নয়। অতএব জগতের কোন কর্মের পেছনের কারণ জীব নিজে নয়।

কর্মের সৃষ্টি বা উৎপত্তি মূলত প্রকৃতি থেকে বা তার প্রভাবে। প্রকৃতি ক্রিয়া করে জীব প্রতিক্রিয়া করে। তাতেই জীবে কর্ম চাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম। অতএব কর্ম ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত হয়। ব্রহ্ম বিষয়ে পূর্বে বলা হয়েছে।

ব্রহ্ম যাকে আশ্রয় করে বিদ্যমান বা উদ্ভূত তাঁকে অক্ষর বলা হয়। অক্ষর হচ্ছে যা ক্ষর নয়। অবিনাশী, অব্যয়-অক্ষয়। যার বিনাশ নেই। ভগবানই হচ্ছেন অক্ষর।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ব্রহ্ম অক্ষর বা ভগবান থেকে উদ্ভূত। ব্রহ্ম থেকে কর্ম উদ্ভূত। ভগবানকে উদ্দেশ্য করে কর্মযজ্ঞ করা হয়। ভগবান তাতে তুষ্ট হলে প্রকৃতি সমৃদ্ধ হয়। ফলে সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম এভাবে যজ্ঞের কারণে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এটি একটি চক্রবিধি যাকে 'যজ্ঞচক্র' বলা হয়। সৃষ্টির সমৃদ্ধি, সুরক্ষা ও টিকে থাকার জন্য তাই যজ্ঞ হচ্ছে সকলের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

● **৩.১৬** ঈশ্বর প্রবর্তীত এই চক্রবিধি বা যজ্ঞচক্র জগৎ সংসারকে চালনা করছে। যজ্ঞ পালনের মধ্য দিয়ে বস্তুত জগত সংসার পরিচালনার কাজে সহায়তা করা হয়। যজ্ঞ পালন করা তাই প্রত্যেকের কর্তব্য।

যজ্ঞ পালন না করে কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য জীবন ধারণ করা হলে সে জীবনের সর্বশেষ কোন লক্ষ্য বা গন্তব্য নেই। কোন বৃহৎ বা মহৎ লক্ষ্যের সাথে তার কোন সম্পৃক্ততা থাকে না। তেমন অর্থহীন জীবন বৃথাই জীবন ধারণ। ভগবান বা স্বয়ং স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন। পাপপূর্ণ জীবন।

পাপপূর্ণ এ কারণে যে যিনি জীবন দান করেছেন, যিনি লালন-পালন করছেন, বিধান দেয়ার একমাত্র অধিকার যার তাঁর কাজে সহায়তা না করে, তাঁকে স্মরণ বা নিবেদন না করে কেবল নিজে ভোগ করা। এটি হচ্ছে গোপনে চৌর্যবৃত্তি করা। এ ভোগ থেকে অর্জিত শক্তি-সক্ষমতা সৃষ্টির কোন কাজে আসে না। অথচ সৃষ্টিকে রক্ষা করার স্বার্থে যজ্ঞ করা কর্তব্য। যারা সৃষ্টির মধ্যে বসবাস করে অথচ তা সুরক্ষায় অংশ গ্রহণ করে না, তারা সৃষ্টি ভোগ করে অথচ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে না। তাই তারা অন্যায়কারী বা পাপী।

কিছু মানুষ আবার ভীষণভাবে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ। তারা সর্বদা পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করতে পারে না। সে কারণেও যজ্ঞের প্রবর্তন বলা যেতে পারে। এর মধ্য দিয়ে তারা পূণ্যের কাজ করে বলা যায় ক্ষতিপুরণ দিয়ে থাকে। এতে তাদের কিছুটা ভার লাঘব হয়। ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করা সত্ত্বেও এভাবে বিধাতাকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে যেন তারা বন্ধন মুক্ত হতে পারে সে কারণেও এর প্রবর্তন। এসব নিয়ম-বিধি পালন করতে করতে জীবের মনে ভগবানের প্রতি

ভক্তিরও উদয় হয় এবং তা বিকাশ লাভ করে। যজ্ঞ করতে তাদেরকে যথেষ্ট খরচ করতে হয়। তারা ভগবানের কারণে যথাসাধ্য ব্যায়ও করে। এটিও ত্যাগ। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমরা কখনই বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তা ব্যায় কর যা তোমরা ভালবাস।" (আল-কোরআন ৩:৯২)

জগতের সুরক্ষা ও সুশৃংখল পরিচালনায় অংশ নেয়া ও যজ্ঞ পালন করা তাই প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এতদ্বসত্ত্বেও কিছু মানুষ এমন কর্তব্যকর্ম পালন করা থেকেও মুক্ত স্তরে বিরাজ করেন। তেমন মানুষ কারা? বলা হচ্ছে,

১৭	কিন্তু যিনি আপনাতে প্রীত, আপনাতে তৃপ্ত, আপনাতেই তুষ্ট তাঁর জন্য কোন কর্তব্যকর্ম নেই।
১৮	এ জগতে তাঁর কোন কর্ম অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন নেই, না তাঁর তা না করারও কোন কারণ আছে। প্রয়োজন পুরণে সর্বজীবে তাঁর কারও আশ্রয়ের দরকার হয় না।
১৯	অতএব আসক্ত রহিত হয়ে সর্বদা কর্তব্যকর্ম পালন কর। কেননা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই মানুষ পরম লক্ষ অর্জন করে।

• **৩.১৭-১৯** যিনি আপনাতে প্রীত, আপনাতে তৃপ্ত, আপনাতেই তুষ্ট এবং প্রয়োজন পুরণে যার কারও আশ্রয়ের দরকার হয় না তাঁর জন্য কোন কর্তব্যকর্ম নেই। বেদোক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানেও তার কোন প্রয়োজন হয় না। কেননা প্রথমত: তার কোন আকাংখা নেই; দ্বিতীয়ত: যে লক্ষ্যে যজ্ঞ পালন করতে হয় সে লক্ষ্য তিনি ইতিমধ্যে অর্জন করেই তেমন স্তরে উন্নীত হয়েছেন। তাহলে তার আর কর্ম কিংবা আরাধনার প্রয়োজন কি?

মানুষ কর্মই করে নিজেকে তৃপ্ত ও তুষ্ট করার জন্য। কিন্তু যিনি নিজের মধ্যেই নিজেকে তুষ্ট রাখতে জানেন তার তো কোন কিছু করার প্রয়োজন নেই। আবার যেহেতু তেমন মানুষ প্রয়োজন পুরণে কারও আশ্রয় নেন না, ফলে কারও প্রতি কোন কর্তব্য পালনে তার দায়বদ্ধতাও থাকে না। তেমন মানুষের কোন কর্তব্যকর্ম নেই বা

পালন করার প্রয়োজন হয় না। ভগবান বা আল্লাহর কৃপায় তারা স্বয়ং জ্ঞানালোকিত হন এবং সে জ্ঞানের আলোকেই তাদের কর্তব্যকর্ম স্থির হয়।

এমন মুক্ত মানুষ কর্মের দ্বারা নিজের জন্য কোন কিছু অর্জন কিংবা লাভ করেন না। আবার কর্ম থেকে বিরত থেকেও তার কোন লাভ নেই। ফলে তাঁদের কর্ম করার যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি কর্ম না করারও কোন কারণ নেই। কর্ম পালন করায় তাঁদের জন্য কোন নিষেধও নেই। স্বেচ্ছায় চাইলে কর্ম করতে পারেন। তাঁরা সাধারণত নিষ্কাম হয়ে জীবন ও জগতের তথা সৃষ্টির কল্যাণার্থে কাজ করেন। এমন কর্মই ভগবানের সেবা করা বা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা নামে পরিচিত। তারা যজ্ঞের জন্য কর্ম করেন।

জাগতিক কোন বিষয়ে আসক্তি বা পাওয়ার আকাংখা না থাকলেই কেবল এমন ভাব লাভ করা সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তেমন জ্ঞানে কর্ম করতে বলছেন। আসক্তি রহিত হয়ে কর্তব্য মনে করে কর্ম করতে হবে। তবেই পরম লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। উদাহরণ উদ্ধৃত করে বলেন,

২০	জনকের মতো রাজারাও কর্মের মাধমেই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সৃষ্টি সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে হলেও কর্ম করা কর্তব্য।
২১	মহান ব্যাক্তিগণ যা যা করেন সাধারণ মানুষ তাই করে। তিনি যা প্রামাণ্য বলে প্রতিষ্ঠা করেন জগত তা অনুসরণ করে।

● **৩.২০-২১** জনক রাজা ছিলেন সীতা দেবীর পিতা। শ্রীরাম চন্দ্র বা রামের শ্বশুর। তিনি ভারতের বিহার প্রদেশের ‘মিথিলা’ অঞ্চলের রাজা ছিলেন। ভগবৎ বা আধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। ভগবানে অতি ভক্তির কারণে তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সিদ্ধি লাভ হচ্ছে পরমাত্মাকে লাভ করা। পরমাত্মাকে তাঁরা অনুভব করেছেন নিবিড়ভাবে।

বেদের নির্দেশ অনুযায়ী যাগযজ্ঞ পালনে তাঁদের কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাঁরা কর্ম করলেও তাঁদের নিজেদের কোন লাভ হয় না। না করলেও কোন ক্ষতি হয় না। তথাপি তাঁরা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন সর্বসাধারনকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। সৃষ্টি সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে।

অর্জুন জানতে চেয়েছিলেন কেন তাঁকে এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সর্বসাধারণে শিক্ষা দেয়ার জন্য কিংবা জগতে ভাল উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করার জন্যও কিছু কাজ করতে হয়। সাধারণ মানুষ মহান ব্যাক্তিদের অনুসরণ করে। মহান ব্যাক্তিগণ যে মান প্রতিষ্ঠা করেন সর্বসাধারণ তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। অর্জুনের মতো মহান ব্যাক্তিত্ব স্বধর্ম পরিত্যাগ করলে সকলে সে পথ অনুসরণ করবে। জগতে মন্দ উদাহরণ প্রতিষ্ঠা পাবে।

দুষ্টদের দমনের জন্য, সাধারণে সঠিক পথের শিক্ষা দেয়ার জন্য, অসত্যের উত্থানকে দমন করার জন্য, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য- এক কথায় সৃষ্টি সুরক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তেমনই এক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করেছে।

অর্জুনের মতো ব্যাক্তিত্ব যে মান প্রতিষ্ঠা করবেন জগত তাই অনুসরণ করবে। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালে জগত সে পথ অনুসরণ করবে। অন্যায় ন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে। মিথ্যে সত্যের কাছে পরাজিত হবে। সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে। জগত সুশৃংখল হবে। সৃষ্টি সুরক্ষিত হবে। সর্বদিক বিবেচনা করে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

“আমি সত্যকে মিথ্যের বিপক্ষে নিক্ষেপ করি; অতঃপর সত্য মিথ্যের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং নিশ্চয়ই! মিথ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।” (আল-কোরআন ২১:১৮)

“যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি একান্তই দয়াশীল।” (আল-কোরআন ২:২৫১)

২২	হে পার্থ! এই ত্রিভূবনে আমার কিঞ্চিৎ কর্তব্য কর্ম নেই, কোন অপ্রাপ্য-প্রাপ্য কিছু নেই; তবুও আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি।
২৩	যদি আমি অনলস হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত না হই মানুষ সর্বতোভাবে আমার পথই অনুসরণ করবে, হে পার্থ!
২৪	যদি আমি কর্ম না করি তবে এই সমস্ত গ্রহলোক উচ্ছন্নে যাবে। বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির কারণ হব আমি এবং প্রজাসকল বিনষ্ট হবে।

● **৩.২২-২৪** ভগবান ত্রিগুণাতীত। প্রকৃতির ত্রিগুণের উর্ধ্বে অবস্থান করেন। ত্রিগুণ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। তিনি কোন কিছুতে আসক্ত হন না। তাঁর কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। যার কাম্য কিছু নেই তার কোন কর্ম থাকে না। উপরন্তু ভগবান চাওয়া বা বলার সাথে সাথে সব হয়ে যায়। বস্তুত ত্রিভূবনে তাঁর কোন কর্তব্যকর্ম নেই। তবুও তিনি কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। যেমন বলা হয়েছে,

"প্রত্যহ তিনি তাঁর কর্মে রত।" (আল-কোরআন ৫৫:২৯)

ভগবান যদি কর্ম না করেন তবে সকল মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে কর্ম পরিত্যাগ করবে। উচ্ছৃংখল পরিবেশের সৃষ্টি হবে। বর্ণ সঙ্কর সৃষ্টি হবে। অবাঞ্ছিত মানুষে সমাজ ভরে উঠবে। সমাজের শৃংখলা নষ্ট হবে। সবকিছুর বিনাশ ঘটবে এবং ভগবান নিজেই সকল অনাসৃষ্টির কারণ হয়ে যাবেন। তাই সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য ও গ্রহলোকসমুহের হিতার্থে তিনি কর্মে ব্যাপৃত থাকেন। বলা হচ্ছে,

২৫	অজ্ঞরা যেমন আসক্ত হয়ে কর্ম করে, হে ভারত! বিদ্বানও তেমনি কর্ম করেন জগতের হিতার্থে আসক্তি রহিত হয়ে।
২৬	কর্মফলে আসক্ত অজ্ঞ ব্যাক্তিদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করা উচিত নয়। বরং বিদ্বানদের উচিত সমস্ত কর্মে নিযুক্ত থেকে তাদেরকে কর্মে প্রবৃত্ত করা।

● **৩.২৫** জ্ঞানী-নির্জ্ঞান কিংবা পরমেশ্বরের ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে বড় পার্থক্য হচ্ছে জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, মানসিকতা বা মনোবৃত্তিতে। ভক্ত ও অভক্তের অনেক কর্মকে বাহির থেকে দেখতে একই রকম মনে হতে পারে। কিন্তু অভক্ত কর্ম করে ভেতরে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছে নিয়ে আসক্তি থেকে। তার মধ্যে অজ্ঞতা ও জ্ঞানের ঘাটতি আছে। জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে সে অবগত নয়। অথচ একই কর্ম ভক্ত বা জ্ঞানী করেন পরমেশ্বর ভগবান বা আল্লাহর তুষ্টির জন্য। দু'জনের কাজের নিয়ত ভিন্ন। বিদ্বান বা ভক্ত কাজ করেন জীবন ও জগতকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য আসক্তি রহিত হয়ে।

● **৩.২৬** বলা হচ্ছে, জ্ঞানীদের উচিত নয় কর্মফলে আসক্ত ব্যাক্তিদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করা। অর্থাৎ অতি জ্ঞানের কথা বলে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। তাদেরকে তাদের মতো চলতে দেয়া উচিত। তাদেরকে নিজ জ্ঞানে কর্ম করতে দেয়া উচিত।

কেননা নিজ থেকে যে কোন বিষয় বোঝে না, তাকে তা জোর করে কিছু বোঝান যায় না। যার ধারণ ক্ষমতা যতটুকু সে তার বাইরে যেতে পারবে না। সে চেষ্টা করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। ভূল বোঝার সম্ভাবনা থাকে। এতে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে। এমনকি সে কারণে অনর্থক বিরোধীতার মুখোমুখী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। অজ্ঞজনেরা ক্ষিপ্তও হতে পারে। যা সমাজে আরেক অনাসৃষ্টির সৃষ্টি করতে পারে।

এটিও বিবেচ্য যে, দীর্ঘসময় কাউকেই ভূল পথেও চলতে দেয়া যায় না। সেটিও সমাজের জন্য কল্যাণকর নয়। তাই জগতের হিতার্থে বিদ্বানগণের উচিত নিজেরা অনাসক্ত হয়ে কর্মে নিযুক্ত থাকা এবং অপরাপরদেরকেও সেভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করা। তবুও কর্ম ত্যাগ নয়; কর্ম করে যেত হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, অজ্ঞরা আসক্ত হয়ে কর্ম করে কিন্তু বিদ্বান কর্মে আসক্ত হন না কেন? দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায়? বলা হচ্ছে,

২৭	প্রকৃতির গুণসমুহের দ্বারা সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু অহঙ্কারে বিভ্রান্ত আত্মা নিজেকে কর্তা মনে করে।
২৮	হে মহাবাহো! গুণ ও কর্ম বিষয়ক তত্ত্ববিদগণ কিন্তু গুণ গুণের ওপর ক্রিয়াশীল আছে বা ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবৃত্ত আছে এরূপ জেনে আসক্ত হন না বা আমিই কর্তা এরূপ মনে করেন না।
২৯	প্রকৃতির গুণে বিমূঢ়চিত্ত ব্যাক্তিগণ গুণের প্রভাবে কৃত কর্মে আসক্ত হয়। এইসকল স্বল্পজ্ঞানের ব্যাক্তিগণের কর্ম নিম্ন পর্যায়ের হলেও জ্ঞানসম্পন্নদের উচিত নয় তাদেরকে বিচলিত করা।

● **৩.২৭** দেহ দ্বারা জীব যা কিছু করে সে সকল কাজ সম্পাদন হয় প্রকৃতির কারণে। দেহ ও নিজের সত্ত্বা এক নয়। দেহ ও আত্মা পৃথক। ব্যাহ্য প্রকৃতি ক্রিয়া করে; দেহ তার স্বভাব বা প্রকৃতির সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণানুসারে প্রতিক্রিয়া করে। তাতেই জীবের কর্মের সৃষ্টি হয়। অতএব প্রকৃতি ও গুণসমুহের দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয় এবং দেহ কর্ম করে। জীব কিছু করে না। জীব অকর্তা হয়ে দেহমধ্যে বিদ্যমান থাকে।

সত্য হচ্ছে, প্রকান্ড এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সকল কাজ পরিচালিত হয় পরমেশ্বর ভগবান বা আল্লাহর দ্বারা। কেননা প্রকৃতি ভগবানের নিয়ন্ত্রনাধীন। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! আমি মানুষকে এক পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি; সে কি মনে করে যে তার ওপরে কারও কোন ক্ষমতা নেই?" (আল-কোরআন ৯০:৮-৫)।

জীব যদিও অকর্তা হয়ে বিদ্যমান থাকে তথাপি আমিত্ববোধে বিভ্রান্ত আত্মা নিজেকে কর্মের কর্তা মনে করে। মনে করে যে সে নিজে সব কর্ম করেছে। সে কারণে কখনও অহঙ্কারও বোধ করে। কাজের কৃতিত্ব নিজে নিতে চায়। আবার কখনও নিজেই হতাশায় ভোগে। নিজেকেই কোন কারণে দায়ী মনে করে। আমিত্ববোধের কারণে জীব এভাবে বিভ্রান্ত হয়।

গুণসমুহের কারণে দেহ দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হলেও আমিত্ববোধের কারণে অজ্ঞজনেরা বিষয়গুলি বুঝতে পারে না। তারা বিষয়ে আসক্ত হয়। সকল কর্মের সাথে নিজেকে তথা অন্তরাত্মাকে ভীষনভাবে জড়িয়ে ফেলে। ফলে বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং ভাল-মন্দ ফল ভোগ করে।

● **৩.২৮** সত্য হচ্ছে, ব্যাহ্য প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং নিজ স্বভাব বা প্রকৃতি এ দুয়ের মিথষ্ক্রিয়ায় দেহ দ্বারা কর্ম সংঘটিত হয়। যখন কোন কর্ম সংঘটিত হয় তখন গুণ গুণের ওপর ক্রিয়া করছে, কিংবা ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবৃত্ত আছে কর্ম ও গুণ বিষয়ক বোদ্ধাগণ বিষয়গুলিকে এভাবে দেখেন। তারা নিজেদেরকে কর্মের সাথে সম্পৃক্ত করেন না বা সম্পৃক্ত মনে করেন না। তারা দেখেন যে ইন্দ্রিয়সমুহ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে। অথবা সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ গুণসমুহ একে অপরের ওপরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। অর্থাৎ দেহই সমস্ত কর্ম করছে। আত্মা এতে সম্পৃক্ত নয়। আত্মা সকল প্রকারের দৈহিক ক্রিয়া থেকে পৃথক। আত্মা নিষ্ক্রিয় ও অকর্তা। কেবল সাক্ষীরূপে বিদ্যমান। তাই তারা কর্মে বা বিষয়ে আসক্ত না হয়ে থাকতে পারেন।

এমন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তাদের ভেতরে আমিত্বভাব থাকে না। অর্থাৎ 'আমি' করি, এটা 'আমার' এমন ভাব কাজ করে না। ফলে দেহের দ্বারা কৃত কর্মের ফল

যেমন সে নিজের মনে করে না, তেমনি দায়ও এ জ্ঞানের কারণে তাঁর ওপর বর্তায় না।

আমিত্ববোধ যখন কারও ভেতর থেকে দুর হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে 'সে আমি' বা আত্মা বস্তুত পরমাত্মায় নিজেকে সমর্পন করেছে। তেমন কর্মে জীবের নিজস্ব কোন লিপ্ততা থাকে না। ভগবানের কর্ম তাঁর মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। ভগবানের সকল কর্মই সৃষ্টির কল্যাণে হয়ে থাকে। তেমন কর্মে জীবের বন্ধন হয় না। পাপও তাকে স্পর্শ করে না। কর্মের ফল তাঁকে ভোগ করতে হয় না [দ্রষ্টব্য গীতা ২:৩৮-৩৯]। যেমন বলা হয়েছে,

"জেনে রেখ, তোমরা শত্রুদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন।" (আল-কোরআন ৮:১৭)

ভগবানের বা আল্লাহর কারণে অর্থাৎ জগতের বৃহৎ কল্যাণের স্বার্থে আমিত্বভাব থেকে মুক্ত হয়ে কর্তব্য মনে করে কর্ম করলে তাতে পাপ হয় না। ফলভোগও করতে হয় না। তাই বাসনা ত্যাগ করে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সে জ্ঞানে কর্ম করতে বলছেন।

বস্তুত নিষ্কামকর্ম মানবীয় কর্ম নয়। ঐশ্বরীক কর্ম। জীবের কর্ম ঈশ্বরমুখী হলেই প্রকৃত নিষ্কাম কর্মযোগ হয়। এর জন্য ভেতরে ঐশ্বরীক ভাব আসতে হয়।

• **৩.২৯** জড় প্রকৃতির গুণে বিভ্রান্ত বিমূঢ়চিত্ত ব্যাক্তি মনে করে যে সে নিজেই সকল কর্ম করছে। গুণের প্রভাবে আসক্ত হয়ে কর্মের সাথে সে নিজেকে ভীষণভাবে জড়িয়ে ফেলে। ফলে ঐ কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলভোগের বাসনা থেকে নিজ স্বার্থে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কোন কাজ করা হলে সে কাজের দায় নিজের ওপরে বর্তায়।

মূলত জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে কেউ বিষয়ে আসক্ত হয় এবং কেউ হয় না। বিষয়গুলির গুরু অর্থ বোঝার জন্যই গীতায় আত্মতত্ত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় যা দেহ ও আত্মার পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে।

বলা হচ্ছে, তেমন বোধসম্পন্ন মানুষদের কর্ম নিচু পর্যায়ের হলেও যারা তত্ত্বজ্ঞ বা জ্ঞানসম্পন্ন তাদের উচিত নয় গভীরের জ্ঞান বা চরম সত্য কথা বলে তাদেরকে বিচলিত করা। যার যে জ্ঞান ধারণ করার ক্ষমতা নেই তাকে সেটা বললে হিতে বিপরীত হতে পারে। বিষয়গুলি তারা নিজ জ্ঞানে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

অধিকতর বিচলিত হবে। বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। তাই তাদেরকে তাদের মতো চলতে দেয়াই উত্তম। যেমন বলা হয়েছে,

"তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক কর যারা সতর্কবার্তাকে অনুসরণ করে।" (আল-কোরআন ৩৬:১১)।

যারা বোধসম্পন্ন কেবল তাদেরকেই সতর্ক করা যায়। বস্তুত কর্ম করেই প্রত্যেককে নৈষ্কর্ম লাভ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে নিজের সক্ষমতা বুঝে কর্ম করে অগ্রসর হওয়াই উত্তম। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩০	অতএব আমাতে সর্বকর্ম সমর্পন করে, আত্ম-চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়ে, নিষ্কাম তথা কর্মের ফল প্রত্যাশা না করে এবং সকল প্রকার মিথ্যে মায়া বা আমিত্বভাব পরিত্যাগ করে শোকাবহ না হয়ে- যুদ্ধ কর!
৩১	যে সকল মানুষ দোষদর্শী না হয়ে শ্রদ্ধার সাথে সর্বদা আমার এই মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত থাকে তারা এমনকি কর্মের বন্ধন থেকেও মুক্ত হন।
৩২	কিন্তু যারা দোষদর্শী হয়ে আমার এ মত অনুসরণ করে না, সর্বপ্রকার জ্ঞানে বিমূঢ় সেসব চেতনাহীনদের বিনষ্ট বলে জানবে।

- **৩.৩০** শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যদি তুমি ওপরের কথাগুলির মর্ম অর্থ বুঝে থাক তবে সর্বকর্ম ভগবানে সমর্পন কর। বিধি মোতাবেক তাঁর নির্দেশনায় কর্ম কর। আত্ম-চেতনায় অধিষ্ঠিত হও। আমি কে, কোথা থেকে এলাম, কেন এলাম, কে সমস্ত সৃষ্টির পেছনের কারণ, তাঁর সাথে সম্পর্ক কি, কি আমার কাজ বিষয়গুলি অনুধাবন করার চেষ্টা কর। তখন তুমি বুঝতে পারবে জগতে কিছুই তোমার নয়। এমনকি তোমার করা নিজের কর্মটিও তোমার নিজের জন্য নয়। বুঝে কিংবা না বুঝে সব ভগবানের কর্ম। সে জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের কারণে কর্ম কর। আমিত্বভাব পরিত্যাগ কর। ফলভোগের বাসনা ত্যাগ কর। অতঃপর শোকাবহ না হয়ে যুদ্ধ কর।

কর্মের প্রকৃত কর্তা মানুষ বা জীব নিজে নয়। প্রকান্ড এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সবকিছু ঘুরে-ফিরে ভগবানের হাতে। যে যুদ্ধে অর্জুন লিপ্ত হতে চলেছে সেটিও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভগবানই পরিকল্পনাকারী, নিয়ন্ত্রনকারী ও পরিচালনাকারী। অর্জুন কেবলই এক উপলক্ষ্য মাত্র। যেমন বলা হয়েছে,

"কে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা ও ব্যাবস্থাপনা করে? .. তবে কি তোমরা তাঁর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন করবে না?" (আল-কোরআন ১০:৩১)

আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ জানেন যে ভগবানের ইচ্ছেতেই জগতে তার উপস্থিতি। এখানে কিছুই তার নিজের নয়, সব ভগবানের; এমনকি তার নিজের জীবনটিও। তাই ভগবান বা আল্লাহর ইচ্ছের কাছে তিনি সবকিছু সমর্পন করে দেন। 'নিজ' ভাব বা আমিত্ববোধ পরিত্যাগ করেন। ভগবানের ইচ্ছেতে কর্ম করেন। তখন নিজের ওপর কর্মের দায় বর্তায় না। ভগবানের কারণে কর্ম করলে দায়মুক্ত বা পাপমুক্ত থাকা যায় [দ্রষ্টব্য গীতা ২:৩৮-৩৯]। তখন ফলাফল সব ভগবানের। আর সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ যা করেন তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, কিন্তু তারা জিজ্ঞাসিত হবে।" (আল-কোরআন ২১:২৩)।

● **৩.৩১** শ্রীকৃষ্ণের বিবৃত ভগবানে সমর্পনের এই দর্শনে প্রতিষ্ঠিত থেকে যারা কর্ম করবেন তারা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাই কর্মত্যাগ বা তথাকথিত সন্ন্যাস গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কর্ম করেও বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায়। ভগবানে সমর্পন করলে আমিত্ববোধ থাকে না। নিজে কর্মের ফলভোগের বাসনা থাকে না। নিজের মাধ্যমে তখন ভগবানের কর্ম সম্পাদিত হয়। সৃষ্টির কল্যাণে কর্ম সম্পাদিত হয়। সে কর্মে বন্ধন হয় না। পাপ প্রাপ্ত হয় না। ফলভোগ নেই। তাই বলা হয়েছে,

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে তাঁর ইচ্ছে ও নির্দেশনার প্রতি নিজেকে সমর্পন করা।" (আল-কোরআন ৩:১৯)

শ্রদ্ধার সঙ্গে যারা সমর্পনের এ মতাদর্শ অনুসরণ করে চলতে পারবে নিঃসন্দেহে তারা বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে, সর্বকর্ম পরিত্যাগ তথা সন্ন্যাস গ্রহণ না করে কর্মে নিয়োজিত থাকলে জীবন ও জগতও উপকৃত হয়। কর্মহীন জীবনের মতো হতাশা গ্রাস করে না। তথাকথিত সন্ন্যাসের নামে সর্বকর্ম পরিত্যাগ যথাযথ নয়।

● **৩.৩২** সবকিছুতেই যাদের দোষ বা ত্রুটি ধরার স্বভাব তারা হয়তবা এ মতাদর্শ অনুসরণ করে চলবে না; তারা এখানেও ত্রুটি-বিচ্যুতির সন্ধান করবে। অথচ বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করে তা পরিপালনের মধ্য দিয়ে মোক্ষ লাভ করার চেষ্টা করবে না। তাদের ভেতরে সত্যকে অনুধাবন করার চেষ্টার চেয়েও বিদ্বেষভাব বেশী। স্বভাবই তাদের ত্রুটিপূর্ণ। ত্রুটিপূর্ণ স্বভাব নিয়ে কি করে উচ্চ পর্যায়ে গমন করা সম্ভব?

জীবন ও জগত সম্পর্কে চেতনাহীন, বিমূঢ়চিত্ত এ ধরণের মানুষ ভূল জীবন দর্শনের কারণে বিনষ্ট বা পথভ্রষ্ট হয়। সৃষ্টির কল্যাণে এরা কোন কাজে বা উপকারে আসে না। নিজেরাই নিজেদের সুন্দর জীবনের বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং অন্যদেরকেও ভূল পথে টেনে নিয়ে যায়। সর্বকর্ম পরিত্যাগের নামে তথাকথিত সন্ন্যাস সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে,

"বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসবাদ! সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। আমি এটি তাদের জন্য নির্দেশ করিনি। কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটি অন্বেষন করেছে। তথাপি তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি।" (আল-কোরআন ৫৭:২৭)

সর্বকর্ম ত্যাগ নয়, কর্ম করেও কেবল কর্মের ফল ভোগের বাসনা ত্যাগ করে মোক্ষ লাভ করা যায়। এতে সৃষ্টি তথা জীবন ও জগতও উপকৃত হয়। যজ্ঞচক্র প্রতিষ্ঠিত থাকে। জীবের দায়িত্ব ও কর্তব্যও পালিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শিত এমন চমৎকার দর্শন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন সবাই সে পথ অনুসরণ করছে না? বলা হচ্ছে,

৩৩	জ্ঞানবান ব্যাক্তি পর্যন্ত স্বীয় স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে কাজ করে। সকল জীবই তার প্রকৃতির অনুগমন করে। দমন কি করতে পারে?
৩৪	ইন্দ্রিয়সমুহ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমুহে রাগ-দ্বেষ অনুভব করে। তাদের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। তা অবশ্যই প্রতিবন্ধক।

● **৩.৩৩** বলা হচ্ছে, প্রত্যেকেই স্বীয় স্বভাব অনুসারে কাজ করে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ যার ওপর যে গুণ প্রভাব বিস্তার করে সে সে অনুসারে কর্ম করে। সকলেই তার প্রকৃতির অনুগমন করে। কেউই নিজেকে দমন করতে পারে না। এমনকি জ্ঞানবান

ব্যাক্তিও স্বভাবের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তেমন মানুষও স্বাত্ত্বিক গুণের প্রভাবে প্রতিক্রিয়া করে। ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে না পারলে নিরপেক্ষ হয়ে ভাল-মন্দ বিচার করে কেউ কোন কিছু গ্রহণ করতে পারে না। কেন এমন হয়?

• **৩.৩৪** ইন্দ্রিয়ের কারণে এমন হয়। ইন্দ্রিয়সমুহ বিষয়ের সংস্পর্শে এলে ভেতরে রাগ-দ্বেষ উৎপন্ন হয়। রাগ হচ্ছে অনুকুল বিষয়ে অনুরাগ এবং দ্বেষ হচ্ছে প্রতিকূল বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাব। জীব তার স্বভাব অনুসারে এক একজন এক একভাবে বিষয়সমুহের প্রতি রাগ-দ্বেষজনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। তাই নিরপেক্ষ হয়ে কোন কিছু বিচার-বিবেচনা করতে পারে না। সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে রাগ-দ্বেষ অবশ্যই প্রতিবন্ধক। তাই এদের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। এগুলিকে দমন করতে হবে। কিন্তু দমন করা কঠিন।

স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে রাগ-দ্বেষ দমন করতে না পেরে সহজ মনে করে অনেকে তাই পরধর্ম অনুসরণ করতে চায়। যেমন অর্জুন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩৫	উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা কিছু ত্রুটিপূর্ণ হলেও স্বধর্ম পালন করা শ্রেয়। স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়; পরধর্ম বিপজ্জনক।

• **৩.৩৫** স্বধর্ম হচ্ছে নিজের স্বভাবজাত কর্ম। অর্থাৎ ব্যাক্তির দেহ ও মন নিজ থেকে যে কাজটি করতে আগ্রহী বা ইচ্ছুক সেটি। মানুষ তার স্বভাবের বাইরে যেতে পারে না বা যেতে চায় না। সেটি তার জন্য অস্বস্তিকর বোধ হয়। তেমন কর্মে মন বসে না। ভালভাবে কাজটি সম্পন্নও হয় না। ক্লেশকর মনে হয়। তথাপি কেউ যদি ভালভাবে তেমন কাজ সম্পন্নও করে তবে সেটি ব্যাতিক্রম হিসেবে বিবেচিত হয়। ব্যাতিক্রমকে নিয়মরূপে দেখা যায় না। আবার সবাই ভাল করবে তেমনও বলা যায় না। তাই স্বধর্ম পালন করা উত্তম। অন্যথায় ক্লেশকর কর্ম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

তবে এখানে যে সময়ে বা যে প্রেক্ষিতে অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে স্পষ্টতই এটি বর্ণাশ্রম ধর্মকে বিবেচনা করে বলা হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মে স্বধর্ম বলতে বর্ণ অনুযায়ী নিজ কর্তব্যকর্মকে বোঝায়। অর্থাৎ ব্রাক্ষান, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যার জন্য যে কাজ নির্ধারিত সেটি পালন করাই হচ্ছে তার জন্য স্বধর্ম

পালন করা। স্বধর্ম পালন করা যথাযথ কর্তব্য কর্মরূপে বিবেচিত হয়। এটিকে নিয়তকর্মও বলে। একের ধর্ম বা কর্ম অপরের পালন করা বাঞ্ছনীয় নয়।

অর্জুন হচ্ছেন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় হিসেবে তাঁর স্বধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা। ব্রাহ্মান হচ্ছেন সাধারণত অহিংসা পরায়ন। সত্ত্বগুণে গুণান্বিত। অহিংসা অর্জুনের ধর্ম বা চলার পথ নয়। অথচ তিনি নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছে পোষন করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, স্ব-ধর্ম পালন করতে গিয়ে যদি মৃত্যুকেও বরণ করতে হয়, কিংবা নিধনও করতে হয় তবে সেটিও উত্তম। সন্মানের এবং কর্তব্যবোধের। সকলের দ্বারা গ্রহণযোগ্য। নিজের স্বভাবও নিজেকে তেমন কর্মের দিকে চালনা করে। মৃত্যু তো একদিন সকলেরই হবে। ক্ষত্রিয় সেভাবেই গড়ে ওঠে যে প্রয়োজনে তাকে যুদ্ধ করতে হবে। অর্জুনকে সেভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে। এটি তার জন্য ধর্মারোপিত কর্তব্যকর্ম। সংকটকালে ধর্ম ত্যাগ করা যায় না। এটি পাপ হিসেবেও বিবেচিত হয়।

স্বধর্ম পালন ত্রুটিপূর্ণ হলেও সমালোচনার মুখে পড়তে হয় না। কিন্তু পরধর্ম পালন করতে গিয়ে ভূল হলে সমাজও নিস্তার দেয় না। পরধর্ম পালন বিপজ্জনক। সেখানে ভূলেরও জন্ম হতে পারে। যা প্রতিষ্ঠিত সকল নিয়মকেও গ্রাস করতে পারে। ব্রাহ্মানকে অনুসরণ করে অহিংসার পথ তাই অর্জুনের জন্য নয়।

উল্লেখ্য যে, অপ্রাকৃত স্তরে বা ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে পারলে যে কোন রকম আচরণ করা যায়। সেক্ষেত্রে অবশ্য গুণ অনুসারে স্তর বিভাগ নেই। তেমন মানুষ জড় গুণের প্রভাবমুক্ত এবং প্রয়োজনে যে কোন কাজে সম্পৃক্ত হতে পারেন। তাঁর কোন কাজই নিজ কিংবা জাগতিক স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয় না। তিনি নিজ বিবেচনায় কল্যানার্থে বা বিধাতার কারণে কর্ম করেন।

স্বধর্মের আচরণ পরিত্যাগ করতে চেয়ে তবে কেন মানুষ পাপের পথে পা বাড়ায়? অর্জুন জানতে চেয়ে বলেন,

৩৬	হে বাঞ্চেয়! তবে কার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মানুষ অনিচ্ছা সত্বেও যেন বলপূর্বক পাপকর্মে নিয়োজিত হয়?
৩৭	শ্রীকৃষ্ণ বলেন: এটি হচ্ছে কাম ও ক্রোধ। রজোগুণ থেকে উদ্ভূত। সর্বগ্রাসী মহাপাপ! এ জগতে এটিকে শত্রু বলে জানবে।

● **৩.৩৬-৩৭** অর্জুন জানতে চেয়ে বলেন, ইচ্ছে না করা সত্ত্বেও তবে কেন মানুষ পাপকাজে লিপ্ত হতে চায়? মনে হয় যেন তাকে জোরপূর্বক সে পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, এটি হচ্ছে কাম ও ক্রোধ যা রজোগুণ থেকে উদ্ভূত। এ দু'টিকে সর্বগ্রাসী মহাপাপ ও শত্রু বলে জানবে। কাম জাগ্রত হলে তা থেকে নিস্তার নেই। কাম প্রতিহত হলে ক্রোধে পরিণত হয়। তখন আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। কামের অন্তরালে ক্রোধ বিদ্যমান থাকে। কাম হচ্ছে কামনা বা বিষয় বাসনা।

কাম শব্দটি দ্বারা অনেকে শুধুমাত্র রিপুকে বুঝে থাকেন। তবে এখানে তেমন সংকীর্ণ অর্থে বিষয়টিকে বোঝান হয়নি। ষড়রিপু হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। এগুলি আত্ম উন্নতির পথে অন্তরায়।

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে স্বাভাবিক আকর্ষন সেটিই হচ্ছে কাম বা কামনা। বাসনায় অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হলে সেটি লোভে পরিণত হয়। বিষয় বাসনা জীবকে অনিত্য বস্তুতে আসক্ত করে রাখে। অতঃপর তার জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। জ্ঞান আচ্ছন্ন হলে সেটি মোহে পরিণত হয়।

অজ্ঞতার কারণে যখন অহঙ্কার বা আমিত্বের ভাব আসে সেটিকে বলে মদ। অহমিকা যখন আবার অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করে চিত্তে ক্ষোভের সৃষ্টি করে, তখন সেটি হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষাপরায়নতা বা মাৎসর্য।

অতএব সব রিপুরই মূল উৎস হচ্ছে কাম। তাই কাম বা বাসনা হচ্ছে প্রধান শত্রু। সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়। বলা হচ্ছে,

৩৮	অগ্নি যেমন ধূম্র দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পনও যেমন ধুলো দ্বারা আবৃত থাকে, যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে গর্ভ; তেমনই কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে।
৩৯	কামরূপ চিরশত্রুর দ্বারা জ্ঞানীর শুদ্ধ চেতনা এভাবেই আবৃত থাকে, হে কৌন্তেয়! যা কখনই পুরণ হবার নয় এবং অগ্নির মতো দগ্ধ করে।

● **৩.৩৮-৩৯** জীবাত্মা বস্তুত ব্রহ্মভূত ও পরম প্রকৃতিজাত। কিন্তু জীবাত্মার সেই শুদ্ধ চেতনা জড় প্রকৃতির কাম তথা রজোগুণের দ্বারা ঢাকা পড়ে। কাম হচ্ছে

রজোগুণপ্রসূত। লোহার ওপরে যেমন মরিচা পড়ে তেমনি সবকিছুর ওপরেই আবরণ পড়ে। আবরণ প্রকৃত রূপকে ঢেকে রাখে। যেমন সূর্য্যকে ঢেকে রাখে মেঘ। অগ্নি ধূম্র দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পন ধুলো দ্বারা আবৃত থাকে, জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে গর্ভ; তেমনই কামের বিভিন্ন মাত্রা দ্বারা ঢাকা পড়ে জীবের পবিত্র ও শুদ্ধ চেতনা ও জ্ঞান।

কাম থেকে উদ্ভূত ক্রোধের সাময়িক নিবৃতি হলেও উপভোগের দ্বারা কাম কখনই নিবৃত হয় না। সাময়িক সময়ের জন্য তৃপ্তি দান করে বটে, কিন্তু আবার পূর্ণরূপে জেগে ওঠে। যন্ত্রনায় দগ্ধ করে। বস্তুত কামের দ্বারা জীবকে জড় প্রকৃতিতে বা জগতে আবদ্ধ করে রাখা হয়। এই সুখের অনুভূতি তাই পরম শত্রু। মোক্ষ লাভের পথে মূখ্য অন্তরায়। একে তাই বিনাশ করতে হবে।

কাম বিনাশ করতে হলে এর উৎস, অবস্থান স্থল বা নিবাস সম্পর্কে জানতে হবে। তবেই প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেয়া সম্ভব হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪০	ইন্দ্রিয়সমুহ, মন ও বুদ্ধিকে এই কামের অধিষ্ঠান স্থল বলা হয়। এই কাম এদের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করে জীবকে বিমোহিত করে।
৪১	অতএব হে ভারত শ্রেষ্ঠ! তুমি ইন্দ্রিয়সমুহকে প্রথমেই দমন কর; জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশক পাপরূপ এই কামকে বিনাশ কর।

- **৩.৪০** ইন্দ্রিয়সমুহ, মন ও বুদ্ধি এই তিন হচ্ছে কামের অধিষ্ঠান স্থল। কাম এদের দ্বারা জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে আবৃত করে। জীবকে বিমোহিত করে। জীবের বুদ্ধি বা জ্ঞান লোপ পায়।

ইন্দ্রিয়সমুহ সর্বপ্রথম বিষয়ের সংস্পর্শে আসে। সে বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান ভেতরে প্রেরণ করে। এতেই মন আন্দোলিত হয়। মন হচ্ছে সকল ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্থল। মন আন্দোলিত হলে সে বিষয় লাভে সংকল্প গ্রহণ করে। মনের আন্দোলনে বুদ্ধি বিমোহিত হয়। বুদ্ধি বিমোহিত হলে শুদ্ধ চেতনা লোপ পায়। শুদ্ধ চেতনা লোপ পেলে জীব স্বরূপ থেকে বিচ্যূত হয়। বিভ্রান্ত বুদ্ধিকে দিয়ে মন তার সংকল্প পুরণে পরিকল্পনা তৈরী করে। এ থেকে পরিত্রানের উপায় কি?

● **৩.৪১** বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানই হচ্ছে পরিত্রানের উপায়। জ্ঞানই মানুষকে সঠিক পথে চালনা করে। কিন্তু জ্ঞান চালনা করবে কিভাবে? মনের আন্দোলনে জ্ঞান তো লোপ পায়।

সামগ্রীক বিষয়গুলি বুঝে এর সাথে লড়তে হলে তাই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বস্তুত পারমার্থিক জ্ঞান থেকেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের শুরু। পারমার্থিক জ্ঞানই সকল জ্ঞানের উৎস। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করতে হলে চিত্তকে শান্ত হতে হয়। চিত্ত শান্ত না হলে আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। কাম প্রবৃত্তি চিত্তকেও অশান্ত করে রাখে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশক পাপরূপ এই কামকে সর্বপ্রথম বিনাশ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে সেটি করা সম্ভব হবে?

পাপের বা জীবের অধঃপতনের প্রথম কারণ হচ্ছে ইন্দ্রিয়। জীবের সকল বিকারগুলির শুরু হয় ইন্দ্রিয়ের কারণে। তাই ইন্দ্রিয়সমুহকে দমন করার কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়কে সংযত বা বশীভূত করা সম্ভব হলে বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। মনও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আন্দোলিত হবে না। মন্দ কর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। তাই বলা হয়েছে,

"মন্দ ও ভাল সমান নয়, যদিও অসংখ্য মন্দ তোমাকে আকর্ষন করে। অতএব হে, বুঝ সম্পন্ন মানুষ! আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালনে মনযোগী হও, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আল-কোরআন ৫:১০০)

"যে তার পালনকর্তার সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং নিজেকে মন্দ প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করেছে, নিশ্চয়ই! স্বর্গীয় উদ্যান হবে তার আবাসস্থল।" (আল-কোরআন ৭৯:৪০-৪১)

বস্তুত সব গ্রন্থই একেকভাবে মন্দকর্ম পরিহার করাকে উৎসাহিত করেছে। সারকথা একই। তবে গীতা দারুণভাবে ও বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করেছে! অতুলনীয়!!

কাম মানুষের সুস্থ জ্ঞানকে বিনাশ করে। কাম হচ্ছে মোক্ষের প্রতিবন্ধক। ইন্দ্রিয় হচ্ছে এ প্রতিবন্ধকতার প্রথম ও প্রধান কারণ। তাই সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়সমুহকে দমন করার কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়সমুহকে দমন করা সম্ভব হলে পাপের কারণ কামকে

বিনাশ করা সম্ভব হবে। কিন্তু ইন্দ্রিয় ও মনকে দমন করা তো কঠিন। সেটি কি করা সম্ভব? কিভাবে? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪২	ইন্দ্রিয়সমুহকে শ্রেয় বলা হয়। ইন্দ্রিয়সমুহ থেকে মন শ্রেয়। মন থেকে বুদ্ধি শ্রেয় এবং বুদ্ধি থেকেও উচ্চতর হচ্ছে 'আত্মা' তথা 'নিজ'।
৪৩	হে মহাবাহো! এভাবে আত্মাকে বুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠ জেনে নিজেই নিজেকে সংযত করে কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় কর।

• **৩.৪২** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, জড়দেহ হচ্ছে চেতনাবিহীন। তার কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা বোধ-বিচার নেই। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই জীবদেহ প্রকৃতি ও পরিবেশের সংস্পর্শে আসে ও মিথষ্ক্রিয়া করে। জড়দেহ থেকে ইন্দ্রিয়সমুহকে তাই শ্রেয় বলা হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সমুহেরও নিজস্ব কোন অনুভূতি নেই। দেহমধ্যে সে সংবাদ বাহকরূপে কাজ করে।

মন হচ্ছে সকল ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্থল বা সমন্বয়ক। সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরণ করা জ্ঞান সম্মিলিতভাবে মনে অনুভূত হয়। মন বিষয় বাসনায় আন্দোলিত হয়। মনের ইচ্ছেতে দেহে গতি আসে। দেহ বিষয় লাভে কর্মে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। অতএব মন হচ্ছে ইন্দ্রিয় থেকে শ্রেয় বা উচ্চতর।

মনের অতি উচ্ছাসে দেহ ছুটে চলে। সে ভাল পথেও চলতে পারে আবার মন্দ পথেও চলতে পারে। মন কোন পথে চলবে বা তাকে কোন পথে চালান হবে সেটি নির্ধারণ করে বুদ্ধি বা জ্ঞান। অতএব মনের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে বুদ্ধি বা জ্ঞান। তাই মন থেকে বুদ্ধি উচ্চতর। কিন্তু আত্মা?

আত্মা হচ্ছে জীবের প্রকৃত স্বরূপ। দেহে আত্মার উপস্থিতির কারণেই জীব সচল ও প্রাণবন্ত। আত্মাই জীব বা 'আমি'র প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর বিদ্যমানতার কারণেই অন্যান্য বিষয়গুলি গুরুত্ববহন করে। অন্যথায় তাদের কোন গুরুত্ব নেই।

ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এগুলি জড়দেহ সম্পৃক্ত বিষয় হলেও আত্মা কিন্তু দেহ থেকে পৃথক এবং জীব প্রকৃতি ও চেতনাসম্পন্ন। জীব বা আত্মা হচ্ছে সবকিছুর উর্ধ্বে।

• **৩.৪৩** কামকে দুর্জয় শত্রু বলা হয়। মোহগ্রস্ত করে জীবের শুদ্ধ চেতনা বা জ্ঞানকে কাম গ্রাস করে। জীব স্বরূপ থেকে বিচ্যূত হয়ে অধঃপতিত হয়।

নিম্ন পর্যায়ের শক্তিকে উচ্চতর শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রন করতে হয়। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সবার উর্ধ্বে হচ্ছে আত্মা বা নিজ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, আত্মা বা নিজকে বুদ্ধি বা জ্ঞানের চেয়েও উর্ধ্বে জেনে নিজেই নিজেকে তথা ইন্দ্রিয়সমুহকে দমন বা নিয়ন্ত্রন করতে হবে। তবেই কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় করা সম্ভব হবে। যেমন বলা হয়েছে,

“সেই সত্যিকার অর্থে সফল যে আত্মাকে বিকশিত করে এবং সেই সত্যিকার অর্থে ব্যার্থ যে এটিকে স্থবির করে রাখে।” (আল-কোরআন ৯১:৯-১০)।

ওপরের উদ্ধৃতিটিতেও একই কথা বলা হয়েছে। নিজেই নিজেকে বিকশিত করতে হবে। আত্মাই হচ্ছে নিজ।

উল্লেখ্য যে, কাম প্রবৃত্তি প্রকাশ পায় রজঃগুণের প্রভাবে। উপভোগের দ্বারা কাম কখনই পূর্ণ নিবৃত হয় না। জড় জগতের সমস্ত কিছুর কেন্দ্র হচ্ছে যৌন আকর্ষন। কামের অতৃপ্তির ফলে ক্রোধের সৃষ্টি হয়। যা সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়। এটি তমগুণের প্রকাশ। এভাবে জীবাত্মা রজোগুণ থেকে তমগুণের দিকে ধাবিত হয় এবং অধঃপতিত হয়।

রজগুনকে তমতে পরিণত হতে না দিয়ে সত্ত্বে উন্নীত করা দরকার। যারা সত্ত্বগুণে প্রভাবিত তারা পাপ কাজ থেকে দুরে থাকে। তাদের মধ্যে আধ্যাত্ম চেতনার বিকাশ ঘটে। তারা জ্ঞানের সাধনা করে। ক্রোধ হচ্ছে তমঃ গুণের প্রকাশ, কাম রজঃ গুণের প্রকাশ এবং সত্ত্ব হচ্ছে ধর্মাচরণের প্রকাশ।

উল্লেখ্য যে, এটিও আরেক যুদ্ধ বা জেহাদ। এ যুদ্ধ অন্তরে সংঘটিত হয়। সেখানেও আরেক কুরুক্ষেত্র আছে। সেখানে কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় করতে হয়। সেখানেও রক্তক্ষরণ আছে।

এটিও বুঝতে হবে যে স্বতন্ত্র জীবাত্মাও আশ্রয় ও অস্তিত্বহীন যদি না পরমাত্মার সাথে তার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। পরমাত্মার কারণেই জীবসমুহ জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। তাই সঠিক পথে চলতে হলে পরমাত্মার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আত্মাকে জাগ্রত করতে হবে। জাগ্রত আত্মাই পারে সবকিছুকে জয় করতে। নিজের ইচ্ছেশক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন আত্মার যথাযথ পরিচর্যা। ঈশ্বরের স্মরণ অন্তরকে জাগ্রত করে। তাই বলা হয়েছে,

“.. আমার উপাসনা কর এবং আমার স্মরণার্থে উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর।” (আল-কোরআন ২০:১৪)

“... অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।” (আল-কোরআন ২৯:৪৫)

কাম ও ক্রোধের মধ্যেও আছে প্রচন্ড শক্তি। যেমন আছে আগুন, পানি কিংবা পরমাণুর মধ্যে। এগুলিকে উপকারেও লাগান যায় আবার অপকারেও লাগান যায়। কামকে তাই বুদ্ধিমত্তার সাথে উপকারী শক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। কামের মধ্যে প্রেম আছে। সেটিকে ভগবৎ প্রেমে রূপান্তরীত করতে হবে। তবেই মুক্তি।

চতুর্থ অধ্যায় : জ্ঞানযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ৪২)

সারকথা : সংসার যাতনা থেকে মুক্তি লাভের জন্য অর্জুন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এভাবে সত্যিকারের যাতনা মুক্তি হয় না। যাতনা মুক্ত হতে হলে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। এটিই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর জন্য কর্ম ত্যাগের প্রয়োজন নেই। কর্ম করেও সেটি অর্জন করা সম্ভব।

যারা ভগবান সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং তাঁর ভাব বা স্বভাব সম্পর্কে জানেন তারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি জানেন। তারা কর্ম ও সাধনা বলে ভগবানকে প্রাপ্ত হন। ভগবাকে প্রাপ্ত হলে সকল যন্ত্রনার অবসান হয়। পরম শান্তি ও আনন্দময় জীবন লাভ হয়। এটিকেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বলে। অতএব ভগবানই লক্ষ্য।

ভগবান সম্পর্কে যথাযথভাবে জেনে তাঁর গুণাগুন বা ভাব প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাত্ব লাভ করতে হবে। জ্ঞানযোগে ভগবান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।

১	শ্রীকৃষ্ণ বলেন: আমি এই অব্যয় যোগ সূর্য্যের দেবতা বিবস্বানকে বলেছিলাম। বিবস্বান মানবজাতির জনক মনুকে এবং মনু ইক্ষাকুকে বলেন।
২	হে পরন্তপ! এভাবে পরম্পরায় প্রাপ্ত এই বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেন এবং সেই জ্ঞানযোগ সুদীর্ঘ কালের প্রভাবে জগতে বিনষ্ট হয়।
৩	সেই অতি প্রাচীন যোগ বিজ্ঞান আজ আমি তোমাকে বলছি; কেননা তুমি আমার বন্ধু ও ভক্ত। এতে অতি উত্তম গুহ্য জ্ঞান বিদ্যমান।

● **৪.১-৩** যোগ শব্দের নানান অর্থ আছে। যোগ হচ্ছে উপায়, কৌশল বা সাধন প্রণালী। কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় বা পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কিত বিজ্ঞান। কর্ম, ধ্যান, জ্ঞান কিংবা ভক্তির মাধ্যমে পরমকে লাভ করার কৌশলই হচ্ছে যোগ। এ জ্ঞান জীবকে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। ভগবানের সৃষ্টি কৌশল বোঝাতেও যোগ শব্দটি ব্যাবহৃত হয়। সৃষ্টি কৌশলকে বেদান্তে মায়া বলে।

যোগকে এখানে অব্যয় যোগ বলা হয়েছে। কেননা এই যোগে অসফলতা নেই। এটি অবিনাশী। একবার সাধনা শুরু করলে তা পূর্ণতা প্রদান করবে যা বিনাশ হবে না।

যোগের ইতিহাস বহু পূর্বের। এই জ্ঞান কিভাবে ধরায় এসেছে এবং কিভাবে তা বিস্মৃত হয়েছে সে বিষয়ে এখানে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হয়েছে।

পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মান্ড পরিচালনা করেন। তিনি গ্রহলোকের অধিশ্বরদের এ জ্ঞান দান করেন যেন তারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখেন। রাজর্ষিরা আবার প্রজা সাধারণদের মাঝে সে জ্ঞান দান করেন। যেন সকলেই জড় জাগতিক কামনা-বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে অবগত হয় এবং পারমার্থিক জীবনের পথে উন্নতি লাভ করে ও সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করে ও তাঁর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।

বিবস্বান থেকে সূর্য্য বংশের উৎপত্তি। বিবস্বান শব্দে সূর্য্যকে বোঝায়। বিবস্বান হচ্ছেন সূর্য্যের দেবতা বা সূর্য্যলোকের অধীশ্বর। বিবস্বান সূর্য্য গ্রহকে পরিচালনা করেন। সূর্য্যদেব বিবস্বানকে পরমেশ্বর ভগবান এ জ্ঞান দান করেন বলে বলা হয়েছে। ফলে এ জ্ঞান পরমেশ্বরের বাণী যা স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে।

বিবস্বানের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইক্ষাকু। ভগবান মানব জাতির পিতা 'মনু'কে এবং মনু তাঁর পুত্র রঘু বংশের জনক ইক্ষাকুকে এ জ্ঞান দান করেন। এ বংশেই মনু থেকে ৫৮তম অধস্তন পুরুষ শ্রী রাম চন্দ্র আবির্ভূত হন। গীতার এ জ্ঞান ইক্ষাকুর সময় থেকে মানব সমাজে বিদ্যমান আছে।

পরম্পরায় রাজর্ষিরা অর্থাৎ যারা একই সাথে রাজা ও ঋষি বা জ্ঞানী তারা রাজ কার্য পরিচালনায় এ জ্ঞান লাভ করেন। কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে এই বিজ্ঞান যেভাবে ছিল তা প্রায় হারিয়ে যায়।

পারমার্থিক এ জ্ঞানকে গোপনীয় বা গুহ্যজ্ঞান বলা হচ্ছে। কেননা এতে ভগবান বা ব্রহ্ম সম্পর্কিত জ্ঞান রয়েছে। যা সর্বসাধারণের জ্ঞানের অগোচর। ব্রহ্ম সম্পর্কিত এ জ্ঞানকে প্রভূত কল্যাণকর বলা হয়েছে। কেননা ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি লাভের উপায় নিহিত আছে। ব্রহ্ম নির্গুণ ও সর্বপ্রকার জড় বন্ধন থেকে মুক্ত। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ

করে, তাঁর সম্পর্কে জেনে ব্রহ্মভাব বা গুণাগুণ অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। তবেই সত্যিকারের মুক্তি মিলবে।

পরম্পরায় ছিন্ন হয়ে যাওয়া সেই প্রাচীন যোগবিজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বন্ধু ও ভক্ত অর্জুনকে অবহিত করেন। অর্জুন বলেন,

৪	বিবস্বানের জন্ম পূর্বে এবং তোমার জন্ম পরে। কিভাবে আমি বুঝব যে তুমি তাঁকে বলেছিলে?
৫	শ্রীকৃষ্ণ বলেনঃ বহু জন্ম আমার অতীত হয়েছে এবং তোমারও, হে অর্জুন! আমি সেসব জানি কিন্তু তুমি তা জান না, হে পরন্তপ!

● **৪.৪-৫** বিবস্বানের জন্ম হয়েছে বহু পূর্বে এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে অনেক পরে বাসুদেব গৃহে। তাই অর্জুন জানতে চান যে কিভাবে এই জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বানকে দিতে পারেন? এটি কি বিশ্বাসযোগ্য?

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বহু বহু জন্ম আমাদের উভয়ের অতীত হয়েছে। আমি সেসব জানি কিন্তু তুমি জান না। তাই তুমি স্মরণ করতে পার না।

আত্মা শাশ্বত, সনাতন। আত্মার মৃত্যু নেই। পুনঃ পুনঃ দেহান্তরীত হয়। কিন্তু সবাই সব জনমের কথা স্মরণ করতে পারে না। ভগবান পারেন। স্বরূপ লাভ ও দেহ লাভ এক কথা নয়। দেহের জন্ম দেখা যায়। কিন্তু স্বরূপের সৃষ্টি দেখা যায় না। স্বরূপ হচ্ছে জন্মরহিত। ভগবান স্বরূপে আবির্ভূত হন। তাঁর জ্ঞানসূত্র ছিন্ন হয় না। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে অপরাপরদের জ্ঞান আবৃত থাকে।

৬	যদিও জন্মরহিত, অবিনশ্বর আমি; জীবসমুহের ঈশ্বর। তথাপি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজস্ব শক্তি দ্বারা আবির্ভূত হই।
৭	যখন ও যেখানে ধর্মের হানি হয়, হে ভারত! এবং অধর্মের উত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে সৃজন করি।
৮	সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

● **৪.৬-৮** ভগবান জন্ম নেন না। তিনি চির বিরাজমান। তাঁর বিনাশ নেই। তিনিই জীবসমুহের ঈশ্বর। সকলের প্রতিপালক। তিনি তাঁর সৃষ্টি কৌশলে এ জগতে আবির্ভূত হন। যখন আবির্ভূত হন স্বরূপেই আবির্ভূত হন। জড় প্রকৃতি দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না। প্রকৃতির গুণের উর্ধ্বে অবস্থান করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ ... জন্ম দেন না, জন্ম নেনও না।" (আল-কোরআন **১১২**:৩)

যখন অধর্মের উত্থান হয় ও ধর্মের গ্লানি হয় এবং সমাজে অন্যায়-অত্যাচার বৃদ্ধি পায়, সত্যের পথে চলা কঠিন হয়ে যায়, আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষের আধিক্য দেখা দেয় তখন তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হন।

যখন কারও হৃদয় অধর্মের উত্থান দেখে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে, ভগবান তখন তাঁর ভেতরে নিজ স্বরূপের রচনা করে দেন। বস্তুত অনুরাগীর হৃদয়েই তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হন। তেমন যোগ্য মানবই তাঁকে ধারণ করতে পারে।

ভগবান তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী যে কোন স্থানে, যে কোন রূপে অবতরণ করতে পারেন। তিনি নিজে অবতরণ করতে পারেন, প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন কিংবা ছদ্মবেশও ধারণ করতে পারেন। যেমন বলা হয়েছে,

"জ্ঞান প্রাপ্তিতে তিনি তাঁর বার্তাবাহকরূপে যাকে ইচ্ছে বাছাই করেন।" (আল-কোরআন ৩:১৭৯)

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ৩:১৮৯)

ধর্মের দু'টি দিক আছে। একটি হচ্ছে অত্ম-উন্নয়নমূলক এবং অপরটি হচ্ছে সমাজে নিয়ম-নীতির প্রতিষ্ঠা। মানুষকে ভগবানমুখী করা এবং সমাজে ধর্মের সংস্থাপন করা বা জগতে শান্তি-শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর অবতরণের কারণ। সৃষ্টিকে রক্ষা করার প্রয়োজনে তিনি আবির্ভূত হন। বলা হচ্ছে,

"যদি ফেরেশতারা পৃথিবীতে নিরাপদে বিচরণ করতে পারত, তবে আমি আসমান থেকে কোন ফেরেশতাকে তাদের জন্য বার্তাবাহক করে প্রেরণ করতাম।" (আল-কোরআন ১৭:৯৫)

৯	যে আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম সম্পর্কে যথার্থভাবে জানে, দেহ ত্যাগ করে তাকে পুনরায় জন্ম নিতে হয় না। হে অর্জুন! সে আমাকে প্রাপ্ত হয়।
১০	আসক্তি, ভয়, ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে; আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে; একান্তভাবে আমার আশ্রয় নিয়ে বহু-বহুজন জ্ঞান তপস্যার দ্বারা পূত-পবিত্র হয়ে আমার ভাব লাভ করেছে।
১১	যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে তাকে আমি সেভাবে অনুগ্রহ বা পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! বস্তুত সকল মানুষ সর্বতোভাবে আমার পথই অনুসরণ করে।
১২	ইহজগতে যারা কর্ম থেকে ফল কামনা করে তারা দেব-দেবীর আরাধনা করে। মনুষ্যলোকে এভাবে কর্মজনিত ফল খুব দ্রুতই লাভ হয়।

• **৪.৯** ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম সম্পর্কে যিনি জানেন দেহ ত্যাগ করে তাকে পুনরায় জন্ম নিতে হয় না। তিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হন। ভগবানকে পেলে মুক্তি লাভ হয়। তাকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না।

ভগবানকে প্রাপ্ত হতে হলে ভগবানকে জানতে হবে। তাঁর দিব্য জন্ম, কর্ম, গুণাগুণ ও ভাব সম্পর্কে জানতে হবে। ভগবানকে না জানলে কিভাবে তাঁর ভাব লাভ করা সম্ভব হবে? জ্ঞানযোগে তাই ভগবান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে।

এটিও বুঝতে হবে যে, কেবল ভগবান সম্পর্কে জানলেই তাঁকে পাওয়া যাবে না। জ্ঞান লাভ করে তাঁর গুণ বা স্বভাব প্রাপ্ত হতে সাধনা করতে হবে। তবেই হয়তবা কেউ তাঁরই অনুগ্রহে তাঁকে লাভ করতে পারেন। ভগবানকে প্রাপ্ত হলে পুনরায় জন্ম নিয়ে জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। এটি বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়। মানুষ কি সত্যিই ভগবানের ভাব লাভ করতে পারে?

বাইবেলে বলা হয়েছে, "বাগানে বিচরণরত প্রাণীকুলে ধূর্ত ছিল সরীসৃপ। নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে সে ইভকে প্ররোচিত করতে লাগল। বলল, গড জানেন যদি তোমরা এ গাছের ফল খাও, তবে তোমাদের দৃষ্টি উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং তোমরা গডের সমপর্যায়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হবে।"

কোরআনে সরীসৃপের কথা উল্লেখ নেই। তবে শয়তানের প্ররোচনার কথা বলা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, "... শয়তান বলল, তোমাদের পালনকর্তা

তোমাদের জন্য এ বৃক্ষ এ কারনে নিষিদ্ধ করেছেন যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা কিংবা চিরজীবি হয়ে যাও।" (আল-কোরআন ৭:২০)

আপাতদৃষ্টে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও ওপরের উদাহরণ দু'টি কেন তুলে ধরা হয়েছে? ফল খেয়ে হোক, পাতা কিংবা ঘাস খেয়ে হোক কিংবা সাধনা করে হোক শাস্ত্রসমুহ এ বিষয়ে ধারণা দেয় যে ভগবান, গড বা আল্লাহর ভাব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ অন্যান্য গ্রন্থ্ও এমন ধারণা দেয়। বিষয়টি স্পষ্টিকরণের জন্য উদাহরণ দু'টি তুলে ধরা হয়েছে।

বিজ্ঞান কি বলে? প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মানুষ বিজ্ঞানভিত্তিক যত লেখাপড়া করে সেগুলোর মাধ্যমে বস্তুত ভগবানেরই এক একটি জ্ঞান, কর্ম, ভাব ও তাঁর মহাত্ম সম্পর্কে অবগত হয়। জগত ভগবানময়। ভগবান বিজ্ঞানময়। তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ সত্য। জগতে ভগবান ব্যাতিত আর কিছু নেই। যে জ্ঞানই মানুষ লাভ করুক না কেন তা ভগবানেরই কোন না কোন ভাব, গুণাগুণ বা শক্তি। যে যেটার সাধনা করে সে সেটা লাভ করে।

জড় বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হলে ভগবানকে প্রাপ্ত হতে হবে। তাঁর গুণাগুণ, ভাব বা স্বভাব প্রাপ্ত হওয়াই হচ্ছে তাঁকে পাওয়া। তাই ভগবান সম্পর্কে যথাযথভাবে জানতে হবে। সে কারণেই জ্ঞানযোগে ভগবান সম্পর্কে ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। তবে আগ্রহ ভিন্ন কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না।

- **৪.১০** ভগবানকে পেতে হলে বা তাঁর কোন একটি গুণ বা ভাব পেতে হলে একাগ্র চিত্তে সে বিষয়ে বা ভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। তাঁর ভাবনায় নিবিষ্টচিত্ত হতে হবে। তাঁকে ও তাঁর কর্ম সম্পর্কে ধ্যান দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষাও কিন্তু এর অন্তর্ভূক্ত বিষয়। কেননা বিজ্ঞান বস্তুত ভগবানেরই সন্ধান করে। জেনে কিংবা না জেনে বিজ্ঞান তাঁকেই জানার ও পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু জাগতিক বিষয়ে আসক্তি থাকলে ভগবানে মনোনিবেশ করা যায় না। তাই জাগতিক বিষয়ে আসক্তি বর্জন করতে বলা হয়েছে।

ভয়, ক্রোধ বা কারও প্রতি বিদ্বেষভাব এসবে মন থাকলে ভগবানে মনোনিবেশ হবে না। তাই এসব থেকে মুক্ত হতে হবে। ভগবানে আশ্রয় নিতে জানলে সকল

প্রকার ভয় দুর হয়ে যায়। সেখান থেকে আসে সাহস। বিপদে তিনিই আশ্রয়। তাই তাঁর ওপরেই ভরসা করতে জানতে হয়। যেমন শিক্ষা দেয়া হয়েছে,

"বল: আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর কাছে যিনি মানবজাতির প্রতিপালক, যিনি মানবজাতির অধিপতি, যিনি মানবজাতির উপাস্য; আশ্রয় প্রার্থনা করছি আত্ম-গোপনকারী কু মন্ত্রনা দাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রনা দেয় মানবের অন্তরে জ্বীন ও মানুষের মধ্য থেকে।" (আল-কোরআন ১১৪:১-৫)।

ওপরের উদাহরণটি কেন তুলে ধরা হয়েছে? যে কোন কারণে কিংবা যে কোন ভাবেই হোক সকল গ্রন্থই ভগবানে আশ্রয় নিতে শিক্ষা দেয় বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। কিন্তু কোন সূত্রই ফল দেবে না যদি না ভগবানে বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

ভগবানে বিশ্বাস অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পরমেশ্বর ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে সকলকে আহ্বান করা হয়। তবেই সকল সূত্র কাজ করবে নচেৎ নয়। ভগবানে বিশ্বাস রেখে, তাঁকে একমাত্র আশ্রয় জেনে, তাঁর ওপর ভরসা করে জ্ঞানের আলোকে সাধনার মাধ্যমে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

বলা হচ্ছে, এভাবে ভগবানের আশ্রয় নিয়ে জ্ঞান তপস্যার দ্বারা পূত-পবিত্র হয়ে অতীতেও অনেকেই ভগবানের ভাব লাভ করেছেন। কিন্তু ভগবানের ভাব তো অন্তহীন! তাহলে সাধনার দ্বারা কে তাঁর কোন ভাব প্রাপ্ত হবে?

- **৪.১১** ভগবানের রূপ, গুণ, ভাব, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, মহাত্ম অন্তহীন। জীব যে কাজই করুক না কেন কিংবা যে জ্ঞানই অর্জন করুক না কেন বা যে গুণই অর্জনের সাধনা করুক না কেন সবই ভগবান থেকে জাত। জগতের সকল শক্তি, গুণ বা ভাবের উৎস একমাত্র ভগবান। তাহলে ভগবানকে কে কোন ভাবে প্রাপ্ত হবে? বা কে তাঁর কোন স্বভাব বা প্রকৃতিকে অর্জন করবে এবং কিভাবে?

বলা হচ্ছে, যে যেভাবে ভগবানকে ভজনা করে তার সিদ্ধি লাভও তদানুরূপ হয়ে থাকে। এ কথার অর্থ হচ্ছে, তাঁর অন্তহীন ঐশ্বর্য্যের মধ্য থেকে যে যে ভাব বা গুণ অর্জনের সাধনা করে সে সেটা লাভ করে। অন্তরের চাওয়াটি হচ্ছে আসল। অন্তরের চাওয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর প্রার্থনা ও ভজনার মধ্য দিয়ে। অন্তর্যামী হৃদয়ে বাস করেন। তরঙ্গ আঁকারে তাঁর কাছে বার্তা পৌঁছে যায়। তিনি প্রত্যেকের অন্তরের চাওয়াকে জানেন।

যে তাঁর যে ভাব, গুণ বা প্রকৃতি লাভ করতে চায় তিনি তুষ্ট হলে তাকে সেভাবেই পুরস্কৃত করেন। এই লাভ করতে চাওয়াই হল চেষ্টা-সাধনা করা। চেষ্টা-সাধনা করাই হচ্ছে তাঁকে বা তাঁর কোন ভাব লাভ করতে চাওয়ার আন্তরীকতার সত্যিকারের প্রকাশ। যে নিজেকে যেভাবে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে তাঁর ভেতরে সে ভাবই জাগ্রত হয়। মানুষের নিজের ভেতরে শক্তি, সাহস, গুণাগুন ও প্রেরণা সেদিকেই উজ্জীবিত হয়। জীবের সকল প্রকারের চেষ্টা-সাধনাও প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনা বা অন্তরের চাওয়ারই বাস্তব রূপ। তিনি প্রসন্ন হলে এভাবেই কারও চাওয়া অনুসারে তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

বিজ্ঞানসম্মত বিষয়ভিত্তিক যত প্রকারের লেখাপড়া বা সাধনা আছে, বুঝতে হবে যে সেগুলোর মাধ্যমেও মানুষ বস্তুত ভগবানেরই এক একটি কর্ম ও ভাব সম্পর্কে জেনে থাকে এবং যে যেটিতে মগ্ন হয়ে সাধনা করে সে সেটিতেই সফল হয় বা সে ভাব প্রাপ্ত হয়। মানুষের চেষ্টা সাধনাই হচ্ছে তাঁর ভজনা বা প্রর্থনার বহিঃপ্রকাশ।

কেউ গায়ক হতে চায়, কেউ অভিনেতা হতে চায়, কেউ জ্ঞানী হতে চায়, কেউ সম্পদশালী হতে চায়, কেউ বিজ্ঞানী হতে চায়, কেউ রাজনীতিবিদ হতে চায়, কেউ বৈরাগী হতে চায়, কেউ রাধুঁনী হতে চায়, কেউ হিসাববিদ হতে চায়। বিচিত্র এতসব জ্ঞান, গুণ ও ভাব কি ভগবান প্রসূত নয়?

তিনি মানুষের প্রার্থনা বা চাওয়া অনুসারে সেভাবেই তাকে পুরস্কৃত করেন। যে যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ভজনা করে তিনি তেমনিভাবে তাকে সাহায্য করেন। সাধকের ভজনা বা ভক্তির ধরণ তার নিজের ওপরেই ভগবানের কৃপারূপে বর্ষিত হয়।

যে ইহজগত চায় তিনি তাকে সেভাবে দেন। যে পরকাল চায় তিনি তাকেও সেভাবেই তুষ্ট করেন। যে সম্পদ চায় সে তাই পায়। যে জ্ঞান চায় সেও তাই পায়। যেমন বলা হয়েছে,

“যে ইহকাল কামনা করে, আমি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে তাকে তা সত্বর প্রদান করি। ... যারা পরকাল কামনা করে এবং বিশ্বাসী হয়ে সেজন্য চেষ্টা-সাধনা করে এমন লোকদের প্রচেষ্টাও স্বীকৃত হয়ে থাকে।” (আল-কোরআন ১৭:১৮-১৯)

"প্রত্যেক ব্যাক্তি সে যা অর্জন করেছে তার অনুরূপ পুরস্কার পাবে।" (আল-কোরআন ৫২:২১)

জ্ঞানী তাই কিছুমাত্র অবশিষ্ট না রেখে নিজেকে পূর্ণরূপে ভগবানে সমর্পন করেন। যিনি তাঁর প্রতি পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পন করেন তাঁর জন্য ভগবান নিজে কৃষ্ণের মতো রথীর দায়িত্ব নিয়ে নেন। তাঁর ভেতরে তিনি কলুষ সৃষ্টির কারণ নাশ করেন। সদগুণ রক্ষা করেন। তিনি রথী না হলে হাজার চেষ্টায়ও ভজনাকারী পার হতে পারবে না। যেমন বলা হয়েছে,

"তুমি যাকে ভালবাস, চাইলেও তুমি তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবে না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (আল-কোরআন ২৮:৫৬)

ভগবান আত্মা থেকে অভিন্ন হয়ে বা আত্মার সাথে একাত্ম হয়ে সমর্পনকারীকে পথ দেখান। কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে, কতটুকু করতে হবে, কখন করতে হবে সব বিষয়ে তিনি সমর্পনকারীর অন্তরে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে ধীরে ধীরে তাকে তাঁর নিজ স্বরূপে প্রবেশ করিয়ে দেন। সাধক ভজন করেন ঠিকই কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছে দেন তিনি। সবই তাঁর অনুগ্রহ।

অতঃপর বলা হয়েছে যে, বস্তুত সকল মানুষ সর্বতোভাবে আমার পথই অনুসরণ করে। অর্থাৎ বুঝে কিংবা না বুঝে যে যে পথেই যেতে ইচ্ছে করুক না কেন সব ভগবানের পথ। সবই ভগবানের ভাব। গন্তব্য একটাই। কেবল পথগুলি ভিন্ন। যে যেদিকেই গমন করুক পথের শেষে সে তাঁকেই পাবে। তাই বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে তা স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক তাঁর নিকট আনুগত্য প্রদর্শন করে।" (আল-কোরআন ৩:৮৩)।

যদি তাই সত্যি হয় তবে ভগবানকে ছেড়ে কিছু মানুষ অপরাপর দেবদেবীদের উপাসনা করে কেন?

● **৪.১২** কিছু মানুষ মনে করে যে দেবদেবীরা হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন রূপ। তারা মনে করে যে তাদের আরাধ্য দেবদেবীই তাদের জন্য সবকিছু বর্ষন করে। তাই তারা দেবদেবীদের আরাধনা করে।

সত্য হচ্ছে, অধিকাংশ মানুষ ভগবানকে পাওয়ার চেয়েও ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ভোগ-সমাগ্রী বা ক্ষমতা লাভে অধিক আগ্রহী। কামনা-বাসনা দ্বারা মানুষ

ভীষনভাবে তাড়িত। তারা এ জগতেই সকল ঐশ্বর্য্য চায়। ভগবান বা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করে যে সাধনা করতে হয় তারা তা করতে ইচ্ছুক নয়। তারা তাৎক্ষণিক তাদের কাম্য বিষয় বা বস্তু লাভ করতে চায়। তাই দেবতাদের আরাধনা করে। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমরা তো পার্থিব জীবনকেই অধিক ভালবাস এবং পরবর্তী জীবনকে অবহেলা কর।" (আল-কোরআন ৭৫:২০-২১)

"সম্পদের প্রতি ভালবাসায় মানুষ উন্মত্ত!" (আল-কোরআন ১০০:৮)

প্রশ্ন হচ্ছে, দেব-দেবী কারা? দেবদেবীরা হচ্ছেন জড় জগতেরই কোন শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী অথবা পূত-পবিত্র তথা কল্পনার দেবতাতূল্য কোন মানব বা মহামানব। দেব-দেবীরা ভগবানের রূপ নয়। এমনকি দেবতারাও নিরন্তর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন এবং তারাও তাঁকে লাভ করার চেষ্টা করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"যাদেরকে তারা আহবান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।" (আল-কোরআন ১৭:৫৭)

দেবদেবীরা ভগবানের নির্দেশে জড় জগতকে পরিচালনা করার কাজে নিয়োজিত আছেন। সকলে একমাত্র ভগবানেরই আজ্ঞাবহ। কিন্তু সবাই বিষয়গুলিকে সেভাবে বোঝে না। যেমন বলা হয়েছে,

"তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।" (আল-কোরআন ৩০:২৫-২৬)

বাস্তবে দেখা যায় যে, কাম্য কোন বিষয় বা বস্তু লাভের আশায় কিছু মানুষ রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীকে খুশী করার চেষ্টা করে। নেতা-নেত্রী তাদের কাছে দেব-দেবীতুল্য। এভাবে দেখা যায় যে চাওয়ার সাথে সাথে ইহজগতেই তারা নেতার কাছ থেকে আরাধ্য বিষয় বা বস্তু লাভ করতে পারে। তাই বলা হয়েছে যে মনুষ্যলোকে এভাবে দ্রুতই ফল লাভ হয়। তারা তাৎক্ষণিক সবকিছু পেয়ে যায়। পরজীবনের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয় না। দেবতাদের আরাধনাকারীরা এটিকেই পরম প্রাপ্তি বলে মনে করে।

কোন দেবতাকে কিভাবে তুষ্ট করতে হবে বেদে সেসব বিষয়ে বলা আছে। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করা হয়। দেবতারা তুষ্ট হলে কাংখিত বিষয় বা বস্তু লাভ হয় বলে আরাধনাকরীরা বিশ্বাস করে। তাই তারা যজ্ঞ ও বিভিন্ন দেব-দেবীদের পূঁজা-অর্চনা করে। ইহজগতে যারা কর্ম থেকে ফল লাভ কামনা করে তারাই দেব-দেবীদের আরাধনা করে।

সত্য হচ্ছে যে, বেদেরও পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে পরমেশ্বরের পথে নিয়ে আশা। তবে বেদ মানুষের ধরণ অনুযায়ী সুচিন্তিতভাবে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাবস্থাপত্র দিয়েছে। কেননা সব মানুষ একইরকম নয় কিংবা সমজ্ঞানসম্পন্নও নয়। প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এক ঈশ্বর ব্যাতিত অপর কারও আরাধনা করেন না। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমাদের উপাস্য এক। তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।" (আল-কোরআন ২:১৬৩)

"আল্লাহ নিজেই সাক্ষী যে তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতা বা দেব-দেবীগণ এবং সুশিক্ষীত জ্ঞানী মানুষগণও এ বিষয়ে সাক্ষী।" (আল-কোরআন ৩:১৮)

ভগবান সকলের হৃদয়ে বাস করেন। যে যেমন চায় তার হৃদয় তাকে সে পথে নিয়ে যায়। তার নিজের প্রচেষ্টাও সে পথে থাকে। তাই সে তার আরাধ্য বিষয় বা বস্তু তার ইচ্ছের অনুরূপ লাভ করে। নিজের আগ্রহ, নিয়ত ও চেষ্টাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নিজের প্রচেষ্টাকে বেগবান করে ভেতর থেকে পরমেশ্বর ভগবান। বস্তুত নিজেকেই নিজের জাগিয়ে তুলতে হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে নিজেকে সাহায্য করে।" (আল-কোরআন ২২:৪০)

১৩	গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে চতুর্বর্ণ আমিই সৃষ্টি করেছি। তবে আমি তার স্রষ্টা হলেও আমাকে অব্যয় ও অকর্তা বলে জানবে।

● **৪.১৩** ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে বেদ মানুষের ধরণ অনুযায়ী উপাসনার বিভিন্ন প্রকারের ব্যাবস্থাপত্র দিয়েছে। এখানে তাই মানুষের বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বলা হচ্ছে যে, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ভগবান মানুষকে চারটি ধরণে বিভক্ত করেছেন। তার ভিত্তিতে সমাজে চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি হচ্ছে ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

সমাজের সর্বোচ্চ স্তর সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন লোকদের নিয়ে। তাদেরকে ব্রাহ্মন বলা হয়। ব্রাহ্মনেরা সত্ত্বগুণে প্রভাবিত। তারা জ্ঞানের সাধনা করেন। এর পরের স্তর হচ্ছে শাসক বা যোদ্ধা সম্প্রদায়। তাদেরকে বলা হয় ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়রা রজোগুণে প্রভাবিত।

পরের স্তর হচ্ছে ব্যাবসায়ি সম্প্রদায়। তাদেরকে বলা হয় বৈশ্য। এরা রজঃ ও তমঃ গুণের মিশ্রন দ্বারা প্রভাবিত। সর্বশেষে শূদ্র বা শ্রমজীবি সম্প্রদায়। এরা তমগুণে প্রভাবিত। প্রত্যেককে তার ধরণ অনুসারে ভগবানের সেবা বা আরাধনা করে সিদ্ধি লাভ করতে হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"প্রত্যেকের জন্য তাদের কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তারা যা করে সে বিষয়ে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।" (আল-কোরআন ৬:১৩২)

উল্লেখ্য যে, ভগবান চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করলেও তিনি নিজে এসব বিভাজনের অন্তর্ভূক্ত নন। তিনি অব্যয়। তাঁর কোনরূপ ক্ষয় বা বিকার নেই। ফলে তিনি এসবের কোন বিভাজনে পড়েন না। তিনি পরিপূর্ণ। সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ গুণসমুহ তাঁকে প্রভাবিত করে না। তিনি গুণসমুহের অতীত বা উর্ধ্বে। তাই তিনি বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

ভগবানের এসব ভাব সম্পর্কে মানুষকে জানতে হবে। তেমন গুণের অধিকারী হয়ে ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হতে হবে। মুক্তি লাভের প্রয়াসীকে তাই ভগবান সম্পর্কে জানতে হয়। মানব জীবনের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে ব্রহ্মত্ব লাভ করা। ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের নির্গুণ ভাব। মানুষকে সেই স্তরে উন্নীত হতে হবে। তবেই মুক্তি লাভ হবে।

ভগবানের স্বভাব, প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট বিষয়ে অবগত হতে পারলে মানুষ সেটিকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। সে জন্যেই জ্ঞানযোগে ভগবান বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়েছে। ভগবানই লক্ষ্য। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার প্রতিপালক, তিনিই সকল কর্ম বা প্রচেষ্টার মূল বা সর্বশেষ লক্ষ্য।" (আল-কোরআন ৫৩:৪২)

১৪	কোন কর্মই আমাকে লিপ্ত করে না। কর্মের ফলেও আমার কোন আগ্রহ নেই। যিনি আমাকে এভাবে জানেন, তিনি কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।
১৫	মুক্তিকামীগণ অতীতেও এভাবে জেনে কর্ম করেছেন। অতএব তুমিও পূর্ববর্তীদের মতো পূর্বেকৃত কর্ম কর।

• **৪.১৪** স্বরূপে জীবাত্মাও ব্রহ্মভূত। ভগবানের গুণেই গুণান্বিত। ভগবানের ভাব তার ভেতরে বিদ্যমান। কিন্তু জড় প্রকৃতির সংস্পর্শে এলে ত্রিগুণের প্রভাবে তার প্রকৃত জ্ঞান অজ্ঞতা দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং সে স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়।

অপরদিকে ভগবান গুণাতীত। প্রকৃতির ত্রিগুণ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই তিনি ত্রিগুণের প্রভাবে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। কর্মের ফলেও তাঁর কোন আগ্রহ নেই। এমনকি প্রয়োজনও নেই। তিনি এসবের আকর্ষন থেকে মুক্ত। পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন। কোন কর্মই তাঁকে জড়াতে পারে না।

প্রত্যেকের জন্য স্রষ্টা প্রদত্ত কিছু কাজ ও দায়িত্ব আছে। তাই তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় তিনি তাদের স্বর্গে রেখে খাওয়াতে পারতেন। কিংবা মানব সৃষ্টি না করলেও পারতেন। অতএব আরোপিত কাজ ও দায়িত্ব পালন করতে হবে। এখানেই যত সমস্যা।

মানুষ যখনই কোন কর্ম করে তখন সে কর্ম থেকে ফল প্রাপ্তির একটি সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। মানুষ সে ফল ভোগ করতে চায়। এই কর্মফল ভোগের বাসনা থেকে মানুষ জড় জগতে একটির পর একটি কর্মের বন্ধনে আঠার মতো জড়িয়ে যেতে থাকে। তাতে কিছু সুখ ভোগ হয়তবা হয় কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। সকল দুঃখের কারণও সৃষ্টি হয় এখান থেকে।

বন্ধন মুক্ত হতে হলে মানুষকে তাই ভগবান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তাঁর ভাব বা প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। তেমন গুণে গুণান্বিত হয়ে ভগবানের ভাব লাভ করতে হবে। জীবাত্মাকে স্বরূপে ফিরে যেতে হবে। তবেই মুক্তি মিলবে। তিনিই লক্ষ্য।

যিনি পারমার্থিক তত্ত্ব বিষয়ে অবগত এবং যিনি ভগবানকে জানেন তিনি কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি জানেন। তাই বলা হয়েছে যিনি আমাকে এভাবে জানেন অর্থাৎ এই তত্ত্ব যিনি বোঝেন তিনি বন্ধনে আবদ্ধ হন না। সত্য হচ্ছে, তত্ত্ব জানলেই বন্ধন মুক্ত হওয়া যায় না।

তত্ত্ব জানতে হবে, বিশ্বাস রেখে সে জ্ঞান অন্তরে ধারণ করতে হবে এবং তা অর্জনে আগ্রহের সাথে সাধনা করতে হবে। তবেই অর্জনের যোগ্য বিবেচিত হবেন। সাধনায় সফল হলে কোন বন্ধনই আর আটকাতে পারবে না। বস্তুত কর্ম তথা সাধনা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। তাই সচেষ্ট হয়ে অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। তেমন মানসিকতা থাকতে হবে।

- **৪.১৫** অতীতে যারা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করেছেন এবং সফলতা লাভ করেছেন তারা এ জ্ঞানেই কর্ম, আচরণ বা সাধনা করে মুক্তি লাভ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পূর্বে যে বা যারা যেভাবে কর্ম করে সফল হয়েছেন তাঁকেও তাদের মতো কর্ম করতে উপদেশ দিচ্ছেন।

তিনি তাঁকে কর্ম, নিয়তকর্ম বা স্বধর্ম পরিত্যাগ করে তথা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রচলিত অর্থে সন্ন্যাসী না হয়ে, ভগবান সম্পর্কে জেনে সে জ্ঞানে অহঙ্কার পরিত্যাগ করে, দেহে অকর্তারূপে অধিষ্ঠিত থেকে কর্ম করতে বলছেন। তবেই সত্যিকারের মুক্তি মিলবে।

যন্ত্রনার এই অশুভ সংসার বন্ধন থেকে কর্মত্যাগ নয় বরং কর্মই জীবকে যথাযথভাবে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু কোনটি কর্ম, কোনটি অকর্ম সেসব ভালভাবে না বুঝলে ভূল কর্ম করার সম্ভাবনা আছে। তাই কর্ম কি, অকর্ম কি কিংবা বিকর্মই বা কি কর্মবিষয়ক তত্ত্ব ভালভাবে জেনে কর্ম করতে হবে? এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৬	কর্ম কি, অকর্ম কি এ বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যাক্তিগন পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে যান। তাই কর্ম কি তা আমি তোমাকে বিধৃত করব, যা জেনে অশুভ অবস্থা থেকে তুমি

	মুক্ত হবে।
১৭	কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম সম্পর্কে সকলেরই ভালভাবে জানা উচিত। কেননা কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝা অত্যান্ত কঠিন।
১৮	যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন; মানুষের মধ্যে তিনি অত্যান্ত বুদ্ধিমান। তিনি সর্বকর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও যোগেযুক্ত।

- **৪.১৬** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কোনটি কর্ম আর কোনটি অকর্ম এটি বোঝা খুব সহজ বিষয় নয়। এমনকি বুদ্ধিমান ব্যাক্তিগণও বিষয়গুলি নির্ণয়ে বিভ্রান্ত হন। সঠিক বা যথাযথ কর্ম নির্ণয়ে ব্যার্থ হলে প্রচুর পরিশ্রম হবে, অনেক কর্ম হবে, অনেক ব্যায় হবে কিন্তু দেখা যাবে যে ফলাফল শূন্য বা পরিণাম অশুভ। তাই কর্ম কি, যথাযথ কর্ম কোনটি ভালভাবে বুঝতে হবে। বুঝে চলতে জানলে কর্মই অশুভ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করবে। উল্লেখ্য যে, এখানে অকর্ম অপকর্ম অর্থেই ব্যাবহৃত হয়েছে।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, কেবল জানলে বা জ্ঞান লাভ করলেই অশুভ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এ জানার অর্থ হচ্ছে, যখন কারও ভেতরে সে জ্ঞান প্রবেশ করে, যখন কেউ বিষয়গুলি সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তখন সে আপনা থেকে ভূল কর্ম পরিত্যাগ করে সঠিক কর্ম বেছে নেয়। সঠিক কর্ম করলে বিধাতার বেঁধে দেয়া সূত্র অনুসারে যে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারে। সে কারণে শাস্ত্রের বিধান মেনে চলতে হয়। কেননা কোন শাস্ত্র কখনও অপকর্ম করতে বলে না। সঠিক পথ প্রদর্শন করে। কেবল সঠিকভাবে বিষয়গুলি বুঝতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর যথাযথভাবে। তিনি তোমাদেরকে দেবেন ভাল ও মন্দের পার্থক্য নিরূপন ক্ষমতা এবং তোমাদের মন্দ ভাবনা ও কর্ম থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবেন। তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহর অনুগ্রহ অসীম।" (আল-কোরআন ৮:২৯)

- **৪.১৭** জড় জগতের অশুভ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে কর্ম করতে হবে। তাহলে যথাযথ কর্ম কোনটি সেটি বুঝতে হবে। কেননা অকর্মও কিন্তু কর্ম। তাই কর্মের পাশাপাশি অকর্ম কি, বিকর্ম কি সেসবও বুঝতে হবে।

একই কাজ দু'জন দু' উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে করতে পারে। তাহলে কর্ম কোনটি বা অকর্ম কোনটি কিভাবে বোঝা যাবে? কোনটি কর্ম, কোনটি অকর্ম কিংবা বিকর্ম কোনটি এগুলিকে তাই যথাযথভাবে বুঝতে হলে কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। কেননা এগুলির যথার্থতা কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। কিন্তু কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝাও খুব সহজ না।

উদাহরণস্বরূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা বলা যেতে পারে। এখানে দু'পক্ষ একই কর্ম করছে। অর্থাৎ যুদ্ধ করছে। এখানে কর্ম কোনটি এবং অকর্ম কোনটি? সেটি বুঝতে হলে অবশ্যই কর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা নিয়তটিকে বুঝতে হবে। কর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথেই কর্মের ভাল-মন্দ বা কর্ম-অকর্ম বিষয়টি সম্পর্কিত। কিন্তু সেটি বোঝাও সবক্ষেত্রে সহজ হয় না। ফলে কর্ম ও অকর্ম বোঝাও সহজ বিষয় না।

- **৪.১৮** কর্মে অকর্ম দর্শন, অকর্মে কর্ম দর্শন এ কেমন কথা? এও কি সম্ভব? হয়ত সম্ভব তা না হলে এভাবে বলা হল কেন? আচ্ছা একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদাহরণই তুলে ধরি।

উভয় শিবিরে লোকজন কর্ম করছে; প্রচুর পরিশ্রম করছে, ব্যায় হচ্ছে। আসলে কি তারা কোন কর্ম করছে? আরও ভালভাবে বললে তারা কি কোন সঠিক বা যথাযথ কাজ করছে? তারা আসলে অকর্ম করছে। অথচ অকর্মের মধ্যেও তারা যথেষ্ট কর্ম করছে। যদিও তা যথাযথ কর্ম নয়। কেননা এ কর্মের পরিণাম প্রকৃতপক্ষে অশুভ। যদিও আরেক অর্থে শুভ।

যে স্বরূপ ও স্বভাব নিয়ে প্রত্যেকে এ জগতে আগমন করেছিল সেটি ছিল সহজ-সরল, আনন্দময় ও পবিত্র। ব্রহ্মভূত। কিন্তু জড় প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো কিংবা তমোগুণ তাদের প্রকৃত স্বরূপ ও জ্ঞানকে মোহাচ্ছন্ন করেছে। অহমবোধ, জড় জাগতিক মায়া ও বিষয় বাসনা তাদেরকে প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করেছে। জগতের বন্ধনে ভীষণভাবে আবদ্ধ করেছে। তারা এখন এখানে আধিপত্য বিস্তার কিংবা টিকে থাকার লড়াইয়ে ব্যাস্ত। যেন এ জগত ছেড়ে কোনদিন আর ফিরে যাবে না। চিরদিন এখানে থেকে যাবে। অথচ জন্ম লাভের দু'দিন পূর্বেও তাদের মধ্যে এসব ভাবনা বা বোধ কিছুই ছিল না।

যুদ্ধের কারণে উভয় শিবিরের প্রতিটি সদস্য অসম্ভব রকম কর্মব্যাস্ত। প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম করছে। প্রত্যেকেরই কর্মের নিজস্ব 'টার্মস অব রেফারেন্স' বা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা আছে। প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। অথচ তারা সবাই কি যথাযথ কর্ম করছে?

কর্মের মধ্যেও একদল এখানে অকর্ম বা অপকর্ম করছে। অপরদল অকর্মকে প্রতিহত করতে কর্ম করতে বাধ্য হচ্ছে। সে বিবেচনায় সেটি যথাযথ কর্ম। যদিও সেটিও প্রকৃত অর্থে যথাযথ কর্ম নয়। একটি অকর্ম বা অপকর্মকে প্রতিহত করতে তাদেরকেও আরেকটি অকর্মই করতে হচ্ছে। কেননা যুদ্ধ কোন প্রকৃত কর্ম নয়। এটা করতে এখানে কেউ আসেনি, কিংবা এটা করতে এখানে কেউ কাউকে প্রেরণও করেনি। জড় জগতে এসে এ কাজে লিপ্ত হওয়াই হচ্ছে একটি অকর্ম বা অপকর্ম। অজ্ঞতার ফল। মানব সৃষ্টিকালে তাই আশংকা প্রকাশ করে বলা হয়েছিল যে,

"... আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে প্রেরণ করবেন যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার মহিমা বর্ণনা করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি! .." (আল-কোরআন ২:৩০)

জড় জগতে এসে যে ব্যাক্তিটি অপকর্ম করতে ইচ্ছুক নয় সেও এমন কর্মে জড়াতে বাধ্য হচ্ছে। চিরশান্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিয়ে প্রাণান্তকর অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টায় শান্তির অন্বেষন করা হচ্ছে। অথচ তাদের সকলের যথাযথ কর্ম করার কথা ছিল [দ্রষ্টব্য গীতা ৩:৯]।

এমনিভাবে কর্ম ও অকর্ম বোঝা বেশ জটিল বিষয়। সেটি বুঝতে হলে কর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। তাই বলা হয়েছে যে, যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন মানুষের মধ্যে তিনি অত্যান্ত বুদ্ধিমান। কেননা তিনি তত্ত্বের গুঢ়ু রহস্য জানেন।

তেমন বুদ্ধিমান মানুষ দেহ দ্বারা কর্মে লিপ্ত হলেও নিজেকে কর্মের সাথে সম্পৃক্ত করেন না। বস্তুত তেমন মানুষ সর্বদাই যোগে যুক্ত থাকেন। এ রহস্য বোঝার জন্য আত্মতত্ত্ব জ্ঞান জানা থাকা আবশ্যক।

এখানে এক অর্থে একদল কর্ম করছে। অপর দল অকর্ম করছে। যে দল অন্যায় করছে সে দল অকর্ম বা অপকর্ম সৃষ্টি করেছে। অন্যায়কে প্রতিহত করতে যে দল

ন্যায়ের পক্ষে লড়ছে তারা এক অর্থে কর্ম করছে। কেননা তারা সৃষ্টির শৃংখলা রক্ষার্থে ন্যায়ের পক্ষে লড়ছে। সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় আপাত কর্ম করছে। যদিও সেটিও প্রকৃত কর্ম নয়। কিন্তু সে কর্ম করতে তারা বাধ্য হচ্ছে। সে বিবেচনায় কর্ম।

কর্ম ও অকর্ম বা অপকর্ম বোঝার ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়জনিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই ন্যায়-অন্যায় বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ণয়ও কিন্তু সবক্ষেত্রে সহজ নয়। তাই কর্ম-অকর্ম বোঝা বা নির্ধারণ করাও সহজ না।

সৃষ্টির শৃংখলা রক্ষার্থে ন্যায়ের পক্ষে কিংবা শাস্ত্র বিহিত কর্ম করাই হচ্ছে এক অর্থে যথাযথ কর্ম। এমন কর্মই ভগবানের সেবা করা নামে পরিচিত। কেউ বলেন আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা বা আল্লাহর রাহে বা রাস্তায় কাজ করা। তাই যজ্ঞের কর্মই হচ্ছে প্রকৃত কর্ম। এ জ্ঞানের বিপরীতে করা সকল কর্ম তথা অবিহিত কর্ম হচ্ছে অকর্ম। অর্থাৎ কর্ম অথচ প্রকৃত কর্ম নয় বা অপকর্ম।

যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী বন্টনে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বাহিনী কৌরবদের পক্ষ হয়ে লড়াই করছে। অথচ শ্রীকৃষ্ণ নিজে পান্ডব সেনানায়ক অর্জুনের রথের সাঁরথী হয়ে কাজ করছেন। তিনি কোন পক্ষ নন। তিনি কারও হয়ে কর্ম করছেন না। অথচ তিনিও কর্ম করছেন। যুদ্ধে তাঁর কোন স্বার্থ নেই। কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোন ফলাফল প্রাপ্তি নেই। আবার তিনি যুদ্ধে নিবৃত থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। এমন কর্মই বিকর্ম।

বিকর্ম হচ্ছে কর্ম অথচ কর্মহীনতা বা কর্মশূন্যতার একটি ভাব; অর্থাৎ কর্ম করা সত্ত্বেও কোন কর্ম সম্পাদিত হয়নি তেমন একটা অবস্থা। যে কর্মে প্রবৃত্ত হলে কর্তার কোন ফল লাভ হয় না, আবার নিবৃত থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। তেমন কর্মই বিকর্ম। অনুগামীদের মঙ্গলের জন্য তেমন কর্ম করা হয়। এরূপ কর্মও বিশুদ্ধ হয়।

কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম এসব ক্ষেত্রে বোঝার বিষয়টি হচ্ছে কিভাবে কর্ম করলে বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায় সেটি। কিভাবে অকর্মের ফলও ভস্ম হয়ে যায় বা দুর্গতিপূর্ণ হয় না এবং বিকর্মে আদৌ মুক্ত হওয়া যায় কিনা সেসব বোঝা। সে দিক নির্দেশনাই পরের শ্লোকগুলিতে দেয়া হয়েছে।

১৯	যার সকল কর্ম প্রচেষ্টা ফলভোগের বাসনা ও আমিত্বভাব বর্জিত, যার সকল

	কর্ম জ্ঞান নামক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে- জ্ঞানীরা তাঁকে পন্ডিত বলে জানেন।
২০	তিনি কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে সর্বদা তৃপ্ত। কারও আশ্রয় কামনা করেন না। কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও তিনি কিছুই করেন না।

● **৪.১৯** অগ্নি সবকিছুকে ভস্মীভূত করে দেয়। কিছুই অবশিষ্ট রাখে না। কর্মও তেমনই ভস্মীভূত হয়। কর্ম ভস্মীভূত হয় জ্ঞান নামক অগ্নি দ্বারা। জ্ঞানকে এখানে অগ্নির সাথে তুলনা করা হয়েছে। জ্ঞান কর্মকে এমনভাবে ভস্মীভূত করে যে সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেখানে কোন কর্ম সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে হবে না। কর্মের সব ফলাফল নিঃশেষ হয়ে যায়। তেমন কর্মে ভল-মন্দ, পাপ-পূণ্য কোন ফলাফল সঞ্চিত হয় না। কর্ম বিকর্মে পরিণত হয়।

কোন জ্ঞানে কর্ম করলে ফলাফল এভাবে দগ্ধ হয়? এ জ্ঞান হচ্ছে আত্মতত্ত্ব ও পারমার্থিক জ্ঞান। যে জ্ঞান নিজেকে ও ভগবানকে বুঝতে এবং ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ককে বুঝতে সহায়তা করে।

বোধসম্পন্ন মানুষ উপলব্ধি করেন যে একসময় জগতে ছিলাম না। নিজেকে নিজে সৃষ্টি করিনি। নিজের ইচ্ছেতেও জগতে আসিনি। তাহলে সবকিছুর পেছনে কে? কেউ একজন আছেন যিনি সবকিছু করেছেন। তাঁকে ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহ কিংবা গড বলছি। তাহলে তিনিই সবকিছুর পেছনে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই প্রেরণ করেছেন। তাহলে কর্ম নিজের হয় কি করে?

কর্ম তাঁরই কারণে। জীবন তাঁর জন্য। জগত তাঁর। দেহ ছিল না, চেতনা ছিল না, জ্ঞান ছিল না সব তাঁরই অনুগ্রহ ও দান। অতএব কর্ম ও কর্মের ফলও তাঁরই জন্য। নিজের জন্য কিছুই না। এ জ্ঞানে সত্যিকার অর্থে জ্ঞানান্বিত হলে কর্মের ফলভোগের লোভ বা বাসনা এবং অহঙ্কার বা নিজের ভেতরের আমিত্বভাব কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সব দগ্ধ হয়ে যায়। যেমন শিক্ষা দেয়া হয়েছে,

“বল: আমার উপাসনা, আমার আরাধনা; আমার উৎসর্গ, আমার যজ্ঞ বা ত্যাগ; এবং আমার বেঁচে থাকা ও আমার মরণ সব আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্ব-জগতসমুহের প্রতিপালক।” (আল-কোরআন ৬:১৬২)

এমন জ্ঞান ও বোধের কারণে নিজ কর্মের ফলভোগের বাসনা ও আমিত্ববোধ যাদের দুর হয়েছে তাদেরকে সকলে পন্ডিত বলে জানেন। তাদের জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত। এমন মানসিক অবস্থার ফলাফল কি?

• **৪.২০** কর্মের ফল ভোগের বাসনা, কর্ম থেকে উৎপন্ন লাভের ভাগ ও তার অধিকার এমনসব ভাবনাই মানুষকে উপদ্রব করে; জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং সুখ ও শান্তি বিনষ্ট করে।

কোথায় কম হলো, কে বেশী পেল, কোনটি হাতছাড়া হয়ে গেল, কে লুটে নিল ইত্যাকার নানান চিন্তা ও হারানোর ভয় এবং তা উদ্ধার ও পুনরুদ্ধারে বা রক্ষায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাকার নানান বিষয় মানুষকে জড় জগতে ভীষনভাবে ব্যাতিব্যাস্ত করে রাখে বা বন্ধনে আবদ্ধ করে।

যিনি কর্ম করেন কিন্তু ফলভোগের বাসনা ত্যাগ করেন, ক্ষণস্থায়ী জাগতের ইত্যাকার অপ্রয়োজনীয় পিছুটান তাঁর থাকে না। তিনি ঝামেলা ও যন্ত্রনামুক্ত থাকেন। যোগক্ষেমার্থে তাঁর কারও আশ্রয়ও কামনা করতে হয় না। তিনিই মুক্ত, তিনিই স্বাধীন। অন্তরে তিনি সর্বদা সুখ অনুভব করেন।

যিনি বোঝেন যে এ জগত তার নয়, তার জন্ম বা সৃষ্টিও তার নিজের নয়, এ ভূমিও তার নয়, দু'দিন পূর্বেও এসব নিয়ে তার কোন মাথাব্যাথা ছিল না- জগতের সকল কিছুই তাঁর যিনি সবকিছুর মালিক; নিজের কর্মটিও প্রকৃতির প্রভাবে তাঁর দ্বারাই পরিচালিত; কিছুই নিজের না, দু'দিন পর আবার কিছুই নিজের থাকবে না- বিষয়গুলিকে যিনি এভাবে দেখেন তিনি দেহগতভাবে সকল কর্মে প্রবৃত্ত হলেও অন্তরগতভাবে কিছুই করেন না। তিনি জড়দেহ দ্বারা কৃত কর্মের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন না। অকর্তা হয়ে কেবল দর্শক ও স্বাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকেন। আরও বলা হচ্ছে,

২১	যিনি কামনাশূন্য, সংযত চিত্ত, সকল প্রকার আধিপত্য ও অধিকারভূক্তির প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করেছেন কেবলমাত্র শরীর দ্বারা কর্ম করেন তিনি পাপ প্রাপ্ত হন না।
২২	আপনা থেকে যা আসে তাতে যিনি তুষ্ট; যিনি দ্বন্দ্ব ভাবসমুহের অতীত, যিনি

	কারও প্রতি ঈর্ষা পোষন করেন না, সাফল্যে-অসাফল্যে যিনি সমবুদ্ধিসম্পন্ন-কর্ম করেও তিনি কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

• **৪.২১** মন ও বুদ্ধি যার সংযত, ভেতর থেকে বাসনা যার দুর হয়েছে, যিনি আধিপত্য ও অধিকারভূক্তির সকল চিন্তা ও প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করেছেন; বস্তুত তিনি যখন কর্ম করেন তখন তার দেহই কেবল কর্ম করে। কিন্তু তার অন্তর তাতে প্রবৃত্ত হয় না।

কর্ম করেও যিনি মনে করেন যে দেহ কর্ম করছে আমি করছি না, তিনি দেহ ও আত্মার বা আমির পার্থক্য বিষয়ে অবগত। তিনি কর্ম করেও ফলভোগী হন না। আমিত্বভাব ত্যাগ করে করা কর্মই বিকর্মস্বরূপ। যা ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, শুভ-অশুভ কোন ফলই সৃষ্টি করে না। ফলে কর্ম করে তারা পাপ প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ কোন ফলাফল প্রাপ্ত হন না।

কেউ যদি আমিত্বভাব ত্যাগ করে কোন কর্ম করে এবং সেটি অপকর্মও হয়ে যায় তবে সেও ফলভোগী হয় না। কথাটি শুনতে যত সহজ মনে হচ্ছে বিষয়টি বোঝা তত সহজ না। বস্তুত আমিত্বভাব ত্যাগ করা যায় না। আবার যখন ত্যাগ করা সম্ভব হয় তখন ত্যাগের আনুসঙ্গিক সকল শর্তসমুহ পুরণ হয়ে যায়। তাই তেমন ক্ষেত্রে ফলভোগী হতে হয় না।

বস্তুত যে কর্মে আমিত্বভাব ও বাসনা থাকে না সে কর্ম নিজের লাভের জন্য করা হয় না। সেখানে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির কোন উদ্দেশ্য থাকে না। সেটির পেছনেও সর্ব সাধারণের কল্যাণের একটি ভাবনা বা চিন্তা থাকে। তেমন কর্ম নিজের হয় না। ভগবানের তরে করা কর্মে পরিণত হয়। এমন মানসিকতায় করা আপাতদৃষ্টের অপকর্মও পাপের কারণ হয় না।

• **৪.২২** যার ভেতরে নিজের পাওয়ার কোন বাসনা নেই তিনি কিভাবে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন? তিনি কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। জ্ঞানের কারণে এমন মানুষের ভেতরে আরও যা ঘটে তা হচ্ছে তিনি আপনা থেকে যা আসে তাতেই তুষ্ট থাকেন। তিনি মনে করেন যা দেয়ার ভগবানই দেবেন; যেমন তিনি জীবন দিয়েছেন, ভূমিতে অবস্থান করার ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন, না চাইতেই আলো-বাতাস সব দিয়েছেন; ভাবেন এতটুকুও কি আমি পেতাম? এমনকি কি চাইতে হবে সে জ্ঞানও

কি আমার কখনও ছিল? সবই তো তিনিই দিয়েছেন। বুদ্ধিদীপ্ত এত এত জ্ঞানও তো তাঁরই দান। যিনি বিষয়গুলিকে এভাবে বোঝেন তিনি ভগবানে পূর্ণ ভরসাকারী। তার ভেতরে আমিত্বভাব দুর হয়ে যায়। কর্ম করেও তিনি কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। কেননা তার করা কর্ম তার নিজের জন্য নয়।

যিনি সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ এমনতর যে কোন প্রকার বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্ব ভাবসমুহের অতীত, ভাল-মন্দ কোনকিছুই তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। ফলে কোন প্রকার ভাব তাকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না। যদিও তিনি সচেতন তথাপি তিনি উদাসীন বা নির্বিকারের মতো থাকেন। সাফল্যে-অসাফল্যেও তিনি সমবুদ্ধিসম্পন্ন হন। না অতি আনন্দে উচ্ছসিত হন, না হতাশ হন। অবিচল থাকতে জানেন। এমন জ্ঞান ও মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ কারও প্রতি ঈর্ষা পোষন করেন না। কেননা তার এসবে প্রয়োজন নেই। তিনি সব ভাবের স্রষ্টা ভগবানের সাথে অন্তরে সরাসরি সম্পর্ক বজায় রাখেন। প্রকৃতির ত্রিগুণ তাদেরকে বিচলিত করে বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না। তাহলে এ ধরণের মানুষের দ্বারা করা কর্মের পরিণতি কি?

২৩	আসক্তিবিহীন, প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত ও আধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে ব্যাক্তি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কর্ম করেন তার সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয়।
২৪	যিনি ব্রহ্ম ভাবনায় মগ্ন নিশ্চিতভাবেই তিনি ব্রহ্মলোকে উন্নীত হবেন। কেননা তাঁর সকল কার্যকলাপের লক্ষ্য ব্রহ্ম। অতএব তাঁর দ্বারা যা কিছু নিবেদিত হয় তা ব্রহ্মতেই বিলীন হয়।

● **৪.২৩** জ্ঞান সকল কর্মকে ভস্মীভূত করে দিতে পারে। সে কর্মে তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কর্ম সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় বা লয় প্রাপ্ত হয়ে বিলীন হয়ে যায়। কর্ম তখন কর্মহীন বা কর্মশূণ্য রূপ ধারণ করে। এ কথার অর্থ কি?

সকল কর্মই ভাল বা মন্দ কিছু একটা ফল প্রদান করে। কিন্তু কেবলমাত্র সঠিক জ্ঞানে করা কিছু কর্ম ফলাফল প্রদান করে না। ফলে সে কর্ম থেকে যেমন কোন পূণ্য লাভ হয় না, তেমনি পাপও হয় না। কর্ম পাপ-পূণ্য কোন ফলই প্রদান করে না। কর্ম হয় নিরাপদ। কি সেই জ্ঞান?

সে জ্ঞান হচ্ছে আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক জ্ঞান। আত্মতত্ত্ব ও ভগবান সম্পর্কিত জ্ঞান। পূর্বেও এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হলে মানুষ বুঝতে পারে যে সবকিছুর মূলে ভগবান এবং তাঁকে লাভ করাই হচ্ছে জীবনের মূল লক্ষ্য। তখন জড় জগতের অসারতা বুঝতে পারা যায়। যেমন বলা হয়েছে,

"জেনে রেখ, ... পার্থিব জীবন এক মরিচীকা বৈ আর কিছু নয়।" (আল-কোরআন ৫৭:২০)

"এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো আর কিছুই নয়। পরকালের আবাস সেটিই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত।" (আল-কোরআন ২৯:৬৪)

গভীরের রহস্য যখন উপলব্ধ হয় তখন জাগতিক বিষয়ে আসক্তি দুর হয়ে যায়। জাগতিক আসক্তি দুর হলে প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তখনই মানুষ বুঝতে পারে যে, যার কারণে জগত প্রতিষ্ঠিত জগতের সকল কর্ম তাঁরই কারণে। আর কোন কর্মই সত্যিকারের কর্মরূপে বিবেচিত নয় বা হতেও পারে না। কেবল নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য কেউ কাউকে জগতে প্রেরণ করেনি। তার প্রয়োজনও নেই। অতএব যজ্ঞই হচ্ছে জীবের একমাত্র কর্ম।

যজ্ঞের কর্মটা কি? যজ্ঞের কর্ম হচ্ছে ভগবানের কারণে করা কর্ম। ভগবানের সেবার মানসিকতা নিয়ে করা কর্ম। ভগবানকে তুষ্ট করার জন্য করা কর্ম। মন যখন সর্বতোভাবে ভগবান বা আল্লাহর ভাবনায় মগ্ন হয়ে সেই চেতনায় কর্ম করে তখন সেটিকেই 'যজ্ঞ' বলা হয়।

ভগবানের জন্য করা কর্ম বলতে কি বুঝব? অন্তর থেকে স্বার্থ, লোভ বা ফল প্রাপ্তির বাসনা ত্যাগ করে জীবন ও জগতের কল্যাণার্থে করা কাজ হচ্ছে ভগবানের জন্য করা কর্ম। ভগবানের জন্য করা কর্মে স্বার্থ, লোভ বা ফলভোগ সব ত্যাগ করা হয়। তাই যজ্ঞ হচ্ছে ত্যাগ বা উৎসর্গ। যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কর্মই হচ্ছে যথাযথ কর্ম।

এমন কর্ম মানুষকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়। বস্তুত জগতে যজ্ঞই একমাত্র কর্ম। এর অতিরিক্ত সবই হচ্ছে বন্ধনের কারণ। এটিকেই আল্লাহর রাস্তায় বা রাহে করা কর্ম বলা হয়।

সত্য হচ্ছে, সর্বত্র সকল ধারণাগুলি সবই এক। ধর্ম বিষয়ে সামাজিক ত্রুটিগুলির কারণ নিহিত বস্তুত মানুষের অজ্ঞতায় কিংবা কিছু মানুষের সত্যকে বুঝতে না দেয়ার মানসিকতায়।

যে ব্যাক্তি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে কর্ম করেন তার সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সেটি কর্তার ওপরে ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য কর্ম ফলের কোন প্রভাব ফেলে না। ফলে তেমন কর্মে পাপ বা পূণ্য কিছুই হয় না। কর্ম বিকর্মে পরিণত হয়। তার সকল কর্ম যজ্ঞময় হয়ে যায়। তাই এভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে,

"বল: আমার উপাসনা, আমার আরাধনা; আমার উৎসর্গ, আমার যজ্ঞ বা ত্যাগ; এবং আমার বেঁচে থাকা ও আমার মরণ সব আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্ব-জগতসমুহের প্রতিপালক।" (আল-কোরআন ৬:১৬২)

গীতার আলোচনা করতে গিয়ে কোরআন থেকে কেন উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে? স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উপস্থাপনায় পার্থক্য থাকলেও মূল বক্তব্য বা ধারণাগুলি সর্বত্র এক এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরার জন্য উদ্ধৃতিগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

পরমেশ্বরের কারণে উৎসর্গীকৃত কর্ম বা ত্যাগই হচ্ছে যজ্ঞের কর্ম। জীবন ও জগতের টিকে থাকার পাশাপাশি যজ্ঞের কর্ম আমাদের নিজেদেরকেও বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। যজ্ঞ করা তাই সকলের জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্যরূপে বিবেচিত। যজ্ঞের চেতনায় যখন কর্ম করা হয় তখন সবকিছু ব্রহ্মময় বা আল্লাহময় হয়ে ওঠে। সেখানে ভাল-মন্দ ফল সঞ্চিত হয় না বলে সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয় বলে বলা হয়েছে।

• **৪.২৪** যিনি ব্রহ্ম ভাবনায় মগ্ন, ব্রহ্ম ভাবনায় কর্ম করেন তিনি নিশ্চিতভাবেই ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। কেননা তাঁর সকল কর্মই যজ্ঞময়। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্ম। বস্তুত যে যেমন লক্ষ্য বা প্রত্যাশা নিয়ে সাধনা করে সে তাই প্রাপ্ত হয়। ভগবান তুষ্ট হলে তাঁকে সেভাবেই পুরস্কৃত করেন। বাস্তবেও আমরা তাই হতে দেখি। যে যা পেতে চায় কিংবা হতে চায় তার সাধনা সে পথেই হয় এবং সে তাই পায় বা হয়। তাই কেউ ডাক্তার হয়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয় ইত্যাদি।

যার কর্ম ব্রহ্ম ভাবনায় সম্পন্ন হয়, যিনি সবকিছুতে ব্রহ্মকে দর্শন করেন, যিনি ব্রহ্ম ব্যাতিত আর কিছুই ভাবতে পারেন না তেমন মানুষের প্রাপ্তিযোগ্যও ব্রহ্মই হয়। তাঁর দ্বারা নিবেদিত সকল কিছু ব্রহ্মতে বিলীন হয়। তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

জড় জগতে পতিত হলে জীবের শুদ্ধ চেতনা ত্রিগুণের প্রভাবে অজ্ঞতা দ্বারা আবৃত হয় এবং জীব স্বরূপ থেকে বিচ্যূত হয়। যত বেশী কাজ পরমেশ্বর ভগবানের ভাবনায় করা হয় ততই 'ব্রহ্ম'ত্ব লাভ হয়। মনুষ্যত্বের পরবর্তী সোপানই হচ্ছে ব্রহ্মত্ব লাভ করা।

ব্রহ্ম হচ্ছে পারলৌকিক পরিবেশ বা প্রকৃতি। ভগবান থেকে নির্গত রশ্মিচ্ছটা হচ্ছে 'ব্রহ্মজ্যোতি'। বিশ্ব চরাচরের সবকিছু এই ব্রহ্ম জ্যোতিতে অবস্থান করছে। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি ... জ্যোতির পরে জ্যোতি!" (আল-কোরআন ২৪:৩৫)

ব্রহ্ম ভাবনায় কর্ম করলে সব 'ব্রহ্মময়' বা 'আল্লাহময়' হয়ে ওঠে। ব্রহ্ম ভাবনায় করা সকল কর্মই হচ্ছে যজ্ঞ। তথাপি দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মচর্যযজ্ঞ, গার্হস্থ্যযজ্ঞ, ইন্দ্রিয়যজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ যজ্ঞের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এ সকল যজ্ঞ পালনের সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধানও রয়েছে। সকল যজ্ঞের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহর সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (আল-কোরআন ১১:৪)

পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিধি অনুসারে কিছু যজ্ঞের উদাহরণ তুলে ধরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৫	কোন কোন যোগী যজ্ঞের মাধ্যমে এভাবে দেবতাদের পূঁজা বা উপাসনা করেন। আবার তাদের কেউ কেউ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে নিবেদন করার মাধ্যমে যজ্ঞ করেন।
২৬	কেউ কেউ সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়সমুহকে আহুতি দেন, আবার অনেকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেমন শব্দকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

২৭	অন্যেরা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্মসমুহ ও প্রাণ-বায়ুর কার্যকলাপ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে আত্মসংযমরূপ যোগের অগ্নিতে আহুতি দেন।
২৮	কেউ কেউ দ্রব্য দানরূপ যজ্ঞ করেন, কেউ কেউ তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন, আবার কেউ যোগরূপ যজ্ঞ করেন; দৃঢ়ব্রত যত্নশীল ব্যাক্তিগন বেদাভ্যাস ও বেদ অধ্যায়নরূপ যজ্ঞ করেন।
২৯	অনেকে অপান বায়ুতে প্রাণ বায়ু এবং প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ু আহুতি দেন; কেউ আবার মিতাহারী হয়ে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করে প্রাণায়াম পরায়ন হয়ে ইন্দ্রিয়সমুহকে প্রাণসমুহে আহুতি দেন।

• **৪.২৫** জীবাত্মা যে কোন প্রকারে জড় জগতে পতিত হয়েছে। ত্রিগুণের প্রভাবে তার প্রকৃত জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়েছে এবং সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

জীবের অজ্ঞতার আবরণকে ঈশ্বর ভাবনা দ্বারা উন্মোচন করতে হয়। যজ্ঞ হচ্ছে সে উপায়। ঈশ্বর ভাবনায় করা কর্মই হচ্ছে যজ্ঞ। যজ্ঞ করা হয় ভগবানকে পাওয়ার আশায়। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি সব মার্গের একটাই লক্ষ্য। ঈশ্বর প্রাপ্তি। জ্ঞান যখন ঈশ্বরমুখী হয় তখন সেটি হয় জ্ঞানযোগ।

ভগবানকে পাওয়ার আশায় বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে যজ্ঞ পালন করেন। এই শ্লোকে দৈবযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ বা ব্রহ্মার্পণ যজ্ঞ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে পাশাপাশি কয়েকটি শ্লোকে নানাবিধ যজ্ঞের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। একটি হচ্ছে জড় জাগতিক মনোবাঞ্ছনা পুরণার্থে পালন করা যজ্ঞ এবং অপরটি হচ্ছে ভগবানকে পাওয়ার আশায় করা যজ্ঞ।

ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে যে, ‘যিনি ব্রহ্ম ভাবনায় মগ্ন নিশ্চিতভাবে তিনি ব্রহ্মলোকে উন্নীত হবেন।’ কিন্তু যারা ব্রহ্ম ভাবনায় মগ্নতার তেমন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি তারা বিভিন্ন দেবতাদের উপাসনা করার মাধ্যমে যজ্ঞ করেন। অর্থাৎ ভগবানের বিভিন্ন শক্তির উপাসনা করেন। এভাবে তারা নিজেদের ভেতরে শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করেন বা অন্তরে দৈবী সম্পদ বা গুণের সঞ্চার করার চেষ্টা করেন। এটি দৈবযজ্ঞ।

দৈবযজ্ঞের মাধ্যমে হৃদয়ে দৈবী সম্পদ সংগ্রহ করা হয়। সব করা হয় ভগবানকে পাওয়ার আশায়।

কেউ আছে জড় সুখ ভোগের বাসনায় ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ বিভিন্ন দেবতাদের উপাসনা করেন। দেবতারা অগ্নি, বায়ু, জল, বজ্র ইত্যাদি শক্তির দেখভাল করেন। ভগবানই তাদেরকে এসব দায়িত্বে ন্যাস্ত করেছেন। সত্যি বলতে সকল শক্তিই কেবল ভগবান বা আল্লাহর। দেবতা বা ফেরেশেতাদের নয়। তারা ভগবানের আদেশ অনুযায়ী এসব পরিচালনা করেন। জড় জাগতিক সুখ ভোগ করার জন্য বৈদিক বিধি অনুসারে যারা বিভিন্ন যজ্ঞের দ্বারা দেব-দেবীদের পূঁজা করে তারা হচ্ছে 'বহু-ঈশ্বরবাদী'।

কেউ কেউ আবার সকল কর্ম ভগবানে অর্পন করে যজ্ঞ করেন। ভগবানের জ্ঞান ও শক্তি দ্বারা নিজেদেরকে চালনা করেন। এটি জ্ঞানযজ্ঞ বা ব্রহ্মার্পণ যজ্ঞ। জ্ঞানযজ্ঞে আসুরী সম্পদ ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দেয়া হয়।

● **৪.২৬** কেউ কেউ সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়সমুহকে আহুতি দেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমুহকে রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে সংযত ইন্দ্রিয় হয়ে অবস্থান করেন। এটি সংযম যজ্ঞ বা ব্রহ্মচর্য। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে আকর্ষন সংযত করেন। আগুনে যেমন সব ভস্মীভূত হয় সেইরূপ সংযম এক প্রকার আগুন।

শব্দ মনকে আবদ্ধ করে। অর্থাৎ মনকে জড় জগতমুখী করে। তাই কেউ কেউ জড় জাগতিক শব্দসমুহে মনোনিবেশ করেন না। তারা লৌকিক আলোচনা শ্রবন করেন না। মহিমাময়ের গুণ কীর্তন বা তাঁর মহত্ব প্রকাশ ও প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তারা কেবল পরমেশ্বর সম্পর্কিত বাণী শ্রবন করেন। তারা তাদের শ্রবন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমুহকে এভাবে সংযমরূপী অগ্নিতে আহুতি দেন। যেমন বলা হয়েছে,

"জেনে রেখ, যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে আছে, তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে এবং ক্লান্ত হয় না।" (আল-কোরআন ৪১:৩৮)

কেউ কেউ ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সমুহকে আহুতি দেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করছে কিন্তু তিনি নিজে অনাসক্ত থাকেন। এটি ইন্দ্রিয় যজ্ঞ। এই আসক্তি ত্যাগই হচ্ছে বিষয় আহুতি। অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়গুলিকে পরিবর্তন করে

নেন। এখানে ইন্দ্রিয় হচ্ছে অগ্নি। অর্থাৎ বিষয় পরিবর্তন করে নিলে বিষয় উত্তেজক রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ভস্ম হয়ে যায়। মনে কু প্রভাব পড়ে না। সাধক আকর্ষিত হন না। বিষয়গুলিকে গ্রহণ করেন না।

- **৪.২৭** কেউ কেউ সকল ইন্দ্রিয়কর্ম ও প্রাণ বায়ুর কর্মকে ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মসংযম বা সমাধিরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দিয়ে আত্মসুখে মগ্ন থাকেন। এটি আত্মসংযম বা সমাধিযজ্ঞ। আত্মাতে চিত্তকে একাগ্র করার নাম আত্মসংযম যোগ। এটিই সবচাইতে জ্ঞানদীপ্ত যজ্ঞ। কেননা এটি আত্মজ্ঞান দ্বারা সমুজ্জল।

- **৪.২৮** যজ্ঞকে নানাভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে। কেউ দানের মাধ্যমে যজ্ঞ করেন। এটি দ্রব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ সবরকম জড় জাগতিক বিষয়াদিকে এক্ষেত্রে উৎসর্গ করা হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"যে দান করে ও কর্তব্যপরায়ন এবং সত্য ও সুন্দরে বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই! আমি তার পথকে সহজ-সারল্যের দিকে সহজতর করে দেব।" (আল-কোরআন ৯২:৫-৭)

অনেকে কঠোর ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে যজ্ঞ করেন। সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করেন। কেউ উপবাস করেন। কেউ তীর্থ ভ্রমন করেন। অর্থাৎ তারা তপোময় যজ্ঞ করেন। আবার কেউ অষ্টাঙ্গ বা রাজযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে যজ্ঞ করেন। এগুলি যোগযজ্ঞ।

অনেকে বিশেষত উপনিষদ, বেদান্ত সূত্র বা সাংখ্য দর্শন অর্থাৎ বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করেন। এগুলিকে স্বধ্যায় যজ্ঞ বলে। যেমন কেউ বাইবেল পাঠ করে, মুসলিমরা কোরআন পাঠ করে। কাজগুলি একই। যেমন বলা হয়েছে,

"কোরআন পাঠ কর সুপরিমিতভাবে। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্ববহনকারী বাণী।" (আল-কোরআন ৭৩:৪-৫)

- **৪.২৯** এই শ্লোকে প্রাণায়াম যজ্ঞ সম্পর্কে বলা হয়েছে। বহিঃনির্গত বায়ু হচ্ছে নিঃশ্বাস বা প্রাণ। অভ্যন্তরগত বায়ু হচ্ছে প্রশ্বাস বা অপান। যোগে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রনের প্রণালীকে বলা হয় 'প্রাণায়াম'। শ্বাসের সাথে ওঁ নাম জপ করা হয়। কেউ যেমন 'আল্লাহু' নাম জপ করে থাকে। নিয়ম বা বিষয়গুলি একই।

প্রাথমিক স্তরে হঠযোগে বিভিন্ন প্রণালী অভ্যাস করার মাধ্যমে প্রাণায়ামের অনুশীলন করতে হয়। এভাবে ইন্দ্রিয়সমুহকে দমন করে বিষয় আসক্তি দুর করে বন্ধন মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা হয়। পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্যই মূলত এসব করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩০	এই সকল যজ্ঞবিদগণ যজ্ঞের দ্বারা নির্মল হয়ে পাপ থেকে মুক্ত হন; যজ্ঞ অবশিষ্ট অমৃত আস্বাদন করেন ও সনাতন ব্রহ্ম প্রকৃতি লাভ করেন।
৩১	হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞবিহীন ব্যাক্তির ইহলোকই নাই, তো অন্য লোক কোথায়?
৩২	এভাবে বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মের মুখে বিহিত বা বেদে বিবৃত আছে। এ সবই কর্মজাত বলে জানবে। এগুলিকে যথাযথভাবে জেনে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

- **৪.৩০** যজ্ঞ কেন পালন করা হয়? পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য। আনন্দময় ব্রহ্ম পরিবেশ বা প্রকৃতি প্রাপ্তির জন্য। এটিই হচ্ছে ভগবানকে পাওয়া। কিন্তু পাপ হচ্ছে অন্তরায়। জাগতিক বন্ধনের কারণ। পাপের কারণে ব্রহ্ম পরিবেশ লাভ হয় না। মনে শান্তি আসে না।

ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বসনা থেকে অন্যায় ও পাপ কর্মের শুরু। পাপের কারণে জীবাত্মা বারবার জন্ম-মৃত্যু চক্রে পতিত হয় ও ফল ভোগ করে। পাপমুক্ত না হতে পারলে শুদ্ধ ও নির্মল হয়ে পবিত্র হওয়া যায় না। পরিপূর্ণ শুদ্ধ ও পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্ম পরিবেশ বা প্রকৃতি লাভ করা যায় না। যজ্ঞের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সংযম করে যজ্ঞবিদগণ নির্মল হয়ে পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। কোন পরিভাষায় এটিকেই ‘তাকওয়া’ অর্জন বলে। অর্থাৎ পরিপূর্ণ শুদ্ধতার স্তর- ত্রুটিমুক্ত, পবিত্র।

যজ্ঞের ফলে অমৃতরূপ যে প্রাপ্তি ঘটে সেটি হচ্ছে জ্ঞান। এই জ্ঞানই শাশ্বত, সনাতন বা পরব্রহ্মকে পেতে সহায়তা করে। ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে মন যখন সফলভাবে নিরুদ্ধ হয় তখন যজ্ঞের পরিণাম বা ফলাফল বের হয়ে আসে। মানুষের জন্য যজ্ঞের শেষ ফল হচ্ছে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। জ্ঞান নামক সেই অমৃত সৃষ্টি করে যজ্ঞ। জ্ঞানেই মুক্তি। জ্ঞানই মানুষকে নিশ্চিতভাবে তার লক্ষ্যকে চিনতে সহায়তা করে। যে অমৃত পান করলে মানুষ লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়।

সকল যজ্ঞই পাপ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। কেননা মনের ওপর এসব কার্যকলাপের প্রভাব পড়ে। এভাবেও আত্মার উন্নতি ঘটে। বিকশিত আত্মা এমনকি এ জীবনেও ব্রহ্ম প্রকৃতি লাভ করে পরম সুখ আস্বাদন করে। জীবনাবসানে ভগবৎ ধাম প্রাপ্ত হয়।

● **৪.৩১** যজ্ঞ হচ্ছে ত্যাগ। দেবতা ও মানবের একে অন্যের জন্য করা ত্যাগ। পারস্পরিক এ আদান-প্রদানে জগত সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে পরিচালিত হয়। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। এতে সকলের সুখ-সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। তাই যে যজ্ঞ কর্ম করে না সে স্বীয় কর্ম বা দায়িত্ব পালন করে না। সংসার কর্মে যোগ দেয় না। এটিও একটি পাপ। সৃষ্টির সুরক্ষায় যজ্ঞ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। এভাবে দায়িত্ব পালন না করলে ইহলোকেও সুখ লাভ হয় না।

পাপের কারণে যজ্ঞরহিত ব্যাক্তি পুনরায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয় না। অধম যোনিতে প্রবেশ করে। তাই বলা হয়েছে, মনুষ্য লোকের মতো উচ্চতর লোকেই যদি সুখ পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে কি অন্য লোকে সুখ পাওয়া যাবে? যেমন বলা হয়েছে,

"দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং অবশ্যই পরকালের জীবন আরও কঠোরতম।" (আল-কোরআন ১৩:৩৪)

বেদ জড় জগতের যন্ত্রনা থেকে মুক্ত হওয়ার পথ প্রদর্শন করে। মুক্ত জীবনের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ভগবানের সঙ্গ লাভ করা। কেউ বলেন আল্লাহকে পাওয়া। বিভিন্ন রকমের স্বর্গলোকে সুখ ভোগ করার পর্যাপ্ত ব্যাবস্থা রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডলে তোমাদের জন্য আছে জীবনোপকরণ এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু।" (আল-কোরআন ৫১:২২)

ভগবান বা আল্লাহকে পেলে সর্বোচ্চ সুখ লাভ হয়। ভগবানের ভাব বা স্বভাব প্রাপ্ত হলে তাঁকে পাওয়া হয়। বন্ধন মুক্ত হয়ে যে তা অর্জন করতে না পারবে তার প্রকৃত সুখ নেই।

● **৪.৩২** বৈদিক শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ বিষয়ে বলা হয়েছে। মানুষের রকম ভিন্নতা অনুসারে বেদে নানারকম যজ্ঞের ব্যাবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে। এমনভাবে যজ্ঞসমুহের ব্যাবস্থা করা হয়েছে যেন মানুষ তার দেহ, মন ও বুদ্ধির যোগ্যতা

অনুসারে এসবের অনুষ্ঠান করতে পারে। ফলে রকমভেদ সত্বেও প্রত্যেকেই যেন জড়দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

কর্মের মাধ্যমে সৃষ্টি টিকে আছে। জগতের সকল কর্মই যজ্ঞ যখন সেটি ভগবানের ভাবনায় করা হয়। অতএব সকল যজ্ঞ কর্ম থেকে জাত। যজ্ঞ কায়িক, বাচিক কিংবা মানসিক কোন না কোন কর্ম থেকে জাত। কর্মই হচ্ছে ব্রহ্মশক্তি। তাই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়।

কর্ম হচ্ছে সেই ক্রিয়া যা করলে যজ্ঞ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ ভগবান বা আল্লাহর কাছে কর্মটি গ্রহণযোগ্য হয়। যজ্ঞ হচ্ছে আরাধ্যদেব পর্যন্ত পৌঁছানর নির্ধারিত প্রক্রিয়া বিশেষ।

যজ্ঞ হচ্ছে এমন ক্রিয়া যা যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে মোক্ষ লাভ বা পরব্রহ্মে প্রবেশ সম্ভব হয়। দেহ তখন পরব্রহ্মরূপ ধারণ করে। পুরুষ মহাপুরুষে পরিণত হয়। তখন তাঁর আর নিজস্বতা, স্বাতন্ত্রতা বা আমিত্ববোধ থাকে না। তেমন সিদ্ধ পুরুষের মাধ্যমে ব্রহ্মই কথা বলেন।

ব্রহ্ম হচ্ছেন নির্দোষ ও সম বা নিরপেক্ষ। যদি মনও নির্দোষ ও সম হয় তবে মন ব্রহ্মে স্থিত বলে বুঝতে হবে। নিজের মন যতটা সংকুচিত বা প্রসারিত জগতও নিজের কাছে তেমনই বোধ হয়। যজ্ঞের মাধ্যমে বস্তুত ইন্দ্রিয় সংযম করে মনকে জয় করা হয়। তখনই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩৩	হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেয়। কেননা সমস্ত কর্ম পরিশেষে, হে পার্থ! পরিপূর্ণরূপে জ্ঞানে সমাপ্ত হয়।
৩৪	বিভিন্ন যজ্ঞের সেই জ্ঞান গুরুর স্মরণাপন্ন হয়ে তাঁর সেবা করার মাধ্যমে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা কর। তবেই আত্ম-উপলব্ধিসম্পন্ন তত্ত্ব দ্রষ্টাগন তোমাকে উপদেশ দান করবেন।
৩৫	যা জেনে তুমি পুনরায় এই প্রকার মোহাবিষ্ট হবে না, হে পান্ডব! যার দ্বারা তুমি দেখবে যে সকল জীবসমুহ স্বীয় আত্মায় অনন্তর পরমাত্মায় স্থিত।

● **৪.৩৩** বিশ্বাস ও বাসনা অনুসারে যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকার। সকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা। যেমন বলা হয়েছে,

“নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যারাই আছে তারা সবাই আল্লাহর এবং যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁকে উপাসনা করতে অহংকার বোধ করে না; এমনকি পরিশ্রান্তও হয় না। তারা রাত্রিদিন তাঁর মহিমা বর্ণনা করে; ক্লান্ত হয় না।” (আল-কোরআন ২১:১৯-২০)

যজ্ঞ হচ্ছে কর্ম। কিন্তু সে কর্ম হচ্ছে ত্যাগের। কর্ম ভিন্ন কোন যজ্ঞ নাই। যজ্ঞ ভিন্ন সিদ্ধি লাভ হয় না। তবে যজ্ঞের শেষ ফল হচ্ছে জ্ঞান। কেননা সমস্ত কর্ম পরিশেষে জ্ঞানে সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ফল প্রদান করে।

বলা হচ্ছে, সেই যজ্ঞ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ যার ফলে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কেননা এ দু'টি তত্ত্ব বুঝতে পারলে তবেই মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। পারমার্থিক জ্ঞান লাভের আশায় কেউ যখন যজ্ঞ করে সেটি উচ্চতর।

জ্ঞানবিহীন যজ্ঞ মূল্যহীন। তেমন যজ্ঞ লৌকিক ক্রিয়ামাত্র। তাতে পরমার্থ লাভ হয় না। সকল যজ্ঞে কিংবা দ্রব্য যজ্ঞে স্বর্গাদি লাভ হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞ ব্যাতিত মোক্ষ লাভ হয় না।

যজ্ঞের ফলে সাম্যবুদ্ধির উদয় হয়। বাসনা ও আমিত্বভাব দুর হয়। ফলে কর্মের বন্ধন দুর হয়। অর্থাৎ কর্মের ফল জ্ঞান নামক অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়।

● **৪.৩৪** পারমার্থিক উপলব্ধির পথ সহজ নয়। জ্ঞান লাভে তাই এমন মানুষের কাছে যেতে হবে যিনি বিষয়গুলি সম্পর্কে জানেন ও অভিজ্ঞ। পরমেশ্বরই এক অর্থে আদি গুরু। তিনি নিশ্চয়ই সৃষ্টির শুরুতে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান করেছিলেন। যা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। ধর্মের পথ স্বয়ং ভগবান প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করেছেন। সে জ্ঞান যারা ধারণ করেন জ্ঞান অর্জনে তাদের স্মরণাপন্ন হতে বলা হয়েছে।

বলা হচ্ছে, যজ্ঞের সেই জ্ঞান আত্ম-উপলব্ধিসম্পন্ন তত্ত্বদ্রষ্টা বা গুরুর স্মরণাপন্ন হয়ে তাঁর সেবা করার মাধ্যমে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা কর। এগুলি হচ্ছে আচরণগত শর্ত। ভক্তের ভক্তিতে গুরুর অন্তর পরিপূর্ণভাবে তুষ্ট হতে না পারলে সেখান থেকে উদারভাবে জ্ঞানের গুঢ় রহস্য আপনা থেকে বেরিয়ে আসবে না বা আসতে বাঁধাপ্রাপ্ত হবে। ফলে যথাযথ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাবে না। জানতে হলে ভক্তির মাধ্যমে গুরুর তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

● **৪.৩৫** গুরুর উপদেশ যিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন তিনি বিষয় বাসনা ও অহমবোধ দ্বারা আর কখনই মোহাবিষ্ট হবেন না। তিনি দেখবেন যে, এ জগত ভগবান বা আল্লাহময়। সবকিছুকে নিয়ে ভগবান এক ও পরিপূর্ণ। সবকিছু তাঁর মধ্যেই স্থিত। ভগবান ভিন্ন জগতে আর কারও বা কোন কিছুর কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই।

সঠিক জ্ঞান লাভ হলে সর্বত্রই পরমাত্মার দর্শন হয়। জীবসমুহ একই আত্মায় স্থিত এমন উপলব্ধ হয়। আবার যখন সকল প্রাণীর মাঝে একই আত্মার বিস্তার বা প্রসার দেখার সক্ষমতা আসে তখনই একজন সত্যিকারভাবে পরমাত্মায় একীভূত হয়। তখন সকল জীবসমুহ স্বীয় আত্মায় অনুভূত হয়। তেমন অনুভূতিসম্পন্ন ব্যাক্তি অন্যের ব্যাথায় ব্যাথিত হন। অপরের আনন্দে আনন্দিত হন। কেননা তিনি পৃথক কিছু দেখেন না। সকলের ভেতরে একজনকেই দেখেন। একজনের ভেতরেই সকলকে দেখেন। সবকিছুকে নিজের মতো করে দেখেন। অর্থাৎ সাম্যের জ্ঞান লাভ হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালনে যত্নবান হও, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা থেকে এবং এটি থেকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন এর সঙ্গিনীকে এবং তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করেছেন অগনিত পুরুষ ও নারী।" (আল-কোরআন ৪:১)

পরম জ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান যার ফলে জানা যায় যে পরমাত্মাই হচ্ছেন সমস্ত জীবের একমাত্র আশ্রয়। সবকিছু তাতেই স্থিত এবং এক আত্মাই সকলের মধ্যে বিদ্যমান থেকে বিরাজ করছেন। জীব যখন ভগবান সম্পর্কে এভাবে জানতে পারে তখন তার মোহভঙ্গ হয়। আমিত্ববোধ থাকে না। জাগতিক বিষয়ে আসক্তি দুর হয়।

৩৬	এমনকি যদি তুমি পাপীদের থেকেও অধিক পাপী হও, তথাপি এই দিব্য জ্ঞানের তরী দ্বারা পাপজনিত দুঃখের সাগর অতিক্রম করতে পারবে।
৩৭	প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসমুহকে ভস্মীভূত করে, হে অর্জুন! জ্ঞানরূপ অগ্নি তেমনই সকল কর্মকে ভস্মীভূত করে।
৩৮	এ জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্র তেমন আর কিছু নেই। যা যোগসিদ্ধ মানুষ

	সময়ে নিজেই অন্তঃকরণে লাভ করেন।

• **৪.৩৬** সত্যিকারের ভগবান প্রেমী পাপ করেন না। আপাত দৃষ্টিতে তাদের যে কর্ম সাধারণের কাছে পাপ বলে মনে হতে পারে সেগুলি পার্থিব নিয়মের অধীন বলে তেমনটি প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু ভক্ত কখনও কখনও জাগতিক নিয়মের উর্ধ্বে কাজ করেন।

আপাত দৃষ্টিতে দেখা তাদের করা পাপ কাজও মঙ্গলার্থে হতে পারে। দেখা গেল তিনি কাউকে হত্যা করছেন। পাপ কাজ করেছেন। মানুষ এ হত্যা করার কারণ বুঝতে পারছে না। পার্থিব নিয়মে অবশ্যই সেটি পাপ। কিন্তু তিনি যদি বিধাতা প্রদর্শিত সূত্রের মধ্যে কাজ করেন তবে তিনি সে পাপের সমুদ্রও পাড়ি দিতে পারবেন।

অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যা সাধারণের দৃষ্টিতে বা পার্থিব নিয়মে পাপরূপে গণ্য হবে। তবে সবকিছুর ব্যাখ্যা করাও সমীচীন বা জ্ঞানসম্মত নয়। কিংবা সাধারণের জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে। ব্যাতিক্রম সর্বসাধারণ বা সকলের জন্য অনুসরণীয় নয়।

উল্লেখ্য যে, তেমন ক্ষেত্রেও কিন্তু কিছু শর্ত থাকে। যেমন কর্মের নিয়ত সৎ হতে হবে। তেমন কাজে কৃত্রিম কিংবা অকৃত্রিম কোনরূপ অসততা থাকতে পারবে না। অন্যথায় তাঁকেও পাপী হয়ে যেতে হতে পারে। কোন আসক্তি বা লোভের বশবর্তী হয়ে বা নিজের সুবিধা প্রাপ্তির জন্য তেমন কাজ করা যাবে না।

একই কাজ স্বকাম মনোবৃত্তি নিয়ে করা যায় আবার নিষ্কামভাবেও করা যায়। পার্থক্য কেবল জ্ঞানে ও নিয়তে। জ্ঞান ও নিয়তের পার্থক্যের কারণে কোন কাজে পাপ হয়। আবার জ্ঞানের দ্বারা পাপমুক্তি ঘটে। তাই বলা হয়েছে, এমনকি যদি তুমি পাপীদের থেকেও অধিক পাপী হও তথাপি এই দিব্য জ্ঞানের তরী দ্বারা পাপজনিত দুঃখের সাগর অতিক্রম করতে পারবে। জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ্ঞান পাপকে পূণ্যে এবং পূণ্যকে পাপে পরিণত করে দিতে পারে। যেমন বলা হয়েছে,

"তারা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেল, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম বিশেষ জ্ঞান।

মূসা তাকে বলল, ‘আমি কি এ শর্তে আপনাকে অনুসরণ করতে পারি যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?’ সে বলল, ‘তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করে থাকতে পারবে না। যে বিষয়ের জ্ঞান তোমার আয়ত্তাধীন নয় তা দেখে তুমি ধৈর্য্যধারণ করবে কেমন করে?’

মূসা বলল, ‘আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না।’ সে বলল, ‘যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে বিষয়ে তোমাকে কিছু বলি।’ ... অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাৎ পেল তখন সে তাকে হত্যা করল।

মূসা বলল, ‘আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই? নিশ্চয়ই! আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।’ সে বলল, ‘আমি কি বলিনি যে তুমি আমার সাথে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবে না।’” (আল-কোরআন ১৮:৬৫-৭৬)

এভাবে পার্থিব নিয়মানুযায়ী কিছু কর্ম সাধারণের দৃষ্টিতে পাপ বলে মনে হতে পারে। তবে পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত শুদ্ধ ভক্ত কখনও কখনও মনে হতে পারে যে শাস্ত্রের বিধানের বিপরীত আচরণ করছেন। বস্তুত তা নয়। এমনকি অতি বুদ্ধিমান লোকও শুদ্ধ ভক্তের পরিকল্পনা ও ক্রিয়াকর্ম বুঝে উঠতে পারে না।

আরেক প্রকারের পাপ আছে যেটা অজ্ঞতা বা সঠিক জ্ঞানের অভাবে করা হতে পারে। কিন্তু যে মানুষ ভগবান বা খোদা প্রেমী তিনি জ্ঞান লাভের সাথে সাথে যথাযথ স্থানে মুহূর্তেই স্থিতি নিয়ে নেন। তিনিও পাপের সমুদ্র পাড়ি দিতে পারেন। তার অন্তর সঠিক স্থানে স্থিত। জ্ঞানের অভাবে সাময়িক ভূল হতে পারে। জ্ঞান অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন বলা হয়েছে,

“তোমার প্রতিপালক কোন জনপদ অযৌক্তিকভাবে ধ্বংস করেন না, যখন তার অধিবাসীরা অজ্ঞতা হেতু অন্যায় কাজ করে।” (আল-কোরআন ৬:১৩১)

তবে কেবল ওপরোক্ত সূত্রসমুহ বুঝলেই হবে না। মানুষের অন্তর সর্বদিক থেকে যথাযথ হতে হবে। সৎ হতে হবে। হিংসা-বিদ্বেষ থাকলে হবে না। কোনদিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ হওয়া চলবে না। সর্বপরি ভগবান বা আল্লাহর কাছে সে বা তার কর্মটি

গ্রহণযোগ্য হতে হবে। পরমেশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানের ক্যালকুলেশনে হয়তবা একেবারেই বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই ভগবান বা আল্লাহর ওপরে সকল বিচার-বিবেচনার ভার ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ সব বিষয়ে ভগবানে সমর্পিত হতে হবে। এমন মনোভাব জ্ঞানেরই ফল।

বস্তুত জ্ঞান পাপপূণ্যের ধারণা দেয় বা সৃষ্টি করে। জ্ঞান এসবের সঙ্গা দাড় করায়। কোন জ্ঞান কখনও কাউকে পাপী ঘোষনা করে। শাস্তি দেয়। আবার কোন জ্ঞানই সে একই পাপ থেকে উদ্ধার করে। মুক্তি দেয়। জ্ঞানই পাপ-পূণ্যের কারণ।

কোন সমাজে মেয়েদেরকে জড়িয়ে ধরা পাপ। কোন সমাজে ছেলেদেরকে জড়িয়ে ধরা অগ্রহণযোগ্য। মানবসমাজ যেখানে যেমনভাবে বা যে জ্ঞানে গড়ে উঠেছে তেমনই তার ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্যের সঙ্গা ও বিচার। চরম সত্য তাই ঈশ্বরের হাতে।

অন্তর যার পরিচ্ছন্ন, ঈশ্বর ভাবনায় সর্বদা মগ্ন প্রথমত: তিনি জেনে-বুঝে পাপ করেন না। দ্বিতীয়ত: যদি করেও ফেলেন যথাসময়ে যথাস্থানে স্থিত হয়ে যান। তৃতীয়ত: ঈশ্বর সকলের অন্তরকে জানেন তিনি চাইলে যে কাউকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন। তিনি সব পারেন। তাঁর সক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ৩:১৮৯)

• **৪.৩৭** জ্ঞানকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অগ্নি যেমন সবকিছু ভস্মীভূত করে দেয়, জ্ঞান তেমনই সকল কর্মকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। যেমন কোন জ্ঞানই মানুষকে পাপী করে তোলে। আবার কোন জ্ঞানই সেই পাপকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। এমনকি পূণ্যেও পরিণত করে দিতে পারে। সে অর্থে জ্ঞানই মানুষের চালক।

যুগে যুগে কত মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে পাপী জ্ঞান করে। শত শত বছর পর সঠিক জ্ঞান লাভ করার কারণে মানুষ তার অতীত কর্মের ভূল বুঝতে পেরেছে। জ্ঞানই পারে কোন কর্মকে অকর্ম কিংবা কোন অকর্মকে কর্মে বা বিকর্মে পরিণত করে দিতে। অর্থাৎ জ্ঞান যেমন কর্মের ভাল-মন্দ নির্ধারণ করতে পারে, তেমনি সব কর্মকে

ভস্মীভূত করে দিতে পারে। সেখানে কোন কর্মই থাকবে না। কর্মের কোন ফলাফলই অবশিষ্ট থাকবে না।

কোন সমাজে মেয়েদেরকে মুখ ঢেকে চলতে হয়। কোন সমাজে মেয়েরা মুখ না ঢেকেই চলছে। দু'টো সমাজই যার যার মতো ভালভাবে চলছে। কোন সমস্যাই হচ্ছে না। কিন্তু কেন কেউ মুখ ঢাকছে এবং কেন কেউ মুখ ঢাকছে না? জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে।

জ্ঞান আজকের পাপকে পূণ্যে ও আজকের পূণ্যকে পাপে পরিণত করে দিতে পারে। আবার পাপ-পূণ্য সকল কর্ম ও কর্মের ফলকে ভস্মিভূত করে ক্ষয় করে দিতে পারে। কর্ম হবে তখন বিকর্মস্বরূপ বা কর্মশূণ্য। ফলে কর্মে ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য কোন ফল উৎপাদন হবে না। কর্ম তখন বন্ধনের কারণ হবে না। জ্ঞান সবকিছুর আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে। জ্ঞান যেমন পাপ ও পূণ্য নির্ধারণ করে দেয়, একই সক্ষমতায় জ্ঞান কৃত কর্মকেও নিঃশেষ করে দিতে পারে। পাপকে পূণ্যে, পূণ্যকে পাপে পরিণত করে দিতে পারে। কিংবা পাপ-পূণ্য সবকিছুকে ভস্মীভূত করে দিতে। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তাদের মন্দ কাজকে ভাল কাজে রূপান্তর করে দেবেন।" (আল-কোরআন ২৫:৭০)

● **৪.৩৮** জ্ঞানের তাৎপর্য বা মহাত্ম হচ্ছে মর্মার্থ উপলব্ধি করা। মর্মার্থ উপলব্ধি ব্যাতিত কোনকিছু সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয় না। জ্ঞানই মানুষকে কোন বিষয়ে সঠিক ধারণা দিয়ে থাকে। তাই জ্ঞানের মতো এত মহিমান্বিত ও নির্মল আর কিছু হতে পারে না। তাই বলা হয়েছে,

"যাকে বিশেষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করা হয় সে প্রকৃত অর্থেই প্রভুত কল্যাণপ্রাপ্ত। তবে উপলব্ধিবোধ সম্পন্ন মানুষ ব্যাতিত কেউ তা স্মরণ বা শিক্ষা গ্রহণ করে না।" (আল-কোরআন ২:২৬৯)

মানুষের বন্ধনের কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা। মুক্তি লাভের উপায় হচ্ছে জ্ঞান। বিশেষত আধ্যাত্ম জ্ঞান। যোগযুক্ত মানুষ এ জ্ঞান লাভে সাধনা করেন। যথাসময়ে যোগসিদ্ধ মানুষের অন্তকরণে জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। অন্তঃকরণ দৃঢ় ও লব্ধ জ্ঞানে বিশ্বাসী হয়। এটাই আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসীর হৃদয় পরমের সাথে যুক্ত থাকে। আত্মবিশ্বাসই

জ্ঞান থেকে উদ্ভূত সর্বোৎকৃষ্ট ফল। যোগসিদ্ধ মানুষ সময়ে নিজেই অন্তঃকরণে সে জ্ঞান লাভ করেন।

৩৯	শ্রদ্ধাবান, সাধক ও ইন্দ্রিয় সংযত ব্যাক্তিই কেবল এই জ্ঞান লাভ করে। জ্ঞান লাভ করে অচিরেই পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।
৪০	অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন এবং সন্দেহ পোষনকারী ব্যাক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। না ইহলোকে, না পরলোকে তাদের জন্য সুখ আছে।

- **৪.৩৯** কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হলে সে বিষয়ে আগ্রহ ও ভক্তি থাকতে হবে। আগ্রহ ও ভক্তি ছাড়া জ্ঞান লাভ হয় না। সাধনা ভিন্নও জ্ঞান লাভ করা সম্ভব না। আগ্রহ ও ভক্তি ছাড়া সাধনাও করা হয় না। তাই জ্ঞান লাভে আগ্রহ ও ভক্তি থাকতে হবে এবং সাধনাও করতে হবে।

চঞ্চল চিত্তে জ্ঞান লাভ হয় না। কেননা সেক্ষেত্রে জ্ঞান যথাযথভাবে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই ইন্দ্রিয় সংযম করতে হয়। যোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়কে দমন করার পন্থা। তাই যোগে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এ সকল শর্ত পুরণ করে জ্ঞান লাভের যোগ্য হতে হয়।

যোগ্য ব্যাক্তি সাধনায় সফল হলে হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব ও পারমার্থিক জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। জ্ঞান চিন্তা-দুঃশ্চিন্তা জাতীয় জাগতিক সকল কর্ম যে অপ্রয়োজনীয় তা বুঝতে সহায়তা করে। জগতের সকল কিছুর অসারতা বুঝতে সহায়তা করে। যেমন বলা হয়েছে,

"জেনে রেখ, ... পার্থিব জীবন এক মরিচীকা বৈ আর কিছু নয়।" (আল-কোরআন ৫৭:২০)

যখন সত্যের জ্ঞান ভেতরে প্রবেশ করে এবং জাগতিক মিছে মায়ার ভ্রান্তি থেকে জ্ঞান যথাস্থানে স্থিত হয়, কেবল তখনই আসক্তি ও আমিত্ববোধ ত্যাগ করা সম্ভব হয়। আসক্তি ও আমিত্বভাব দুর হলে জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। জগতের পিছুটানের মায়া দুর হয়। তখন মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে বিচরণ করা সম্ভব হয়। এটিই প্রকৃত স্বাধীনতা। বন্ধন মুক্ত স্বাধীন জীবনে পরম প্রশান্তি লাভ হয়।

● **৪.৪০** শ্রদ্ধা বা ভক্তিহীন ব্যাক্তির জ্ঞান লাভে আগ্রহ থাকে না। আগ্রহ ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। অপরদিকে অজ্ঞ তার অজ্ঞতার কারণে জ্ঞান লাভ করতে পারে না। সন্দেহ পোষনকারী ব্যাক্তির জ্ঞান থাকলেও সেটি অর্থহীন। কেননা সে বিশ্বাস করে না।

কর্ম বন্ধন কি, কিভাবে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে শাস্ত্রে সেসব বলা আছে। যাদের শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান নেই তারা বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত নয়। তারা জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিষয়েও অবগত নয়। তাহলে মুক্তি মিলবে কিভাবে?

কেন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে? জীবনের লক্ষ্য কি? কেবলি কি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার জন্য? সে কারণে সৃষ্টিকর্তা কেন তাকে সৃষ্টি করতে যাবেন? এসব প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে যারা অজ্ঞ, এ জীবন উপভোগ করা পর্যন্তই হচ্ছে তাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। কোন বৃহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। এ ধরণের মানুষ ভীষনভাবে ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়। ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবন বৃথাই জীবন ধারণ।

শুধুমাত্র অজ্ঞতার কারণে অজ্ঞরা অজ্ঞতার ফল ভোগ করে। ধীরে ধীরে তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সন্দেহ পোষনকারী বিষয়গুলি জানলেও বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস না করার কারণে মেনে চলে না। ফলে দর্শনের জ্ঞান যদি সত্যও হয়, তবে তারাও সঠিক পথ অনুসরণ না করার কারণে একই পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

কোন একটি আদর্শে বিশ্বাস রাখতে হয়। সেটিকে সত্য ধরে নিয়ে এগুতে হয়। তা না হলে জীবনের কোন লক্ষ্য থাকে না। লক্ষ্য ছাড়া গন্তব্যে যাওয়া যায় না। সংশয় নিয়ে এগুনো যায় না। যে যে লক্ষ্যই নির্ধারণ করুক না কেন গন্তব্য কিন্তু এক। অতএব জীবনে একটি লক্ষ্য স্থির করতে হয়।

অন্তিম সময় চলে এলে অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সন্দেহ পোষনকারী বা বিশ্বাসহীন ব্যাক্তি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন জীবনে তাই অপুর্ণতা ও আক্ষেপ নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করে। না ইহলোকে তারা সুখ পায়, না পরলোকে। তারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অধম যোনিতে প্রবেশ করে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪১	যোগের দ্বারা সকল কর্ম যিনি ভগবানে ন্যাস্ত করেছেন, জ্ঞানের দ্বারা সকল সংশয় যার ছিন্ন হয়েছে তেমন আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তিকে কোন কর্মই বন্ধনে

	আবদ্ধ করতে পারে না, হে ধনঞ্জয়!
৪২	অতএব, হে ভারত! অজ্ঞান থেকে উদ্ভূত তোমার হৃদয়স্থিত সংশয় জ্ঞান নামক খড়গ দ্বারা ছিন্ন কর! যোগে অধিষ্ঠিত হও! উঠে দাড়াও!

● **৪.৪১-৪২** যোগের মাধ্যমে সমাধিস্ত হয়ে পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হতে হয়। এ ধ্যান সত্যের জ্ঞানকে উদ্ভাসিত করে দেয়। মানুষ নিজেকে বুঝতে শিখে। আত্মতত্ত্বের জ্ঞান মানুষকে তার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করে। ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব ও তাঁর সাথে নিজের সম্পর্ককে উপলব্ধিতে নিয়ে আসতে সহায়তা করে। ফলে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়। তখন আর নিজের ভেতরে আমিত্ববোধ থাকে না। 'ভগবানের কারণে সবকিছু' এমন বোধ আসে। সে বোধ থেকে সকল কর্ম কেবল ভগবানের কারণে বা ভগবানের ভাবনায় সম্পন্ন হয়।

জীবন ও জগতের গুঢ় রহস্য অনুধাবনে সক্ষম হলে সাধকের অন্তর নিজেকে পরমাত্মায় সমর্পন করে দেয়। জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়ে একাকার হয়ে যায়। বস্তুত জ্ঞান অন্তরকে শক্তিশালী করে। মানুষ হয় আত্মবিশ্বাসী। আত্মবিশ্বাস সকল সংশয়কে দুর করে দেয়। আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন তেমন মানুষকে জগতের কোন কর্মই আর বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না।

জড় জগতের বন্ধন, ক্ষণস্থায়ী জীবনের মিথ্যে মায়া, হৃদয়স্থিত নানান সংশয় এসবের পেছনের কারণ মূলত অজ্ঞতা বা পারমার্থিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। এ সীমাবদ্ধতাই অর্জুনকে নির্জীব করে দিয়েছে। প্রকৃত সত্য অনুধাবনের ব্যার্থতাই তাঁর নিস্তেজতার কারণ। এমতাবস্থায় করণীয় বুঝে উঠতে পারছেন না।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হচ্ছে সত্যের জ্ঞান লাভ করা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞানের সকল বিষয়ে অবহিত করেছেন। তবে নিজ থেকে বিষয়ের সত্যতা অনুধাবন ও উপলব্ধি গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্য যোগে অধিষ্ঠিত হতে হবে। যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে একাগ্রচিত্তে ধ্যানমগ্ন হলে জীবন ও জগত সম্পর্কিত সকল জ্ঞান উন্মোচিত হয়ে যাবে। সকল সংশয় দুর হয়ে নিজ জ্ঞানে দৃঢ় বিশ্বাসের সৃষ্টি হবে। এটিই আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসই মানুষকে উঠে দাড়াতে সাহায্য করে।

বিশ্বাসী বা ভক্তের কোন কর্মই সত্যিকার অর্থে নিজের কর্ম নয়। তাঁর সকল কর্মই যজ্ঞের কর্ম। যজ্ঞের কর্ম জাগতিক কল্যাণার্থে কর্তব্যরূপে পালিত হয়। তেমন কর্মে

পাপ স্পর্শ করে না। তাই যথাযথ জ্ঞান লাভ করে পাপবোধ থেকে শুরু করে মনের সকল সংশয়কে দুর করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দৃঢ়তার সঙ্গে উঠে দাড়াতে বলেন। ভাল-মন্দ, সুঃখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় কোন কিছু বিবেচনা না করে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে বলেন। যুদ্ধ করতে বলেন।

পরম লক্ষ্য জানার আগ্রহ নিয়ে জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহন করে ভগবানকে জানার চেষ্টা করাই হচ্ছে জ্ঞানযোগ। ভগবান সম্পর্কে জানা ও তাঁর সাথে জীবের সম্পর্কের বিষয় অনুধাবনে এলে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝতে পারা যায়। জ্ঞান তখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। জীবন ও জগতের সকল রহস্য উন্মোচিত হয়। সৃষ্টি রহস্য উপলব্ধিতে এলে মানুষ আত্মবিশ্বাসী হয়।

আত্মবিশ্বাস হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত সবচাইতে মূল্যবান ফল। আত্মবিশ্বাস মানুষকে দৃঢ়তার সাথে চলতে সাহায্য করে। নির্জীব অবস্থা থেকে উঠে দাড়াতে সাহায্য করে। যোগ সে মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে যোগে অধিষ্ঠিত হতে বলেন। বলেন,

"হে ভারত! অজ্ঞান থেকে উদ্ভূত তোমার হৃদয়স্থিত সংশয় জ্ঞান নামক খড়্গ দ্বারা ছিন্ন কর! যোগে অধিষ্ঠিত হও! উঠে দাড়াও!"

পঞ্চম অধ্যায় : সন্ন্যাসযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ২৯)

সারকথা : মোক্ষ লাভে জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মবাদীদের মধ্যে দু'টি ধারার সৃষ্টি হয়। একটি হচ্ছে যোগমার্গ এবং অপরটি হচ্ছে সন্ন্যাসমার্গ। সন্ন্যাসমার্গ বলে কর্মই বন্ধনের কারণ। অতএব কর্ম ত্যাগ করতে হবে। কর্ম ত্যাগ ব্যাতিত মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। সন্ন্যাসীরা তাই কর্ম ত্যাগ করেন।

মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে জড় প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা। কর্ম ত্যাগ করে সেটি অর্জন করা যায়, আবার কর্ম করেও অর্জন করা যায়। জগতের সকলে যদি কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসের পথ বেছে নেয় তবে কি সৃষ্টি টিকে থাকতে পারবে? কর্ম করে লক্ষ্য অর্জন করা তাই শ্রেয়। তাতে মুক্তি লাভের পাশাপাশি লোকরক্ষা ও বিশ্বকর্মও সাধিত হয়। জীবন ও জগত উপকৃত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই কর্ম ত্যাগ নয় বরং যোগী চেতনায় কর্ম করতে বলেন। সেভাবেই ব্রহ্ম লাভ করতে হবে। ব্রহ্ম লাভেই বন্ধন মুক্তি। ব্রহ্ম লাভেই সকল যন্ত্রনার অবসান এবং ব্রহ্ম লাভেই পরম প্রশান্তি লাভ হয়।

১	অর্জুন বলেন: হে কৃষ্ণ! প্রথমে তুমি সন্ন্যাস তথা কর্মত্যাগ করতে বললে, অতঃপর যোগের প্রশংসা করছ। দু'য়ের মধ্যে কোনটি শ্রেয় দয়া করে নিশ্চিতভাবে তা আমাকে বল।

● **৫.১** কর্মযোগের কথা বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান মার্গেরও প্রশংসা করেছেন। বলেন জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই, সকল কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে। জ্ঞানেই মুক্তি। আবার কর্মযোগে বলছেন নিষ্কাম কর্মে মুক্তি। শ্রীকৃষ্ণের এমন দ্ব্যার্থবোধক কথায় অর্জুন বিভ্রান্ত হন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে চান যে, পরমার্থ সাধনের জন্য সাংখ্য বা জ্ঞানমার্গে কর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্মকে বেছে নেয়া উত্তম, নাকি যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করা উত্তম? কোনটি শ্রেয়? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২	কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ উভয়ই মুক্তিদায়ক, তবে দু'য়ের মধ্যে কর্ম ত্যগের চেয়ে কর্মযোগ শ্রেয়।

৩	যিনি কোন কিছুর জন্য আকাংখা করেন না আবার দ্বেষও পোষন করেন না, তাঁকে নিত্য সন্ন্যাসী বলে জানবে। নিশ্চিতভাবে দ্বন্দ্বরহিত, হে মহাবাহো! তিনি বন্ধন থেকে মুক্ত থেকে সুখ লাভ করেন।

● **৫.২** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, জ্ঞানমার্গে কর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন এবং যোগমার্গে কর্মযোগ বা নিষ্কামকর্ম উভয়ই মোক্ষপ্রদ। তবে দু'য়ের মধ্যে কর্ম ত্যগের চেয়ে কর্মযোগ শ্রেয়। উভয়টি জড় জাগতিক বন্ধন ও যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেয়। তবে কর্ম পরিত্যাগ করার চেয়ে বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে পরমেশ্বরের ভাবনায় কর্ম করা উত্তম। কর্ম সেক্ষেত্রে জীবন, জগত ও সমাজের কল্যাণার্থেও সুফল বয়ে আনে। এ ধরণের কাজ ভগবানের সেবা করা নামে পরিচিত। কেউ বলেন আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা বা তাঁর রাহে বা রাস্তায় কাজ করা।

নিষ্কাম কর্মযোগে কর্মের ফল নিজে ভোগ করার বাসনা থাকে না। ফলে সেক্ষেত্রে জনকল্যাণে যেমন কর্ম সম্পাদিত হয়, আবার কর্মের বন্ধন থেকেও মুক্ত থাকা যায়। তাই সম্পূর্ণরূপে কর্ম পরিত্যাগ বা কর্ম-বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস অপেক্ষা যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করা শ্রেয়।

● **৫.৩** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যিনি কোন কিছু পাওয়ার জন্য আকাংখা করেন না। আবার কোন কিছু না পাওয়ার কারণে কোন প্রকার দ্বেষ বা আক্ষেপও করেন না তিনি সততই সন্ন্যাসী। সুখ-দুঃখ এমনসব জাগতিক দ্বান্দ্বিক ভাবসমুহ তাদেরকে বিচলিত করে না। জাগতিক কোন কিছু পাওয়া-না পাওয়া নিয়ে তাদের কোন পিছুটান বা বন্ধন থাকে না। বন্ধন বা যন্ত্রনা মুক্তির কারণে সুখ লাভ করেন।

সন্ন্যাস বিষয়ে বাস্তবে সর্বসাধারণের মাঝে ভূল ধারণা আছে। সকল কর্ম পরিত্যাগ করাকে সকলে সন্ন্যাস বলে জানে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সংসারে থেকেও যিনি রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। যেমন বলা হয়েছে,

"বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসবাদ ... তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটি অবলম্বন করেছে। তথাপি তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি।" (আল-কোরআন ৫৭:২৭)

৪	স্বল্প জ্ঞানের মানুষ সাংখ্য বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাস এবং যোগ বা কর্মযোগকে পৃথক

	বলে মনে করে; তবে জ্ঞানীরা তা বলেন না। তারা বলেন, দু'টির একটিতেও অবস্থিত হলে উভয়টিরই ফল পূর্ণরূপে লাভ হয়।
৫	সাংখ্যগণ অর্থাৎ সন্ন্যাসগণ যে স্থান লাভ করেন, যোগীগণও সে একই স্থান প্রাপ্ত হন। যিনি বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে দেখেন অর্থাৎ তত্ত্বদ্রষ্টা, তিনি দেখেন যে সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ একই।

• **৫.৪-৫** কেউ কেউ সাংখ্য বা জ্ঞানযোগে সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে পৃথক বলে মনে করেন। তবে যারা বিষয়গুলি যথাযথভাবে বোঝেন তারা তা বলেন না। কেননা পদ্ধতি ভিন্ন হলেও দু'টি দর্শনেরই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এক। মোক্ষ লাভ বা বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা। কিংবা বলা যায় যে ভগবান বা আল্লাহকে পাওয়া। ফলে যে কোন একটিতে অবস্থান করলে উভয়টিরই ফল লাভ হয়ে যায়।

জ্ঞানযোগে নিজের সক্ষমতা বুঝে কাজ করা হয়। কর্মযোগে ভগবানের ওপর নির্ভর করে কাজ করা হয়। সন্ন্যাসে মনে করা হয় কর্মই বন্ধনের কারণ, অতএব কর্মত্যাগ ব্যাতিত মোক্ষ লাভ হয় না। সন্ন্যাসে তাই কর্মত্যাগ করা হয়। যোগে মনে করা হয় কর্ম নয় বরং কর্মের ফল ভোগের বাসনাই বন্ধনের কারণ। অতএব কর্মের ফল ত্যাগেই মোক্ষ লাভ হয়। কর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না। যোগে লোকরক্ষা ও বিশ্বকর্মও সাধিত হয়।

দার্শনিক গবেষনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া। সকল দর্শনই পরমেশ্বর ভগবান, গড কিংবা আল্লাহর সন্ধান করে। তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। ফলে সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে যে স্থান লাভ হয় যোগও সে একই স্থান প্রাপ্ত হয়। কেবল পন্থা ভিন্ন।

সন্ন্যাসে জড় জাগতিক বিষয়ে নিরাসক্ত হতে হয়। অপরদিকে যোগে ভগবানে আসক্ত হতে হয়। আবার জড় জাগতিক বিষয়ে নিরাসক্ত না হয়ে ভগবানে আসক্ত হওয়া যায় না। ফলে দু'টোতে দু'টোরই প্রয়োজন আছে। তত্ত্বদ্রষ্টাগণ তাই দেখেন যে সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ একই।

সন্ন্যাস ও যোগ উভয়টি যদি একই গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছায় তবে কর্মযোগের বিশেষত্ব কি? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৬	হে মহাবাহো! যোগ ব্যাতিত কেবল সন্ন্যাস দুঃখময় হয়। কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মাকে লাভ করেন।
৭	যোগযুক্ত বিশুদ্ধ চিত্ত বা পবিত্র আত্মা আত্ম-সংযত ও ইন্দ্রিয় জয়ী হন। সর্ব জীবের প্রতি দয়াশীল হন এবং সকল কর্মে ব্যাপৃত থেকেও লিপ্ত হন না।
৮	যোগেযুক্ত তত্ত্বদর্শী ব্যাক্তি যদিও দর্শন, শ্রবন, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমনাগমন, নিদ্রা ও শ্বাস, কথোপকথন, দ্রব্য ত্যাগ ও গ্রহণ, চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ করেন- তথাপি তিনি জানেন যে তিনি আসলে কিছুই করছেন না। কেবল ইন্দ্রিয়সমুহ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সাথে প্রবৃত্ত হচ্ছে এমন ধারণা করেন। [৮-৯]

● **৫.৬** যোগ বা কর্মযোগ হচ্ছে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করা। এটি পরমের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একটি পন্থা। এ পন্থায় ইন্দ্রিয়সমুহকে সংযত বা দমন করার চেষ্টা করা হয়। কেননা ইন্দ্রিয়কে দমন করা না হলে ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। বিষয়ে প্রবৃত্ত হলে তার ভেতরে বিষয় লাভের বাসনার সৃষ্টি হয় এবং জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যা পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভের পথে বাধাস্বরূপ। ইন্দ্রিয়কে দমন করা তাই প্রথম কাজ। এটি করা সম্ভব হলে ব্রহ্ম লাভ সহজ হয়।

অপরদিকে সন্ন্যাসীগণ সাংখ্য দর্শনের অনুসারী। এ মতে মানুষের জড়দেহটি সে নয়। তার প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে আত্মা। আত্মার শাশ্বত ধর্ম পালন করতে না পারলে মুক্তি নেই। তারা তা অর্জনে সচেষ্ট হন। তবে এখানে ইন্দ্রিয়কে দমনের চেষ্টা করা হয় না। ফলে সন্ন্যাসে যদি কর্মফল লাভের বাসনা ছাড়াও কর্মত্যাগ করা হয়, তবুও ইন্দ্রিয়জনিত যে উপদ্রব তা থেকে যায়।

তাই বলা হয়েছে যে যোগ ব্যাতিত কেবল সন্ন্যাস দুঃখময় হয়। ইন্দ্রিয়জনিত উপদ্রবের কারণে তাদের জন্য ব্রহ্ম লাভ করা কষ্টকর হয়। কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরেই ব্রহ্মাকে লাভ করেন। কেননা তিনি ইন্দ্রিয়ের উপদ্রব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

যোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়কে দমনের পন্থা। ইন্দ্রিয় দমন হলে পরমে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়। ফলে যোগযুক্ত মুনি অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়কে দমন করতে পেরেছেন তিনি অচিরেই ব্রহ্মাকে লাভ করেন। তেমন মানুষের লক্ষণ কি?

- **৫.৭-৯** যোগে সফলভাবে যুক্ত হলে ইন্দ্রিয়সমুহ বশীভূত হয়। তেমন মানুষ হন সংযত চিত্ত। তিনি নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আত্মনিয়ন্ত্রন ক্ষমতার কারণে তেমন মানুষের চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং মনে নির্মল-পবিত্র ভাবের সৃষ্টি হয়। আত্ম-উপলব্ধির কারণে সকল জীবের প্রতি তিনি দয়াশীল হন। সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন।

তেমন মানুষ সর্বকর্মে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও যোগী চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সাথে লিপ্ত হন না। তিনি মনে করেন ইন্দ্রিয়সমুহ ও তার বিষয় পরস্পর মিথষ্ক্রিয়া করছে। তিনি নিজে কিছুই করছেন না। এভাবে সকল কর্মের ক্ষেত্রেই তিনি উদাসীন, নিরপেক্ষ বা অকর্তা হয়ে বিদ্যমান থাকেন।

চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ হচ্ছে মানে ইন্দ্রিয় তার বিষয়ের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে। এমনিভাবে দর্শন, শ্রবন, স্পর্শ, ঘ্রাণ সবকিছুতেই ইন্দ্রিয় তার বিষয়ের সাথে ক্রিয়া করছে বলে মনে করেন। অর্থাৎ দেহ ক্রিয়া করছে। কিন্তু দেহ থেকে পৃথক আত্মা কোন কিছুতেই লিপ্ত হচ্ছে না। তিনি নিজে এ সকল কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত মনে করেন না। এই চেতনায় যোগী জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। আরও বলা হচ্ছে,

১০	ফলাসক্তি ও অহমবোধ পরিত্যাগ করে যিনি ব্রহ্মে সমর্পন করে সমুদয় কর্ম করেন, পাপ তাঁকে স্পর্শ করে না; যেমন পদ্মপাতাকে জল স্পর্শ করে না।
১১	দেহের দ্বারা, মনের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা এমনকি বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারাও যোগী কর্ম করেন- তবে আসক্তি রহিত হয়ে কেবলমাত্র আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য।
১২	নিষ্ঠাবান যোগী কর্মের ফল পরিত্যাগ করে অনাবিল শান্তি লাভ করেন। কিন্তু সকাম কর্মী কামনাপূর্বক প্রবৃত্ত হওয়ায় কর্মফলে আসক্ত হয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

• **৫.১০** বিভ্রান্ত জীব মনে করে যে আমি কর্ম করি। এটিই তার অহম বা আমিত্ববোধ এবং সে কারণে সে তার নিজের করা কর্মের ফল ভোগ করতে চায়। এই আমিত্ববোধের কারণে সে কর্ম ও কর্মফলের সাথে নিজেকে ভীষনভাবে জড়িয়ে ফেলে। ফলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং কর্মের কারণে ভাল-মন্দ ফলও তাকে ভোগ করতে হয়। আমিত্ববোধ বন্ধনের অন্যতম কারণ।

অপরদিকে দেহ ও আত্মার পার্থক্য বিষয়ে যিনি জানেন তিনি বোঝেন যে কর্ম তার স্বভাব অনুসারে দেহ দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রকৃতি প্ররোচিত করে। পেছনে দৈবের হাত থাকে। কিন্তু জড়দেহে স্থিত জীব বা তিনি নিজে কিছু করেন না। তিনি অকর্তা। অর্থাৎ তিনি আমিত্ববোধ ত্যাগ করেন। যে কর্মে আমিত্ববোধ থাকে না সে কর্ম ব্রহ্মে সমর্পিত হয়।

এভাবে আমিত্ববোধ ও ফলাসক্তি পরিত্যাগ করে যিনি ব্রহ্মের ভাবনায় সমুদয় কর্ম করেন পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। যেমন পদ্মপাতাকে জল স্পর্শ করে না। তিনি নিজে কাজের কৃতিত্ব গ্রহণের মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করেন এবং সকল কৃতিত্ব ভগবানে সমর্পন করেন। ভগবানের কারণে করা কর্মে কর্তার দায়ও থাকে না।

ভগবানের ভাবনায় করা কর্ম সাধারণত নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও ফলভোগের বাসনা রহিত হয়। তেমন কাজ বৃহৎ জনগোষ্ঠির কল্যাণার্থে করা কাজরূপে বিবেচিত হয়। কল্যাণার্থে করা কোন কাজে পাপ স্পর্শ করে না। কর্ম তাই ভগবানকে বা ব্রহ্মে সমর্পন করে করতে হয়। যোগী সেভাবেই কাজ করেন। নিজে ফল ভোগের আকাংখা না করে আসক্তি রহিত হয়ে কাজ করেন। আমিত্ববোধ পরিত্যাগ করে কাজ করেন। বলা হচ্ছে,

"যে কেউ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং ভাল কাজ করে, তার পুরস্কার রয়েছে তার পালনকর্তার কাছে।" (আল-কোরআন ২:১১২)

• **৫.১১** একজন সাধারণ মানুষের করা কর্ম ও যোগীর করা কর্মে পার্থক্য আছে। যদিও দু'জনে একই কাজ করে। পার্থক্য মনে-প্রাণে, চিন্তা-চেতনায়, নিয়তে ও জ্ঞানে।

সধারণভাবে সবাই কর্ম করে কর্মজাত ফল ভোগ করার জন্য। বিষয়ে আসক্ত হয়ে। যোগীও একই কাজ শরীর, মন, ইন্দ্রিয় সবকিছুকে কাজে লাগিয়েই করেন।

মনে হতে পারে যেন দু'জন একই কাজ করছে। কিন্তু নিয়তে ও জ্ঞানে পার্থক্য আছে।

যোগী বিষয়ে আসক্ত হয়ে কাজ করেন না। ভগবানে সমর্পন করে কাজ করেন। আমিত্ববোধ ত্যাগ করে কর্ম করেন। এভাবে কাজ করলে অন্তর পরিশুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়। যেটা যোগী করতে পারেন কিন্তু সবাই পারে না। এখানেই যোগী বা আধ্যাত্মমনা মানুষদের সাথে সাধারণের পার্থক্য। তারা কাজ করেন সমাজ ও মানব কল্যাণার্থে সকলকে পথ প্রদর্শনের জন্য।

● **৫.১২** যোগী কর্মজাত ফল পরিত্যাগ করেন। আসক্তিরহিত হয়ে কাজ করেন। ফলে তার জাগতিক কোন পিছুটান থাকে না। ফল প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বিষয়ক কোন আক্ষেপও তার থাকে না। কোন কিছু হারানোর কোন প্রকার ভয় চিত্তকে উপদ্রব করে না। সবকিছু ভগবানে সমর্পন করে কর্মফল পরিত্যাগ করে তিনি অনাবিল শান্তি লাভ করেন। কিন্তু যারা তেমন চেতনায় কাজ করে না তারা লাভ-ক্ষতি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব কষতে গিয়ে কর্ম বা সংসার বন্ধনে ভীষনভাবে আবদ্ধ হয়ে যায়। জাগতিক যন্ত্রনা তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। কখনই শান্তি পায় না।

১৩	দেহধারী জীব সমস্ত কর্ম মানসিকভাবে পরিত্যাগ করে, সংযত হয়ে নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ নগরে সুখে থাকেন। না নিজে কিছু করেন, না কিছু করান।
১৪	দেহরূপ নগরীর প্রভূ তথা জীবাত্মা না কর্তৃত্ব করেন, না কোন কর্ম করেন; না কর্মের কোন ফল সৃষ্টি করেন। স্বভাব কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

● **৫.১৩** জীবকে এখানে 'দেহধারী জীব' বলা হচ্ছে। অর্থাৎ দেহ কিন্তু জীব না। প্রকৃত যে জীব অর্থাৎ জীবন বা চেতনা যার মাঝে তিনি কিন্তু দেহকে ধারণ বা আশ্রয় করে আছেন। তাই দেহধারী জীব বলা হয়েছে। দেহটা যন্ত্রবৎ বাহিরের আবরণ মাত্র। প্রকৃত যে জীব বা জীবাত্মা তিনি দেহ নামক দুর্গের ভেতরে নিরাপদে পরম সুখে অবস্থান করেন। তবে সবাই সুখে থাকেনা। সুখটা নিতে জানতে হয়। তার জন্য জ্ঞান অর্জন কিংবা মস্তিষ্কে জ্ঞান আবির্ভূত হতে হয়।

সুখী কেবল তিনি যিনি দেহ দ্বারা সর্বকর্ম করেও নিজেকে সংযত রেখে মানসিকভাবে কর্মফল ত্যাগ করেন। ফলে তিনি নিজে কর্মের সাথে যুক্ত হয়ে যান না। কাউকে দিয়ে তিনি কিছু করানও না। দেহ তার নিজ স্বভাব অনুসারে কর্ম করে।

স্বকাম কর্মের পরিণতিস্বরূপ জাগতিক যে যন্ত্রনা এমন জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন মানুষকে তা ভোগ করতে হয় না। তিনি সবরকম পিছুটান থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে পরম সুখে নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ নগরে বসবাস করেন। নবদ্বার বা দেহের নয়টি দ্বার হচ্ছে- চোখ (২), কান (২), নাসারন্ধ্র (২), মুখ (১), উপস্থ (১) ও পায়ু (১)।

● **৫.১৪** দেহ হচ্ছে জড় প্রকৃতিসম্পন্ন। আবরণ বা দুর্গস্বরূপ। দেহের প্রভূ বা মালিক হচ্ছেন আত্মা। আত্মা নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, উদাসীন বা নিরপেক্ষ। তিনি কোন কিছুতে কোন প্রকার কর্তৃত্ব আরোপ করেন না। কোন কর্ম সৃষ্টি করেন না। কর্ম দ্বারা কোন ফলের সংযোগও তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয় না। তিনি দেহও নন কিংবা দেহের অংশ নন। তিনি জড় নন। জীব বা জীবন্ত। অকর্তা হয়ে দেহমধ্যে বিদ্যমান থাকেন। তাহলে এই যে এত কর্ম সাধিত হচ্ছে সেসব কিভাবে হচ্ছে?

দেহ হচ্ছে যন্ত্রবৎ। দেহের অংশ ইন্দ্রিয় বহিঃজগতের সংস্পর্শে এসে ভেতরে বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান প্রেরণ করে। দেহ বা যন্ত্র তাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উজ্জীবিত হয়ে স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে। এতেই জীবের কর্মের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি দেহ নিজ স্বভাব অনুসারে কাজ করতে বাধ্য হয়।

বিষয়টিকে বর্তমান সময়কালের চালকবিহীন গাড়ীর কথা ভেবে অনুধাবন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। গাড়ী বা যন্ত্র সকল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাস্তায় এগিয়ে চলে। যাত্রী পরম সুখে ভেতরে বসে ভ্রমন করেন। এতদ্বসত্বেও অলক্ষ্যে গাড়ির নিয়ন্ত্রক আছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৫	পরমেশ্বর বিভু; না কারও পাপকে গ্রহণ করেন, না কারও পূণ্য। অজ্ঞতার কারণে জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় জীবসমুহ এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়।
১৬	আত্মজ্ঞানের দ্বারা সেই অজ্ঞতা যাদের বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাদের জ্ঞান পরমতত্ত্বের সবকিছু প্রকাশ করে দেয়; ঠিক যেমন উদীয়মান সূর্য্য দিবসে সবকিছু উন্মোচন করে।

● **৫.১৫** প্রভূ হচ্ছেন বিভু। অর্থাৎ পূর্ণ বৈভবযুক্ত ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। তিনি সর্বব্যাপি আত্মা। তিনি কারও দ্বারা কৃত পাপ-পূণ্য বিষয়ে উদাসীন বা নির্বিকার। কারও পাপকেও তিনি গ্রহণ করেন না, আবার কারও পূণ্যকেও গ্রহণ করেন না। তাঁর সেসব ভাববার প্রয়োজনও নেই। অজ্ঞতার কারণে জীব নিজেই বিভিন্ন পরিস্থিতি কামনা করে ও সৃষ্টি করে। ফলে তার নিজের দ্বারা কৃত কর্ম কর্মফলের প্রবাহ সৃষ্টি করে যা তাকে দিয়ে ভাল-মন্দ ফল ভোগ করায়।

প্রকৃতির মাঝে মানুষ যদি একা বসবাস করত তবে কর্মের কারণে তার কোন পাপ কিংবা পূণ্য কিছুই হত না। তেমন ক্ষেত্রে কে কার পাপ-পূণ্য বিবেচনা করত? বস্তুত সমাজবদ্ধ মানুষ নিজেরাই কোন একটি বিষয়ে ভাল-মন্দের প্রশ্ন উত্থাপন করে। তখন এসব ধারণার সৃষ্টি হয়। মানুষ একে অন্যকে বিচলিত না করলে কিংবা একে অন্যের বিষয়ে নির্বিকার থাকলে পাপ-পূণ্য কোনকিছুই বিবেচিত হত না। কিন্তু জীব মনে করে আমি এই ভাল কাজটি করেছি। সে ঐ মন্দ কাজটি করেছে ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রত্যেকের ভেতরে একটা আমিত্ববোধ কাজ করে। এ আমিত্ববোধের কারণে একে অপরের ওপর দোষ-গুণ আরোপ করে। তাতেই পাপ-পূণ্য ও তার ফলভোগের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বস্তুত মানুষ নিজেরাই একে অন্যকে উন্নীত করে কিংবা অধঃপতিত করে। ভগবান এসব বিষয়ে উদাসীন বা নিরপেক্ষ। তাঁর সেসব ভাববার প্রয়োজনও নেই।

দেহ ও আত্মার পার্থক্য বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে জীবসমুহ এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়। সর্বত্র একই পরমাত্মা বিরাজমান এমনটি ভাবতে পারে না। সুনির্দিষ্ট একটি দৈহিক আকৃতিকে বড় প্রমাণ করার চেষ্টা করে, কিংবা অপর একটি আকৃতিকে ছোট করতে চায়। অর্থাৎ নিজেকে পূণ্যবানরূপে ও অপরকে পাপিরূপে প্রমাণ করতে চায়। আমিত্ববোধের কারণে এমনসব ভাবনা আসে। আমিত্ববোধ পরিত্যাগ করে নিজেকে অকর্তা গণ্য করে ভগবানে সমর্পন করে কর্ম করলে পাপ-পূণ্যের বোধের আর প্রয়োজন হয় না। তখন সব ভগবানময় বোধ হয়।

জীবন ও জগত ভগবানই পরিচালনা করেন। তিনি জীবকে ভাল পথে নিয়ে যান। আবার মন্দ পথেও নিয়ে যান। তাই সে স্বর্গগামী হয় কিংবা নরকগামী হয়। তবে ভগবান জীবকে কোন পথে নিয়ে যাবেন সেটি নির্ভর করে জীবের নিজের ইচ্ছের

ওপর। অর্থাৎ জীবাত্মার স্বাধীনভাবে ইচ্ছে করার স্বাতন্ত্র আছে। কিন্তু চলার নিজস্ব শক্তি নেই। তবে জীবের ইচ্ছের অনুমোদনদাতা ভগবান।

সর্ব শক্তিমানের অনুমোদনেই জীবের ইচ্ছে পূরণ হয়। বায়ু যেমন মেঘকে চালনা করে, তেমনি ভগবানের শক্তি জীবের ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে স্বর্গে অথবা নরকের পথে নিয়ে যায়। আমরা দেখি জীব নিজে চলছে। ভগবানকে দেখি না। যেমন দেখি মেঘ নিজে চলছে। বায়ুকে দেখি না। ঠিক তেমনিভাবে জীবের ভেতরের চলার শক্তিটিও নানান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভগবান থেকে আসে। তিনিই চালনা করেন। জীব কেবল ইচ্ছে প্রকাশ করে।

উল্লেখ্য যে, নরকগামীও কিন্তু নরকে যেতে চায় না বা যেতে ইচ্ছে করে না। তহলে কেন ভগবান তাকে নরকের পথে নিয়ে যাবেন? অজ্ঞতার কারণে যে নরকে যাবার মতো কর্ম করে ভগবান তাকে কর্ম অনুযায়ী সে পথে নিয়ে যান। তখন কর্মই তার ইচ্ছের প্রমাণস্বরূপ হয়ে যায়। যেমন বলা হয়েছে,

"শাস্তি তোমাদের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অন্যায় করেন না।" (আল-কোরআন ২২:১০)

ভগবান কাউকে অতি ভালবাসেন না আবার ঘৃণাও করেন না। যদিও তাঁর সকল কৌশল বুঝতে না পারার কারণে মানুষের কাছে কখনও তেমনটি প্রতীয়মান হয়। তিনি নিরপেক্ষ। তিনি নিশ্চল-নিশ্চুপ, নির্বিকার, উদাসীনবৎ। ন্যায্যতার প্রতীক, ভারসাম্যপূর্ণ, সাক্ষী। কারও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। তবে মন্দ পথ বেছে নিলে মানুষ নিজেই যেমন গাড়ীসহ খাঁদে পতিত হয়, তার মন্দ ফলাফল ভোগের বিষয়টিও তেমনই।

দেহধারী জীব ভগবান কিংবা আল্লাহকে ভূলে থাকার কারণে এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়। ভগবান মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু ভগবানকে বিস্মৃত হয়ে তাঁর দিক-নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে চলতে গিয়ে জীব নিজেই বিপদগ্রস্ত হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"মানুষকে পথ চলার ভিন্ন ভিন্ন দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি- ভাল ও মন্দ। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি উন্নতর বা উচ্চতর পর্যায়ে আরোহনের।" (আল-কোরআন ৯০:১০-১১)

শাস্ত্রের জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞতা ও বিশ্বাসহীনতার কারণে জীবসমুহ বিভ্রান্ত হয়। বিভ্রান্তির কারণ হচ্ছে ভগবান, গড, ঈশ্বর কিংবা আল্লাহকে বিস্মৃত হওয়া। সে কারণে তাঁর নির্দেশনাকে উপেক্ষা করা। কিভাবে এ অজ্ঞতাকে দুর করা সম্ভব?

• **৫.১৬** বলা হচ্ছে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বা নিজের সম্পর্কিত জ্ঞান এ অজ্ঞতাকে দুর করতে পারে। এ জ্ঞান নিজেকে জানতে ও বুঝতে শেখায়। দেহ ও আত্মার পার্থক্য জ্ঞান, অস্তিত্বের উৎস সম্পর্কিত জ্ঞান, আত্মার সাথে পরমের সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান পরমতত্ত্বের সবকিছু দিনের আলোর মতো প্রকাশ করে দেয়। তখন অজ্ঞতা দুরীভূত হয়। সেই জ্ঞানের স্বরূপ কেমন?

১৭	বুদ্ধি যাদের নিজ আত্মাতেই নিবিষ্ট, তাতেই যাদের নিষ্ঠা, তাতেই যারা তৎপর, জ্ঞানের দ্বারা বিধৌত হয়ে যিনি কলুষমুক্ত হয়েছেন তিনি পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না।
১৮	আত্ম-তত্ত্বদর্শী পন্ডিতগণ বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তি, কুকুর, চন্ডাল সবকিছুকে সমদৃষ্টিতে দেখেন।
১৯	যাদের মন এভাবে সাম্যে স্থিত, এ জীবনেই তাঁরা জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারকে জয় করেছেন। যেহেতু ব্রহ্ম সমদর্শী ও ত্রুটিহীন। অতএব তারা ব্রহ্মে স্থিত।

• **৫.১৭** বলা হচ্ছে, তেমন জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্মত ব্যাক্তি আত্মাতে নিবিষ্টচিত্ত হন। এই নিবিষ্টতাতেই তাদের নিষ্ঠা ও তৎপরতা। তারা স্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ করে নিজেকে কর্ম থেকে নির্লিপ্ত রেখে কলুষমুক্ত থাকেন। অর্থাৎ দেহ স্বভাব অনুসারে কর্ম করে, কিন্ত জ্ঞানসম্মত আচরণের দ্বারা বুদ্ধিমান নিজেকে সে কর্ম থেকে নির্লিপ্ত রাখেন। তবে বিষয়টি যথাযথ বোধের কারণে অন্তর থেকে হতে হবে।

জাগতিক টান বা পিছুটান মুক্ত হওয়ার কারণে জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবৃত্তির যে বন্ধন তা থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন। জ্ঞানের কারণে তাদের সংসার বন্ধনের কারণজনিত অজ্ঞানতা দূর হয়ে যায়। তাদের তাই পুনরায় দেহধারণ করতে হয় না। এ দর্শনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। এটি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

• **৫.১৮** তেমন আত্ম-তত্ত্বদর্শীগণ সর্বত্র এক পরমাত্মাকে দেখেন। ফলে কোন কিছুকে তিনি বড়-ছোট, উচু-নিচু দেখেন না। ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তি, কুকুর, চন্ডাল

সবকিছুকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। সমাজ ব্যাবস্থার প্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণ, চন্ডাল জাত-কুল পৃথক হতে পারে। কিন্তু তিনি দেখেন বাহিরের দেহগত আবরণ বা কর্ম সম্পাদনের যন্ত্রগুলিই কেবল পৃথক। ভেতরে একই জন বা একই পরমাত্মা সকলের মাঝে বিদ্যমান। তিনি সর্বত্র একই ব্রহ্মকে দর্শন করেন। তাই দেহজাত ভেদসমুহ তার কাছে নিরর্থক বোধ হয়। ফলে সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন।

ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানী মনে করেন ভগবান এভাবে মানুষের আচরণ প্রত্যক্ষ করেন। ভগবান সর্বোচ্চ মহান হওয়া সত্বেও সে নিজে ভগবানের কাছে কেমন আচরণ প্রত্যাশা করে, অথচ স্তরভেদে নিজে অপরকে কোন দৃষ্টিতে দেখে ও কেমন আচরণ করে তিনি তা প্রত্যক্ষ করেন। জীবন তাই এক পরীক্ষার নাম। পরমতত্ত্ব বা আধ্যাত্ম জ্ঞানের এটিই হচ্ছে প্রকৃত মহাত্ম। যেমন বলা হয়েছে,

"সে ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ অন্ধ লোকটি তার কাছে এসেছিল। ... অথচ যে নিজেকে আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যাতিতই আত্মনির্ভর মনে করে তুমি তার প্রতি মনযোগ প্রদর্শন কর। যার অন্তরে আল্লাহ প্রীতি আছে তুমি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু না এটি সঠিক নয়। নিশ্চয়ই! এটি একটি সতর্কবার্তা।" (আল-কোরআন ৮:১-১১)

"তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে তোমাদের মধ্যে কর্ম ও আচরণে কে শ্রেষ্ঠ!" (আল-কোরআন ১১:৭)

• **৫.১৯** আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বা আত্ম-উপলব্ধি ব্যাতিত সাম্যস্থিতি আসে না। এ জ্ঞানে সর্বত্র বা সর্বজীবে এক পরমাত্মাকে দর্শন হয়। জীব যতক্ষণ নিজ দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে ততক্ষন সে জড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সে জড় দেহের সাথে একাত্ম হয়ে থাকে। অন্যান্য দেহ থেকে নিজেকে পৃথক মনে করে। কিন্তু যখন নিজের স্বরূপ বুঝতে পারে এবং বুঝতে পারে যে দেহ ও আত্মা পৃথক এবং স্বতন্ত্র আত্মা পরমাত্মার সাথে যুক্ত তখন সে সর্বত্র এক পরমাত্মাকে দর্শন করে। সকলকে একই শ্রেণীভূক্ত মনে হয়। তখন সাম্যবুদ্ধির উদয় হয়। সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করে ব্রহ্ম স্থিতিতে স্থিত হন।

ব্রহ্ম সমদর্শী ও ত্রুটিহীন। যেহেতু ব্রহ্ম সম ও নির্দোষ তাই সমদর্শীগণ ব্রহ্মে স্থিত। রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত বিধায় ভগবান নির্দোষ। তেমনি জীবও যখন রাগ-দ্বেষ

থেকে মুক্ত হয় সেও নির্দোষ হয়ে যায়। তারা জীবিতাবস্থায়ই সংসার জয় করেন। জ্ঞানের কারণে তাদের সংসার বন্ধনের কারণজনিত অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। সংসাররূপ কারণকে জয় করতে পারলে তাদের আর জন্ম নিতে হয় না। এটিই পরম গতি। বিষয়টি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। ব্রহ্মে স্থিতদের লক্ষণ কি?

২০	প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে যিনি উচ্ছসিত হন না এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতেও বিচলিত নন, মোহমুক্ত ও স্থির-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং ব্রহ্মজ্ঞানী- তিনি ব্রহ্মেই স্থিত।
২১	বিষয়সুখে অনাসক্ত চিত্তসম্পন্ন ব্যাক্তি যিনি আত্মায় সুখ অনুভব করেন, তিনি ব্রহ্মে যোগযুক্ত হয়ে অন্তহীন সুখ প্রাপ্ত হন।
২২	জড় ইন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত ভোগসমুহের শুরু ও শেষ আছে যা দুঃখের কারণ, হে কৌন্তেয়! জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তি তাতে উৎফুল্ল হতে পারে না।

● **৫.২০** যিনি কোন প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে উচ্ছসিত হন না, আবার অপ্রিয় কোন বস্তুর প্রাপ্তিতেও মনঃক্ষুন্ন, হতাশ বা বিচলিত হন না তেমন মানুষ ত্রিগুণাতীত। তিনি মোহমুক্ত। চিত্তের এমন দৃঢ় অবস্থাই স্থিরবুদ্ধি। এগুলি ব্রহ্মেরই গুণ। যেমন বলা হয়েছে,

"যেন তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখ না পাও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লসিতও না হও।" (আল-কোরআন ৫৭:২৩)

উদ্ধৃত ভাব বা গুণসমুহ ব্রহ্ম স্থিতির লক্ষণ। যিনি ব্রহ্মের স্বভাব বা গুণ প্রাপ্ত হন তিনি ব্রহ্মেই স্থিত। তিনি ব্রহ্মের স্বভাব, প্রকৃতি বা গুণ বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

● **৫.২১** জাগতিক বিষয়ে অনাসক্ত এমন মানুষ আত্মায় সুখ অনুভব করেন। জগতে কিছুই নিজের না। স্থায়ীও না। এখানে কোন কিছুর অধিকার বৃথাই অধিকার, বৃথাই কর্তৃত্ব। এমন জ্ঞানে বিষয় সুখজনিত জাগতিক সকল আসক্তি পরিত্যাগ করেন। কোন আক্ষেপ অন্তরকে বিচলিত করে না। তেমন মানুষ নিজেই নিজের ভেতরে বা আত্মায় পরম সুখের অনুভূতি লাভ করেন। তিনিই প্রকৃত সুখী।

বস্তুত সুখটাই আসল। যারা বিষয়ের পেছনে ছুটে তারাও এই সুখের পেছনেই ছুটে, কিন্তু জ্ঞান বিবর্জিত হয়ে সুখকে বিসর্জন দিয়ে। আত্মাতে বা নিজের মধ্যে নিজেই যিনি তৃপ্ত তিনিই প্রকৃত সুখী।

জড় জাগতিক বিষয় অর্জনে প্রানান্তকর কষ্ট করতে হয়। কষ্ট করতে গিয়ে সুখকেই বিসর্জন দিতে হয়। ব্যাস্ততার কারণে আপাতদৃষ্টে প্রাপ্ত সে সুখ তৃপ্তি সহকারে উপভোগও করা সম্ভব হয় না। নানান চিন্তা তাড়িয়ে বেড়ায়। সুখের পেছনে ছুটতে গিয়ে জাগতিক বন্ধনে এমনভাবে আবদ্ধ হয় যে তারা না পারে ছেড়ে দিতে, না পারে ধরে রাখতে। সুখটাকেই বিসর্জন দিতে হয়।

● **৫.২২** ইন্দ্রিয় ও তার বিষয়ের সংযোগের ফলে সুখানুভূতির উদয় হয়। জীব তার পেছনে ছুটে বেরায়। কিন্তু এ দেহ অনিত্য। ইন্দ্রিয়ও অনিত্য। সুখানুভূতিও অনিত্য। এর শুরু আছে আবার শেষও আছে। বুদ্ধিমানগণ ক্ষণস্থায়ী কোন কিছুর প্রাপ্তিতে মোহাবিষ্ট হয়ে আকৃষ্ট হন না।

ইন্দ্রিয়সমুহের সাথে কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ যুক্ত থাকে। যদিও সাময়িক সুখ ভোগ হয় তথাপি এগুলির ফল পরবর্তীতে দুঃখেরও কারণ হয়ে দাড়ায়। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তি তাতে উৎফুল্ল হন না। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৩	দেহ ত্যাগ করার পূর্বে এ সংসারেই যিনি কাম, ক্রোধ থেকে উদ্ভূত টান সহ্য করতে সক্ষম- তিনিই যোগী, তিনিই সুখী মানুষ।
২৪	যিনি আত্মাতে সুখ অনুভব করেন, আত্মাতে ক্রিয়াশীল-উল্লসিত, আত্মাই যার আলোকিত- নিশ্চিতভাবে তিনি যোগী। তিনি ব্রহ্মে স্থিত এবং পরিশেষে ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন।

● **৫.২৩** কাম, ক্রোধ ভীষনভাবে টানে। জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ করে। মানুষকে মন্দ কাজে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করে। কিন্তু যিনি আমরণ কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করতে পারেন তিনিই যোগী- তিনিই প্রকৃত সুখী।

সংসারে এবং বিষয়ের মধ্যে থেকে কাম-ক্রোধের বেগ সংবরণ করা কঠিন। সন্ন্যাসবাদ বলে সংসারে থেকে ইহজীবনে মুক্তি অসম্ভব। তাই তারা সংসার ত্যাগ করেন।

তবে কি মানুষ মৃত্যুর পরে এসব প্রবৃত্তিকে দমন করবে? গীতা বলে সংসারে থাকা অবস্থায়ই এগুলিকে দমন করতে হবে। যেন সংসার জীবন ও সংসার পরবর্তীতেও এর সুফল লাভ হয়। জীবিতাবস্থায় এর সুফল লাভ করতে না পারলে প্রকৃত সুখ কোথায়? তাই দেহ ত্যাগ করার পূর্বেই এগুলিকে দমন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং এ জীবনেই বন্ধন ও যন্ত্রনা মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে ও সুখ লাভ করতে হবে।

যোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমুহকে দমন করার পন্থা যেখান থেকে কাম-ক্রোধের উৎপত্তি। যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পেরেছেন তিনি কাম-ক্রোধ থেকে উদ্ভূত টান সহ্য করতে সক্ষম- তিনিই যোগী।

কাম-ক্রোধ মানুষকে উপদ্রব করে। দমন করা সম্ভব হলে উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তেমন মানুষ উপদ্রবহীন প্রকৃত সুখ লাভ করেন। তাই বলা হচ্ছে যে যোগীই প্রকৃত সুখী।

● **৫.২৪** যিনি আত্মাতে সুখ অনুভব করেন, ভেতর থেকে যিনি জাগরিত বা উৎফুল্ল তিনিই সত্যিকার যোগী। কেননা সুখের অনুভূতি লাভ, জাগরিত আত্মাকে প্রাপ্তি এগুলি যোগ সাধনার ফল। তেমন মানুষের সকল প্রকারের দুঃখের নিবৃতি ঘটে। সুখের অনুভূতি কিংবা আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে তেমন একজনের ব্যাহ্য বিষয়ের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানের আলোয় নিজ আত্মাই তাঁর আলোকিত। ভেতর থেকে তিনি অনুপ্রাণীত। তিনি ব্রহ্মে স্থিত। তিনি ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন। যার অর্থ হচ্ছে মায়াবদ্ধ বিভ্রান্ত জীবের আমিত্বভাব বা সে চেতনার লয় এবং উচ্চতর আত্মাতে সমর্পন। কারা নির্বাণ লাভ করেন? বলা হচ্ছে,

২৫	সংযত চিত্ত, সকল প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে, যিনি সমস্ত জীবের কল্যাণে রত- তেমন নিষ্পাপ ঋষিগণ ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন।
২৬	কাম-ক্রোধ মুক্ত, সংযতচিত্ত ও আত্মদর্শী সন্ন্যাসীদের অচিরেই ব্রহ্ম নির্বাণ উপস্থিত হয় ।

• **৫.২৫** কতগুলি কথা খুব প্রচলিত। যেমন ভগবানের সেবা করা, কেউ বলেন আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা। কথাগুলির প্রকৃত অর্থ কি? কোথায় পাব আমরা ভগবান বা আল্লাহকে?

তিনি বিরাজ করেন সকল জীবের হৃদয়ে। তাই বলা হয়েছে, যিনি সমস্ত জীবের কল্যাণে রত- তেমন নিষ্পাপ ঋষিগণই ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন। জীবের কল্যাণের মধ্য দিয়েই ভগবানকে পাওয়া সম্ভব।

ভগবান কিংবা আল্লাহকে পেতে হলে বা তাঁর সেবা করতে হলে, কিংবা তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করতে হলে জীবের কল্যাণে কাজ করতে হবে। জাগতিক ও মহাজাগতিক কল্যাণকল্পে অংশগ্রহণ করা, প্রকৃতি ও পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষন ও তার সুরক্ষায় অংশ নেয়া, সমাজে শৃংখলা রক্ষায় কাজ করা- এ সবই ভগবানের তরে করা কাজ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে; প্রকারান্তরে যার সুফলভোগী মানুষ নিজেই।

উদ্ধৃত কর্মগুলির সাথে সমস্ত জীবের টিকে থাকারও সম্পর্ক আছে। তাই বলা হয় সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এসবই ভগবান বা আল্লাহর তরে করা কাজকে বোঝায়। এগুলিই যজ্ঞের কাজ। এ ধরণের কাজে নিজের দেনা-পাওনা থাকে না। কোন বন্ধন বা পিছুটান থাকে না। কাজ করেও মুক্ত থাকা যায়। তাই বলা হয়েছে যারা সংযত চিত্ত, দ্বন্দ্ব ভাবসমুহের উর্ধ্বে এবং সমস্ত জীবের কল্যাণে রত তেমন পবিত্র জ্ঞানসম্পন্ন মানুষই ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন। নির্বানই মুক্তি।

• **৫.২৬** কাম-ক্রোধ মুক্ত, সংযতচিত্ত ও আত্মদর্শী সন্ন্যাসীরাই দ্রুত ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন। কাম-ক্রোধ ও চিত্ত সংযত করতে ইন্দ্রিয়সমুহকে দমন করতে হয়। তাই যোগে যুক্ত হতে হয়। কিভাবে যোগ সাধনা করতে হবে? বলা হচ্ছে,

২৭	ব্যাহ্যিক সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দুয়ার বন্ধ রেখে; চক্ষু ও দৃষ্টি দুই ভ্রুর মধ্যখানে নিবদ্ধ রেখে; নাসিকায় বিচরণশীল অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী প্রাণবায়ু রোধ করে; ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত রেখে; বাসনা, ভয় ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে- যিনি সর্বদা বিরাজ করেন তেমন আধ্যাত্মিক ব্যাক্তি নিশ্চিতভাবেই মুক্ত। [২৭-২৮]
২৯	আমাকে সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা বা সর্বশেষ লক্ষ্য জেনে, সর্বলোকের

	পরম ঈশ্বর ও সমস্ত জীবের সুহৃদ জেনে- যোগীরা শান্তি লাভ করেন।

• **৫.২৭-২৮** যোগে যুক্ত হয়ে কিভাবে সমাধিস্ত হতে হয় এখানে সেটি বলা হয়েছে। এটি রাজযোগ, সমাধিযোগ, চিত্তনিরোধ যোগ বিভিন্ন নামে পরিচিত। এ যোগের আটটি অঙ্গ আছে। তাই অষ্টাঙ্গযোগও বলা হয়।

অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে সমাধিস্ত হয়ে যেভাবে ব্রহ্ম নির্বাণের স্তরে উন্নীত হওয়া যায় এখানে সে বিষয়ে বলা হয়েছে। বহির্মূখী চঞ্চল মনকে সংযত করে আত্মস্থ করার এটি একটি উপায় বা পদ্ধতি বিশেষ। এর মাধ্যমে ব্যাহ্য বিষয় থেকে মনকে প্রত্যাহার করা হয়। অন্য কোন দিকে মনোনিবেশের সুযোগ দেয়া হয় না। এভাবে বহিঃর্মূখী মনকে সংযত করে আত্মায় নিবিষ্ট করা হয়।

এই যোগ অন্তরজনিত ইচ্ছা-ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হতে সহায়তা করে। এভাবে শুদ্ধ-পবিত্র ও অপ্রাকৃত সত্ত্বাময় অবস্থায় পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব হয়। যোগে সফল মানুষই কেবল সেটি উপলব্ধি করতে পারেন। যিনি এভাবে বিরাজ করতে পারেন তিনিই মুক্ত। কিন্তু মুক্তি লাভ করে কি হবে?

• **৫.২৯** মুক্তি হচ্ছে বন্ধন মুক্তি। কিসের বন্ধন? বন্ধন হচ্ছে জড় প্রকৃতির বন্ধন; কর্মবন্ধন; জগতের মায়ার বা টানের বন্ধন। বন্ধনলব্ধ যে অনিত্য সুখ সে সুখ বন্ধনের আরও বড় কারণ। বন্ধন থেকেই সকল যন্ত্রনার উৎপত্তি ও অনুভব হয়। অতএব বন্ধন মুক্তি হচ্ছে যন্ত্রনার অবসান। যন্ত্রনার অবসানেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ হয়। এ সুখ ও শান্তি বিষয়ভোগ থেকে উচ্চতর। কিন্তু সেটি লাভ করা খুব সহজও নয়।

মানুষ এমনভাবে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে যে মুক্ত হওয়ার জন্য তাকে যে জ্ঞান লাভ ও কর্ম করতে হবে মায়ার এ বন্ধন ছেড়ে সে তা করতে চাইবে না। সে কারণেই তো এটিকে বন্ধন বলা হয়। কঠিন এ বন্ধন। এর দ্বারাই জীবকে কঠিনভাবে জড় প্রকৃতিতে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে চাই সত্যের জ্ঞান। নিজেকে জানতে হবে। নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। আমি কে? কোথা থেকে এলাম? কে পাঠাল? কেন পাঠাল? তার সাথে সম্পর্ক কি? কিভাবে এ সম্পর্ক ধরে রাখতে হবে? জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি? আত্ম তত্ত্বজ্ঞান ও পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

জীবন ও জগতের অনিত্যতাকে বুঝতে হবে। এখানে নিজের কারণে কোন কিছুর পেছনে ছুটে চলা মিছেই ছুটে চলা। সব ক্ষণস্থায়ী। যেমন বলা হয়েছে,

“প্রতিটি প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে ... পার্থিব জীবনের আনন্দ মিছে মরিচীকা।” (আল-কোরআন ৩:১৮৫)

ভগবান সর্বলোকের পরম ঈশ্বর। সকল কর্ম যজ্ঞের তিনিই একমাত্র লক্ষ্য। বিষয়গুলি উপলব্ধিতে আসতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

“তোমার প্রতিপালক, তিনিই সকল কর্ম-প্রচেষ্টার মূল বা সর্বশেষ লক্ষ্য।” (আল-কোরআন ৫৩:৪২)

ভগবান জীবন দান করেছেন। বেঁচে থাকার সকল কিছু তিনিই সরবরাহ করছেন। সমস্ত জীবের তিনিই একমাত্র সুহৃদ। মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

“আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই।” (আল-কোরআন ২৯:২২)

সামধিস্থ বা ধ্যানমগ্ন হয়ে যারা বিষয়গুলিকে এভাবে বুঝতে শিখেছেন, যথাযথ জ্ঞানের কারণে জাগতিক বিষয় তাদেরকে আর টানে না। মানসিকভাবে জাগতিক সকল বন্ধন ছিন্ন করে তারা ঈশ্বর ভাবনায় মগ্ন থাকেন। সর্বদা ভগবানের সান্নিধ্যে থাকেন। জগতের সর্বাধিপতির সাহচর্যে থাকার কারণে ক্ষুদ্র বিষয়ে তারা মনোনিবেশ করেন না। তাদের কোন জাগতিক চাওয়া-পাওয়া থাকে না। কোন কিছু হারাবার ভয় থাকে না। এতে তাদের সকল যন্ত্রনার অবসান হয়। যোগী এভাবে অনাবিল শান্তি লাভ করেন। অষ্টাঙ্গ যোগেরও লক্ষ্য হচ্ছে এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ধ্যানযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ৪৭)

সারকথা : অর্জুন শোক ও সংসার যাতনা থেকে মুক্তি লাভের জন্য কর্ম ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধন মুক্তির জন্য কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেয়। দু'টোই মুক্তির পথ। তবে সবাই যদি কর্ম ত্যাগ করে তবে জগত চলবে কিভাবে? বলা হচ্ছে, সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম যজ্ঞের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞই হচ্ছে কর্ম। কর্মযোগে যজ্ঞের কর্ম করে ভগবানকে প্রাপ্ত হলে মুক্তি লাভ হয়।

অশান্ত চিত্তে ভগবানকে পাওয়া যায় না। বহির্মূখী ভাবনা চিত্তকে অশান্ত করে তোলে। ভগবানে মনোনিবেশে চিত্তকে তাই শান্ত করতে হয়। ধ্যানযোগে সমাধিস্ত হয়ে কিভাবে ভগবানকে পাওয়া যায় অধ্যায়ে সে বিষয়ে বলা হয়েছে। অতএব কর্ম ত্যাগের প্রয়োজন নেই। কর্ম করেও মোক্ষ লাভের উপায় আছে। সেটি কল্যাণকর।

১	শ্রীকৃষ্ণ বলেন: কর্মফলের আকাংখা না করে, কর্তব্য মনে করে যিনি কর্ম করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী বা যোগী। কিন্তু যিনি যজ্ঞ ত্যাগী ও একেবারেই নিষ্ক্রিয় তিনি নন।
২	যাকে সন্ন্যাস বলা হয় তাকেই যোগ বলে জানবে, হে পান্ডব! কেননা সংকল্প ত্যাগ না করে কেউই যোগী হতে পারে না।

● **৬.১** সন্ন্যাসী বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যিনি জীবন ও জগত সংসারের সকল কর্ম পরিত্যাগ করেছেন তেমন কাউকে। কিন্তু এখানে সে ভূল ধারণার সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, যিনি যজ্ঞ কিংবা সকল কর্ম ছেড়ে একেবারেই নিষ্ক্রিয় তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী নন। যিনি কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন, অথচ অন্তরে সে কর্ম থেকে উৎসারিত ফল ভোগের বাসনা রাখেন না তিনিই প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী।

● **৬.২** যোগ হচ্ছে ভগবানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একটি পন্থাবিশেষ। যে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হলে কর্মের ফল ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়। কিন্তু মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত না করে চঞ্চল চিত্তে সে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। তাই যোগ

হচ্ছে মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করারও পন্থা। অর্থাৎ যোগীকে সকল প্রকার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনিত কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে হয়। এটিই সংকল্প ত্যাগ।

সন্ন্যাস হচ্ছে ত্যাগ। সকল কর্ম ত্যাগ। বস্তুত সকল কর্ম ত্যাগ সন্ন্যাস নয়। তাই বলা হয়েছে যিনি একেবারেই নিষ্ক্রিয় তিনি সন্ন্যাসী নন। সন্ন্যাস হচ্ছে সকাম কর্ম ত্যাগ। সকাম কর্ম হচ্ছে অন্তরে যে কর্মের ফল ভোগের বাসনা থাকে তেমন কর্ম।

প্রকৃত সন্ন্যাস হচ্ছে সকাম কর্ম ত্যাগ। অর্থাৎ সন্ন্যাসী কর্ম করেন তবে তিনি নিষ্কামকর্ম করেন। নিষ্কামকর্ম হচ্ছে অন্তর থেকে যে কর্মের ফল ভোগের বাসনা ত্যাগ করা হয়েছে তেমন কর্ম।

সন্নাসী কর্মের ফল ভোগের বাসনা ত্যাগ করেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা ত্যাগ করেন। যোগীকেও সকল প্রকার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা ত্যাগ করতে হয়। যোগী ও সন্ন্যাসী উভয়কেই ত্যাগী হতে হয়। অতএব সন্ন্যাস যা যোগও তা। সেজন্যই বলা হয়েছে যে, যাকে সন্ন্যাস বলা হয় তাকেই যোগ বলে জানবে। কেননা ত্যাগের সংকল্প না করে কেউই যোগী হতে পারে না। অতএব বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসও যথাযথভাবে হতে হবে। সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে ভূল পথে চললে সেটি যথার্থ সন্ন্যাসরূপে বিবেচিত হবে না। যেমন বলা হয়েছে,

"বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসবাদ ... তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটি অবলম্বন করেছে। তথাপি তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি।" (আল-কোরআন ৫৭:২৭)

৩	যোগে আরোহনে ইচ্ছুক অর্থাৎ যোগারুরুক্ষ মুনির জন্য কর্মকেই কারণ বলা হয়। কিন্তু যোগারূঢ়র জন্য কর্ম সন্ন্যাসকেই কারণ বলা হয়।
৪	সর্ব সংকল্প ত্যাগী সন্ন্যাসী বা ব্যাক্তি যখন ইন্দ্রিয় বিষয়ে ও কর্মেও আসক্ত হন না তখন তাঁকে যোগারূঢ় বলা হয়।

● **৬.৩-৪** যোগ সাধনার বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ। প্রথম স্তরকে যোগারুরুক্ষ এবং পরবর্তী স্তরকে যোগারূঢ় বলে।

কর্মের সাথে যুক্ত থেকে যিনি যোগ সাধনা করেন তাকে বলা হয় যোগারুরুক্ষ। অর্থাৎ এ অবস্থায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়েই যোগ সাধনা করে যেতে হয়। এরূপ সাধনায় কর্মই হচ্ছে যোগ সিদ্ধির মূল ভিত্তি।

অপরদিকে জ্ঞানযোগী অর্থাৎ যোগারূঢ়র জন্য কর্ম সন্ন্যাসকেই কারণ বলা হয়। এটি উচ্চতর পর্যায়। এ অবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য কাজ করেন না; কর্মফল ভোগের আকাংখা করেন না। সমস্ত কিছু ত্যাগে সংকল্পবদ্ধ থাকেন। যোগ সাধনা কেন করতে হবে বা যোগ সাধনের উদ্দেশ্য কি সে প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৫	আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করা কর্তব্য। আত্মাকে অধঃপতিত করা উচিত নয়। এই আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার শত্রুও।
৬	যে আত্মা দ্বারা আত্মাকে জয় করতে পেরেছে আত্মাই সে আত্মার বন্ধু। কিন্তু যে আত্মা আত্মাকে বশ করতে পারেনি আত্মা শত্রুবৎ তার অপকারে প্রবৃত্ত হয়।

• **৬.৫-৬** আত্মা বলতে প্রতিটি জীবের বা ব্যাক্তির নিজ সত্ত্বাকে বোঝায়। আত্মাই 'আমি'র প্রতিনিধিত্ব করে। তাই কোন মানুষেরই উচিত নয় আত্মাকে বা নিজেকে অধঃপতিত করা। যদি তেমন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তবে নিজেই নিজেকে উদ্ধার করা কর্তব্য। তাই বলা হয়েছে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করা কর্তব্য। যেমন বলা হয়েছে,

"সে ই সত্যিকার অর্থে সফল যে আত্মাকে বিকশিত করে এবং সে ই সত্যিকার অর্থে ব্যার্থ যে এটিকে স্থবির করে রাখে।" (আল-কোরআন ৯১:৯-১০)

ভাল ও মন্দ দু'টো প্রবৃত্তিই আত্মা তথা জীব বা মানুষের মধ্যে আছে। যে আত্মা তার মন্দ প্রবৃত্তিকে দমন করে ভাল প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছে সে নিজেই তার বন্ধুরূপ হয়ে যায়। নিজেকে অধঃপতিত হতে দেয় না। যেমন বলা হয়েছে,

"যে নিজেকে ভাল পথে বিকশিত করে তার উপকারভোগী সে নিজেই।" (আল-কোরআন ৩৫:১৮)

অপরদিকে যে মন্দ প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারেনি সে নিজেই নিজের অপকারে প্রবৃত্ত হয়। তার অবিবেচনা প্রসূত কীর্তিকলাপ তার নিজেরই ধ্বংস ডেকে আনে। সে নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে। আত্মা তখন শত্রুবৎ তার অপকারে প্রবৃত্ত হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"যে নিজেকে ভূল পথে চালিত করে আল্লাহ তাকে পথ দেখান না।" (আল-কোরআন ১৬:৩৭)

অজ্ঞতার কারণে মানুষ ভূল পথে চলে। মন্দ কাজ করে। নিজেই নিজের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। অপরদিকে জ্ঞান মানুষকে নিজেকে চিনতে ও জানতে সাহায্য করে। পরমাত্মার সাথে সম্পর্ক অনুধাবনে সহায়তা করে। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিষয়ে যথযথ উপলব্ধিতে নিয়ে আসে। এখানেই যোগ সাধনার গুরুত্ব নিহিত। যোগে সমাধিস্ত হয়ে ধ্যানমগ্ন হলে সত্যের জ্ঞান দিনের আলোর মতো সাধকের সামনে প্রকাশ পায়। নিজেকে তখন নিজে অধঃপতিত হতে দেয় না। নিজেই নিজেকে উদ্ধারে সচেতন ও তৎপর থাকে। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ পরক্রমশালী, শক্তিধর।" (আল-কোরআন ২২:৪০)

অতএব আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার আত্মাই আত্মার শত্রু। নিজেকে নিজেরই উদ্ধার করতে হয়। অন্য কেউ উদ্ধার করে দিতে পারবে না।

উপস্থাপনা ভিন্ন হলেও সকল শাস্ত্রের মূল বক্তব্যগুলি একই প্রকার। যিনি আত্মাকে জয় করতে পেরেছেন বা যোগ সাধনায় সফল হয়েছেন তাকে কিভাবে চেনা যাবে?

৭	যিনি আত্মাকে জয় করেছেন তেমন প্রশান্ত ব্যাক্তির পরমাত্মা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান-অপমানে অবিচল থাকে।
৮	জ্ঞান ও আত্ম-উপলব্ধিবোধে তৃপ্ত আত্মা, নির্বিকার, যিনি ইন্দ্রিয়সমুহকে জয় করেছেন তেমন একজনকেই যোগে যুক্ত বা যোগারূঢ় বলা হয়। তাঁর কাছে নুড়ি, পাথর, সোনা সব একইরকম।
৯	যারা সুহৃদ, শত্রু-মিত্র বিষয়ে উদাসীন; বিদ্বেষ পোষনকারী ও বন্ধুতে নিরপেক্ষ; সাধু কিংবা পাপীকে একই দৃষ্টিতে দেখে- এ পথে তারা আরও অগ্রসর।

- **৬.৭** যিনি আত্মাকে জয় করতে পেরেছেন তাঁর চিত্ত প্রশান্ত হয়ে যায়। অন্তরে সর্বদা শান্তি বিরাজ করে। মনের চঞ্চলতা দুর হয়। তেমন মানুষ শীত-উষ্ণ, সুখ-

দুঃখ, মান-অপমান এমনসব দ্বন্দ্বভাবে বিচলিত হন না। সর্বাবস্থায় স্থির-অবিচল থাকেন।

● **৬.৮** আত্মজ্ঞান ও আত্ম-উপলব্ধির কারণে যে আত্মা নিজের ভেতরে নিজে তৃপ্তি অনুভব করেন, জাগতিক বিষয়ে নির্বিকার বা উদাসীনের মতো থাকেন তিনিই যোগে যুক্ত। তাকেই যোগারূঢ় বলা হয়। তিনি ইন্দ্রিয়সমুহকে জয় করেছেন। তাই ইন্দ্রিয়ের বিষয় তাকে আন্দোলিত করতে পারে না।

তেমন মানসিক অবস্থার একজনের দৃষ্টিতে নুড়ি, পাথর, সোনা সব একইরকম। তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। কোন কিছুতে ভেদাভেদ করেন না। তার কাছে মূল্যবান কেবল পরমেশ্বর। আর সব একই প্রকার। মূল্যহীন।

● **৬.৯** কতগুলো বিষয় সহজ। যেমন স্বর্ণের টুকরো ও মাটির ঢেলাকে একই প্রকার দেখা। কতগুলো বিষয় সহজ ও স্বাভাবিক যেমন সুহৃদ ও মিত্রের বিষয়ে উদাসীন থাকা। কেননা এসব দিক থেকে ক্ষতি বা ভয়ের কোন আশংকা থাকে না।

কিন্তু যারা শত্রু ও মিত্র উভয় বিষয়ে উদাসীন; বিদ্বেষ পোষনকারী ও বন্ধুতে নিরপেক্ষ; সাধু ও পাপীকে একই দৃষ্টিতে দেখেন তাঁরা সাধারণ নন। অন্তরে তিনি নিজে শত্রুকেও বন্ধুর মতই দেখেন। একজন সাধারণ মানুষের মতই দেখেন। কিন্তু শত্রু তাকে শত্রু ভাবে যেটি শত্রুর মানসিক বৈকল্য। এমন দৃষ্টিভঙ্গী যাদের তারা এ পথে আরও বেশী অগ্রসর।

যোগী সাধু কিংবা পাপী দেখেন না। যোগী দেখেন সবই ভগবানের সৃষ্ট মূল্যবান জীব। সকলেই তার যথাযথ স্থানে প্রয়োজনীয় কর্ম করে চলেছে। যে কর্ম ভগবানই কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই সকলের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সমান। সকল সৃষ্টিকে তিনি একই দৃষ্টিতে দেখেন। সাধু কিংবা পাপীকেও সম দৃষ্টিতে দেখেন।

পাপীকে পাপী কিংবা মন্দকে মন্দ হিসেবে না দেখে তিনি পরিবেশ পরিস্থিতি, জীবের সক্ষমতা-অক্ষমতা কিংবা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার বিষয়গুলিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। জীবের অসহায়ত্বকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। তাই তিনি তাদের প্রতিও সহানুভূতিশীল হন এবং প্রত্যাশা করেন যেন তারাও সঠিক জ্ঞানের পথে ফিরে

আসতে পারে। তাদের জন্যও তিনি ভগবানের কাছে আশীর্বাদ করেন, কিংবা তিনি বিষয়গুলিকে দৈবরূপেও দেখে থাকতে পারেন।

সর্ববিষয়ে চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গীর এই সমতা বা নিরপেক্ষতাকেই এখানে নির্বিকার বা উদাসীন বলা হয়েছে। এই সমচিত্ততা লাভের উপায় কি?

এটি সম্ভব হয় সবকিছুর উৎস ভগবানকে জানার কারণে। তিনি জানেন সকলের ভেতরে একই জন বিরাজ করেন। যোগী সর্বত্র ভগবানকে দেখেন।

যোগী একাগ্রচিত্তে মনকে নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় বা ধ্যানে মগ্ন রাখেন। এরই নাম 'সমাধি'। বস্তুত সত্যিকার যোগী সর্বদাই সমাধিস্থ বা ধ্যানমগ্ন থাকেন। সমাধিস্থ হতে চাইলে কি করতে হবে? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১০	নির্জন স্থানে একাকী অবস্থান করে যোগী সবসময় নিজেকে সমাধিযুক্ত করবেন। চিত্ত সংযত রেখে, নিস্পৃহ হয়ে, কোনরূপ দখলি বা মালিকানাসূচক অনুভূতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়।
১১	পরিচ্ছন্ন স্থানে, যা অতি উচুও নয়, অতি নিচুও নয়; কুশা ঘাস বিছিয়ে, তার ওপরে মৃগচর্ম ও তার ওপরে বস্ত্র বিছিয়ে, নিজের আসন স্থাপন করতে হবে। সেই আসনে স্থির চিত্তে উপবেশন করে, ইন্দ্রিয় কার্যকলাপ ও মনকে সংযত করে, অন্তকরণ শুদ্ধ করার জন্য একাগ্র হয়ে যোগাভ্যাস করতে হবে। [১১-১২]
১৩	দেহ, মস্তক ও গ্রীবা একই সরল রেখায় রেখে, নিশ্চল ও স্থির হয়ে, দৃষ্টি নাসিকার অগ্রভাগে নিবদ্ধ রেখে এবং কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে, প্রশান্ত চিত্তে, নির্ভয়ে, ব্রক্ষ্মচর্য ব্রতে স্থিত হয়ে, মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে, আমাতে চিত্ত সমর্পন করে, আমাকে পরম লক্ষ্য নির্ধারণ করে যোগাভ্যাস করতে হবে। [১৩-১৪]
১৫	সর্বদা এইভাবে অভ্যাস করে যোগী দেহ, মন ও আত্মাকে সংযত করে জড় বন্ধন মুক্ত হয়ে আমাতে স্থিতিরূপ শান্তি লাভ করেন।

● **৬.১০** নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় মনকে একাগ্র করার নামই হচ্ছে সমাধি। সমাধিস্থ হতে হলে নির্জন স্থানে একাকী অবস্থান করা উত্তম। সতর্কভাবে অনুকূল পরিবেশ

গ্রহণ ও প্রতিকূল পরিবেশ পরিত্যাগ করতে হবে। ব্যাহ্য পরিবেশ যেন বিরক্তির কারণ বা ধ্যানের প্রতিবন্ধক হতে না পারে কিংবা মনোনিবেশের অনুকূল হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

ব্যাহ্য পরিবেশ ছাড়াও অন্তরের পরিবেশও অনুকুল হতে হবে। পাপমুক্ত ও পবিত্র হতে হবে। চিত্তকে বিষয় ভাবনা থেকে সংযত রাখতে হবে। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেন কোনভাবেই বিচলিত করতে না পারে। বিষয়সমুহের ক্ষেত্রে নিস্পৃহ ভাব বজায় রাখতে হবে। ইন্দ্রিয় বিষয়ে মনযোগ দেয়া যাবে না। তাহলে ধ্যানমগ্ন হওয়া বিঘ্নিত হবে।

দখলি বা মালিকানাসূচক ভাব বা ইচ্ছে অন্তর থেকে দুর করতে হবে। এটি থাকা মানে পার্থিব বিষয়ের প্রতি মোহ থাকা। এটি থেকে মুক্ত হতে হবে। যোগী জানেন যে জগতের সবই ভগবান বা আল্লাহর। কোন কিছুই তাঁর নিজের না। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।" (আল-কোরআন ৩:১০৯)

এভাবে জেনে এ অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। ভগবান ব্যাতিত সবকিছুর ভাবনা পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় জাগতিক ভাবনায় চিত্ত বিচলিত হবে। অতঃপর গভীর মনযোগের সাথে আত্মায় ধ্যান দিতে হবে। সমাধিস্ত হতে হলে এভাবে ধ্যনযোগের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

• **৬.১১-১২** ধ্যানস্ত হওয়ার জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণ স্থানে আসনে বসতে হবে। চিত্তকে স্থির ও শান্ত রাখতে হবে। ইন্দ্রিয় কার্যকলাপ ও মনকে সংযত করে অন্তকরণকে শুদ্ধ করার জন্যই মূলত একাগ্রচিত্তে যোগাভ্যাস করতে হবে।

• **৬.১৩-১৪** যোগাসনের জন্য দেহ, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রেখে বসতে হবে। দৃষ্টি একভাবে রাখা বাঞ্ছনীয়। কোনদিকে দৃষ্টিপাত করা কাম্য নয়। মনকে সংযত রেখে নিশ্চল, স্থির ও প্রশান্ত চিত্তে আসনে বসতে হবে। আসনে বসে কি করবেন? সমাধিস্ত বা ধ্যানস্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন। কি ধ্যান করবেন? ভগবানে চিত্ত সমর্পন করে তাঁকেই পরম লক্ষ্য জেনে তাঁর ভাবনায় মনোনিবেশ করতে হবে।

এভাবে ধ্যানমগ্ন বা সমাধিস্ত হয়ে নিজেকে জানার চেষ্টা করতে হবে। আমি কে? কোথা থেকে কিভাবে এলাম? কে সৃষ্টি করল? তাঁর সাথে সম্পর্ক কি? কিভাবে সে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়? কিভাবে সে সম্পর্ক ধরে রাখা যায়? কেন তিনি জগত সৃষ্টি করেছেন? সৃষ্টির লক্ষ্য কি? ধ্যানমগ্ন হয়ে এভাবে নানান প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। এভাবেই ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান লাভের পথে এগিয়ে যেতে হয়।

সাধনা বলে একসময় সত্যের জ্ঞান উন্মোচিত হয়ে যায়। দিনের আলোর মতো সব রহস্য প্রকাশ পায়। সাধক একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সত্যের জ্ঞান অন্তকরণকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে। লভ্য জ্ঞানে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। বিশ্বাসে স্থির-অবিচল হন। এভাবেই আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

জীবনের পরম পাওয়া হচ্ছে সাধনা থেকে অর্জিত আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস মানুষকে চলতে সাহায্য করে। বিপদ মোকাবেলা করতে সাহায্য করে। বিপদ থেকে উদ্ধার করে। নিজেকে দৃঢ়চিত্ত করে গড়ে তোলে। আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমেই পরমাত্মা ভগবান বা আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনের সৃষ্টি হয়।

মানুষ কর্ম করে ফলভোগের বাসনাকে আশ্রয় করে। ফলভোগ হচ্ছে কর্মের প্রেরণা। কিন্তু সন্ন্যাসী বা যোগী কর্ম করেন ফলভোগের বাসনা ত্যাগ করে। সন্ন্যাসী বা যোগীর নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা কোথা থেকে আসে? নিশ্চয়ই তাদেরকেও বিকল্প কিছু একটার আশ্রয় নিতে হয় যাকে আশ্রয় করে তারা অন্তরের সকল কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করেও কর্ম করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন।

তাদের প্রেরণা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান বা আল্লাহ! তারা ভগবান বা আল্লাহকে আশ্রয় করে কর্মের ফল থেকে শুরু করে জাগতিক সবকিছু ত্যাগ করেন। কত বড় ত্যাগ ভাবা যায়! সাধারণের পক্ষে এভাবে কাজ করা সম্ভব না। এখানেই যোগী ও সন্ন্যাসীর মহাত্ম!

তাদের হৃদয়ে এমন কি ঘটে যে তাদের দ্বারা এভাবে কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে? সত্যি বলতে চাইলেও কেউ এভাবে কর্ম করতে পারবে না। চিত্তের সে দৃঢ়তা স্বয়ং ভগবানের আশীর্বাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। তেমন সৌভাগ্যবান হওয়ার আশায় নিরন্তর সাধনায় যুক্ত থাকতে হয়। সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করতে হয়। সেজন্যই যোগাসনে

বসে সমাধিস্ত হয়ে পরমেশ্বরে ধ্যানমগ্ন হতে বলা হয়। ভগবানকে লাভ করার এটি একটি উপায় বা পথ। তাই বলা হয়েছে,

"... অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" (আল-কোরআন ২৯:৪৫)

ধ্যানস্ত হওয়ার আগ্রহের কারণে যোগী সর্বদা নির্জনতা ও একাকীত্ব পছন্দ করেন। ভগবান বা আল্লাহর সঙ্গ ব্যাতিত অপর কিছু তাঁর পছন্দনীয় নয়। এমন বিশুদ্ধ ভক্তই হচ্ছেন প্রকৃত যোগী। যোগী সর্বদাই অপ্রাকৃত স্তরে অবস্থান করেন। এতে কি লাভ হয়?

• **৬.১৫** জড় জগতের প্রতি টান বা আকর্ষন মানুষকে জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ করে। এতেই যত প্রকারের দুঃখ-কষ্টের উদ্ভব হয়। জীব সে যন্ত্রনা ভোগ করে। উদ্ধৃত পন্থায় যোগের অভ্যাস বা চর্চ্চা করা হলে দেহ, মন ও আত্মা সংযত হয়।

চিত্তকে সংযত করা গেলে ভবরোগের নিবৃতি হয়। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়। এ মুক্তি অন্তরে অপার শান্তি বয়ে নিয়ে আসে। যোগী তখন অপ্রাকৃত স্তরে অবস্থান করে এবং ভগবানে স্থিতিরূপ প্রশান্তি লাভ করে। যেমন বলা হয়েছে,

"... অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ দ্বারা অন্তরসমুহ প্রশান্তি লাভ করে।" (আল-কোরআন ১৩:২৮)

শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৬	হে অর্জুন! না অতি ভোজনকারীর, না অত্যল্প আহারকারীর যোগ হয়; না অত্যান্ত নিদ্রাশীল, না অতি নিদ্রাহীন ব্যাক্তির।
১৭	যার আহার-বিহার, কর্ম-প্রচেষ্টা, নিদ্রা-জাগরণ সবকিছু পরিমিত- যোগ অভ্যাসের দ্বারা তারই দুঃখের নিবৃত্তি হয়।
১৮	চিত্ত ও মনের কার্যলকাপ যখন বিশেষভাবে সংযত হয় এবং সকল প্রকার কামনা-বাসনার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে নিশ্চিতভাবে আত্মাতে অবস্থান করে, তখন যোগ লাভ হয়েছে বলে বলা হয়।

• **৬.১৬-১৭** ইন্দ্রিয় তৃপ্তির লোভে মানুষ অতিভোজ করে। অথচ ইন্দ্রিয়কে সংযত করাই হচ্ছে যোগের লক্ষ্য। ফলে অতিভোজী প্রথমেই যোগের শর্ত ভঙ্গ করে। প্রাণ

ধারণের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত আহার হচ্ছে অতিভোজ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহারকারীর যোগ অনুশীলন হয় না।

অপরদিকে শরীরে শক্তির প্রয়োজন আছে। যা আসে আহার থেকে। ফলে যথাযথ যোগী একেবারে উপবাসও থাকেন না। তাতেও যোগ অনুশীলন ব্যাহত হয়।

অত্যাধিক নিদ্রা অলসতা আনে। আবার অতি ভোজের কারণেও অতি নিদ্রা হয়। এগুলি মূল কাজকে ব্যাহত করে। যোগীদেরকে তাদের আহার-নিদ্রায় সংযত হতে হয়। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন যথাযথভাবে এগুলিকে সংযত করা না হলে যোগের পথে এগুলি অন্তরায় হয়ে কাজ করে। তাই বলা হয়েছে আহার-বিহার, কর্ম-প্রচেষ্টা, নিদ্রা-জাগরণ সবকিছু যার পরিমিত যোগ অভ্যাসের দ্বারা তারই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। তিনি যোগ লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হন।

- **৬.১৮** যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে যোগ লাভ করা। যোগ লাভ কি? যোগ লাভ হচ্ছে ভগবানের সাথে সফলভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা। দেহে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে আত্মা। আত্মার মাধ্যমেই ভগবানের সাথে সম্পর্ক রক্ষিত হয়। অতএব যোগ হচ্ছে আত্মাতে নিবিষ্ট হতে পারা।

চঞ্চল চিত্ত আত্মাতে নিবিষ্ট হতে পারে না। কামনা-বাসনা চিত্ত চাঞ্চল্যতার কারণ। তাই কামনা-বাসনার প্রতি নিস্পৃহ হতে হবে। চিত্তকে সংযত করতে হবে। ইন্দ্রিয়সমুহকে দমন করতে হবে। যোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয় দমনের পন্থা। বাসনা নিবৃত হয়ে প্রশান্ত চিত্ত যখন আত্মাতে সফলভাবে স্থিত হবে, কেবল তখনই যোগ লাভ হয়েছে বলে বলা যেতে পারে। সফল যোগীর স্বরূপ কেমন হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৯	বায়ুশূন্য স্থানে প্রদীপ যেমন কম্পিত হয় না, তেমন উপমাই যোগীর জন্য প্রযোজ্য যিনি যোগের মাধ্যমে চিত্তকে সংযত করার অভ্যাসে রত।
২০	যোগ অভ্যাসের দ্বারা জড়-জাগতিক বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে চিত্ত যখন নিবৃত হয়, পবিত্র মন তখন নিজেকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেই তুষ্ট হয়ে যায়।
২১	এ অবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয়ের অগোচর বুদ্ধিগ্রাহ্য পরম সুখ অনুভব করেন। যে অবস্থায় স্থিতি লাভ করে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে আর বিচলিত হন না।

২২	এ অবস্থা লাভ করে অন্য কোন লাভকে এর চেয়ে অধিক বলে মনে হয় না। যে অবস্থায় স্থিত হলে মহা দুঃখেও যোগী বিচলিত হন না।
২৩	এ অবস্থাকেই জড় জগতের সংযোগ থেকে উদ্ভূত দুঃখের নিবৃতি তথা মুক্তি বলে জানবে। এটিকেই যোগ বলে। হতাশ না হয়ে অধ্যাবসায়ের সাথে এই যোগের অভ্যাস করা কর্তব্য।

● **৬.১৯** পরিপূর্ণ বায়শূণ্য স্থানে প্রদীপের আলোক শিখা বিন্দু পরিমান কম্পিত হয় না। এটি বিজ্ঞান দ্বারাও পরীক্ষিত সত্য। সত্যিকার যোগীর চিত্তও তেমন স্থির-অবিচল হয়ে থাকে। এটি একটি উদাহরণ।

যিনি যোগের মাধ্যমে চিত্তকে সংযত করার অভ্যাসে রত, সফল হলে তাঁর চিত্ত প্রদীপের উদাহরণের মতো স্থির ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাগতিক বিষয় তাঁকে তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যূত করতে না পারে। পরমেশ্বরের ভাবনা থেকে দুরে সরাতে পারে না।

● **৬.২০** যোগ অভ্যাসে সফল হলে জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে। ফলে চিত্ত জাগতিক বিষয় থেকে নিবৃত হয়। আসক্তি ও কলুষমুক্ত হয়ে আত্মা পবিত্র ও বিশুদ্ধ সত্ত্বায় পরিণত হয়। তখন নিজের প্রশান্তির জন্য বাহিরের কোন উদ্দীপকের আর প্রয়োজন হয় না। সাধক নিজের ভেতরে নিজেই তৃপ্তি অনুভব করেন। চিত্ত আত্মায় গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়। নিজেই নিজের বন্ধু হয়ে যান। নিজেকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে সাধক তুষ্টি লাভ করেন।

পরমাত্মার সংস্পর্শ ব্যাতিত সতন্ত্র আত্মারও কোন অস্তিত্ব নেই। ফলে সমাধিস্থ যোগী চিত্তে পরমাত্মাকে অনুভব করে সর্বোচ্চ তুষ্টি অনুভব করেন।

● **৬.২১-২৩** এ অবস্থায় পরম সুখ অনুভূত হয়। কিন্তু সে সুখ ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা যায় না। জ্ঞানে অনুভূত হয়। এ অবস্থায় যোগী আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। জাগতিক কোন বিষয় তখন আর তাঁকে বিমোহিত-বিচলিত বা আকর্ষনও করতে পারে না।

এ অবস্থা প্রাপ্ত হলে এর চেয়ে নিরাপদ এবং অধিক সুখ ও প্রশান্তি অন্য কিছুতে আছে বলে মনে হয় না। এই সুখের অনুভূতিকে কেউ বর্জন করতে চায় না। সাধক

নিজেকে এ অবস্থায় সর্বদা পরিপূর্ণ অনুভব করেন। ফলে দুঃখেও যোগী বিচলিত বা হতাশ হয়ে যান না। নিজেকে স্থির-অবিচল ধরে রাখতে জানেন।

জড় জগতের সংযোগ হেতু যত প্রকারের দুঃখ-যাতনার সৃষ্টি হয়ে থাকে, স্থির-অবিচল হয়ে টিকে থাকতে পারার এ অবস্থাটিকে তার নিবৃতি বলা হয়। এ অবস্থাতে সকল যন্ত্রনা থেকে সত্যিকারের মুক্তি লাভ হয়। প্রকৃত অর্থে এটিকেই যোগ বলে। যোগ এখানেই পূর্ণতা পায়। এ অবস্থায় 'অপ্রাকৃত আনন্দ' অনুভব হয়। এটিই যোগের চরম লক্ষ্য।

জাগতিক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভের জন্য অধ্যাবসায়ের সাথে এই যোগের অভ্যাস করা কর্তব্য। সহসা সফলতার দেখা না মিললেও হতাশ না হয়ে লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে বলা হয়েছে। কিভাবে এ যোগ সাধনা করতে হবে?

২৪	অবিচল অধ্যাবসায় সহকারে সমস্ত কামনা ত্যাগ করে, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমুহকে পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রন করে যোগপদ্ধতি সাধন করা কর্তব্য।
২৫	বুদ্ধির দ্বারা ধৈর্য্যের সাথে ধীরে ধীরে মনকে নিবৃত করে আত্মাতে স্থিত হতে হয়। অন্য কোন কিছুই চিন্তা করা বিধেয় নয়।
২৬	অস্থির-চঞ্চল মন যে সকল বিষয়ে অত্যান্ত বিচলিত হয় সেই সকল বিষয় থেকে নিবৃত করে মনকে অবশ্যই বশে আনতে হবে।

● **৬.২৪-২৬** বলা হচ্ছে, যোগ সাধনার জন্য সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে হবে। কাজটি মোটেও সহজ না। এর জন্য অবিচল অধ্যাবসায়ের সাথে লেগে থাকতে হবে। মন থেকে ইন্দ্রিয়সমুহকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসতে হবে। এভাবেই যোগ সাধনা করতে হবে।

বুদ্ধির দ্বারা ধৈর্য্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে মনকে বিষয় আসক্তি থেকে নিবৃত করে আত্মাতে স্থিত হতে হবে। এ অবস্থায় অন্য কোন চিন্তা করা বিধেয় নয়। যে সকল বিষয়ে মন অত্যাধিক অস্থির-চঞ্চল হয় সেই সকল বিষয় থেকে নিবৃত করে মনকে বশে নিয়ে আসতে হবে।

অবিচল অধ্যাবসায়ের সাথে ধৈর্য্যযুক্ত হয়ে যোগ সাধনা করা বাঞ্ছনীয়। যে কৌশলে চিত্ত শান্ত রেখে আত্মস্থ হয়ে স্বরূপ উদঘাটন করা যায় সেটিই যোগ। তাতে কি ফল পাওয়া যাবে?

২৭	রজোগুণ প্রশমিত ও নিষ্পাপ ব্রহ্ম ভাবসম্পন্ন হয়ে প্রশান্ত মন যোগী সর্বোত্তম সুখ প্রাপ্ত হন।
২৮	এভাবে সর্বদা আত্মাতে যুক্ত থেকে, সর্বপ্রকার কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যোগী ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ পরম সুখ লাভ করেন।

● **৬.২৭-২৮** রজোগুণ চিত্তকে চঞ্চল করে। কামনা-বাসনার সৃষ্টি করে। যৌন উত্তেজনারও মূল কারণ রজোগুণ। রজোগুণের প্রভাবে মানুষ পাপের পথে বা মন্দ পথে পা বাড়ায়। যোগ সাধনায় যোগীর রজোগুণ প্রশমিত হয়। রজোগুণ প্রশমিত হলে দেহ-মন শান্ত হয়ে নিষ্পাপ ভাব চলে আসে। এ অবস্থায় যোগী সুখের অনুভূতি লাভ করেন।

যোগী সর্বদা এভাবে আত্মাতে যুক্ত বা বলা যায় সমাধিস্ত থাকেন। সর্বপ্রকার কলুষ ভাব থেকে মুক্তির অনুভূতি নিয়ে এ জগতেই তিনি ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ পরম সুখ লাভ করেন। এ অবস্থাকেই ব্রহ্মভূত অবস্থা বলে। অর্থাৎ ব্রহ্ম অনুভূতি বা ব্রহ্মভাব। নির্মল ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিই হচ্ছে যোগসিদ্ধির ফল।

বস্তুত অন্যায়, দোষ বা পাপের অনুভূতি মানুষের মনের আনন্দকে হরণ করে নেয়। মানসিকভাবে মানুষকে দারুণভাবে ক্ষয় বা ক্ষতিগ্রস্ত করে। যোগসিদ্ধির ফলস্বরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলে পাপের এ অনুভূতি থাকে না। জগতের সকল কিছুর প্রেক্ষিতে নিজের ভেতরে নির্দোষ ভাবের উদয় হয়। নিজের কাছে নিজেকে নির্মল ও পবিত্র বোধ হয়। বস্তুত মন ও মস্তিষ্কের এ অবস্থা সুখের অনুভূতি দেয়। এ জগতে থেকেও তখন পরম সুখের অনুভূতি লাভ করা সম্ভব হয়; যদিও বাহির থেকে সেটি বোঝা যায় না বা দেখা যায় না। সফল যোগীই সেটি অনুভব করতে পারেন। ব্রহ্মস্থিতি লাভ হলে আরও যা হয়,

২৯	যোগী সমদর্শী হয়ে সকল জীবে একই পরমাত্মাকে দেখতে পান এবং একই আত্মায় সকল জীবকে দেখতে পান।

৩০	যে আমাকে সর্বত্র দেখতে পায় এবং সবকিছুকে আমার মাঝে দেখতে পায়, তাঁর থেকে আমি কখনও হারিয়ে যাই না, না সে আমার থেকে হারিয়ে যায়।

● **৬.২৯-৩০** এ অবস্থায় যোগী সকল জীবকে এক আত্মায় দেখতে পান। ভগবানের মাঝে সবকিছুর স্থিতি দেখতে পান। আবার সকল জীবে একই পরমাত্মাকে দেখতে পান। বস্তুত যোগী সর্বত্র ভগবানকে দেখতে পান। যেমন বলা হয়েছে,

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালনে যত্নবান হও যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা থেকে ...।" (আল-কোরআন ৪:১)

"... তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন।" (আল-কোরআন ৫৭:৪)

"পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। তোমার যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।" (আল-কোরআন ২:১১৫)

যোগী দেখেন যে সকল জীব একই পরমাত্মার সাথে যুক্ত। যোগীর অন্তর অনুভবে সর্বদা সেই বৃহৎ বা পরম আত্মার সাথে যুক্ত থাকে। ভগবানের সাথে জীবের যে একটা চির সম্পর্ক আছে যোগী সেটি উপলব্ধি করেন।

একবার যার জ্ঞানে বিষয়টি এভাবে ধরা দিয়েছে সে জ্ঞানটি তার থেকে কখনই হারিয়ে যায় না। ফলে ভগবান কখনই তার দৃষ্টির আড়াল হন না। তিনি সর্বদা ব্রহ্ম সংস্পর্শে বিদ্যমান থাকেন। তেমনি ভগবান থেকেও যোগী হারিয়ে যান না।

৩১	যিনি সর্বভূতে স্থিত আমাকে সর্বাবস্থায় একইভাবে স্থিত দেখে ভজনা করেন তিনি আমাতেই অবস্থান করেন।
৩২	হে অর্জুন! সকল জীবের সুখ-দুঃখকে যে নিজের সুখ-দুঃখের মতো সমভাবে বিচার করে তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী মনে করা হয়।

● **৬.৩১-৩২** ভগবান এক। তাই যোগী দেখেন যে সকল জীব একই পরমাত্মার সাথে যুক্ত। আবার তিনি দেখেন সর্বভূতে কেবল ভগবানই আছেন। এমন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তিনি নিজেও ভগবানের মধ্যেই বাস করেন এবং অনুভব করেন যে ভগবান তার মধ্যেই বাস করেন।

ভগবানকে সর্বকারণের কারণ জেনে যোগী তাই কেবলমাত্র ভগবানেরই ভজনা করেন এবং তিনি ভগবানেই বাস করেন। কিন্তু ভগবানকে কোথায় পাওয়া যাবে?

যিনি একই পরমাত্মায় সকল জীব কিংবা সকল জীবে একই পরমাত্মাকে দেখেন তিনি সর্বভূতে ভগবানকে দেখেন। তাই তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হয়ে যান। যোগী তাই সকল জীবের সেবা করেন। এটাই কর্মযোগের প্রেরণা।

যোগী অপরের সুখ-দুঃখকে তাই নিজের সুখ-দুঃখের মতো বিবেচনা করেন। তিনি দেখেন যে, জীবসমুহ তাদের কর্মফল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতে থাকলেও সর্ব অবস্থায় তারা ভগবানের মধ্যে এবং ভগবানও তাদের মধ্যে স্থিত। নিজ নিজ অবস্থানে সকলে তাঁরই কর্মে তথা সৃষ্টির কল্যাণেই রত। এভাবে সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন যোগী হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী।

যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। নিত্যযুক্ত যোগীর চিত্ত সবকিছুকে ভগবানময় বা আল্লাহময় দেখেন। কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যে মন থাকা দরকার মনকে কি সেভাবে গড়ে তোলা সম্ভব? অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চেয়ে বলেন,

৩৩	হে মধুসূদন! সাম্য বা সমদর্শনের যে যোগ পদ্ধতি তুমি বর্ণনা করলে, মনের চঞ্চলতা হেতু আমি এর কোন স্থায়ীত্ব দেখতে পাচ্ছি না।
৩৪	হে কৃষ্ণ! মন একেবারেই অশান্ত-চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ, একরোখা, দুর্দমনীয়; একে বিষয়-বাসনা থেকে নিবৃত করে বশীভূত করা বায়ুকে নিয়ন্ত্রন করা অপেক্ষাও কঠিন মনে হয়।

● **৬.৩৩-৩৪** ভাল-মন্দ, শীত-উষ্ণ, সুখে-দুঃখে একইভাবে অবিচল থাকা; সকল জীবের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখের মতো সমভাবে বিচার করা; শত্রু-মিত্রকে একইভাবে দেখা- অর্জুন মনে করেন যে সাম্য বা সমদর্শনের এমন যোগ পদ্ধতি একেবারেই বাস্তবসম্মত নয়। সকলের ভেতরেই একটা আমিত্বভাব আছে। মন একেবারেই অশান্ত-চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ, একরোখা, দুর্দমনীয়। তাকে দিয়ে আমিত্বভাব দুর করে সাম্যদৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব।

কৃত্রিমভাবে সমদৃষ্টির ভাব প্রদর্শন করা গেলেও অন্তর থেকে তা করা সম্ভব নয়। বাস্তবে মানুষ তা করে উঠতে পারে না। মনকে বশীভূত বা নিয়ন্ত্রন করা কঠিন। অর্জুন এ যোগ দর্শনের কোন বাস্তবভিত্তি বা স্থায়ীত্ব দেখতে পাচ্ছেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩৫	হে মহাবাহো! নিঃসংশয়ে মন দুর্দমনীয়, চঞ্চল। কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন চর্চা ও বৈরাগের দ্বারা একে নিরোধ করা সম্ভব, হে কৌন্তেয়!
৩৬	অসংযত মনের দ্বারা যোগ প্রাপ্তি কঠিন কাজ- এটিই আমার অভিমত। তবে যথার্থ উপায়ে সাধনার মাধ্যমে বশীভূত করে তা লাভ করা সম্ভব।

● **৬.৩৫-৩৬** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, নিঃসংশয়ে মন দুর্দমনীয় ও চঞ্চল। তাকে বশীভূত করা কঠিন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উপায় আছে। অসংযত-অনিয়ন্ত্রিত মন নিয়ে যোগে অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না। মনকে তাই প্রথমে সংযত করে নিতে হয়। যথার্থ উপায়ে সাধনা করলে সেটি করা সম্ভব।

নিরবিচ্ছিন্ন চর্চা বা অভ্যাস ও বৈরাগের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। অভ্যাসে দুঃসাধ্য সাধন হয়। যোগ বস্তুত কতগুলি ভাল অভ্যাসের অনুশীলন। তাই একে অভ্যাসযোগও বলা হয়। অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয়। ভাল অভ্যাস ভাল স্বভাব গঠনে ভূমিকা রাখে। ভাল অভ্যাসের দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে শান্ত করা সম্ভব।

অপরদিকে 'বৈরাগ্য' হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্তিহীনতা এবং ভগবানে আসক্তি। বিষয়াসক্তি বা কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হলে মন শান্ত হয়। শান্ত মনে যোগ লাভ সম্ভব হয়।

অতএব অভ্যাস ও বৈরাগ্য এ দু'টিকে কাজে লাগিয়ে যোগে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যথার্থ উপায়ে সাধনা করলে মনকে বশীভূত করা সম্ভব। অর্জুন চেয়ে বলেন,

৩৭	হে কৃষ্ণ! যিনি আন্তরীকতা নিয়ে যোগে প্রবৃত্ত হন কিন্তু অযত্নের কারণে বিচ্যূত হয়ে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন না তার গতি কি হয়?
৩৮	হে মহাবাহো! ব্রহ্ম লাভের পথে ভ্রষ্ট হয়ে উভয় পথ হারিয়ে সেই বিমূঢ় কি

	ছিন্ন মেঘের মতো আশ্রয়হীন হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায় না?
৩৯	হে কৃষ্ণ! এই আমার সংশয় যা সর্বতোভাবে কেবলমাত্র তুমিই দুর করতে পার। তুমি ছাড়া এই সংশয় ছিন্ন করার মতো আর কেউ নেই।

• **৬.৩৭-৩৯** অর্জুন জানতে চেয়ে বলেন, যদি কেউ ভক্তি সহকারে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু অযত্ন-অবহেলা বা কোন ত্রুটির কারণে বিচ্যূত হয়ে সিদ্ধি লাভে ব্যার্থ হন তবে তার কি গতি হয়? ব্রহ্ম লাভের পথে ভ্রষ্ট হয়ে সে কি উভয় পথ হারায় না? অর্থাৎ যোগে ব্যার্থ হয়ে মোক্ষ লাভে ব্যার্থ হয়, আবার যোগে প্রবৃত্ত হতে গিয়ে কাম্যকর্ম ত্যাগহেতু স্বর্গাদি লাভেও ব্যার্থ হয়। ফলে তিনি কি উভয় পথ হারিয়ে ছিন্ন মেঘের মতো বিলীন হয়ে যান না?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সংকটকালীন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন যোগ ও পারমার্থিক জ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা করছেন অর্জুনের মনের ভেতরে তখন যোগাভ্যাস করার চেতনা দারুণভাবে উজ্জীবিত। কিন্তু তিনি নিজেও নিশ্চিত না যে পরবর্তীতে তাঁর এমন চেতনা বিদ্যমান থাকবে কিনা? ফলে ভেতরে এমন সংশয় দেখা দিয়েছে যে, যোগের প্রচেষ্টা নেয়া সত্বেও যদি কখনও মনের দুর্বলতা হেতু, কিংবা পরিবর্তীত পরিস্থিতীতে সে পথ থেকে তিনি নিজেও বিচ্যূত হন, তবে কি তিনি উভয় পথই হারাবেন না? তিনি কি সব হারিয়ে ছিন্ন মেঘের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন না?

বিষয়টি তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে জেনে নিশ্চিত হয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চান। তিনি মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেউ নেই যে তাঁকে এ বিষয়ে যথাযথভাবে জানাতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪০	হে পার্থ! কখনও এমন হয় না; না ইহলোকে না পরলোকে যে তাঁর বিনাশ হয়। কেননা কল্যাণমূলক কাজ করে কেউই কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না, হে আমার বন্ধু!
৪১	ব্যার্থ যোগী পূণ্যবানদের লোকসমুহে গমন করে। সেখানে বহুকাল বসবাস করার পর সৎ অথবা অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে।
৪২	অথবা কোন যোগী তথা জ্ঞানবান পরিবারে জন্মগ্রহন করে। অবশ্যই এই প্রকার জন্ম জগতে অত্যান্ত দুর্লভ।

৪৩	এভাবে পূর্ব জন্মের পরমাত্মা বিষয়ক বুদ্ধি বা জ্ঞানের সংযোগ লাভ করেন। অতপর সিদ্ধি লাভের জন্য পুনরায় যত্নবান হন, হে কুরুনন্দন!
৪৪	পূর্ব অভ্যাসের কারণে তিনি আপনা থেকেই যোগে আকৃষ্ট হন এবং সেই জিজ্ঞাসু পুরুষ এমনকি বেদে উক্ত যোগের রীতি-নীতিসমুহকেও ছাড়িয়ে যান।
৪৫	অনেক অনেক জন্মের সাধনা অপেক্ষা অধিকতর যত্নবান হয়ে এই প্রকার যোগী সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত ও বিশুদ্ধ হয়ে সিদ্ধি লাভ করে পরম গতি প্রাপ্ত হন।

● **৬.৪০** যারা যোগ সাধনা করেন তারা নিষ্কাম হয়ে কর্ম করেন। সেখানে নিজের কোন স্বার্থ থাকে না। নিষ্কামকর্ম জনকল্যাণমূলক হয়ে থাকে। কল্যাণমূলক কাজ করে কেউ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

কল্যাণমূলক কাজ করে অসফল হলে ইহলোকেও মানুষ অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না। মানুষের সহানুভূতি তাদের ওপর বজায় থাকে। ভগবানের গুণই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং ভগবানও তেমন সাধকদের বিনষ্ট হতে দেন না। সহানুভূতির সাথে আবার এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দেন। ইহলোক পরলোক কোন কালেই তাদের বিনাশ হয় না।

● **৬.৪১-৪২** বলা হচ্ছে, ব্যার্থ যোগী পূণ্যবানদের উচ্চতর লোকসমুহে গমন করেন। এগুলি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। সেখানে বহুকাল বসবাস ও নানারকম সুখ ভোগ করার পর এ জগতে ফিরে আসেন। মৃত্যুকালে পরিপূর্ণ বিষয় বৈরাগ্য অর্জিত না হওয়ার কারণে বা বিষয় তৃষ্ণা থেকে যাওয়ার কারণে তারা সৎ অথবা অভিজাত বা ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। যেন বিষয় তৃষ্ণার নিবারণ হয়।

অপরদিকে যিনি বৈরাগ্য অর্জন করতে পেরেছিলেন তার জন্ম হয় যোগী বা কোন জ্ঞানবান পরিবারে এবং এই প্রকার জন্ম অত্যান্ত দুর্লভ। কেননা যথাযথ যোগীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হলে পরম গতি লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অন্তরের বাসনাগুলি তৃপ্ত হওয়ার পরেই মানুষ সিদ্ধি লাভের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। সুপ্ত বা অতৃপ্ত বিষয় বাসনা থেকে গেলে সাধনায় মন বসে না। সফল হওয়া যায় না। মোক্ষ লাভও হয় না।

- **৬.৪৩-৪৫** এই প্রকার জন্ম লাভের ফলে যোগী পূর্ব জন্মের পরমাত্মা বিষয়ক বুদ্ধি বা জ্ঞানের সংযোগ লাভ করেন। অতপর সিদ্ধি লাভের জন্য পুনরায় যত্নবান হয়ে সচেষ্ট হতে পারেন। ধর্মপরায়ন বা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেয়ার ফলে তারা পরমার্থ সাধনের উপযুক্ত পরিবেশও লাভ করেন।

পূর্ব জনমের অভ্যাসের কারণে পর জনমে তিনি আপনা থেকেই যোগে আকৃষ্ট হন এবং এমনকি বেদে উক্ত কাম্যকর্মের ফলফলাদিকেও ছাড়িয়ে যান। এ ধরণের মানুষ সাধনার বিধিবদ্ধ নিয়মের উর্ধ্বে উঠেও কার্যকলাপ করতে পারেন।

এভাবে জন্ম নেয়ার ফলে পূর্বের অনেক অনেক জন্মের সাধনা অপেক্ষাও তারা অধিকতর যত্নবান হয়ে সর্বপ্রকার পাপ থেকে মুক্ত ও বিশুদ্ধ হয়ে সিদ্ধি লাভ করেন। পরিশেষে পরম গতি প্রাপ্ত হন। এমনই লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া। একজন যোগীর মর্যাদা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪৬	যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই আমার মত। কর্মীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জুন! যোগী হও।
৪৭	যোগীদের মধ্যে যার অন্তরাত্মা সর্বদা আমাতেই মগ্ন, শ্রদ্ধার সাথে যে আমার ভজনা করে সেই আমার সাথে সর্বাধিক যুক্ত- এই আমার মত।

- **৬.৪৬** ইচ্ছেকৃত দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করাকে তপস্যা বলে। ভগবানকে পাওয়ার আশায় তপস্বী স্বেচ্ছায় নানারূপ কষ্টকে বরণ করেন। এমনকি নিজ দেহকেও কষ্ট দেন। শাস্ত্রে উল্লেখ না থাকলেও কখনও কখনও অযাচিতভাবেই এসব করেন। তবে সব করেন ভগবানের কারণে।

একজন যোগীও তপস্বী। তবে যোগী যথাযথ জ্ঞানে তপস্যা করেন। দেহকে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরঞ্জিত কষ্ট দিয়ে কোনকিছু করেন না। কষ্টক্লিষ্ট দেহে ভগবান নিজেকে বিকশিত করেন না। যোগী তাই তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অপরদিকে জ্ঞানের চর্চ্চাও নিরর্থক হয় যদি তা ভগবানের সাথে সম্পৃক্ত হতে না পারে। বস্তুত সকল কর্মের মধ্য দিয়ে আমরা ভগবানেরই সন্ধান করি এবং তাঁরই কর্ম বা আরাধনা করি। যদি এ জ্ঞান উপলব্ধিতে না আসে তবে সে জ্ঞানও লক্ষ্যবিহীন হয়ে যায়। তেমন জ্ঞান ব্যাক্তি-সমাজ কোন কিছুর জন্যই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সাধারণভাবে সকল জ্ঞানীদের মধ্যে এ বোধ থাকে না।

একজন যোগীও জ্ঞানী। তবে যোগী আত্মতত্ত্ব ও পরমার্থ বিষয়েও জ্ঞান রাখেন। তাঁর জ্ঞনের সাথে ভগবানের সম্পৃক্ততা আছে। জীবন ও জগতের পরম লক্ষ্যের সাথে একটি সম্পর্ক আছে। যোগী তাই জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কর্মী বলতে সাধারণত সকাম কর্মীদেরকেই বুঝিয়ে থাকে। তারা জাগতিক ও পারলৌকিক ফল লাভের বাসনায় পূঁজা-অর্চনা, যাজযজ্ঞের কর্ম করে। কোন বিনিময় প্রাপ্তির বাসনায় যারা কর্ম করে মানসিকতার দিক থেকে তাদেরকে উচ্চ পর্যায়ের বলা যায় না।

একজন যোগীও কর্মী। তবে যোগী কর্ম করেন রাগ-দ্বেষ, লোভ-আসক্তি, অহঙ্কার বর্জন করে নিষ্কাম হয়ে। জীবন ও জগতের হিতার্থে ভগবানের ভাবনায় কর্ম করেন। অতএব যোগী কর্মীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

সর্বদিক বিবেচনায় একজন যোগী সাধু বা তপস্বীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং কর্মীদেরও উপরে। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে সর্বাবস্থায় একজন যোগী হতে বলছেন। মানুষের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

● **৬.৪৭** যোগীদের মধ্যেও যিনি সর্বদা ভগবানে নিমগ্ন, ভগবানকে স্মরণ করেন এবং যথাযথ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের ভজনা করেন তিনিই ভগবানের সঙ্গে সমধিক যুক্ত। তাই বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা কর।" (আল-কোরআন ৩৩:৪১-৪২)

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে কোরআন থেকে উদ্ধৃতিসমুহ কেন তুলে ধরা হয়েছে? বস্তুত সকল গ্রন্থ একই সুরে কথা বলেছে। সত্য হচ্ছে বিধাতা এক। তাঁর প্রদর্শিত পথও এক। কেবল গভীর মনযোগের সাথে মর্ম অর্থগুলি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায় : বিজ্ঞানযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ৩০)

সারকথা : ভগবান ও তাঁর মহাত্ম বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানে অবগত হতে পারলে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির সৃষ্টি হয়। তখনই লোকে তাঁর ভজনা-উপাসনা করে। ভজনা-উপাসনা ও সাধনার দ্বারা পাপমুক্ত ও নির্মল হয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব হয়।

বিজ্ঞানযোগে ভগবান সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্মত ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। যা জেনে মানুষ ভগবানের মহাত্ম সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। তাঁর ভাব বা স্বভাব লাভ করার জ্ঞান অর্জন করবে এবং সাধনার দ্বারা ভগবানের ভাব লাভ করে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। অতএব কর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। যথাযথ জ্ঞানে কর্ম করেও বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব।

১	হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিত্ত ও আমাতে আশ্রয় নিয়ে যোগযুক্ত হয়ে যেভাবে সমগ্র আমাকে নিঃসংশয়ে জানতে পারবে তা শ্রবণ কর।
২	আমি তোমাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই জ্ঞানের কথা পূর্ণরূপে বলব যা জেনে এ জগতে জানার আর কিছু বাকি থাকবে না।

- **৭.১-২** জগত ভগবানময়। এখানে ভগবান ব্যাতিত আর কিছুই নেই। ভগবানকে আশ্রয় করেই জগতে সবকিছু বিদ্যমান। তিনি সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। সবকিছু তাঁর মধ্যেই স্থিত। আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখি সবই তাঁর নানাবিধ ঐশ্বর্য্য, গুণাগুন, শক্তি ও বিভূতিসমুহ। অতএব তাঁকেই একমাত্র আশ্রয় জেনে যোগযুক্ত হয়ে তাঁকে জানার চেষ্টা-সাধনা করতে হবে।

ভগবানকে জানতে হলে তাঁর প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবানকে একমাত্র লক্ষ্য জেনে তাঁর ধ্যানে ধ্যানস্ত হতে হবে। সেজন্যই যোগযুক্ত হতে বলা হয়েছে। কেননা যোগ হচ্ছে কর্মের সেই কৌশল। যার মাধ্যমে ধ্যানস্ত হয়ে চেষ্টা-সাধনা করে ভগবান সম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত সামগ্রীক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। বস্তুত জ্ঞান-গবেষনার মাধ্যমে আমরা যা কিছু জানি বা

আবিস্কার করি এর মাধ্যমে আমরা ভগবানকেই জানি। ভগবানকেই একটু একটু করে আবিস্কার করি।

উল্লেখ্য যে, ধ্যানস্ত হওয়া বলতে এখানে শুধুমাত্র প্রথাগত সমাধিযোগে অধিষ্ঠিত হওয়াকেই বোঝায় না। আধুনিককালে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান-গবেষনামূলক কর্মকেও এখানে ধ্যানরূপেই বিবেচনা করতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে বিজ্ঞানসম্মত সে কৌশলও যোগেরই অন্তর্ভূক্ত বিষয়। বিষয়গুলিকে সেভাবে বুঝতে হবে।

ভগবান সম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত সেই জ্ঞানের কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অবহিত করেন। ভগবানের বিবিধ বিভূতিসমুহ যেমন জড় ও চেতন, ব্যাক্ত-অব্যাক্ত, সগুণ ও নির্গুণ স্বরূপ সামগ্রীক বিষয় তিনি তুলে ধরেন। এ সবই বিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞান। যেসব জ্ঞানকে আশ্রয় করে বিজ্ঞান আজ এতদুর অগ্রসর হতে পেরেছে।

এ জগতে মানুষ আমরা যা কিছু অধ্যায়ন করি, যা কিছু আবিষ্কার করি, এমনকি যা কিছু নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষনা হয়ে থাকে তার সবই বস্তুত ভগবানের স্বরূপ উন্মোচনের নিমিত্তে। আধুনিককালে এ কাজগুলি বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্মতভাবে করে থাকে। তাই এখানে 'বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান' কথাটি এভাবে বলা হয়েছে। এখানে সৃষ্টি সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সেইসব মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়সমুহ তুলে ধরা হয়েছে, যে জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে আমরা মানবসমাজের বর্তমান অগ্রগতি দেখতে পাই।

কোন কিছু পেতে হলে সে বিষয়ে আগ্রহ থাকতে হয়। ভগবানকে পেতে হলেও সে বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকতে হবে। সেটিকেই এখানে ভগবানে আসক্তচিত্ত হতে হবে বলে বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩	হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধি লাভের জন্য সচেষ্ট হন। সচেষ্ট সেই সিদ্ধি প্রাপ্তদের মধ্যে বস্তুত কেউ একজন আমাকে তত্ত্বত জানতে পারেন।

- **৭.৩** বাস্তবেও দেখা যায় যে, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দু-একজন পারমার্থিক বা আধ্যাত্ম বা ভগবান সম্পর্কিত জ্ঞান বিষয়ে জানতে আগ্রহী বা সচেষ্ট হন। সিদ্ধি লাভে সচেষ্ট তেমন হাজারও যত্নশীলদের মধ্যেও যারা মনে করেন যে তারা সিদ্ধি

লাভ করেছেন, বলা হচ্ছে যে তাদের মধ্যেও হয়তবা কেউ একজন সত্যিকারভাবে ভগবানকে তত্ত্বত জানতে পারেন। তাই আমরা দেখি যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে শুরু করে জগতের বিবিধ বিষয়ে আজ আমরা যাদের মাধ্যমে ভগবান বা আল্লাহর অপার অনুগ্রহসমুহ বিষয়ে অবগত হতে পেরেছি, লক্ষ-কোটি মানুষের ভীড়ে তেমন মানুষের সংখ্যা মাত্র হাতে গণা ক'জন।

ভগবানকে জানা ও বোঝা সহজ বিষয় নয়। পরম জীবসত্ত্বা ভগবান, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা জ্ঞানেরও অতীত। তিনি জ্ঞানময়; তিনিই বিজ্ঞানময়। কোন ভক্তের ভক্তিতে প্রসন্ন হলে ভগবান স্বয়ং তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। তেমন মানুষ সৌভাগ্যবান। তেমন সৌভাগ্যবান মানুষই কেবল গুঢ়ু রহস্য বুঝতে পারেন।

এ জ্ঞান অত্যান্ত গুরুত্ববহ ও বিজ্ঞানসম্মত। সকলের জন্য সহজবোধ্য নাও হতে পারে। এখানে জীবন ও জগতের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত জ্ঞানের মৌলিক ও প্রাথমিক ধারণাসমুহ তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন,

৪	মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার এভাবে আমার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন আটটি ভাগে বিভক্ত।
৫	এটি অপরা প্রকৃতি। এর থেকেও শ্রেষ্ঠ আমার জীবরূপ ভিন্ন এক পরম প্রকৃতি আছে বলে জানবে, হে মহাবাহো! যার দ্বারা এ জগত ধৃত আছে।

• **৭.৪** ভগবানের পূর্ণ প্রকাশকে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষনাত্মক জ্ঞানের আলোকেই কেবল যথাযথভাবে জানা সম্ভব। সাংখ্য শাস্ত্র বা বিজ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা ও গবেষনা বস্তুত এক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য। সত্য বলতে, আধুনিককালের বিজ্ঞান মূলত ভগবানেরই বিভিন্ন শক্তির তত্ত্ব নিয়ে গবেষনা ও বিশ্লেষণ করে এবং তাঁর স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করে।

সাংখ্যের আলোকে ভগবান বিষয়ে জানতে হলে প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পর্কিত জ্ঞান জানা থাকা আবশ্যক। সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষই হচ্ছে মূলতত্ত্ব। প্রকৃতির শুরু ও শেষ বিষয়ে কেউ জানে না। প্রকৃতিকে তাই অনাদি ও অনন্ত বলা হয়। জগত সৃষ্টির সকল মূল উপাদানসমুহ প্রকৃতির মধ্যে নিহিত। প্রকৃতি স্বয়ং বা আপনা থেকে জগৎ সৃষ্টি করে। জগত সৃষ্টির সামগ্রীক প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিকেই মূল কারণ বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, পুরুষ শব্দটি এখানে লিঙ্গাত্মক অর্থে ব্যাবহৃত হয়নি। পুরুষ শব্দটি দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জীবনের ধারক তথা জীবসত্ত্বাকে বোঝান হয়েছে।

বলা হচ্ছে মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এ পাঁচটি হচ্ছে স্থুল শক্তি। এগুলিকে একত্রে পঞ্চ মহাভূত বলে। অহংকার, বুদ্ধি ও মন হচ্ছে সূক্ষ শক্তি। স্থুল শক্তি ও সূক্ষ শক্তি একত্রে মূল প্রকৃতি।

অব্যাক্ত অবস্থায় জড় প্রকৃতির সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণকে প্রধান বলা হয়। সে বিবেচনায় অহঙ্কার, বুদ্ধি ও প্রধান এভাবেও তিনটি বিষয়কে মূল প্রকৃতির অন্তর্গত ধরা হয়।

স্থুল শক্তি ও সূক্ষ শক্তি এভাবে ভিন্ন ভিন্ন আটটি অথবা প্রধান এর তিনটি গুণ বিবেচনায় দশটি ভাগে ভগবানের সামগ্রীক শক্তি বা প্রকৃতি বিভক্ত। এটি হচ্ছে ভগবানের নিম্নপর্যায়ের প্রকৃতি। এটিকেই জড় প্রকৃতি বলা হয়। জড় প্রকৃতিকে গীতায় অপরা প্রকৃতি বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রতিটি জীব এমনকি মানবেরও একটি দেহ আছে। দেহটি হচ্ছে ওপরে উদ্ধৃত নিম্ন পর্যায়ের জড় প্রকৃতি। একইভাবে এই বিরাট বিশ্ব ব্রক্ষান্ড নামক দেহেরও একটি নিম্ন পর্যায়ের প্রকৃতি আছে। যা আমাদের দেখা এই জড় জাগতিক প্রকৃতি। যার মধ্যে আমাদের বসবাস।

ভগবানের এই জড় শক্তিসমুহই সাংখ্যের মূল আলোচ্য বিষয়। সাংখ্য দর্শন নিরিশ্বর ও জড়বাদী। অহংকার, বুদ্ধি ও মন বিষয়ে জড়বাদীরা গুরুত্ব দেন না। জড় বিজ্ঞানে মূল এই দশটি তত্ত্ব বা বিষয়ই আছে [দ্রষ্টব্য গীতা ১৩:৬]।

● **৭.৫** ওপরোক্ত নিম্ন পর্যায়ের প্রকৃতি ছাড়াও ভগবানের আরও একটি প্রকৃতি বা শক্তি আছে। সেটিকে উচ্চ পর্যায়ের পরম বা উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বা শক্তি বলে। সেটিই হচ্ছে ভগবানের জীবরূপ চেতনসম্পন্ন প্রকৃতি। এই পরা বা পরম প্রকৃতির প্রভাবেই জগত সচল ও সক্রিয় আছে। যা এই জড় জগতকে ধারণ করে আছে।

উল্লেখ্য যে, উৎকৃষ্ট শক্তি জীব যখন অনুৎকৃষ্ট স্থুল ও সূক্ষ শক্তিকে ভোগ করে, তখন সে তার প্রকৃত স্বরূপ তথা মন ও বুদ্ধিকে বিস্মৃত হয় এবং জড় প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদ্ধৃত এ তত্ত্বসমুহ হচ্ছে সাংখ্য শাস্ত্রের অধীন।

সাংখ্য মতে কেবল প্রকৃতিই ক্রিয়াশীল এবং পুরুষ বা জীব হচ্ছে নিষ্ক্রিয়। বেদান্ত শাস্ত্রে সাংখ্যের এই প্রকৃতিকে মায়া বা ক্ষেত্র বলে এবং নিষ্ক্রিয় জীবকে নির্গুণ ব্রহ্ম বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। গীতায় এগুলিকে যথাক্রমে অপরা ও পরা প্রকৃতি নামে অভিহীত করা হয়েছে।

প্রতিটি জড়দেহে এমনকি মানব দেহেও ভগবানের জীবরূপ উচ্চ পর্যায়ের চেতনসম্পন্ন একটি শক্তি বিদ্যমান আছে। এটিই জীবাত্মা বা আত্মা নামে পরিচিত। আত্মাই হচ্ছে জীবের বা জীবনের প্রকৃত স্বরূপ।

একইভাবে এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মান্ডেরও জীবরূপ চেতনসম্পন্ন উৎকৃষ্ট বা পরম একটি প্রকৃতি আছে। জড় ও চেতন যে দুইয়ের সমন্বয়ে এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের প্রকাশ তা মূলত ভগবানেরই দুটি শক্তি। এই বিশাল ব্রহ্মান্ডের বিকাশের কারণ হচ্ছে পরম আত্মা বা পরমাত্মা। বৃহৎ-ক্ষুদ্র তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয় আত্মার কারণ হচ্ছেন ভগবান। জীবের যেমন জড় দেহের পরিবর্তন ও বিকাশ হয় তেমনি বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডেরও পরিবর্তন ও বিকাশ হয়। যেমন বলা হয়েছে,

“আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছি এবং এটিকে করেছি মহা সম্প্রসারণশীল।” (আল-কোরআন ৫১:৪৭)

৬	জেন যে, সকল কিছু এই উভয় প্রকৃতিজাত এবং আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ।
৭	হে ধনঞ্জয়! আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। সূতোয় যেমন মুক্তো গাঁথা থাকে তেমনি সবকিছু আমাতে গ্রথিত।

● **৭.৬** জড় ও চেতন হচ্ছে ভগবানেরই দুটি শক্তি। ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির কারণ। ওপরোক্ত দুই প্রকৃতি থেকে জগতের সকল কিছুর সৃষ্টি। জড় প্রকৃতি দেহরূপ ধারণ করে। পরম প্রকৃতি জীবরূপ চৈতন্য ধারণ করে। উভয় প্রকৃতিই ভগবান থেকে জাত। তিনিই সকল কিছুর উৎস। তিনিই সৃষ্টির কারণ। যেমন বলা হয়েছে,

“আল্লাহই নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা!” (আল-কোরআন ২:১১৭)

উল্লেখ্য যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতির এই তিন গুণ ত্রৈগুণ্য নামে পরিচিত। সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ বা জ্ঞান (Harmony), রজের স্বভাব প্রকৃতি বা কর্ম প্রবণতা

(Energy, Activity) এবং তমের স্বভাব অপ্রকাশ বা মোহ (Resistance, Inertia)। তিন গুণের স্বভাব পরস্পর বিরোধী।

তিন গুণের সাম্যাবস্থা হচ্ছে প্রকৃতির অব্যাক্ত অবস্থা। প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। যেমন নির্জীব পদার্থে তমঃ গুণ দ্বারা সত্ত্বঃ ও রজঃ গুণ সম্পূর্ণরূপে আবৃত থাকে। সৃষ্টিকালে সাম্য ভঙ্গ হয়। কোথাও সত্ত্ব প্রবল হয়, কোথাও রজঃ ও কোথাও তমঃ প্রবল হয়। সৃষ্টির শুরুতে সাম্যভঙ্গের কারণে প্রথম যে পরিণাম হয় তাকে বলা হয় 'মহতত্ত্ব'।

মহত্তত্বের পরিণাম হচ্ছে অহংকার। অহংকার আপন শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করতে শুরু করে। এর প্রবৃদ্ধি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে সেন্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করে।

একদিকে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ দ্বারা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যথা হস্ত, পদ, বাক, পায়ু, উপস্থ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা চক্ষু, কর্ণ , নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং উভয়েন্দ্রিয় মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়।

অপর দিকে তমগুণের উৎকর্ষ দ্বারা পঞ্চ সূক্ষভূত উৎপন্ন হয়। সেখান থেকে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা বা পৃথিবী পঞ্চ স্থুলভূত সৃষ্টি হয়। এই স্থুল ভূতের পরিণামে জড় জগৎ সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতি হচ্ছে জড়। জীবের সান্নিধ্যে প্রকৃতিতে চৈতন্যের উদয় হয়। তাই প্রকৃতি ও জীব বা পুরুষ হচ্ছে মূল তত্ত্ব। জড় জগত ভগবানের অনন্ত শক্তির একটির সাময়িক প্রকাশ। ভগবানই হচ্ছেন এই জড় জগত সৃষ্টির মূল বা আদি কারণ। জড় প্রকৃতি সৃষ্টির যে সমস্ত উপাদান তা ভগবানেরই বিভিন্ন শক্তি। লক্ষ্যনীয় যে, বিজ্ঞানের বর্তমান কালের অভাবনীয় অগ্রগতির বহু বহু পূর্বেই বিজ্ঞানের এ সকল মৌলিক বিষয় সম্পর্কে শাস্ত্র বা ঐশী গ্রন্থসমুহে ধারণা দেয়া হয়েছে।

ভগবান যেমন সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ, তেমনি আবার তিনিই হচ্ছেন সমগ্র জগতের প্রলয়েরও কারণ। যখন কেউ বন্ধনরূপ এই প্রকৃতির উর্ধ্বে চলে যেতে সক্ষম হয় তখন মহাপ্রলয়ও ভগবান।

প্রলয় কি, কখন ও কিভাবে এসব বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কেউ কিছু জানে না। জানেনা বিধায় এটি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। বিজ্ঞানীরা বোঝার চেষ্টা

করছেন। তবে প্রলয় সম্পর্কিত একটি ধারণা প্রচলিত আছে। সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ের কারণ ভগবান। তিনিই শুরু; তিনিই শেষ। তিনিই সর্বকারণের কারণ। প্রলয় সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে,

"তোমার কাছে কি মহা-প্রলয়ের সংবাদ এসেছে? ... তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও।" (আল-কোরআন ৮৮:১,২১)

"ভয় কর এমন এক দিবস মহা-প্রলয়কে যেদিন পিতামাতা সন্তানের কোন কাজে আসবে না এবং সন্তানও পিতামাতার কোন উপকারে আসবে না।" (আল-কোরআন ৩১:৩৩)

"সেদিন ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং আটজন ফেরেশতা তোমার পালনকর্তার আরশ বা আসনকে উর্ধ্বে ধারণ করবে।" (আল-কোরআন ৬৯:১৭)

● **৭.৭** ভগবানের ওপর আর কেউ নেই বা কোন কিছু বা কোন সত্য নেই। তিনিই চরম সত্য। সবকিছুতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কেউ নেই, কিছু নেই।" (আল-কোরআন ১১২:৪)

বৃক্ষের মতো বা জালের মতো তিনি তাঁর সকল শক্তিকে বিস্তৃত করে জগতের সবকিছুকে ধারণ করে রেখেছেন। তাই বলা হয়েছে আমাতে সবকিছু স্থিত যেমন সূতোয় মুক্তো গাঁথা থাকে। তার সকল মূল শক্তিগুলি সম্পর্কে ওপরে ধারণা দেয়া হয়েছে। জগতের সবকিছুই ভগবানের সত্ত্বায় সত্ত্বাবান। বস্তুত জগত ভগবানময়। সে বিষয়ে ধারণা দিয়ে বলা হচ্ছে,

৮	হে কৌন্তেয়! আমিই জলের স্বাদ, চন্দ্র ও সূর্য্যের জ্যোতি; সমগ্র বেদে ওঙ্কার, মহাশূন্যের শব্দ; মানুষের মধ্যে আমিই সক্ষমতা।
৯	আমি ধরিত্রীর পবিত্র গন্ধ। অগ্নিতে আমিই তেজ, সর্বজীবে প্রাণ; তপস্বীদের তপশ্চর্যাও আমি।
১০	হে পার্থ! আমাকে সর্বজীবের বীজ বলে জানবে। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি আমি এবং

	তেজস্বীদের তেজ।
১১	কাম-রাগ বিবর্জিত বলবানের শক্তি আমি। হে ভারত শ্রেষ্ঠ! সর্বজীবে আমিই কামশক্তি যা ধর্মবিরুদ্ধ নয়।

● **৭.৮** এ জগত ভগবানময়। জগতে যা কিছু আছে সবই ভগবান থেকে জাত। তাঁরই নানাবিধ শক্তি সর্বত্র জালের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে। তিনি ব্যাতিত কোথাও কোন কিছুর কোন অস্তিত্ব নেই।

বলা হচ্ছে, জলের যে স্বাদ তা ভগবান থেকে আগত। সূর্য্য ও চন্দ্রের রশ্মিচ্ছটাও ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ। বৈদিক মন্ত্রের প্রারম্ভে ভগবানকে সম্বোধনসূচক অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম প্রণব বা যে 'ওঙ্কার' মন্ত্র উচ্চারিত হয় সে শব্দেরও উৎস তিনিই। জীব ও জড়ের ভেতরে সকল শক্তির প্রবাহ ভগবান থেকে আগত। অর্থাৎ এক একটি বিভূতি বা রূপের মধ্য দিয়ে তাঁর এক একটি শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। বিভূতিগুলি তাঁর নির্দিষ্ট কোন শক্তির ধারক মাত্র। যেমন মনে করি কার্বহাইড্রেড শক্তির উৎস; কিন্তু ধান, চাল, গম শক্তির ধারক। এটি একটি স্থুল উদাহরণ। বোঝাবার সুবিধার্থে তুলে ধরা হয়েছে। কেননা মূল শক্তি আরও গভীরে। ভগবান থাকেন অনেক পর্দার অন্তরালে। তিনি যেমন বৃহতেরও বৃহৎ, তেমনি ক্ষুদ্রের চেয়েও ক্ষুদ্র। বস্তুত ভগবানের নাগাল পাওয়া সহজ নয়।

ভগবান সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর বিভিন্ন শক্তি ও গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা নিতে হয়। তাঁকে উপলব্ধি করতে হয় তাঁর গুণ ও তাঁর শক্তিসমুহের প্রকাশের মধ্য দিয়ে। জড় ও চেতন শক্তির মাধ্যমে ভগবান কিভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন এখানে সে বিষয়ে সামান্য ধারণা তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ! ... সবচাইতে সুন্দর নামসমুহ তাঁরই।" (আল-কোরআন ২০:৮)

ঈশ্বর বলি, ভগবান বলি, আল্লাহ বলি, গড বলি তাঁর সকল নামই সুন্দর, মহাত্ব ও তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং তাঁর নামের মাঝেই তাঁর গুণাগুণ, মহিমা ও ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। তাঁর গুণেই তাঁর শক্তি ও সক্ষমতার প্রকাশ। আল-কোরআনেও এমনিভাবে আল্লাহর মহাত্বপূর্ণ অনেক নামের উল্লেখ আছে।

বিজ্ঞান যত প্রকারের গবেষনা করে বস্তুত তা ভগবানকে জানার জন্যই তাঁর শক্তিসমুহকে নিয়ে গবেষনা করে। যার প্রাথমিক সূচনা, ধারণা ও প্রেরণা ধর্ম গ্রন্থসমুহ থেকেই আগত। এসব গ্রন্থে সব বিষয়ে মৌলিক ধারণা বা দিক-নির্দেশনা দেয়া রয়েছে।

• **৭.৯** প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব ঘ্রাণ আছে, স্বাদ আছে। সবকিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট সেই বৈশিষ্ট হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। স্বাদ বলি, গন্ধ বলি সকল কিছুর রাসায়নিক কিংবা ভৌতিক ধর্মের কারণও ভগবান। জীব-জড় সবকিছুর ধর্ম বা বৈশিষ্ট ভগবান থেকে আগত।

সর্বজীবে যে জীবনের প্রকাশ তাও ভগবান। বস্তুত তিনিই জীবন। তিনিই একমাত্র জীবন্ত এবং তিনিই চিরঞ্জীব! তাঁর পরশেই অন্যান্যরা জীবন্ত। সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেলে সব প্রাণহীন হয়ে যায়। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ! ... তিনিই জীবন্ত, চিরঞ্জীব।" (আল-কোরআন ২:২৫৫)

• **৭.১০** ভগবান হচ্ছেন সর্বজীবের বীজস্বরূপ। তাঁর থেকেই সকল কিছুর উৎপত্তি। তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনিই পরিপালনকারী।

জীবের সমস্ত বুদ্ধি বা জ্ঞানের উৎসও হচ্ছেন ভগবান। সকল জ্ঞান ও বুদ্ধি তাঁর থেকেই আগত। এছাড়া কারও নিজস্ব কোন বুদ্ধি নেই। সকল জ্ঞানশক্তির উৎস তিনি। তেজস্বীদের মধ্যে যত তেজ সে তেজশক্তির উৎসও তিনি।

• **৭.১১** কাম হচ্ছে অপ্রাপ্ত কোন বিষয়ে তীব্র আকাংখা বা অভিলাষ এবং রাগ হচ্ছে প্রাপ্ত বিষয়ে তীব্র আকাংখা বা আসক্তি। কাম-রাগবিহীন শক্তিমানের শক্তির উৎসও ভগবান। কাম-রাগ নিজস্ব আকর্ষনে জীবকে তার পথে তীব্রভাবে টেনে নিয়ে যেতে চায়। তাকে প্রতিহত করা যায় না। কিন্তু সেটিকেও যে শক্তি দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব হয় সে শক্তির জোরও স্বয়ং ভগবান। কেবলমাত্র ভগবানের ভাবনা দ্বারাই কাম-রাগ দমন করা যায়। আর কোন কিছু দিয়েই সেই তীব্র টান বা আকর্ষনকে দমন করা যায় না।

অপরদিকে সর্বজীবে যে কামশক্তি সেটির কারণ বা উৎসও কিন্তু স্বয়ং ভগবান। যৌন জীবন প্রকৃতপক্ষে ধর্মবিরুদ্ধ কিছু নয়। কাম বা যৌন জীবন মানবজাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং দেহ ও মনকে সুস্থ্য ও পবিত্র রাখতে অত্যান্ত

প্রয়োজনীয়। প্রজন্মকে ধরে রাখে এই কাম প্রবৃত্তি। কামপ্রবৃত্তি আছে বলেই সমাজ-সংসার টিকে আছে। কাম প্রবৃত্তির যথাযথ ব্যাবহার নিশ্চিত করাই হচ্ছে মূখ্য বিবেচ্য বিষয়। সুসন্তান জন্ম দেয়া এর অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যৌন জীবনযাপন করা হয় তখন সেটি অপচয় বা প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে গন্য হয়।

পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে সুস্থ্য সন্তান জন্ম দেয়া। সন্তানদের ধর্মপরায়ন অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলে তেমন জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত করে গড়ে তোলা। তাই বলা হয়েছে,

“তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্রের মতো। অতএব তোমার শস্যক্ষেত্রে যাও যখন ইচ্ছে কর। আর তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য পূর্বেই ভাল কাজ প্রেরণ কর।” (আল-কোরআন ২:২২৩)

১২	সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যে ভাবসমুহ আছে তা আমার থেকে উদ্ভূত বলে জানবে। আমি এসবের মধ্যে নই, তবে তারা আমার মধ্যে আছে।
১৩	এই ত্রিগুণের ভাবের দ্বারা সমস্ত জগত সম্মোহিত হয়ে আছে। তাই গুণ সকলের উর্ধ্বে নির্গুণ আমাকে জানতে পারে না।
১৪	ত্রিগুণময়ী আমার এই দৈবী মায়াশক্তিকে অতিক্রম করা কঠিন। তবে যারা কেবল আমাকেই ভজনা করে তারা এই মায়াশক্তিকে অতিক্রম করতে পারে।

- **৭.১২** সবকিছু ভগবান থেকে জাত। জড় প্রকৃতি বা স্বভাবের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমুহও ভগবান থেকে আগত। জীবসকল এই ত্রিগুণের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে জগতে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুক্তি বলতে এই আবদ্ধতা থেকেই মানুষের মুক্তির কথা বলা হয়ে থাকে।

ভগবান থেকে উদ্ভূত হলেও ভগবান এই গুণ সকলের অতীত বা উর্ধ্বে অবস্থান করেন। অর্থাৎ তিনি নির্গুন। গুণসমুহ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। এটি তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট। মানুষকে এ গুণই অর্জন করার কথা বলা হয়ে থাকে। তবেই সে জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। স্বরূপে ফিরে যেতে পারবে। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে স্বাধীন।" (আল-কোরআন ৩:৯৭, ২৯:৬)

গুণসমুহের স্রষ্টাও ভগবান। কিন্তু গুণসমুহ তাঁকে প্রভাবিত বা আবদ্ধ করতে পারে না। তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে স্বাধীন হয়ে বিচরণ করেন।

উল্লেখ্য যে, সাত্ত্বিক গুণের বৈশিষ্ট হচ্ছে জ্ঞান, বৈরাগ্য এসব; রাজসিক হচ্ছে লোভ, দম্ভ, উৎফুল্লতা এবং তামসিকের বৈশিষ্ট হচ্ছে শোক, মোহ, নিদ্রা, আলস্য এগুলি। এসব ভাব থেকে ভগবানের কিছুই পাওয়ার নেই। তিনি এসকল বিষয়ে উদাসীন। তাই গুণসমুহ ভগবানকে আকর্ষিত বা প্রভাবিত করতে পারে না।

• **৭.১৩** অপরদিকে জড় জগতে জীবসমুহ ত্রিগুণের প্রভাব থেকে কোনভাবেই নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পারে না। কোন না কোন একটি গুণের অধীন হয়েই যায় এবং মোহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে স্বভাবজাত কর্মে আবদ্ধ হয়। ফলে ত্রিগুণের প্রভাবমুক্ত কোন কিছু হতে পারে বা থাকতে পারে বিভ্রান্ত জীব সেটি ধারণায়েও আনতে পারে না। বদ্ধ জীবের পক্ষে তার সক্ষমতার উর্ধ্বের অবস্থা বা নির্গুণ অবস্থাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। তাই গুণ সকলের উর্ধ্বে নির্গুণ ভগবানকে তারা বুঝতে পারে না।

• **৭.১৪** ভগবানের ত্রিগুণময়ী সৃষ্টিশীল এই মায়াশক্তিকে অতিক্রম করা কঠিন। তবে শ্রীকৃষ্ণ বলেন অতিক্রম করার উপায় আছে। যারা কেবল ভগবানের ভজনা করেন তারা একে অতিক্রম করতে পারেন।

এই ভজনা করার অর্থ কি? প্রথমত ভগবানকে জানতে ও বুঝতে হবে। তাই পারমার্থিক বা আধ্যাত্ম জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না। তাতে মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখতে হবে। সত্য অন্তরে নিজের ভেতরে তা ধারণ করতে হবে। অতঃপর সিদ্ধি লাভের যে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে তা অনুসরণ করে সাধনা করতে হবে। সাধনা করলে ফল লাভ করা সম্ভব হতে পারে। যদিও ভগবানের ইচ্ছে ও অনুগ্রহের ওপরই সফলতা নির্ভর করে।

শাস্ত্রে গুণভেদ অনুসারে কর্মভেদ ও উপাসনা প্রণালীর ভেদ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সব সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তমঃ ও রজঃ গুণকে প্রশমিত করে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়া। গুণসমুহের মধ্যে সত্ত্বগুণ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুণ। সত্ত্বগুণ মোক্ষের অনুকূল। যদিও পরিপূর্ণ মোক্ষের অবস্থা না। সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করে ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত

হওয়াই হচ্ছে লক্ষ্য। তবেই প্রকৃতির বন্ধন দশা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভাব লাভ করা সম্ভব হতে পারে। উল্লেখ্য যে, মনুষ্যত্বের পরবর্তী সোপান হচ্ছে ব্রহ্মত্ব লাভ করা। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৫	পাপী, বিবেকহীন ও অধম ব্যাক্তিরা যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে তারা অসূর ভাব প্রাপ্ত হয় বলে আমাকে ভজনা করে না।
১৬	হে ভারত শ্রেষ্ঠ অর্জুন! চার ধরণের পূণ্যবান মানুষ আমাকে ভজনা করে। আর্ত, অনুসন্ধিৎসু, অর্থ-সম্পদ প্রত্যাশী এবং জ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞ।
১৭	তাদের মধ্যে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞ বা জ্ঞানী যার মন সর্বদা আমাতে যুক্ত- সেই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু আমি তার অত্যান্ত প্রিয় তাই সেও আমার প্রিয়।
১৮	এদের সকলেই মহান। তবে তত্ত্বজ্ঞ বা জ্ঞানী আমারই মতো, যেহেতু সেই যুক্তাত্মা পরম লক্ষ্য আমাকেই আশ্রয় করেছে। এটাই আমার মত।
১৯	বহু বহু জন্মের পর 'বাসুদেবই সব' এভাবে জেনে আমাকে ভজনা করে, তেমন মহাত্মা অতি দুর্লভ।

● **৭.১৫** পাপী অন্তর, বিবেকহীন ও অধম ব্যাক্তিরা ভগবানকে ভজনা করে না। ভগবানকে ভজনা করতে হলে তাঁর বিষয়ে সঠিক ধারণা বা জ্ঞান রাখতে হবে। তাঁর মহাত্ম বিষয়ে অবগত থাকতে হবে। তবেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হবে। কিন্তু পারমার্থিক বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে এমন লোকেরা জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে জানে না। করণীয়ও বোঝে না।

জড় জাগতিক বিষয়ে আসক্তি বা মায়ার কবলে পড়ে তাদের জ্ঞান এমনভাবে অপহৃত হয় যে তারা এ জগতে আবদ্ধ হয়ে যায়। উচ্চ পর্যায়ের চিন্তা-ভাবনা তাদের ভেতরে আসে না। কর্মের পরিণতি বিষয়ে ভাবনা নেই বলে হেন মন্দ কাজ নেই যা তারা করতে পারে না। তারা অসূর স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এ ধরণের মানুষ ভজনা তো দুরের কথা এমনকি ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ ভাবও পোষন করে। তাই তারা ভগবানের ভজনা করে না। এদের বিষয়ে এভাবে বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল জীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারা যারা অভক্ত, অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ; তারা বিশ্বাস করবে না।" (আল-কোরআন ৮:৫৫)

"যারা অবিশ্বাস করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। নিশ্চয়ই! তোমরা অস্বীকারকারীরা দোষীদের পর্যায়ভূক্ত।" (আল-কোরআন ৪৭:১২,৭৭:৪৬)

• **৭.১৬** তাহলে ভগবানের ভজনা করেন কারা? বলা হচ্ছে, চার ধরণের মানুষ ভগবানের ভজনা করেন বা তাঁকে স্মরণ করেন। এরা হচ্ছেন আর্ত-পিড়ীত, অনুসন্ধিৎসু বা জিজ্ঞাসু, অর্থ-সম্পদ প্রত্যাশী এবং জ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞ।

আর্ত ও নিপীড়িত জন অসহায় হয়ে ভগবানকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়। তবে বাধ্য হলেও তারা ভগবানকে বিশ্বাস করে। তাই বিপদে বা নিজেদের প্রয়োজনে ভগবানকে স্মরণ করে।

অর্থ-সম্পদ প্রত্যাশী তার নিজের কামনা-বাসনা ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভগবানকে স্মরণ করে। তবে তার নিজের আকাংখার প্রয়োজনে হলেও সে ভগবানকে স্মরণ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ ভগবানকে স্বীকার করে ও বিশ্বাস করে।

অপরদিকে আসুরিক ভাবাপন্ন বা অবিশ্বাসীরা ভগবানকে স্মরণ তো করেই না বরং অস্বীকার ও ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাবও পোষন করে। তারা ভগবানকে বিশ্বাস করে না এবং কর্মের ফল বিষয়েও তাদের বিশ্বাস নেই।

অনুসন্ধিৎসু সৃষ্টি রহস্য বা ভগবানকে জানার আগ্রহ নিয়ে তাঁকে স্মরণ করে। সে কারণে তারা অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দও বিসর্জন দেয়। অনুসন্ধিৎসুই লেগে থাকলে এক পর্যায়ে তত্ত্বজ্ঞে পরিণত হয়।

সত্যিকারের জ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞ গভীরের রহস্য জানেন। তারা সত্যের জ্ঞানের কারণে ভগবানে সত্যিকারের বিশ্বাসী। তারা জ্ঞানতই জানেন যে ভগবানই জীবন ও জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়কর্তা। তিনিই প্রভূ বা প্রতিপালক। তারা ভগবানের অফুরন্ত অনুগ্রহের কারণে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞচিত্তে তাই তারা কেবলমাত্র ভগবানেরই ভজনা করেন। বলা হচ্ছে,

"যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না।" (আল-কোরআন ১৬:১৮)

• **৭.১৭** বিশ্বাসী যদি জ্ঞানবান হন তবে তিনিই ভগবানের সবচেয়ে প্রিয় হন। তিনি অন্ধের মতো নয় বরং জ্ঞানের কারণে ভগবানের ভক্ত হন এবং সে কারণে ভগবানের

সেবা করেন বা তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করেন। তিনি যা করেন বুঝে করেন। সত্যকে জেনে করেন। অন্ধের মতো করেন না।

তত্ত্বজ্ঞ সৃষ্টি বা জীবন ও জগত সম্পর্কিত জ্ঞানে অন্যদের চেয়ে অনেক অগ্রসর। গভীরের জ্ঞান রাখেন বিধায় তিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন। সত্যের জ্ঞানের কারণে তিনি ভগবানের ভক্তে পরিণত হন। তাই ভগবানকে স্মরণ করেন। জ্ঞানের কারণে যিনি ভগবানে বিশ্বাসী হন ভক্তদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। কেননা কাম্য কিছুর প্রত্যাশায় তিনি ভগবানকে স্মরণ করেন না। কোন প্রতিদান বা বিনিময় ছাড়াই কেবল সত্যের জ্ঞানের কারণে তিনি ভগবানকে স্মরণ করেন।

ভগবান বলেন, যে আমাকে যেমন প্রীতি করে আমিও তাকে তেমন প্রীতি করি। ভগবানও তাদেরকে অনুরূপ কিংবা তার চেয়েও অধিক ভালবাসেন। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী এবং জ্ঞানসম্পন্ন আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।" (আল-কোরআন ৫৮:১১)

সকাম কর্মীগণ ইহকাল-পরকাল সব কামনা করে। তারা ঈশ্বরও চায়, সংসারেও উন্নতি কামনা করে। তারা কেবলমাত্র ভগবানেরই দ্বারস্ত হয় না। তারা ধন-সম্পদের লোভে দেব-দেবীদের কাছেও যাচঞা করে। অথচ ভগবান সকলের অন্তরের ভাবনা পর্যন্ত জানেন। তিনি জানেন যে তত্ত্বজ্ঞ অন্য কিছুই চায় না। তত্ত্বজ্ঞ কেবল তাঁকেই চায়। তাই তত্ত্বজ্ঞ তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। যেমন বলা হয়েছে,

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থেকে আল্লাহর উপাসনা করে। যদি কল্যাণ প্রাপ্ত হয় তবে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়। কিন্তু যদি কোন পরীক্ষায় পতিত হয় তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।" (আল-কোরআন ২২:১১-১২)

● **৭.১৮** যারা ভগবানে বিশ্বাসী ও তাঁর ভজনা করেন, বলা হচ্ছে তারা সকলেই মহান। এমনকি সকাম কর্মীরাও। কেননা সকাম কর্মী হলেও তারা ভগবানে বিশ্বাসী এবং তাঁর ভজনা-উপাসনাও করেন। যারা বিশ্বাসী ও ভগবানের ভজনা করেন ভগবান তাদের সকলের ওপরই সন্তুষ্ট।

তত্ত্বজ্ঞ ব্যাতিত অপরাপররা ভগবানের ভজনা করলেও তাদের প্রত্যেকেরেই ভগবানের কাছে কিছু না কিছু প্রত্যাশা বা প্রাপ্তির বাসনা থাকে। অর্থাৎ কোন বিনিময় প্রাপ্তির আশায় তারা ভগবানের ভজনা করেন।

অপরদিকে তত্ত্বজ্ঞ ভগবানের মহাত্ম বিষয়ে জানেন। জ্ঞানের কারণে তিনি মনে-প্রাণে ভগবানে বিশ্বাসী। তিনি জানেন ভগবানই লক্ষ্য। তিনি তাঁকেই একমাত্র আশ্রয় গণ্য করেন। তাই ভগবানের সেবা করতে পেরেই তিনি সন্তুষ্ট। তাতেই তাঁর তৃপ্তি, তুষ্টি এবং তাতেই তিনি সুখী। তিনি অন্যদিকে মনোনিবেশ করেন না। অন্য কিছু কামনাও করেন না।

তত্ত্বজ্ঞ ভগবানের গুণাগুণ ও ভাব সম্পর্কে অবগত। সর্বদা ভগবানের সাথে যুক্ত বা তাঁর ভাবনায় অনন্যচিত্তে নিমগ্ন থাকায় তিনিও ভগবানের মতোই ভাবপ্রাপ্ত। স্বাভাবতই ভগবানের দৃষ্টিতেও তিনি অন্যদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

ভগবান বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে সকলে তেমন উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হতে হলে জ্ঞান অর্জন বিশেষত পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

● **৭.১৯** জ্ঞানী অনেক জন্মের সাধনার পর এটি বুঝতে সক্ষম হন যে 'বাসুদেবই সব'। বাসুদেবই সর্বব্যাপী, বাসুদেবই সমস্ত জীবে বাস করেন, অর্থাৎ ভগবান সবকিছুর মূল বা পেছনের কারণ এবং তিনিই লক্ষ্য এমন জেনে তাঁরা ভগবানকেই ভজনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের সন্তান। তাই এভাবে বলা হয়েছে।

সংকটকালে ভগবানের বাণী যখন সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় থেকে নিঃসৃত হয়েছে, তখন ভগবানের ভাবই তাঁর মধ্যে প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। মানবরূপী কৃষ্ণ সেই প্রকট রূপের আড়ালে ঢাকা পড়েছিলেন। তাঁর মধ্য দিয়ে ব্যাক্ত ছিলেন ভগবান স্বয়ং। গীতা উপস্থাপনের সময়কালে শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাই বসুদেবই ভগবান এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। বাসুদেবের সন্তান হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকেই এখানে বসুদেব বলা হয়েছে।

এতক্ষণ সকাম ও নিষ্কাম ভক্তদের বিষয়ে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। যারা ভগবানের ভজনা করেন তেমন সকাম ভক্তরাও ক্রমে চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা নিষ্কাম ভাব

প্রাপ্ত হন এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু যারা কেবল কামনা-বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়ে দেবোপাসনা করে এবার তাদের বিষয়ে বলা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২০	জ্ঞান যাদের যেমন কামনা-বাসনা দ্বারা অপহৃত হয়েছে, স্বীয় স্বভাবের বশীভূত হয়ে তারা তদ্রূপ নিয়ম অবলম্বন করে অপরাপর দেবতাদের ভজনা করে।
২১	ভক্তি সহকারে ভক্ত যেমন দেবমূর্তী অর্চনা করতে ইচ্ছে করে, দেবোপাসক ভক্তের নিশ্চিত ভক্তি আমি তেমন দেবমূর্তীতেই বিধান করে দেই।
২২	সেই দেবমূর্তী অর্চনাকারী দেবোপাসক ভক্তিযুক্ত হয়ে আরাধ্য দেবতার আরাধনা করে। আরাধ্য দেবতা থেকে সে যে কাম্য বস্ত লাভ করে বস্তুত সে সবই আমার দ্বারা বিহিত হয়ে থাকে।
২৩	স্বল্প জ্ঞানের সে সমস্ত মানুষদের প্রাপ্ত ফল নশ্বর হয়। দেবতাদের উপাসকগণ তাদের আরাধ্য দেবতাদের লোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।

● **৭.২০** ভগবান বা আল্লাহকে পেতে হলে যে সময়, ধৈর্য্য, সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয় দেবতাদের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় না। তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি ঘটে। দেবতা বলতে কাদেরকে বোঝায় পূর্বে সে বিষয়ে বলা হয়েছে। ফলে স্বীয় স্বভাব ও মনোবাঞ্ছা অনুসারে আরাধনাকারীরা তৎ সংশ্লিষ্ট দেবতাদের দ্বারস্ত হয়। সেসব দেবতাদের পূঁজা বা আরাধনা করার জন্য যে যে নিয়ম প্রচলিত আছে তারা সে সে নিয়ম পালন করে দেবতাদের ভজনা করে।

বৈদিক শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর পূঁজা করার বিধান আছে। যেমন- রোগ নিরাময়ের জন্য সূর্য্যদেবের উপাসনা করার বিধান আছে। বিদ্যার্থীদের জন্য স্বরস্বতীর পূঁজা করার বিধান আছে। সুন্দরী স্ত্রী লাভের জন্য শিবপত্নী উমার পূঁজা করা হয় ইত্যাদি।

দেবোপাসকগণ মনে করে যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট দেবদেবীদের কাছেই যেতে হয়। ফলে স্বীয় স্বভাবের বশীভূত হয়ে তারা তাদের আরাধ্য দেবতাদের ভজনা করে। বলা হচ্ছে,

“সাবধান! নিষ্ঠাপূর্ণ উপাসনা কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহ ব্যাতিত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, ‘আমরা তাদের উপাসনা করি এজন্য যে, তারা যেন আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে।’ তারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করছে আল্লাহই তার মিমাংসা করবেন।” (আল-কোরআন ৩৯:৩)

“তাদের দেবতারা যাদেরকে তারা আল্লাহর সমপর্যায়ের গণ্য করেছে কেউই সুপারিশ করবে না এবং তারাও তাদের দেবদেবীগুলিকে অস্বীকার করবে।” (আল-কোরআন ৩০:১৩)

“নভোমন্ডলে কত ফেরেশতা আছে যাদের কোন সুপারিশ কাজে আসবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে অনুমতি দেন যাকে তিনি পছন্দ ও গ্রহণ করেন।” (আল-কোরআন ৫৩:২৬)

গীতায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ‘কামনা-বাসনা দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে’ অর্থাৎ সঠিক জ্ঞান থেকে যারা বিচ্যূত হয়েছে তারাই ভগবানকে ছেড়ে দেবতাদের দ্বারস্ত হয় ও তাদের পূঁজা করে। ফলে এ কাজটি যে সঠিক ও জ্ঞানসম্মত কাজ নয় গীতাতে সেটিই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

এটিই এক পরীক্ষা। মানুষ কি করে ভগবান তা দেখেন। সত্যিই কি মানুষ তাঁকে ভালবাসে, ভক্তি করে? তাঁকেই সবকিছুর হর্তাকর্তা ও মূল কারণরূপে জানে? মানুষ কি যথাযথ জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয়েছে? তাদের কাছে কি সঠিক বার্তা পৌঁছান হয়েছে? সত্যকে কি তারা অন্তরে ধারণ করতে পেরেছে? নাকি মূল কারণ ভগবানকে বিস্মৃত হয়ে কামনা-বাসনা বা কোন লোভ বা প্ররোচনা দ্বারা তাড়িত হয়ে অপরের দ্বারস্ত হচ্ছে। চিত্তের দৃঢ়তা কি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? এগুলিই পরীক্ষা। যেমন বলা হয়েছে,

“আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভূলে গিয়েছিল। আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।” (আল-কোরআন ২০:১১৫)

আদমকে স্বর্গ বা বেহেশত ছেড়ে পৃথিবীতে আসতে হয়েছে। এখানেই জ্ঞানী-নির্জ্ঞানী, ধৈর্য্যশীল-অধৈর্য্যশীলদের চিত্তের দৃঢ়তার পরীক্ষা ও বাছাইয়ের বিষয়টি চলে আসে। যেমন বলা হয়েছে,

"অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জন-সম্পদের মাধ্যমে। তবে যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর এবং মন্দ পথ পরিহার করে চল, তবে সেটি হবে আত্মপ্রত্যয়ী অন্তরজনিত বিষয়।" (আল-কোরআন ৩:১৮৬)

"পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যেসব উপকরণ আমি দিয়েছি সেসব বস্তুর প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত কর না। এর মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করি।" (আল-কোরআন ২০:১৩১)

তবে ভগবান বা আল্লাহ কেন মানুষকে এভাবে পরীক্ষা করেন সে বিষয়ে মানুষের কোন ধারণা নেই। জগত পরিচালনায় যোগ্যদের তিনি বাছাই করতে পারেন। যেমন বলা হয়েছে,

"বল, হে মোহাম্মদ আমি জানি না, হতে পারে পার্থিব জীবন তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা, কিংবা ক্ষণকালের জন্য আনন্দ-উপভোগ।" (আল-কোরআন ১০:৪)

জ্ঞানসম্পন্নরা অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি জানেন ও বোঝেন। সাময়িক লোভ পরিত্যাগ করে তাই কেবলমাত্র ভগবানেরই উপাসনা করেন। বলা হচ্ছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিচ্যূত না করে। যারা তা করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (আল-কোরআন ৬৩:৯)

• **৭.২১** 'ভক্তি সহকারে ভক্ত যেমন দেবমূর্তী অর্চনা করতে ইচ্ছে করে' কথাটির অর্থ হচ্ছে যার মন যা পেতে চায় সে তৎ সংশ্লিষ্ট দেবতার অবয়বকে উপাসনা করতে ইচ্ছে করে। কেননা সে বিশ্বাস করে যে সংশ্লিষ্ট দেবতাই তাকে তা প্রদান করতে পারেন। ফলে সেই দেবোপাসক ভক্তের নিশ্চিত ভক্তি ভগবান নিজেই তার প্রত্যাশিত দেবমূর্তীতে বিধান করে দেন। যেন তার চাওয়াতেই সে তুষ্ট থাকে এবং একটা নিয়মের অধীন থেকে তার আরাধ্য বিষয় বা বস্তু লাভ করে।

লক্ষণীয় যে, স্বভাবজাত বিশ্বাসের ভিত্তি কিন্তু ভগবানই স্থাপন করে দেন। ভগবানের শক্তি ব্যাতিত কারও কিছু করার সক্ষমতাটিও নেই। তবে তিনি জীবের চাওয়া বা ইচ্ছে অনুযায়ী সব হতে দেন। কিন্তু তিনি ভাল-মন্দ, সঠিক-বেঠিক,

করণীয়-অকরণীয়, উচিত-অনুচিত সবকিছুর দিক-নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন এবং প্রতিনিয়ত অন্তরে বলেও চলেছেন।

ভগবান সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে স্থিত। তিনি সকলের মনোবাসনা জানেন। ভক্ত কেবল ইচ্ছে প্রকাশ করে। ভগবানের শক্তি তা বাস্তবায়ন করে দেয়। ভগবানের সাহায্য ছাড়া মানুষ কিংবা দেবতা কেউই কিছু করতে পারে না। তবে ভগবান কারও ইচ্ছেতে হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি নানাভাবে ভাল-মন্দ পথ প্রদর্শন করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"মানুষকে পথ চলার ভিন্ন ভিন্ন দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি- ভাল ও মন্দ। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি উন্নতর বা উচ্চতর পর্যায়ে আরোহনের।" (আল-কোরআন ৯০:১০-১১)

মন্দ ইচ্ছে করাও তাই পাপরূপে গণ্য হয়। কেননা ভগবান মানুষকে তার ইচ্ছের পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যান। তাই আমিত্ববোধ নিয়ে করা কর্মের ভাল-মন্দের দায় ও ফলভোগ নিজের ওপর বর্তায়। ভগবানের ওপর বর্তায় না। কেননা ইচ্ছে বা অঙ্গীকারটা তখন নিজের হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের প্রকৃত সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।" (আল-কোরআন ২:২৫৫)

● **৭.২২** ভক্ত বিশ্বাস সহকারে তার আরাধ্য দেবতার আরাধনা করে। অর্থাৎ স্বভাব অনুসারে কাম্য দেবদেবীদের আরাধনা করে এবং আরাধ্য বিষয় বা বস্তু লাভ করে। কিন্তু বলা হচ্ছে যে, দেবতাদের থেকে তারা যা কিছু লাভ করে সবকিছুর বিহিত-ব্যাবস্থা ভগবানই করে থাকেন। তবে যে যেমন দেবতার মাধ্যম হয়ে পেতে চায় তাকে তিনি তার সেই আরাধ্য দেবতার মাধ্যম দিয়েই দিয়ে থাকেন। যেন সে তাতেই তুষ্ট থাকে।

বস্তুত দেবদেবীরা যা দেয় ভগবানের অনুমতি ভিন্ন তারা কিছুই দিতে পারে না বা দেয়ার সে ক্ষমতাও তারা রাখে না। কিন্তু স্বল্প জ্ঞানের মানুষ তা জানেনা। ভগবানের সাহায্য ছাড়া কারও কিছু করার কোন ক্ষমতা নেই। না দেবতাদের না মানুষের। না দেয়ার না চাওয়ার। সত্য হচ্ছে জগতে উপাস্য একজনই। অন্য কারও উপাসনা করা বিধেয় নয়। যেমন বলা হয়েছে,

"শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ বা ভগবান! তিনিই সত্যিকার অধিপতি! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি সন্মানিত আসনের অধিপতি।" (আল-কোরআন ২৩:১১৬)

"যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য থাকত, তবে অবশ্যই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল বিশৃংখল হয়ে যেত। অতএব আল্লাহর সাথে তারা যেসব অংশীদারীত্ব আরোপ করে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।" (আল-কোরআন ২১:২২)

"তবুও কি তারা মিথ্যে বিষয়েই বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ... আল্লাহ ব্যাতিত এমন কিছুর উপাসনা করবে যে তাদের জন্য ভূমন্ডল ও নভোমন্ডল থেকে সামান্য জীবনোপকরণ প্রদানের অধিকার রাখে না এবং ক্ষমতাও রাখে না? আল্লাহর সঙ্গে কোন সাদৃশ্য সাব্যস্ত কর না।" (আল-কোরআন ১৬:৭২-৭৪)

জীবাত্মা ও দেবতা উভয়ই ভগবানের ইচ্ছের অধীন। জীব নিজের ইচ্ছেতে দেবদেবীদের পূঁজা করতে পারে না। আবার দেবতারা বা ফেরেশতারাও ভগবানের ইচ্ছে ব্যাতিত কোন কিছু প্রদান করতে পারে না।

দেবদেবীরা হচ্ছে উপলক্ষ্য মাত্র। স্বল্প জ্ঞানের মানুষ বিষয়গুলি জানে না বা বোঝে না বিধায় তারা লোভ দ্বারা তাড়িত হয়ে সাময়িক ও তাৎক্ষণিক সুবিধা লাভের আশায় দেবতাদের স্মরণাপন্ন হয়। কিন্তু বিষয়গুলি যিনি জানেন বা বোঝেন তিনি কেবল ভগবান বা আল্লাহর কাছেই যাচঞা বা প্রার্থনা করেন এবং তাঁরই উপাসনা করেন।

● **৭.২৩** স্বল্প জ্ঞানের মানুষেরা দেবতাদের আরাধনা করে। দেবতাদের আরাধনা করে তারা যা কিছু লাভ করে তা নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী হয়। এমনকি সকল দেবদেবী, তাদের ধাম ও তাদের উপাসক সবকিছুই বিনাশশীল। যেমন বলা হয়েছে,

"ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে; কেবল থেকে যাবে তোমার মহিমাময় মহানুভব স্রষ্টার সত্ত্বা।" (আল-কোরআন ৫৫:২৬-২৭)

দেবতাদের উপাসকগণ তাদের আরাধ্য দেবতাদের লোক প্রাপ্ত হয়। যেমন সূর্য্যের উপাসকেরা সূর্য্যলোকে যায়। চন্দ্রের উপাসকেরা চন্দ্রলোকে যায়। কেউ যদি ইন্দ্রের মতো দেবতার উপাসনা করে তবে সে সেই বিশেষ দেবতার লোকে যেতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকেরা এই জড় জগতেরই ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক

প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবানের প্রকৃত ভক্ত যেখানে যায় এগুলি সে স্থান নয়। ভগবান বা আল্লাহর উপাসক কেবল তাঁরই সান্নিধ্য লাভ করে। বলা হচ্ছে,

".. জেনে রেখ যে, যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে আছে, তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করে এবং ক্লান্ত হয় না।" (আল-কোরআন ৪১:৩৮)

ভগবান বা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের বিষয়টি সর্বত্রই গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সত্যিকার ভক্তকে ভগবান বা আল্লাহ সাধারণত জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ, ভোগ-বিলাস দেন না। এটিও এক পরীক্ষা। স্বল্প জ্ঞানের মানুষ সেসব লাভের জন্য দেবতাদের উপাসনা করে। কিন্তু যে ভক্ত ভগবৎ ধামে ফিরে যেতে চায় তার কাছে জাগতিক বাসনাগুলি প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ মনে হয়। যারা কামনা-বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়ে দেবোপাসনা করে তারা কাম্য বস্তু লাভ করে কিন্তু ভগবানকে পায় না। যেমন বলা হয়েছে,

"যে ইহকাল কামনা করে, আমি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে তাকে তা সত্বর প্রদান করি। ... যারা পরকাল কামনা করে এবং বিশ্বাসী হয়ে সে জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা-সাধনা করে এমন লোকদের প্রচেষ্টাও স্বীকৃত হয়ে থাকে। ... অবশ্যই পর্যায় ও পছন্দের দিক থেকে পরকালই হবে উচ্চতর।" (আল-কোরআন ১৭:১৮-২১)

স্বল্প জ্ঞানের মানুষ মনে করে যে বিভিন্ন দেবদেবীরা হচ্ছে এক একজন ভগবান এবং তারা সকলেই ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী। বলা হচ্ছে,

"বল: যদি আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য আরও উপাস্য থাকত যেমনটি তারা বলে, তবে তারা আরশের অধিপতির বিপক্ষে উপায় অন্বেষণ করত।" (আল-কোরআন ১৭:৪২)

"যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য থাকত তবে অবশ্যই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল বিশৃংখল হয়ে যেত।" (আল-কোরআন ২১:২২)

দেবদেবীরা হচ্ছেন ভগবানের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ। এগুলি হচ্ছে কিছু ধারণামাত্র। ধারণা মতে দেবদেবীরাই কেবল ভগবানের অংশবিশেষ নন। সাধারণ জীবেরাও ভগবানের অংশবিশেষ। যেমন- ব্রাক্ষ্মণ হচ্ছেন ভগবানের মস্তকের অংশ, ক্ষত্রিয় হচ্ছেন বাহু, বৈশ্যরা উদর এবং শূদ্ররা পায়ের অংশ। তারা প্রত্যেকে এক একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৪	স্বল্পবুদ্ধির মানুষ আমার অব্যয় ও সর্বোত্তম পরম ভাব না জেনে অব্যাক্ত আমাকে মনুষ্যবৎ ভাবসম্পন্ন বলে মনে করে।
২৫	আমি যোগমায়ায় সমাবৃত; সকলের নিকট প্রকাশিত নই। তাই এই সকল মূঢ় লোকেরা আমাকে জন্মরহিত অক্ষয় বলে জানতে পারে না।

● **৭.২৪** প্রকৃতি বা স্বভাবের ত্রিগুণের কারণে মানুষ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কোনভাবেই নিজেকে দমন করতে পারে না। ফলে ত্রিগুণের প্রভাবের উর্ধ্বে কোন ভাব হতে পারে সেটি মানুষ ধারণায়েও আনতে পারে না।

ভগবানের ভাব কিন্তু সাধারণ জীব থেকে পৃথক। তিনি ত্রিগুণের অতীত নির্গুণ। তাই তিনি জড় বন্ধনে আবদ্ধ হন না। তিনি অব্যয় বা বিকারহীন। লীলাচ্ছলে মনুষ্যবৎ ভাব গ্রহণ করলেও তাঁর পরম ভাব অক্ষয় থাকে।

ভগবানের সব ভাব ব্যাক্ত নয়। তাঁর অব্যাক্ত ভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারে না। তাই তারা তাঁকে বুঝতে পারে না। বরং ভূলভাবে তাঁকে মনুষ্যবৎ ব্যাক্তিত্বসমপন্ন মনে করে উপহাসও করে। যেমন বলা হয়েছে,

"কখনই তাদের কাছে এমন কোন বার্তাবাহক আসেনি যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।" (আল-কোরআন ৪৩:৭)

"নিশ্চয়ই! তোমার পূর্ববর্তী বার্তাবাহকগণের সঙ্গেও উপহাস করা হয়েছে হে মোহাম্মদ, অতঃপর যারা তাদের সঙ্গে উপহাস করেছিল তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিয়েছিল যা নিয়ে তারা উপহাস করত।" (আল-কোরআন ৬:১০)

প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণ মানুষ তাহলে ভগবানের ভাবপ্রাপ্ত একজনকে জানবে কিভাবে? বস্তুত ভগবান কোন না কোন মাধ্যম দিয়ে তাঁর কোন একটি বিশেষ বা নির্দিষ্ট গুণের প্রকাশ ঘটান। যেন জীব তাঁর সেই গুণ সম্পর্কে জানতে পারে। তখন তাঁকে আকার ধারণ করতে হয়। যদিও তিনি নিরাকার। নিরাকার এ কারণে যে তাঁর প্রকৃত আকার বিষয়ে কারও কোন ধারণা নেই; কিংবা তিনি সুনির্দিষ্ট কোন আকার ভূক্ত নন; ইচ্ছেমতো যে কোন আকার ধারণ করতে পারেন। তিনি সব করতে পারেন। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ৩৫:১)

"‥ আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই করেন।" (আল-কোরআন ২২:১৪)

কোন নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে তিনি তাঁর অনন্ত বিভূতির কোন বিশেষ একটি গুণ সকলের সম্মুখে তুলে ধরেন বা প্রকাশ করেন। বুঝতে হবে যে, এতে কিন্তু সেই আকার বা মাধ্যমটি ভগবান হয়ে যায় না। এটি ভগবানের অনন্ত বৈভবের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। পূর্ণাঙ্গ ভগবান নয়। যেমন হিমালয় তাঁর একটি প্রকাশ হলেও হিমালয় কিন্তু ভগবান না। ফুল বা ফুলের গন্ধ তাঁর প্রকাশ হলেও ফুল বা তার গন্ধ কোনটিই কিন্তু ভগবান না।

ভগবান তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়েই মানুষের সামনে তাঁর এত এত বিভূতি প্রকাশ করেন। স্থাবর-অস্থাবর, জীব-জড় এসবের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর বিভূতিসমুহের প্রকাশ ঘটান। তাঁর বিভূতির যা কিছু অপ্রকাশিত বা অব্যাক্ত সে বিষয়ে মানুষের কোন ধারণা নেই। কেবল তিনি কোন প্রকারে ব্যাক্ত হলেই মানুষ তাঁর সেই গুণ, বৈশিষ্ট বা সক্ষমতা বিষয়ে জানতে পারে। তার জন্য তাঁকে আকার ধারণ করতে হয়। আকার বা কোন একটি রূপের মাধ্যমেই তিনি ব্যাক্ত হন।

কোন মানুষের মধ্য দিয়ে তিনি যখন তাঁর কোন ভাব প্রকাশ করেন তখন সে মানুষও ভগবান হয়ে যান না। ভগবান অসীম বিভূতিসম্পন্ন। কোন মানুষ বা কোন কিছুই অসীম বিভূতিসম্পন্ন নয়। তারা তাঁর একটি বা সামান্য বিভূতি প্রকাশের মাধ্যম মাত্র হয়।

সংকটকালে তিনি যখন কারও মাধ্যম দিয়ে তাঁর কমান্ড, নির্দেশনা বা কোন প্রেরণা প্রেরণ করেন তখন সে মাধ্যম ভগবান হয়ে যান না। মাধ্যম হন মাত্র। মাধ্যম হিসেবে কাকে তিনি বেছে নেবেন? বলা হচ্ছে,

"জ্ঞান প্রাপ্তিতে তিনি তাঁর বার্তাবাহকরূপে যাকে ইচ্ছে বাছাই করেন।" (আল-কোরআন ৩:১৭৯)

"তোমার পালনকর্তা … যাকে ইচ্ছে মনোনীত করেন। তাদের কোন পছন্দ নেই।" (আল-কোরআন ২৮:৬৮)

ভগবান জানেন কাকে তাঁর বার্তা প্রেরণ করতে হবে। তিনি সকলের অন্তরের ভাব জানেন। তিনি সকলের ভাল-মন্দ নিয়ত সম্পর্কেও অবগত। নিশ্চয়ই! তিনি তাঁর ইচ্ছেতেই কাউকে এক্ষেত্রে বেছে নিতে পারেন।

ভগবানের অব্যয় ও সর্বোত্তম পরম ভাব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে কিছু মানুষ যেমন ভগবানকে মনুষ্যবৎ ভাবসম্পন্ন বলে মনে করে, আবার কেউ কেউ ভগবানের ভাবসম্পন্ন প্রতীয়মান কোন মানুষকে সরাসরি ভগবান বলেও মনে করে।

- **৭.২৫** ভগবান সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। তিনি অব্যাক্ত থাকেন। অন্তরালে থাকেন। তিনি যোগমায়া বা তাঁর সৃষ্টি কৌশলে সকলের থেকে নিজেকে আবৃত বা আড়াল করে রাখেন। যোগমায়া হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টি কৌশল যা সকলের কাছে বোধগম্য নয়। সাধারণ মানুষ তাই তাঁকে অব্যয়-অক্ষয় জন্মরহিত বলে জানতে পারে না। তারা ভগবানের ভাব সম্পর্কে অবগত নয়। ভগবান হচ্ছেন সূর্য্যের মতো উদ্ভাসিত। কিন্তু মায়া হচ্ছে মেঘের মতো যা আড়াল করে রাখে। যেমন বলা হয়েছে,

"কোন মরণশীলের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন কোন ওহীর মাধ্যম ব্যাতিত বা কোন পর্দার অন্তরাল অথবা কোন দূত প্রেরণ করার মাধ্যম ব্যাতিত, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান সে বার্তা পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই! তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।" (আল-কোরআন ৪২:৫১)

কোন শাস্ত্র অধ্যায়ন করে ভগবানকে সত্যিকারভাবে জানা যায় না। কেবল তাঁর কৃপার ফলেই তাঁকে জানা সম্ভব। তাঁকে বুঝতে হলে তাঁর পরম ভাবকে বুঝতে হবে। তাঁকে পেতে হলে তাঁর সেই পরম ভাবকে অর্জন করতে হবে। তাই পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করে সাধনা করতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সত্ত্বাই ভগবানের গুণ ও ভাবসম্পন্ন। কেননা ভগবান থেকেই সব উদ্ভূত। অর্থাৎ ব্রহ্মভূত। সহজ-সরল ও আনন্দময়। কিন্তু জড় প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে জীবাত্মা বিভ্রান্ত হয়। এমনকি না জেনে না বুঝে ভগবানের প্রতিও বিদ্বেষ ভাব পোষন করে। নিজেকে সকল কিছুর হর্তাকর্তা বলে মনে করে। জগতে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। জড় জগতের ত্রিগুণের বন্ধনে বাধা পড়ে ব্রহ্মভূত অবস্থা থেকে তার ভাবের পরিবর্তন সূচিত হয়। সত্যের জ্ঞান জড় প্রকৃতির গুণের আবরণে ঢাকা পড়ে।

বুদ্ধি যখন এভাবে নাশপ্রাপ্ত হয় তখন সে মায়ার কবলে পড়ে এবং ভগবানকে আর বুঝতে পারে না। ভগবান যে জন্ম-মৃত্যুরহিত, অব্যয়-অক্ষয় সে তা বিস্মৃত হয়। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকেও বিচ্যূত হয়। প্রকৃত দায়িত্ব-কর্তব্য কি তাও ভূলে

যায়। তার পরিবর্তীত এ ভাবকে পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে আনার পথই গীতায় প্রদর্শন করা হয়েছে। যদিও সেটি লাভ করা কঠিন।

উল্লেখ্য যে, যোগ শব্দের নানান অর্থ আছে। যোগ অর্থ হচ্ছে উপায়, কৌশল, সাধন বা পন্থা। কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ এসব ক্ষেত্রে যোগ বলতে বোঝায় ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়। আবার ভগবানের সৃষ্টি কৌশল বোঝাতেও যোগ শব্দটি ব্যাবহৃত হয়। এই সৃষ্টি কৌশলকে বেদান্তে মায়া বলে। মায়াযোগ হচ্ছে সৃষ্টি কৌশল।

সামান্য ব্যাক্তির জন্য মায়া আবরণস্বরূপ। ভগবান স্বীয় মায়া দ্বারা আবৃত থাকেন। যোগ সাধনা করতে করতে দক্ষ হয়ে যোগারূঢ় হওয়ার ক্ষমতা লাভ করলে অন্তরে স্থিত পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়। যারা যোগে পরিপক্ক অবস্থায় পৌঁছেছেন তারাই ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন বা উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি সকলের কাছে প্রকাশিত নন। বস্তুত তিনি সকলের কাছেই প্রকাশিত কিন্তু অজ্ঞতা তাঁকে চিনতে বা বুঝতে দেয় না। যিনি ভগবানের স্থিতি লাভ করেছেন এমন মহাপুরুষকে চিনতে তাই মানুষ প্রায়শই ভূল করে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৬	হে অর্জুন! আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সমস্ত কিছু জানি; কিন্তু কেউ আমাকে জানে না।
২৭	হে ভারত! হে পরন্তপ! সৃষ্টিকালে ইচ্ছে-দ্বেষজনিত দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত মোহের দ্বারা সমস্ত জীব সম্মোহিত হয়।
২৮	কিন্তু পূণ্যকর্ম দ্বারা যাদের পাপ নিঃশেষ হয়েছে এবং দ্বন্দ্ব-মোহমুক্ত হয়েছে, তারা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাকে ভজনা করে।

● **৭.২৬** ভগবান জগত সৃষ্টি করেছেন। স্বাভাবতই তিনি সবজান্তা। উপরন্তু পরমাত্মারূপে তিনি সকলের বা প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজ করেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কল্পনাসমুহকেও জানেন। কিন্তু কেউ তাঁকে জানে না। যেমন বলা হয়েছে,

“দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহকে ধারণা বা কল্পনা করতে সক্ষম নয়, কিন্তু তিনি সকল ধারণা বা কল্পনাকে জানেন। তিনি সূক্ষদর্শী, সচেতন।” (আল-কোরআন ৬:১০৩)

"তোমরা তোমাদের মতামত গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ কর তিনি সব জানেন, এমনকি যা আছে অন্তরে। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত।" (আল-কোরআন ৬৭:১৩-১৪)

"তিনি অব্যাক্ত, অদৃশ্য, গোপন, ব্যাক্ত, প্রকাশ্য সকল বিষয় অবগত; তিনি মহত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।" (আল-কোরআন ১৩:৯)

● **৭.২৭** কেন কেউ ভগবানকে জানতে পারে না? বলা হচ্ছে যে, সৃষ্টিকালে স্থুল বা জড়দেহ প্রাপ্তিকালে জীবের ভেতরে রাগ-দ্বেষজনিত দ্বান্দ্বিক ভাবের উদয় হয়। রাগ হচ্ছে অনুকুল বিষয়ে অনুরাগ এবং দ্বেষ হচ্ছে প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ ভাব। এই দ্বান্দ্বিক ভাবসমুহ জীবকে সম্মোহিত করে। এতে তার স্বভাবে পরিবর্তন দেখা দেয়। সে মোহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হয়।

জীবের ভেতরে অহঙ্কার ও আমিত্ব ভাবের উদয় হয়। সে মনে করতে থাকে এটি 'আমার' বা এসব 'আমার নয়' ইত্যাদি। নিজেকে সবকিছুর হর্তাকর্তা ভাবতে শুরু করে। এভাবে বিভ্রান্ত হওয়ার কারণে সে ভগবানের গুণাগুণ, ঐশ্বর্য্য ও ভাবসমুহকে বিস্মৃত হয়।

জীব এটিও ভূলে যায় যে সে হচ্ছে ভগবানের দাস। নিজের কর্তব্যকর্ম ভূলে সে এখানে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। অথচ বলা হচ্ছে,

"নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে কেউ নেই যে দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না।" (আল-কোরআন ১৯:৯৩)

● **৭.২৮** তবে কি ভগবানকে কেউই জানতে পারবে না বা তাঁকে স্মরণ করবে না? জীবের স্বরূপ যতক্ষণ জড় জাগতিক মায়া বা ভ্রান্তি দ্বারা আবৃত থাকে ততক্ষণ সে প্রকৃত সত্য জানতে পারে না। স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে না পারা পর্যন্ত ভগবানকেও যথাযথভাবে জানতে পারে না। রাগ-দ্বেষ, আসক্তি-মোহ এগুলি তার যথার্থ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং পাপের পথে নিয়ে যায়।

ভগবানকে সঠিকভাবে জানতে পারলে মানুষ তাঁর মহাত্ম ও বিশালত্ব এবং নিজের ক্ষুদ্রত্ব বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে পারে। তখন তার অন্তর ভগবানে নিজেকে সমর্পন করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। এর পূর্ব পর্যন্ত সে নিজেকেই সবকিছুর হর্তাকর্তা মনে করে। অজ্ঞতা দুর হলে ভগবানের মহাত্ম অবগত হয়ে সে ভগবানের ভজনা করে।

ভগবানকে যারা যথাজ্ঞানে বুঝতে পারেন তারা তাঁর নির্দেশিত পথে চলেন। তাঁর নির্দেশিত পথে চলার অর্থই হচ্ছে মন্দ পথ পরিহার ও ভাল পথ অনুসরণ করে চলা। এভাবে তাঁর দেখান পথে চলে পূণ্যকর্ম করে যারা নিজেদেরকে নিষ্পাপ করতে পেরেছেন, রাগ-দ্বেষজনিত দ্বন্দ্ব ও জাগতিক বিষয়ে আসক্তি ও মোহ থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন তারা ভগবানকে বুঝতে পেরে তাঁর স্মরণাপন্ন হন এবং তাঁর ভজনা করেন। পূণ্য কর্ম পাপ কর্মকে বিদুরীত করে। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! ভাল কাজ মন্দ কাজকে দুরীভূত করে।" (আল-কোরআন **১১:১১৪**)

পাপ নিঃশেষ হলে অন্তর নির্মল, প্রশান্ত ও পবিত্র হয়। পবিত্র অন্তর সঠিক জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়। সঠিক জ্ঞানের কারণে লোকে ভগবানকে ভজনা করে। সেই সঠিক জ্ঞানটি কি যার কারণে লোকে কেবলমাত্র ভগবানকেই ভজনা করে? বলা হচ্ছে,

২৯	বার্ধক্য ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য যারা আমাকে আশ্রয় করে চেষ্টা-সাধনা করেন বস্তুত তাঁরা সেই ব্রহ্ম, আধ্যাত্মতত্ত্ব এবং কর্মতত্ত্ব বিষয়ে সবকিছু অবগত।
৩০	যারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞরূপে জানেন- আমার প্রতি আসক্তির কারণে মৃত্যুকালেও তারা আমাকেই জানেন।

● **৭.২৯** বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের আশায় মানুষ বিভিন্নজনের স্মরণাপন্ন হয়। কেউ ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়, কেউ হস্তরেখা বিশারদ, কেউ ইঞ্জিনিয়ার কিংবা জ্ঞানী বা বিজ্ঞানীর কাছে যেতে পারে। কিন্তু বার্ধক্য ও মৃত্যু থেকে পরিত্রানের জন্য মানুষ কার কাছে যাবে? কে এ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে? জ্ঞানী জানেন বা বোঝেন যে ভগবান ব্যাতিত এ থেকে পরিত্রানদাতা আর কেউ নেই। এটিই হচ্ছে সেই যথাযথ জ্ঞান যার কারণে লোকে কেবলমাত্র ভগবানকেই ভজনা করে।

বার্ধক্য ও মৃত্যু থেকে যারা মুক্তি লাভের জন্য ভগবানের দ্বারস্ত হন বলা হচ্ছে, তারা ব্রহ্মতত্ত্ব, আধ্যাত্মতত্ত্ব এবং কর্মতত্ত্ব বিষয়ে সব অবগত। তা না হলে কেন তারা এ বিষয়ে কেবল ভগবানের দ্বারস্ত হবেন? তারা জানেন যে ভগবানই সব। তাঁর

হাতেই সকল কিছুর চাবি। তারা সেটি বিশ্বাস করেন। তাই তারা ভগবানের ভজনা করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"অদৃশ্য জগতের চাবি তাঁরই কাছে। তিনি ব্যাতিত কেউই এ সম্পর্কে জানে না।" (আল-কোরআন ৬:৫৯)

"আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর অভিভাবক বা রক্ষাকর্তা। আসমান ও জমিনের চাবি তাঁরই কাছে।" (আল-কোরআন ৩৯:৬২-৬৩)

ভগবানই সবকিছুর নিয়ন্তা। ভগবান ব্যাতিত কেউই বার্ধক্য ও মৃত্যু থেকে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যরা যা করতে অপারগ তেমন শ্রেষ্ঠ কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ জনের কাছেই চাইতে হয়। তাই এ বিষয়ে তারা কেবলমাত্র ভগবানের দ্বারস্ত হন। তারা ভগবানকে স্মরণ করেন এবং তাঁকে আশ্রয় করে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা-সাধনা করেন।

জরা-ব্যাধি-মৃত্যু এগুলি জড় প্রকৃতিতে বিদ্যমান। কিন্তু পরম প্রকৃতিতে এসব নেই। তাই বার্ধক্য ও মৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে হলে জড় প্রকৃতির উর্ধ্বে পরম প্রকৃতিকে লাভ করতে হবে। তার জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা বা দাস তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ব্যাবস্থা। ... তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়নে আয়তলোচনা সঙ্গিনীগণ। তারা বলবে, এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না ... নিশ্চয়ই! এটিই মহাসাফল্য।" (আল-কোরআন ৩৭:৪০-৬০)

• **৭.৩০** যার যেদিকে আগ্রহ, কিংবা যে যে বিষয়টি সর্বদা স্মরণ করে অথবা নিজের ভেতরে যে যে ভাব রচনার সাধনা করে মৃত্যুকালে সে ভাব দ্রুতই আপনা থেকে তার স্মরণে চলে আসে।

বলা হচ্ছে, ভগবানকে যারা অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞরূপে জানেন অর্থাৎ ভগবানই সব, তিনিই সবকিছুর নিয়ন্তা, তিনি সব করতে পারেন অন্তরে সে বিশ্বাস ধারণ ও লালন করেন ভগবানের প্রতি এমন আসক্তির কারণে মৃত্যুকালে তাদের স্মরণে ভগবানই চলে আসেন।

অষ্টম অধ্যায় : অ-ক্ষর ব্রহ্মযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ২৮)

সারকথা : পূর্বের অধ্যায়ে ভগবান সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে কিভাবে তাঁকে পাওয়া যাবে বা তাঁর ধামে প্রবেশ করা যাবে সে বিষয়ে বলা হয়েছে। ভগবানকে প্রাপ্ত হলে সেখান থেকে আর জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় না। বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। সকল যন্ত্রনার অবসান হয়। অতএব কর্ম ত্যাগ নয়, জীবনের মূল লক্ষ্য অর্জনের বিষয়কে বিবেচনায় রেখে শোকে কাতর না হয়ে কর্ম করতে হবে। কর্ম করেও ভগবানকে লাভ করা যাবে।

১	অর্জুন বলেন: সেই ব্রহ্ম কি? আধ্যাত্ম কি? কর্ম কি, হে পুরুষোত্তম! অধিভূত ও অধিদৈব কাকে বলে?
২	অধিযজ্ঞ কাকে বলে? এই দেহে কিভাবে অবস্থান করেন, হে মধুসূদন! সংযতচিত্ত ব্যাক্তি মৃত্যুকালে কিভাবে তোমাকে জানতে পারে?

● **৮.১-২** পূর্ব অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, বার্ধক্য ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য যারা ভগবানের স্মরণাপন্ন হন বস্তুত তাঁরা ব্রহ্ম, আধ্যাত্মতত্ত্ব, কর্মতত্ত্ব বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত। তারা ভগবানকেই অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞরূপে জানেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে চান। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩	যা কিছু অ-ক্ষর তাই পরম ব্রহ্ম এবং তাঁর স্বভাব আধ্যাত্ম বলে কথিত হয়। জীব ও জড়ের উৎপত্তি বা সৃষ্টি, প্রবৃদ্ধি বা সংসার ও লয় কর্ম বলে সঙ্গায়িত হয়।

● **৮.৩** যার ক্ষয় নেই তাকেই অ-ক্ষর বলে। অ-ক্ষর হচ্ছে অবিনাশী-অবিনশ্বর। যার বিকার এবং ক্ষয় নেই অর্থাৎ অব্যয়-অক্ষয়। অ-ক্ষর সব কিছুই পরম ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম। জগতে সবই ধ্বংসশীল। তাহলে কি আছে এমন যা অ-ক্ষর, অবিনাশী-অবিনশ্বর, অব্যয়-অক্ষয়, অপরিবর্তনীয় ও চির বিরাজমান? বলা হচ্ছে,

"ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর; ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কেবল থেকে যাবে তোমার মহিমাময়-মহানুভব স্রষ্টার সত্ত্বা।" (আল-কোরআন ৫৫:২৬-২৭)

স্রষ্টার সত্ত্বা ব্যাতিত এ জগতে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। স্রষ্টা হচ্ছেন ভগবান। কেউ বলেন আল্লাহ। অতএব সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা ভগবানই হচ্ছেন পরব্রহ্ম। তাঁর থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি। জীবাত্মাও ব্রহ্ম। তবে পরব্রহ্মের অংশ ব্রহ্ম।

পরব্রহ্মের স্বভাবই হচ্ছে আধ্যাত্ম। এ জগতে আর কি আছে এমন যা পরব্রহ্মের স্বভাবপ্রাপ্ত হতে পারে? জীব, জীবাত্মা বা ব্রহ্মই পরব্রহ্মের স্বভাবপ্রাপ্ত হতে পারে। কেননা আত্মা অবিনাশী-অবিনশ্বর, অব্যয়-অক্ষয়, চেতনাসম্পন্ন। জীব বা জীবাত্মা পরব্রহ্মেরই স্বভাবজাত।

জীবাত্মা জড় জগতের সংস্পর্শে এসে স্বরূপে বা স্বভাবে থাকতে পারে না। জড় জগতের সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের কবলে পড়ে তার প্রকৃত স্বভাব আবরণে আচ্ছাদিত হয়। স্বরূপ বিস্মৃত হয়। তাই সে অ-ক্ষর হলেও তার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। পরিপূর্ণ অক্ষর বলা যায় না। কিন্তু পরব্রহ্ম অ-ক্ষর। কোন কিছুই তাঁর স্বরূপ বা স্বভাবকে পরিবর্তন করতে পারে না। তিনি সর্বদা স্বরূপে বিরাজমান।

জীবের বা জড় দেহের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হচ্ছে সৃষ্টিকর্ম। তার প্রবৃদ্ধি বা সংসার হচ্ছে সংসার ধর্ম বা কর্ম। তার লয় বা বিসর্গ আরেক কর্ম। সৃষ্টি-সংসার-লয় সব মিলেই হচ্ছে কর্ম- কর্মযজ্ঞ বা কর্মচক্র।

৪	ক্ষর ভাবই অধিভূত। পুরুষই অধিদৈব এবং 'আমি'-ই এই দেহে অধিযজ্ঞ।

• **৮.৪** পূর্বের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যা কিছু অবিনশ্বর বা অ-ক্ষর তাই পরব্রহ্ম। এখানে বলা হচ্ছে যা কিছু ক্ষর, ক্ষয়িষ্ণু বা বিনাশশীল বৈশিষ্টসম্পন্ন তাই অধিভূত।

জড় প্রকৃতি ও এর মাঝে যা কিছু আছে সবই পরিবর্তন ও বিনাশশীল। একসময় এর সৃষ্টি হয় এবং কোন একসময় এর বিনাশ হয়। অতএব জড় প্রকৃতি হচ্ছে ক্ষর। অক্ষর এই ক্ষর প্রকৃতিকে অধিকার করে আছে। তাই জড় জাগতিক প্রকৃতি হচ্ছে 'অধিভূত'। যা জীবসমুহের অধিষ্ঠান স্থল।

অপরদিকে জীবের জড়দেহও নশ্বর। এখানেও একইরকমভাবে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। অতএব জড়দেহ ক্ষর। কোন অক্ষরের অধীন থেকে জড়দেহ তার নিজ

প্রকৃতির মাঝে আরও জীবকে ধারণ করে আছে। এভাবে প্রতিটি ক্ষর বা নশ্বর প্রকৃতি যা অক্ষরের অধিকারভূক্ত তাই হচ্ছে 'অধিভূত'। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অক্ষর ক্ষর বৈশিষ্টসম্পন্ন সবকিছুকে বা ভূতসমুহকে অধিকার করে রাখে। তাই ক্ষর হচ্ছে 'অধিভূত'।

পুরুষ তথা মহাবিশ্বরূপ প্রকান্ড জীব সত্ত্বাকে 'অধিদৈব' বলে। অর্থাৎ ভগবানের বিশ্বরূপ; যা সমস্ত দেব-দেবী ও তাদের লোকসমুহকে অধিকারভূক্ত করে রেখেছে তাই 'অধিদৈব'। তিনিই হচ্ছেন হিরণ্য গর্ভা ব্রহ্মা। দেব লোকসমুহের অধিষ্ঠান স্থল।

যার থেকে সকল কিছুর সৃষ্টি। যিনি অন্তর্যামীরূপে দেহমধ্যে বাস করেন। যিনি সকল কর্মযজ্ঞের প্রবর্তক। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই 'অধিযজ্ঞ'। বিষ্ণু হচ্ছেন পরমাত্মার প্রতীকী নাম। পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবানের একটি প্রকাশ। পরমাত্মাই জীবের চেতনার উৎস। দেহে বিরাজমান পরমাত্মাই হচ্ছেন দেহধারীদের 'অধিযজ্ঞ'। অর্থাৎ ভগবানই অধিযজ্ঞ। সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে আদি কর্ম। কিন্তু সৃষ্টি রক্ষার্থে জীবের যে নিষ্কামকর্ম তাই হচ্ছে 'যজ্ঞ'।

ব্রহ্ম, আধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এভাবেই সংক্ষেপে বলেন। কিভাবে ভগবানকে পাওয়া যায় সে বিষয়ে বলেন,

৫	অন্তিমকালে আমাকে স্মরণ করে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই।
৬	হে কৌন্তেয়! অন্তিমকালে যে যেমন ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করে তার চিত্ত সর্বদা তেমন ভাবে তন্ময় থাকায় সে সে ভাবই প্রাপ্ত হয়।
৭	অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ কর। তোমার মন-প্রাণ, বুদ্ধিমত্তা সব আমাতে সমর্পিত হলে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে পাবে।
৮	চিত্তকে অন্যদিকে মনোনিবেশ করতে না দিয়ে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা যিনি সর্বক্ষণ দিব্য পরম পুরুষের ধ্যান করেন তিনি তাঁকেই প্রাপ্ত হন, হে পার্থ!
৯	যিনি সর্বজ্ঞ, অনাদি-অনন্ত, সবকিছুর নিয়ন্তা, সূক্ষ থেকে সূক্ষতর, সকলের বিধাতা, অচিন্তনীয়, সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় এবং অন্ধকারের অতীত মৃত্যুকালে একাগ্রমনে ভক্তি সহকারে যোগ শক্তিবলে ভ্রু-যুগলের মধ্যে

	প্রাণবায়ুকে সম্যকরূপে ধারণ করে যিনি তাঁকে স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। [৯-১০]

- **৮.৫** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মৃত্যুকালে যিনি ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন নিঃসংশয়ে তিনি ভগবানের স্বভাব প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন।

- **৮.৬** সূত্রটি হচ্ছে, অন্তিমকালে যে যেমন ভাব স্মরণ করে বা যে যেমন ভাবে তন্ময় থাকে সে তেমন অবস্থা বা ভাবিত তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। চিত্ত সর্বদা যে ভাবনায় মগ্ন থাকে অন্তিমকালে সাধারণত সে ভাবনাই তার স্মরণে চলে আসে বা সে ভাবনাতেই সে তন্ময় হয়। অর্থাৎ অন্তরের টান বা ঝোঁক যেদিকে থাকে অন্তিমকালে সেটিই তার স্মরণে আবির্ভূত হয়। ফলে মৃত্যুকালে সহজেই তার স্মরণে সে ভাবনাটি চলে আসে এবং সে সে ভাবই প্রাপ্ত হয়।

- **৮.৭** চাইলেই মৃত্যুকালে কেউ ইচ্ছে বা সুবিধামতো কোন ভাব স্মরণ করতে পারে না। তার জন্য অব্যাহত চর্চ্চা বা অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়। তবেই শেষ সময়ে মনের মধ্যে সে ভাবনা উদিত হতে পারে। অর্থাৎ অন্তরে ও চিন্তার গভীরে যে বিষয়টি মানুষকে গভীরভাবে রেখাপাত করে সে ভাবনাটিই শেষ মুহূর্তে তার স্মরণে চলে আসে।

ভগবানকে পেতে হলে তাই সর্বদা তাঁকে স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়। চিত্তকে ভগবানমুখী করে গড়ে তুলতে হয়। যোগ অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরে স্থিত পরমাত্মার ধ্যান করা। এতে মন সর্বদা ভগবানের ভাবনায় নিবিষ্ট থাকে। অন্তরে সে ভাবনা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাই যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করতে বলেন। সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করে যুদ্ধ করতে বলেন। মন-প্রাণ, বুদ্ধিমত্তা সব ভগবানে মগ্ন থাকলে অন্তিমকালে ভগবানকেই প্রাপ্ত হবেন। যুদ্ধ তাঁর জন্য মুক্তির দ্বার উন্মোচন করে দেবে!

অতএব কর্ম ত্যাগ নয়। যুদ্ধ পরিত্যাগ নয়। স্বধর্ম পালন করার মধ্য দিয়েই ভগবানকে স্মরণ করতে বলা হচ্ছে। যুদ্ধ করার মধ্য দিয়েই ভগবানের স্মরণ নিতে হবে। মুসলমানরাও সংকটকালে এভাবে স্মরণ করার শিক্ষা লাভ করে। যেমন বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা শত্রু বাহিনীর মুখোমুখী হও, তখন অবিচল থাক এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যেন তোমরা সফল হতে পার।" (আল-কোরআন ৮:৪৫)

● **৮.৮** চিত্তকে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। অনন্যচিত্তে সর্বক্ষণ পরম পুরুষ ভগবানের ধ্যান করতে হবে। এভাবে অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তাহলে অন্তিমকালে সে বিষয়টিই স্মরণের মধ্যে থাকবে এবং পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সর্বদা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।" (আল-কোরআন ৩৩:৪১)

● **৮.৯-১০** যিনি সর্বজ্ঞ, অনাদি-অনন্ত, সবকিছুর নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, অচিন্তনীয়, সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় এবং অন্ধকারের অতীত মৃত্যুকালে সর্বশ্রেষ্ঠ তেমন কাউকেই স্মরণ করা উচিত। আর তিনি হচ্ছেন ভগবান!

একাগ্রমনে ভক্তি সহকারে যোগ শক্তিবলে, ভ্রু-যুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে সম্যকরূপে ধারণ করে যিনি তাঁকে স্মরণ করতে পারেন তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। প্রয়ানকালে কিভাবে ভগবানকে স্মরণ করতে হবে এখানে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১১	বেদবিদগণ যাকে 'অ-ক্ষর' বলেন, অনাসক্তগণ যাতে প্রবেশ করেন এবং যাকে পাওয়ার জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয় সেই পরম পদ প্রাপ্তি বিষয়ে তোমাকে সংক্ষেপে বলব।
১২	সকল দুয়ার সংযত করে, মনকে নিবিষ্টভাবে হৃদয়ে নিবদ্ধ করে, ভ্রু-যুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে ধারণ করে আত্মায় সমাধিরূপ যোগে স্থিত হয়ে, ব্রহ্মের প্রতীকস্বরূপ একাক্ষর 'ওঁ' উচ্চারণ করতে করতে, আমাকে স্মরণ করে যিনি দেহত্যাগ করে প্রস্থান করেন তিনি পরম গতি অভিমুখে গমন করেন। [১২-১৩]
১৪	হে পার্থ! অনন্যচিত্ত হয়ে যিনি চিরদিনই নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন তেমন

	নিত্যযুক্ত যোগীর কাছে আমি সহজলভ্য।

- **৮.১১** বিষয়-আসক্তিহীনরা যেখানে প্রবেশে যত্নশীল হন, কিংবা ব্রহ্মচারীরা যাকে পাওয়ার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন বেদবিদগণ তাঁকে 'অ-ক্ষর' বলেন। 'অ-ক্ষর' হচ্ছে অক্ষয় বা অবিনাশী। ভগবান ব্যাতিত আর কেউ বা কিছুই 'অ-ক্ষর' নয়। কিভাবে তাঁকে পওয়া সম্ভব হবে সে বিষয়ে বলা হচ্ছে।
- **৮.১২-১৩** সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করে, অর্থাৎ সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে, মনকে নিবিষ্টভাবে হৃদয়ে নিবদ্ধ করে, প্রাণবায়ুকে মস্তিষ্কে নিরুদ্ধ করে আত্মায় সমাধিরূপ যোগে স্থিত হয়ে, ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে ভগবানকে স্মরণ করে যিনি দেহত্যাগ করে প্রস্থান করেন তিনি পরম গতি অভিমুখে গমন করেন। এ পন্থাটি যোগ সাধকদের জন্য বলা হয়েছে।
- **৮.১৪** আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া বা তাঁর ভাব বা স্বভাব লাভ করা বা তাঁর ধামে প্রবেশ করা। সেটি নানাভাবে করা যেতে পারে। যোগীদের জন্য পন্থাটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

মৃত্যুকালে যে কোনভাবেই হোক না কেন, ভক্তির সাথে মনকে ভগবানের ধ্যানে একাগ্রচিত্ত করতে পারলেও সেটি লাভ করা সম্ভব হয়। ব্রহ্মের প্রতীকী শব্দরূপ 'ওঁ' বা ওঙ্কার ধ্বণি উচ্চারণের মধ্য দিয়েও তাঁকে স্মরণ করা যেতে পারে। ওঙ্কার, ব্রহ্ম ও ভগবান হচ্ছে অভিন্ন। 'ওঁ' হচ্ছে ভগবানেরই নির্বিশেষ শব্দব্রহ্ম।

ভগবানের সত্যিকার ভক্ত সর্বদা ভগবানেই ধ্যানমগ্ন থাকেন। সেটি তাঁর অভ্যাসেও পরিণত হয়। মৃত্যুকালে তেমন মানুষদের স্মরণে ভগবান আপনা থেকেই চলে আসেন। নিত্যযুক্ত যোগীর কাছে ভগবান তাই সহজলভ্য হন।

পূর্বের শ্লোকে মৃত্যুকালে যে যোগের ধারণা দেয়া হয়েছে তা সকলের জন্য সহজসাধ্য নয়। তাই সকলের জন্য যাবজ্জীবন ভগবানকে স্মরণ করার এই পথ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যেন তোমরা সফল হতে পার।" (আল-কোরআন ৬২:১০)

ভগবানকে পাওয়ার অর্থ কি? তাঁকে পেলে কি হয়? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৫	মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়ে এই অনিত্য দুঃখালয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। কেননা তারা পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ পর্যায়কে অর্জন করেছেন।
১৬	এ ভূবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সবই পুনরাবর্তনশীল, হে অর্জুন! কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হলে, হে কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম হয় না।

● **৮.১৫** জড় জগত হচ্ছে নশ্বর এবং নানারূপ ক্লেশে জর্জরিত। কিন্তু যারা ভগবানের পরম ধাম প্রাপ্ত হন তারা এই অনিত্য দুঃখালয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। এটি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। কেন তারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না?

বলা হচ্ছে, ভগবানের পরম ধাম হচ্ছে সকল কর্মযজ্ঞের পরম গতি বা জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেটি প্রাপ্তিই হচ্ছে জীবনের চরম সার্থকতা। সে লক্ষ্যেই সকলে ছুটে চলেছে। চূড়ান্ত লক্ষ্য বা সর্বোচ্চ পর্যায় অর্জিত হয়ে গেলে সংসার ধর্মে ফিরে আসার কারণ নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই এ জগতে আর ফিরে আসতে হয় না। যেমন বলা হয়েছে,

"যারা বলেঃ আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর সঠিক পথে চলে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, না তাদের থাকবে কোনরূপ মনকষ্ট। তারাই উদ্যানের অধিকারী; সেখানে তারা চিরজীবি হবে তাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ।" (আল-কোরআন ১৩-১৪:৪৬)

"সেখানে তারা মৃত্যু যন্ত্রনা আস্বাদন করবে না। এটিই মহাসাফল্য।" (আল-কোরআন ৪৪:৫৬-৫৭)

● **৮.১৬** শাস্ত্রে সপ্ত লোকের উল্লেখ আছে। এগুলি হচ্ছে ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং 'সত্যলোক' বা 'ব্রহ্মলোক'। 'ব্রহ্মলোক' হচ্ছে সর্বোচ্চলোক। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি নভোমন্ডলীকে .. সপ্ত আকাশে পরিণত হতে নির্দেশ দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশকে তার নিজস্ব বিধান প্রদান করলেন।" (আল-কোরআন ৪১:১২)

"... অতঃপর তিনি মনোসংযোগ করেন নভোমন্ডলের প্রতি এবং এটিকে সাঁজিয়েছেন সপ্ত আসমানরূপে।" (আল-কোরআন ২:২৯)

জড় ব্রহ্মাণ্ডে পার্থিব জগত থেকে শুরু করে 'ব্রহ্মলোক' পর্যন্ত সবই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বাধা। এমনকি ব্রহ্মা নিজেও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির চক্র থেকে মুক্ত নন। জড় প্রকৃতির নিয়মানুসারে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মলোকের সকল বাসিন্দাদের মৃত্যু হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি তোমাদেরকে .. সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বিশ্ব-জগতের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে আল্লাহর কাছে।" (আল-কোরআন ৬:২)

মর্তবাসীরা ভাল কাজ বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে পূণ্য সঞ্চয় করে। পূণ্য সঞ্চয় করে ক্রমে বিভিন্ন স্বর্গলোক বা উচ্চলোকে গমন করে। উচ্চলোকে উন্নতি করে উত্তরোত্তর আরও উচ্চতর লোকে গমন করে যেমন চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি। কিন্তু যজ্ঞের ফলে অর্জিত পূণ্য শেষ হয়ে গেলে বৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে পতিত হয়। অতঃপর শস্যকণায় পরিণত হয়। জীব সে শস্য আহার করে এবং তা বীর্য্যে পরিণত হয়। সেই বীর্য স্ত্রী যোনীতে সঞ্চারিত হয়। স্ত্রী গর্ভবতী হয়। এভাবেই জীবাত্মা পুনরায় দেহ প্রাপ্ত হয়। এমনকি সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকেও যদি পূণ্যক্ষয় হয় তবে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন যথাযথ পরিমাপে। অতঃপর তা দ্বারা আমি মৃত ভূ-ভাগকে পুনরুজ্জীবিত করি। এমনিভাবে তোমরাও উত্থিত হবে।" (আল-কোরআন ৪৩:১১)

জীব তার কর্মের মাধ্যমে ভাল-মন্দ ফল প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মা মন ও ইন্দ্রিয় তথা সূক্ষ শরীরকে নিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের অনুরূপ দৈবী অথবা আসুরী সম্পদ নিয়ে নতুন যোনি প্রাপ্ত হয়ে তদ্রূপ দেহ ধারণ করে। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল।

জীব আবার যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। পূণ্য সঞ্চয় করে। পরিপূর্ণভাবে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ ভগবান ধামে না পৌঁছান পর্যন্ত এভাবেই জড়-জগতে প্রতিনিয়ত গমনাগমন করে। এটিকেই এখানে পুনরাবর্তন বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছিল,

"এখান থেকে তোমরা সবাই নিচে নেমে যাও। তবে আমার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনা আসবে, যারা সেই পথ নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের অন্তরে না কোন

ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনোকষ্টে।” (আল-কোরআন ২:৩৮)

“যারা সৌভাগ্যবান তারা থাকবে উদ্যানের মাঝে। তারা সেখানে ততদিন থাকবে যতদিন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল থাকবে, তোমার প্রতিপালকের অন্য কোন ইচ্ছে ব্যাতিত।” (আল-কোরআন ১১:১০৮)

“তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় জীবন দান করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন।” (আল-কোরআন ২:২৮)

মহাপ্রলয়ের পর জীব সনাতন চিন্ময় ধামে প্রবেশ করে। যেমন বলা হয়েছে,

“মহাপ্রলয়! কি সেই মহাপ্রলয়!! এমন এক দিন যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এবং পর্বতসমুহ হবে ধুনিত তুলার মতো। অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে ভাল কর্ম দ্বারা সে সুখী জীবন লাভ করবে। কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে ‘হাবিয়া’। কি সেই ‘হাবিয়া’? প্রজ্জলিত অগ্নি!” (আল-কোরআন ১০১:১-১১)

“হে মানুষ, নিশ্চয়ই! তুমি তোমার কর্মসহ তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে চলেছ। এ প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত! অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে কৃতকর্মসহ।” (আল-কোরআন ৮৪:৬)

ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্তগণ সরাসরি তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ভগবানের পরম ধাম হচ্ছে অব্যাক্ত। অর্থাৎ সেই গ্রহলোক হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির অতীত, ধারণার অতীত, বর্ণনারও অতীত। অ-ক্ষর। যার ক্ষয় নাই; অবিনাশী-অবিনশ্বর। অন্য সকল স্বর্গীয় গ্রহলোক বিনাশ হয়ে যাওয়ার পরেও তা বর্তমান থাকে। যা প্রাপ্ত হলে পুনর্জন্ম হয় না। ভগবানের দিব্য ধামে একবার প্রবেশ করলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। যেমন বলা হয়েছে,

“যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা তাদের জন্য আছে নির্ধারিত ব্যাবস্থা। তারা বলবে এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না। এটিই মহাসাফল্য।” (আল-কোরআন ৩৭:৬১)

“পরকালের আবাস, সেটিই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত।” (আল-কোরআন ২৯:৬৪)

".. সেখানে তাই থাকবে মন যা চায় এবং চক্ষু যাতে তৃপ্ত হয় এবং সেখানে তোমরা হবে চিরজীবি।" (আল-কোরআন ৭১:৪৩)

যথাযথ কর্ম করা সত্ত্বেও মন যদি পরিপূর্ণরূপে শান্ত না হয় তবে দেবতা কিংবা ব্রহ্মার স্থিতি লাভ হলেও পুনর্জন্ম থেকে রেহাই নেই। হৃদয়ে স্থিত সমস্ত কামনা-বাসনাগুলি যখন সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায় কেবলমাত্র তখনই মরণশীল জীব অমর হয়। তখন মনুষ্য দেহে অবস্থান করেও এ জগতেই জীব পরমাত্মাকে প্রাপ্তির অনুভূতি লাভ করে। ভগবানকে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে যন্ত্রনামুক্ত সুখী ও আনন্দময় জীবন লাভ করা। ভগবান হচ্ছেন আনন্দময়!

১৭	সহস্র সহস্র যুগে ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রিও তেমনি যুগ সহস্রান্তে; এরূপ যারা জানেন তারাই দিবা-রাত্রির তত্ত্ববেত্তা।
১৮	দিনের আগমনে অব্যাক্ত সবকিছু ব্যাক্তরূপে প্রকাশিত হয়। রাত্রির সমাগমে তা সব অব্যাক্তে লয় প্রাপ্ত হয়।
১৯	হে পার্থ! এইসকল জীবসমুহ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে রাতের আগমনে লয় প্রাপ্ত হয়। দিনের আগমনে আবার আপনা থেকেই আবির্ভূত হয়।

● **৮.১৭** মানবীয় হিসেবে সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক একটি দিন; এখানে যুগ দ্বারা চতুর্যুগকে বোঝান হয়েছে। তেমনই সহস্র চতুর্যুগান্তে এক একটি রাত্রি। তত্ত্ববিদেরা এভাবেই জাগতিক বা ব্রহ্মার দিবা-রাত্রির হিসেবকে জানেন। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার পালনকর্তার একদিন তোমাদের গণনার সহস্র সহস্র বছরের সমান।" (আল-কোরআন ২২:৪৭)

সময়ের হিসেবের নানারকম একক আছে। বড় সময়ের হিসেবে যেমন আলোকবর্ষ ব্যাবহার করা হয় তেমন। এখানে 'কল্প' এর মাধ্যমে সময়ের হিসেব পরিমাপ করা হয়েছে। ব্রহ্মার একদিনকে 'কল্প' বলে। এক কল্পে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারটি যুগ সহস্রবার আবর্তিত হয়।

সত্য যুগের স্থায়িত্বকাল হচ্ছে ১৭,২৮,০০০ বছর। ত্রেতা যুগের স্থায়িত্বকাল হচ্ছে ১২,৯৬,০০০ বছর। দ্বাপর যুগের স্থায়িত্বকাল ৮,৬৪,০০০ বছর এবং সর্বশেষে কলি

যুগের স্থায়িত্বকাল ৪,৩২,০০০ বছর। কেবল এ হিসেব থেকেই জড় ব্রহ্মান্ডের স্থায়িত্বকাল যে মহাজাগতিক হিসেবে কত ক্ষুদ্র তা অনুমান করা যায়।

এ চারটি যুগ যখন এক হাজার বার আবর্তিত হয় তখন ব্রহ্মার একদিন হয় এবং তাঁর রাতের কালও তেমনই। এইরূপ সময় অনুসারে ব্রহ্মা এক শত বছর বেঁচে থেকে দেহ ত্যাগ করেন। এই গননা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু কল্পনা প্রসূত বা অক্ষয় বলে মনে হয়। কিন্তু নিত্যতার প্রেক্ষিতে এর স্থায়িত্বকালও বিদ্যুৎ চমকের মতই ক্ষণস্থায়ী। যেমন বলা হয়েছে,

"যেদিন তারা দেখবে যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রলয় বা পুনরুত্থান, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী সময় পৃথিবীতে অবস্থান করেনি।" (আল-কোরআন ৪৬:৩৫)

বলা হচ্ছে, মহাজাগতিক সময়ের হিসেবকে যারা এভাবে জানেন তারাই এ বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ববেত্তা। উল্লেখ্য যে, সত্য যুগের লক্ষণ হচ্ছে- সদাচার, বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান এবং ধর্ম অর্থাৎ যথাযথ নিয়ম বা সূত্রের পরিপালন। সত্য যুগে অজ্ঞতা বা পাপ থাকে না বললেই চলে।

ত্রেতা যুগে পাপ কর্মের সূচনা হয়। দ্বাপর যুগে ধর্মের অবনতি ঘটে এবং অধর্মের অভ্যূদয় হয়। সর্বশেষে কলিযুগ। এই যুগে কলহ, অজ্ঞতা, অধর্ম ও পাপাচারের প্রাবল্য দেখা দেয় এবং ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়। বর্তমানে কলি যুগ চলছে।

কলিযুগে অধর্ম এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, যুগের শেষ পর্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং কল্কি অবতাররূপে অবতীর্ণ হন এবং অসুরদের বিনাশ করেন। তাঁর ভক্তদের পরিত্রান করে আর একটি সত্য যুগের সূচনা করেন। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

- **৮.১৮-১৯** ব্রহ্মার দিবাভাগে অব্যাক্ত সবকিছু ব্যাক্তরূপে প্রকাশিত হয়। সব কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। রাত্রির সমাগমে সব অব্যাক্তে লয় প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ব্রহ্মার দিনের আগমনে আবার সব অভিব্যাক্ত হয়। দিনে প্রকাশিত হয় এবং রাতে লয় প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মার দিবসের শুরু বা কল্পারম্ভ হচ্ছে সৃষ্টি এবং দিবসের শেষ বা রাত্রির আগমন হচ্ছে কল্পের সমাপ্তি বা প্রলয়। কল্পক্ষয়ে জীবসমুহ কারণ বা বীজ অবস্থায় সুপ্ত থাকে এবং কল্পারম্ভে তারাই পুনঃ জন্ম নেয়। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ সৃষ্টি করেন অতঃপর পুনরাবর্তন করেন।" (আল-কোরআন ১০:৩৪)

সাংখ্যে মূল প্রকৃতিকে অব্যাক্ত বলে। এটিকে হিরণ্য গর্ভও বলা হয়। ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থাও বলে। এই প্রকৃতির প্রথম পরিণামই হচ্ছে মহত্তত্ব।

মহাসাগরের বুদ্বুদের মতো কারণ সমুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মার নিত্য উদয় ও লয় হয়ে চলেছে। ব্রহ্মা ও তার সৃষ্টি জড় ব্রহ্মান্ডেরই অংশ। নিত্য প্রবহমান। জড় ব্রহ্মান্ডে ব্রহ্মাও জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি থেকে মুক্ত নন। তবুও জড় জগতের পরিচালনায় তিনি ভগবানের সেবায় রত।

ব্রহ্মার দিবসকালে জড় জগতের অভ্যন্তরে উর্ধ্ব ও নিম্ন লোকগুলিতে জীবসমুহ তাদের কর্ম প্রদর্শন করে। কিন্তু ব্রহ্মার রাত্রির আগমনে তারা আবার লয় প্রাপ্ত হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনিই তোমাদেরকে রাত্রিকালে সমবেত করেন এবং দিবসে তোমরা যা কিছু কর তিনি তা জানেন। অতঃপর তিনি দিবসে তোমাদেরকে উত্থিত করেন- যেন নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি তোমাদের জানাবেন যা কিছু তোমরা করতে।" (আল-কোরআন ৬:৬০)

অন্তিমে ব্রহ্মার আয়ু যখন শেষ হয়ে যায় তখন সবকিছু বিলীন হয়ে যায় এবং কোটি কোটি বছর ধরে অব্যাক্ত বা অপ্রকাশিত থাকে। তারপর আর একটি কল্পে ব্রহ্মা যখন আবার জন্মগ্রহণ করেন তখন তারা পুনরায় ব্যাক্ত হয়। বলা হচ্ছে,

"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজ-পত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার একটি অবধারিত প্রতিশ্রুতি আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।" (আল-কোরআন ২১:১০৪)

জড় জগতে যারা থাকার চেষ্টা করে তারা পূণ্য সঞ্চয় করে উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়। পূণ্যক্ষয় হলে তাদেরকে আবার এই গ্রহে পতিত হতে হয়। এ সময়ে জীব জড় জগতের মোহে আকৃষ্ট হয়। বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এইসকল জীবসমুহকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয়, মৃত্যু মুখে পতিত হতে হয় এবং সংসারে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের সব লোকই যদি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বাধা তাহলে মুক্তি বা মোক্ষ লাভের উপায় কি? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২০	কিন্তু সেই অব্যাক্ত হতেও উর্ধ্বে যে সনাতন ভাব আছে সবকিছু ধ্বংস হলেও তা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।
২১	অব্যাক্ত, অ-ক্ষর এভাবে বলা হয় তাকে; এটিকেই পরম গতি বা সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে। যা প্রাপ্ত হলে আর প্রত্যাবর্তীত হয় না। সেটিই আমার পরম ধাম।
২২	হে পার্থ! যার মধ্যেই সমস্ত কিছু বিদ্যমান; যার দ্বারাই সবকিছু পরিব্যাপ্ত; সেই পরম পুরুষ কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই লভ্য।

- **৮.২০** বলা হচ্ছে, আরও এক সনাতন বা নিত্য প্রকৃতি আছেন যিনি পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান। ওপরোক্ত অব্যাক্ত থেকেও শ্রেষ্ঠ সে অব্যাক্ত প্রকৃতি। সবকিছু লয় প্রাপ্ত হলেও তার বিনাশ নেই। যেমন বলা হয়েছে,

“ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। কেবল থেকে যাবে তোমার মহিমাময় মহানুভব স্রষ্টার সত্ত্বা।” (আল-কোরআন ৫৫:২৬-২৭)

“আল্লাহর সত্ত্বা ব্যাতিত সবকিছু ধ্বংস হবে।” (আল-কোরআন ২৮:৮৮)

- **৮.২১** ব্রহ্মার সাথে অপরাপর সকল স্বর্গীয় গ্রহলোকসমুহের বিনাশ হয়ে গেলেও ওপরোক্ত সেই অব্যাক্ত প্রকৃতি বিদ্যমান থাকে। ভগবানের সেই অব্যাক্ত প্রকৃতিকে অ-ক্ষর বলা হয়। অ-ক্ষর অর্থাৎ যা ক্ষর নয়। যার ক্ষয় বা বিনাশ নেই। তাঁকে আশ্রয় করেই সকল কিছু স্থিত। এটিই পরম গতি বা সর্বোচ্চ লক্ষ্য। যা প্রাপ্ত হলে জড় জগতে প্রত্যাবর্তীত হতে হয় না। সেটিই ভগবানের পরম ধাম। যেমন বলা হয়েছে,

“তাদেরকে তাদের ধৈর্য্যের প্রতিদানে সুউচ্চ অবস্থানে স্থান দেয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা জানান হবে শান্তির বাণী সহকারে। সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থান স্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতই না উত্তম!” (আল-কোরআন ২৫:৭৫-৭৬)

কিভাবে সে লক্ষ্য অর্জন করা যাবে?

● **৮.২২** জগতে যা কিছু আছে ভগবান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সবকিছু তার মধ্যেই স্থিত। তিনি তাঁর পরা ও অপরা এই দুই শক্তি দ্বারা সবকিছুকে ধারণ করে আছেন এবং তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টনও করে আছেন। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে .. আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন।" (আল-কোরআন ৪:১২৬)

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সেই পরম পুরুষ ভগবান কেবলমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারাই লভ্য। আর কোনভাবেই তাঁকে পাওয়া যায় না। তাই বলা হয়েছে,

"... অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" (আল-কোরআন ২৯:৪৫)

যারা ভগবানের ভক্ত, সর্বক্ষণ তাঁর সেবায় রত, তাঁরই ধ্যানে মগ্ন তারাই ভগবানের ধামে তথা ভগবানের অগনিত বৈকুন্ঠলোকে প্রবেশ করে। সেখানে প্রবেশ করলে পুনর্জন্ম হয় না। সেটিই জীবনের সর্বশেষ লক্ষ্য। লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেলে পুনর্জন্মের কারণ থাকে না। জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ চির আনন্দময় জীবন প্রাপ্ত হয়।

উল্লেখ্য যে, সাংখ্যের কৈবল্যে অর্থাৎ কেবল হওয়া এবং বৌদ্ধের নির্বানেও কিন্তু দুঃখের নিবৃতির কথা বলা হয়, তবে সেখানে আনন্দময় জীবনের কথা নেই।

ভগবানের পরম ধামে কেবল ভগবানই আছেন। যদিও সেখানে তিনি 'এক' হয়ে অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি লক্ষ লক্ষ অসংখ্য অংশরূপ ধারণ করে বিরাজ করেন। তিনি সর্বব্যাপ্ত, তাই সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

যদিও ভগবান বহু বহু দুরে অবস্থিত কিন্তু তাঁর শক্তি সমুহ এতই সুদুর প্রসারী যে তারা সুবিন্যাস্ত ও ত্রুটিহীনভাবে থেকে বিশ্বব্রহ্মান্ডের সবকিছু পরিচালনা করে চলেছে। যেমন বলা হয়েছে,

"শপথ ফেরেশতাদের! যারা মর্যাদাক্রমে সুশৃংখল সারিবদ্ধভাবে নিজেদেরকে বিন্যাস করে রাখে ... তারা বলে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে সুনির্ধারিত স্থান বা অবস্থান এবং আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান থাকি কার্য নির্বাহের জন্য এবং আমরাই আল্লাহর মহাত্ম ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।" (আল-কোরআন ৩৭:১, ১৬৪-১৬৬)

ভগবানের সেই পরম ধামকে 'চিন্তামণি' ধামও বলা হয়। সেখানে সকল বাসনা পূর্ণ হয়। সেখানকার বৃক্ষসমুহ চাওয়া মাত্র খাদ্যসামগ্রী প্রদান করে। সেখানকার গাভীসমুহ 'সুরভী'। যারা অপর্যাপ্ত দুধ প্রদান করে। যেমন বলা হয়েছে,

"চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে।" (আল-কোরআন ২৫:১৬)

সেই নিত্য ধামে শত-সহস্র লক্ষী নিরন্তর ভগবানের সেবা করে চলেছে। ভগবানের চিন্ময় ধামের চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। যেমন বলা হয়েছে,

"সেখানে থাকবে আনত নয়না রমণীগণ; কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি।" (আল-কোরআন ৫৫:৫৬)

"সেখানে তাদের ঘাম বা অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিস্কারও হবে না।" (আল-কোরআন ১৫:৪৮)

সেখানে সবকিছু চিন্ময় আনন্দে ভরপুর। সেখানে যত রকমের বিচিত্রতার প্রকাশ তা সবই দিব্য আনন্দে ভরপুর। কোন কিছুই জড় না। এই সকল বৈচিত্র ভগবানেরই আত্ম-বিস্তার। যেমন বলা হয়েছে,

"স্বর্গীয় উদ্যানের ... প্রতিরূপ এমন যে, সেখানে আছে নদী যার পানি দূষণমুক্ত, নির্মল দুধের স্রোতধারা যার ঘ্রাণ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শারাবের নহর এবং পরিশোধীত মধুর স্রোতধারা। সেখানে তাদের জন্য আছে সব রকমের ফল-মূল এবং পালনকর্তার ক্ষমা।" (আল-কোরআন ৪৭:১৫)

"কেউ জানে না তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য আনন্দের কি কি লুক্কায়িত আছে।" (আল-কোরআন ৩২:১৭)

কখন প্রয়াণ হলে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হতে হয় এবং কখন প্রয়াণ হলে পুনর্জন্ম হয় না বা মুক্তি লাভ হয়? এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৩	হে, ভারত শ্রেষ্ঠ! যে সময়ে প্রয়াণ হলে যোগীগণ অপুনরাবর্তন ও পুনরাবর্তন প্রাপ্ত হন সেই সময় সম্পর্কে বলছি।
২৪	অগ্নি, জ্যোতি, দিবস, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ন কালের ছয় মাস এই সময়ে

	প্রয়াণ হলে ব্রহ্ম উপাসকগণ ব্রহ্মে গমন করেন।
২৫	ধুম্র, রাত্রিকাল, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়ন কালের ছয় মাস এই সময়ে দেহ ত্যগ করলে যোগী চন্দ্রলোকে গমন করে পুনরাবর্তীত হন।
২৬	বৈদিক শাস্ত্র মতে জগতে শাশ্বত দু'টি পথ আছে। শুক্ল ও কৃষ্ণ। একটি প্রাপ্ত হলে আবর্তীত হতে হয় না এবং অন্যটি প্রাপ্ত হলে পুনরাবর্তীত হতে হয়।

- **৮.২৩** যে সময়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হলে যোগীগণ পার্থিব জগতে ফিরে আসেন বা পুনর্জন্ম লাভ করেন এবং যে সময়ে মৃত্যু প্রাপ্ত হলে ফিরে আসেন না অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন সে সময়ের কথা বলা হচ্ছে।

আত্মা দেহ ত্যাগ করে কোথায় ফিরে যাবে তার নির্দিষ্ট পথ আছে এবং সঠিক পথ ধরার সঠিক সময়ও আছে। এ আলোচনা থেকে সে বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। ঠিক যেমন মহাকাশযান প্রেরণে বিজ্ঞানীরা আজকাল অংক কষে কোথায় যেতে হবে, কোনদিন কখন যাত্রা শুরু করতে হবে সে সব দিনক্ষণ ঠিক করেন বিষয়গুলি তেমন। বলা হচ্ছে,

"পরিপূর্ণ পথবিশিষ্ট আকাশের শপথ! সত্য বিষয়ে তোমরা নানান মতাদর্শী। সেই সত্যচ্যূত হয় যে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (আল-কোরআন ৫১:৭-৯)

পরিপূর্ণ পথবিশিষ্ট আকাশের শপথ! অতএব অসংখ্য পথের মধ্যে কাঙ্খিত পথ চিনতে হবে। তবেই লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হবে। সিদ্ধযোগী এই জড় জগত ত্যাগ করার জন্য উপযুক্ত পথ ও কাল নির্ণয় করতে পারেন। কিন্তু যদি কেউ সিদ্ধ না হন তবে তার সাফল্য নির্ভর করে দৈবক্রমের ওপর।

- **৮.২৪** বলা হচ্ছে যে অগ্নি, জ্যোতি, দিবস, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ন কালের ছয় মাস সময়ে মৃত্যুবরণ করলে আত্মা ব্রহ্মে গমন করে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে এই সকল দেবতাদের লক্ষিত পথে আত্মা গমন করে। সে লক্ষ্যে পৌঁছাবার এগুলি সঠিক সময়।

উত্তম যোগী তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী কোন বিশেষ স্থানে ও কোন বিশেষ সময়ে দেহত্যাগ করতে পারেন। অন্য কারও তেমন নিয়ন্ত্রনের সামর্থ থাকে না। দৈবক্রমে

কোন শুভ ক্ষণে যদি কারও মৃত্যু হয়ে যায় তবে সে জন্ম-মৃত্যুর পুনরাগমনে পরবে না। অন্যথায় তাকে এ জগতে ফিরে আসতে হবে।

• **৮.২৫** ধুম্র, রাত্রিকাল তথা কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়ন কালের ছয় মাস সময়ে দেহ ত্যগ করলে যোগী চন্দ্রলোকে গমন করে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসে। অর্থাৎ এই সকল দেবতাগণের লক্ষিত পথে গমন করে।

পৃথিবীতে যারা সকাম কর্ম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তারা দেহত্যাগ করে চন্দ্রলোকে গমন করে। সেখানে তারা সোমরস পান করে জীবন উপভোগ করে। তবে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়।

• **৮.২৬** বৈদিক শাস্ত্র মতে সনাতন প্রকৃতি প্রাপ্তি অভিমুখী বা মর্ত্যলোক পরিত্যাগের দুইটি মার্গ, পন্থা বা উপায় আছে। একটি শুক্ল বা আলোকজ্জ্বল কাল এবং অপরটি কৃষ্ণ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন কাল।

কেউ যদি আলোকজ্জ্বল কালে মর্ত্যলোক ত্যাগ করে তবে সে আর ফিরে আসে না। ঐ সময়ে আত্মা ঐ সকল দেবতাদের লক্ষিত পথে গমন করে। যেখান থেকে ফিরে আসতে হয় না। যখন কেউ অন্ধকারাচ্ছন্ন কালে দেহ ত্যাগ করে তবে তাকে এই জড় জগতে আবার ফিরে আসতে হয়। মোক্ষ লাভ হয় না। যেমন বলা হয়েছে,

"... সেখানে তারা ততদিন থাকবে যতদিন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল থাকবে, তোমার প্রতিপালকের অন্য কোন ইচ্ছে ব্যাতিত। ..." (আল-কোরআন **১১:১০৭-১০৮**)

উল্লেখ্য যে, মনুষ্যের উত্তরায়ন ছয়মাস কাল দেবগণের দিন এবং মনুষ্যের দক্ষিণায়ন ছয়মাস কাল দেবগণের রাত। অর্থাৎ দেবতাগণ সে সময়ে মেরু পর্বতের উপর উত্তর ধ্রুব স্থানে থাকেন। সেই হিসেবে আমাদের এক বছর দেবতাদের একদিন একরাত।

২৭	হে পার্থ! এ দু'টি মার্গ বা পন্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যোগী বা সাধক কখনই বুদ্ধিভ্রষ্ট বা মোহগ্রস্ত হন না। অতএব, হে অর্জুন! সর্বদা যোগযুক্ত থাক।
২৮	বেদপাঠে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, তপস্যায় এবং দানে যত পূণ্যফল নির্দিষ্ট আছে, এই তত্ত্ব জেনে যোগী তার সব পূণ্যফল অতিক্রম করে পরম স্থান লাভ

	করেন।

- **৮.২৭** বলা হচ্ছে, মোক্ষ লাভ কিংবা পুনরাবর্তনের এ দু'টি পন্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যোগী বিভ্রান্ত হন না। যোগী ভগবানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বা সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি ভগবানে আস্থা ও ভরসাকারী।

ভগবান যা দেন বা যেভাবে যা নির্দিষ্ট করেন তিনি তাতে তুষ্ট থাকেন। তিনি ভগবানের বিবেচনা বা বিচার ব্যাবস্থায় পূর্ণ আস্থাশীল। তাই গমনাগমন বিষয়ে তিনি চিন্তিত নন। সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কেবল নিজ কর্তব্যকর্ম পালন করে যান। এমন ভরসা ও ভক্তিপূর্ণ মনোভাবের কারনে ভগবানের সান্নিধ্য লাভের সম্ভাবনা তাদের আপনাতেই বৃদ্ধি পায়। যেমন বলা হয়েছে,

"... আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর ওপর ভরসা করে।" (আল-কোরআন ৩:১৫৯)

বস্তুত উদ্ধৃত দু'টি উপায়ের দুটিই এক অর্থে ক্লেশকর। কিন্তু যোগে যুক্ত থাকলে ভগবানকে পাওয়া সহজ, নিরাপদ ও নিশ্চিত হয়। আত্মার গমন পথের এই সকল বিবরণে ভগবানের যথার্থ ভক্ত তাই বিচলিত হন না। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন বা বিশ্বাস করেন যে, ভক্তিতে যুক্ত থাকলে তিনি অবশ্যই ভগবৎ ধামে ফিরে যাবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে সর্বদা যোগে যুক্ত থেকে কর্ম করতে বলছেন।

উল্লেখ্য যে, যারা পরমেশ্বরে ভরসা রাখে না তাদেরকে নিজ চেষ্টায় সবকিছু অর্জন করে নিতে হয়। যারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগের ওপর নির্ভর করেন তাদেরকে ফিরে যেতে হলে নিজ প্রচেষ্টায় জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে উপযুক্ত সময়ে দেহ ত্যাগ করতে হয়। যার দ্বারা তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে জন্ম-মৃত্যুর এই সংসারে তাদেরকে পুনরায় ফিরে আসতে হবে কি হবে না।

অপরদিকে যোগী কিংবা ভক্ত দৈব হোক কিংবা স্বেচ্ছায় হোক, শুভ হোক কিংবা অশুভ হোক যখনই দেহ ত্যাগ করুন না কেন তার পুনরাগমনের আশংকা থাকে না। তাঁকে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব স্বয়ং ভগবান বা আল্লাহর। যেমন বলা হয়েছে,

"তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা কামনা করবে তাই পাবে। এই প্রতিশ্রুতি পালন করার দায়িত্ব স্বয়ং তোমার পালনকর্তার।" (আল-কোরআন ২৫:১৬)

● **৮.২৮** বৈদিক রীতি অনুসারে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও নানারূপ যজ্ঞ, তপস্যা ও সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রম পালন করে সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সফল হয়ে স্বর্গলোকে উন্নীত হন। তারপর আরও উন্নতি করে ব্রহ্মজ্যোতি বা বৈকুণ্ঠলোকে পরম মুক্তি লাভ করেন।

অপরদিকে বলা হচ্ছে যে, ভগবানের ভক্তি বা তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবনা বা স্মরণের এতই মাধুর্য্য ও গুরুত্ব যে এই একটিমাত্র সাধনার ফলে সমস্ত আশ্রম ও বৈদিক কর্মকান্ডের সকল আচার-অনুষ্ঠানে যত পূণ্য অর্জন হয় তার সব অতিক্রম করা সম্ভব হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"... নিশ্চয়ই! নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে; তবে অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" (আল-কোরআন ২৯:৪৫)

ভগবান বা আল্লাহতে সর্বক্ষণ মগ্নতা বা সার্বক্ষণিক তাঁকে স্মরণের মধ্যে রাখতে পারার বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তেমন ভক্তের অন্তর অবশ্যই অনন্য!

যোগ বলি নামায বলি কিংবা পূঁজা, উপাসনা, আরাধনা, ভজনা করা যাই বলি না কেন এ সবকিছুই করা হয় বস্তুত ভগবান বা আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য। তাঁর ধ্যান বা তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য। যোগী সর্বদা পরমেশ্বরে সমাধিস্ত থাকেন। তাই সকল বিধি-বিধান অনুসরণে যত ফল অর্জিত হয় তাঁরা তার সবকিছুকে অতিক্রম করে পরমেশ্বরের নিকটবর্তী হয়ে যান।

বৈদিক কাম্যকর্ম দ্বারা স্বর্গ লাভ হলেও পুনরায় সংসারে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যোগী স্বর্গ প্রাপ্তিকেও তাই তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং যোগে মনোনিবেশ করে পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। তবে সর্বসাধারণের জন্য বিধিবদ্ধ কর্মযজ্ঞেরও অবশ্যই গুরুত্ব আছে।

নবম অধ্যায় : রাজবিদ্যা গুহ্যযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ৩৪)

সারকথা : ভগবানকে পেলে জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন ব্যাক্তি ভগবানকে পায় না। তারা জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্রে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হতে থাকে এবং জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভাল-মন্দ ফলাফল ভোগ করে।

ভগবান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ হলে মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়। তাঁর মহাত্ম সম্পর্কে জানতে পারলে তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রবন হয়ে তাঁর ভজনা করে। অধ্যায়ে ভগবানের মহাত্ব তুলে ধরা হয়েছে। ভগবানকে কিভাবে পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে বলা হয়েছে।

১	শ্রীকৃষ্ণ বলেন: যেহেতু তুমি দোষদর্শী নও, তাই বিজ্ঞানসম্মত এই অতি গুহ্য জ্ঞান বিষয়ে তোমাকে বলছি যা জেনে অশুভ থেকে মুক্তি লাভ করবে।
২	এটি অতি গুহ্য, শ্রেষ্ঠবিদ্যা, বিশুদ্ধ ও পবিত্রতম। প্রত্যক্ষভাবে বোধগম্য, ধর্মসম্মত, সুখপ্রদ এবং অব্যয়-অক্ষয় ফলপ্রদ।

● **৯.১** শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ঈশ্বর বিষয়ক গোপন বা অতি গুহ্য জ্ঞান সম্পর্কে বলছেন। এ জ্ঞানকে বিজ্ঞানসম্মত বলা হয়েছে। কেননা এটি নির্ভূল। যে লক্ষ্যে এ জ্ঞানকে কাজে লাগান হবে সেটি নিশ্চিতভাবে অর্জিত হবে। বিষয়টি পরীক্ষিত।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যেহেতু তুমি দোষদর্শী, ঈর্ষাপরায়ন বা বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নও তাই তোমাকে এ জ্ঞান বিষয়ে বলছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে সকল মানুষের স্বভাব এমন যে তারা মূল বিষয়ে মনোনিবেশ করে না, শিক্ষা গ্রহণ করে না, অপরের দোষ-ত্রুটি সন্ধান করে বেরায় এমনকি ভগবানও তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। তেমন স্বভাব ভগবানেরও পছন্দ নয়। অর্জুন তেমন নন বিধায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গোপনীয় জ্ঞান বিষয়ে বলছেন।

বলেন, এ জ্ঞান লাভ করে অশুভ থেকে মুক্তি লাভ করবে। জগত সংসারে মানুষ দুঃখ-কষ্টরূপ অশুভর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। এ জ্ঞানে কাজ করলে জীবন

যন্ত্রনামুক্ত হবে। প্রশান্তি লাভ হবে। বস্তুত শান্তি লাভই মানুষের সকল কর্মযজ্ঞের মূল লক্ষ্য।

● **৯.২** বলা হচ্ছে, এটি অতি গুহ্য বা গোপন জ্ঞান। কেননা এ জ্ঞান বিষয়ে সকলে অবগত নয়। এর মহাত্বও সকলে উপলব্ধি করে না। অথচ এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠবিদ্যা। এর দ্বারা যা অর্জন হয় তা সর্বশ্রেষ্ঠ। এর উর্ধ্বে আর কিছু নেই। এটি ত্রুটিহীন তাই বিশুদ্ধ। বাস্তব জীবনেও এ জ্ঞানের প্রায়োগীক ফলাফলের সাফল্য প্রত্যক্ষভাবে বোঝা যায়।

ধর্ম বলতে সাধারণ মানুষ ব্যাকরণের মতো সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির মধ্যে চলাকে বুঝে থাকে। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের ব্যাবস্থাপনায় এটিরও প্রয়োজন আছে সেটিও স্বীকার করতে হবে। বলা হচ্ছে, গুহ্য জ্ঞানে কাজ করলেও সে একই লক্ষ্য অর্জিত হয়। যদিও আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে যে ধর্মের বিধান পালিত হচ্ছে না। তাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে এটি ধর্ম বিরুদ্ধও নয়। বরং অধিক ধর্মসম্মত।

বস্তুত মানুষ সুখের সন্ধানেই ছুটে চলেছে। এ জ্ঞানে কাজ করা সুখপ্রদ। এ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলও সুখপ্রদ। এ জ্ঞানে চলতে জানলে কাঙ্খিত ফল লাভ হয়। প্রাপ্ত ফল শুধু সুখপ্রদ হয় তাই নয়, উপরন্তু ফলাফল হয় অব্যয় ও অক্ষয়। প্রাপ্ত ফল নিঃশেষ হয়ে যায় না। এ পন্থায় অনেক নিয়ম-বিধির জটিলতায়েও প্রবেশ করতে হয় না। এই গোপন জ্ঞানকে রাজবিদ্যা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যার রাজা। কি সেই জ্ঞান? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩	হে পরন্তপ! এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যাক্তিরা আমাকে না পেয়ে মৃত্যুময় সংসার পথে পরিভ্রমন করে।

● **৯.৩** ধর্ম হচ্ছে জীবনকে চালনা করার সঠিক উপায় বা যথাযথ পথ। ভগবান মানুষের জন্য চলার সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। যা শাস্ত্রসমুহে উদ্ধৃত হয়েছে। আবার ভগবানই মানুষকে প্রকৃতির গুণ ও নানান আকর্ষন দ্বারা জড় জগতে আবদ্ধ করে রেখেছেন। মানুষকে বন্ধনমুক্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তিনি উপায় বলে দিয়েছেন। এটিই পরীক্ষা। যেমন বলা হয়েছে,

"জেনে রেখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আল্লাহর কাছে আছে মহাপুরস্কার।" (আল-কোরআন ৮:২৮)

মানুষ জগত চায় নাকি ভগবানকে চায়। জগতের তাৎক্ষণিক অথচ ক্ষণস্থায়ী সুখ চায়, নাকি ধৈর্য্যের সাথে সাধনা করে সময় সাপেক্ষ হলেও চিরস্থায়ী ও সর্বোচ্চ সুখ চায়? কারা সত্যিই ভগবানকে ভালবেসে ও ভক্তি করে দৃঢ়চিত্ত হয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে ইচ্ছুক তিনি তা দেখেন। বলা হচ্ছে,

"কিন্তু না, তোমরা তো পার্থিব জীবনকেই অধিক ভালবাস এবং পরবর্তী জীবনকে অবহেলা কর (৭৫:২০-২১)। অতঃপর যে আমার স্মরণ থেকে দুরে সরে গেছে এবং কেবল পার্থিব জীবন কামনা করে তার থেকে সরে এসো (৫৩:২৯)। এটি এ জন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে। আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ দেখান না। এরাই তারা যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু আল্লাহ বদ্ধ করে দিয়েছেন। এরাই উদাসীন। বলা বাহুল্য পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (আল-কোরআন ১৬:১০৭-১০৯)

ধর্মে প্রদর্শিত পথে জড় জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় বলা আছে। কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে যারা সে পথ অনুসরণ করে না তারা ভগবানকে পায় না। ভগবানকে না পেয়ে সংসার পথে পুনঃ পুনঃ ফিরে আসে। জন্ম-মৃত্যুর জীবনচক্রে আবদ্ধ হয়। মুক্তি লাভ করে না। যেমন বলা হয়েছে,

"আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভূলে গিয়েছিল। আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি।" (আল-কোরআন ২০:১১৫)

সৃষ্টির প্রথম মানব আদম শ্রদ্ধা-ভক্তি বা বিশ্বাসহীন ছিলেন না। তবে তিনি দৃঢ়চিত্ত হতে পারেননি। তাই তাদের সবাইকে সুখের স্বর্গীয় জীবন ছেড়ে নিচে নেমে আসতে হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"আমি বললাম, এখান থেকে সবাই নিচে নেমে যাও। তবে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পথ নির্দেশনা আসবে। যারা পথ নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের অন্তরে কোন ভীতির সঞ্চার হবে না, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।" (আল-কোরআন ২:৩৮)

"নিশ্চয়ই! মানুষ সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম অবয়বে। অতঃপর আমি তাকে নিম্নস্তরের সর্বনিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে এনেছি; তাদের ব্যাতিত যারা বিশ্বাস ও ভাল কাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত পুরস্কার।" (আল-কোরআন ৯৫:৪-৬)

গীতার বিশ্লেষন করতে গিয়ে ওপরের উদাহরণগুলি কেন তুলে ধরা হল? যারা ভগবান বা আল্লাহর নির্দেশনা অমান্য করে, তাতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-ভক্তি রাখে না কিংবা দৃঢ়চিত্তে ভগবানের প্রদর্শিত পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না তাদের পরিণতি এমন হয়। তারা উর্ধ্বলোক থেকে নিম্নলোকে পতিত হয়। যেমন বলা হয়েছে, 'ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যাক্তিরা আমাকে না পেয়ে মৃত্যুময় সংসার পথে পরিভ্রমন করে।' শাস্ত্রসমুহের মূল বক্তব্যগুলি একই। স্থান, কাল, পাত্রভেদে কিছু পার্থক্য তো থাকবেই। কেননা নিশ্চিতভাবে কেউই কিছু জানে না।

গীতায় মুক্তির যে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে তা খুবই বিজ্ঞানসম্মত। যা আলোচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। যারা তা অনুসরণ করতে পারে না তারা জন্ম-মৃত্যু জীবনচক্রে আবদ্ধ হয়।

জড় জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে উর্ধ্বে বা উচ্চলোকে আরোহণের জন্য মনের যে একটা গতি প্রয়োজন, যারা দৃঢ়চিত্ত নয় তারা সে গতি নিজেদের ভেতরে সঞ্চার করতে পারে না। তাই জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে উর্ধ্বলোকে যেতে পারে না। জাগতিক টানে বা আকর্ষনে বারবার তাদেরকে ফিরে আসতে হয়। ঠিক যেমন মহাকাশযানকেও জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে উর্ধ্বে যেতে একটি নির্দিষ্ট পরিমান শক্তি সঞ্চার করতে হয় বিষয়টি তেমন।

মনের ভেতরে ইচ্ছেশক্তি সঞ্চারের সে পথই গীতায় প্রদর্শন করা হয়েছে। যারা প্রদর্শিত পথে চলার ফলে দৃঢ়চিত্ত হয়ে অন্তরে সে শক্তি সফলভাবে সঞ্চার ও ধারণ করে ভগবানকে কামনা করে- কেবল তারাই পার্থিব বা জড় জগতের বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে ভগবান ধামে ফিরে যেতে পারে।

প্রত্যেকেই তার মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী ফল পেয়ে থাকে। প্রত্যাশিত লোকে গমন করে। ধর্মের প্রদর্শিত পথে যারা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীন তারা ভূল পথে চলার কারণে ভগবানকে পায় না। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪	আমার অব্যাক্ত রূপের দ্বারা এই সমগ্র বিশ্বজগত পরিব্যাপ্ত। সমস্ত জীব ও

	জড় আমাতে স্থিত কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।
৫	আমার অচিন্তনীয় যোগশক্তি দেখ! সকল বস্তুও আবার আমাতে স্থিত নয়। আমি সৃষ্টিসমুহের ধারক ও প্রতিপালনকারী অথচ সৃষ্টির অন্তর্গত নই।
৬	সর্বদা সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু যেমন আকাশে স্থিত তেমনই সমস্ত জীব ও জড় আমাতে স্থিত বলে জানবে।

• **৯.৪** ভগবানের অব্যাক্ত বা অপ্রকাশিত রূপে সমগ্র বিশ্বজগত পরিব্যাপ্ত। এটি বুঝতে হবে যে ভগবানের এ অব্যাক্তরূপ কিন্তু ভগবানের কাছে অব্যাক্ত নয়। এ অব্যাক্তরূপ তাঁর অন্তরস্ত শক্তিতে আবদ্ধ বা বিদ্যমান জীবসমুহের কাছে। তাঁর অব্যাক্ত রূপ বা শক্তি বিষয়ে তিনি নিজেই জানেন। বিশ্ব চরাচরে সবকিছু তাঁকে আশ্রয় করে বিদ্যমান আছে। সমস্ত জীবের বসবাস তাঁরই মাঝে। ফলে জীবের পক্ষে তাঁর পরিপূর্ণ রূপ সম্পর্কে ধারণা নেয়া কখনই সম্ভব নয়। ঠিক যেমন মানব দেহে অবস্থিত কোন একটি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ জীবের পক্ষে মানবের পূর্ণরূপ অবগত হওয়া সম্ভব নয় বিষয়টি তেমন।

ভগবানের যে জড় প্রকৃতির মাঝে সকলকিছু বিচরণশীল, কেউ যেন ভূলভাবে এমনটি না বোঝে যে তিনিও সেখানেই অবস্থান করেন, তাই বলা হয়েছে যে আমি তাতে অবস্থিত নই। ঠিক যেমন মানুষ তার সম্পূর্ণ দেহকে পরিব্যাপ্ত করে আছে অথচ পূর্ণাঙ্গ মানব নিজে তাতে অবস্থিত নয়।

সমস্ত জীব যে প্রকৃতির মাঝে স্থিত তিনি সে সমগ্র প্রকৃতিকে ধারণ করে আছেন। ধারণকৃত সে প্রকৃতিতে সকল জীব স্থিত। কিন্তু তিনি সেখানে স্থিত নন। সবকিছু তাঁর মধ্যে। তাঁর বিবিধি শক্তি সবকিছুকে ধারণ করে রেখেছে। তিনি সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আল্লাহ সর্বসময়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন।" (আল-কোরআন ৪:১২৬)

• **৯.৫** ভগবানের নানাবিধ শক্তি ও কৌশলই হচ্ছে তাঁর ঐশ্বর্য্য। কিংবা বলা যায় যে তাঁর ঐশ্বর্য্যই হচ্ছে তাঁর শক্তি ও কৌশল! তিনি যা পারেন বা করেন তা অকল্পনীয়! যোগ শব্দের নানারূপ ব্যাবহার আছে। এখানে অচিন্তনীয় যোগশক্তি দ্বারা

ভগবানের সৃষ্টি কৌশলকে বোঝান হয়েছে। ভগবানের ঐশ্বর্য্য, শক্তি বা সৃষ্টি কৌশল অচিন্তনীয়!

যারা তাঁর অন্তরস্ত প্রকৃতিতে স্থিত তিনি তাদের সকলকে তার অচিন্তনীয় যোগ শক্তিবলে ধারণ করে রেখেছেন। তিনি তাদের সকলকে পরিপালন করছেন। সব তাঁরই সৃষ্টি! কিন্তু তিনি নিজে সেই সৃষ্টির অন্তর্গত নন। তিনি কোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত নন। তিনি সবকিছু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। তারহীন সংযোগের মতো তাঁর সম্পৃক্ততা। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে স্বাধীন ।" (আল-কোরআন ৩:৯৭)

বিজ্ঞানে আমরা যে সকল শক্তি বিষয়ে অধ্যায়ন করি যেমন- শব্দশক্তি, তাপশক্তি, আলোক শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি ইত্যাদি সবই বস্তুত ভগবানেরই ঐশ্বর্য্য বা শক্তি। বিজ্ঞান যা আবিস্কার করে বা খুঁজে পায় বস্তুত তার মাধ্যমে ভগবানকেই একটু একটু করে জানা হয়।

• **৯.৬** বায়ু যেমন শূন্যে সর্বত্র বিচরণ করে, অথচ যার ভেতরে অবস্থান করে তার সাথে তার কোন সংস্পর্শ নেই বলে মনে হয়, এ বিষয়টিও তেমন। জীবসমুহ তেমনিভাবে ভগবানের অন্তরস্ত প্রকৃতিতে বিচরণ করছে বিষয়গুলিকে সেভাবে বুঝে নিতে হবে।

৭	হে কৌন্তেয়! কল্পের অবসানে সমগ্র সৃষ্টি আমার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে এবং কল্পের শুরুতে পুনরায় আমি তাদের সকলকে সৃষ্টি করি।
৮	স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত রেখে সমগ্র ভূতসমুহকে আপনা থেকেই স্ব স্ব স্বভাব বশত পুনঃ পুনঃ সৃজন করি।

• **৯.৭-৮** ব্রহ্মার একদিনকে 'কল্প' বলে। ব্রহ্মা হচ্ছেন মহাজগতের প্রথম সৃষ্ট জীবসত্ত্বা। এক কল্পে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারটি যুগ সহস্রবার আবর্তিত হয়। তাঁর একমাস এই রকম ৩০ দিন ও রাতের সমন্বয়ে গঠিত। এই রকম **১২** মাসে তাঁর **১** বছর। তাঁর একদিন পৃথিবীর দিনের হিসেব অনুযায়ী ৪৩০,০০,০০,০০০ দিন। তাঁর রাতের হিসেবও তেমনই। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার পালনকর্তার একদিন তোমাদের গণনার সহস্র সহস্র বছরের সমান।" (আল-কোরআন ২২:৪৭)

এই রকম ১০০ বছরে ব্রহ্মার মৃত্যু হয় অর্থাৎ কল্পের অবসান হয়। তখন প্রলয় হয়। ভগবানের প্রকাশিত শক্তি পুনরায় তাঁরই মধ্যে বিলীন বা লয় প্রাপ্ত হয়। বলা হচ্ছে,

"একদিন সমস্ত কিছু তাঁর সমীপে পৌঁছাবে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় সহস্র সহস্র বছর।" (আল-কোরআন ৩২:৫)

"তিনি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং বিশ্ব জগতের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে আল্লাহর কাছে।" (আল-কোরআন ৬:২)

জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পূর্ণরূপে ভগবানের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। তাঁর ইচ্ছে অনুসারে জড় জগতের সৃষ্টির প্রয়োজন হলে তিনি সৃষ্টি করেন। পুনরায় জড় জগতের কার্যকলাপ শুরু হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব .. যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব।" (আল-কোরআন ২১:১০৪)

ভগবান সকল সৃষ্টির কারণস্বরূপ। জীবদেরকে তিনি জড় প্রকৃতির গর্ভে সঞ্চার করেন। জীবেরা তাদের পূর্ব জনমের কর্ম অনুসারে বিভিন্ন অবস্থা বা দেহ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পূর্ব জন্মে দৈবী অথবা আসুরিক যে নিজের যেমন সংস্কার করেছে তেমন স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে ভাল-মন্দ যোনি প্রাপ্ত হয় এবং ফল ভোগ করে। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! সৃষ্টিকে তিনি প্রথমত অস্তিত্বে নিয়ে আসেন, অতঃপর পুনরাবর্তন করেন; যেন তিনি তাদের পুরস্কৃত করেন যারা বিশ্বাস করে এবং ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে ভাল কাজ করে।" (আল-কোরআন ১০:৪)

"অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে দেবেন এবং তিনি তোমাদেরকে আবার জীবিত করবেন এক নতুন সৃষ্টিরূপে।" (আল-কোরআন ৭১:১৮)

"আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর জীবনোপকরণ দান করেছেন; এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন; পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন।" (আল-কোরআন ৩০:৪০)

সৃষ্টির শুরু থেকে বিভিন্ন প্রজাতির জীবদের কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। সবই সাধিত হয় পরমেশ্বরের ইচ্ছেতে। ইচ্ছেশক্তি ভগবানের এক অকল্পনীয় শক্তি। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই! তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ২৪:৪৫)

উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মশক্তি ত্রিবিধ। ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছেশক্তি। ভগবানের ইচ্ছেশক্তি অত্যান্ত গুরুত্ববহ। সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকৃতি হচ্ছে উপাদান কারণ। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছেশক্তি হচ্ছে মূল কারণ। সৃষ্টির মধ্য দিয়েই ভগবানের অনন্ত শক্তি প্রকাশ পায়। জীবের বাসনা পূরণার্থেই জড় জগতের সৃষ্টি হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ার মাঝে তারা উৎফুল্ল থাকুক।" (আল-কোরআন ১০:৫৮)

"পার্থিব জীবন!! আমার পক্ষ থেকে এ এক প্রশান্তি ক্ষণকালের জন্য।" (আল-কোরআন ৩৬:৪৪)

৯	হে ধনঞ্জয়! এই সমস্ত কর্ম আমাকে বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না। আমি আসক্তি রহিত উদাসীনের ন্যায় স্থিত।

● **৯.৯** স্বভাবের বা প্রকৃতির তিন গুণ হচ্ছে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ। এ গুণগুলি দিয়েই জীবকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখা হয়। কিন্তু এসব গুণ ভগবানকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই তিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিরহিত এবং নিরপেক্ষ বা উদাসীনের মতো থাকেন। প্রাকৃতির গুণসমুহের প্রভাবের উর্ধ্বে অবস্থান করেন তিনি। ফলে বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

কিন্তু জীব এ মায়া এড়াতে পারে না। বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং জাগতিক কর্মকান্ডে ভীষনভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। ফলশ্রুতিতে নিজে কে, কোথা থেকে এল, কোথায় যেতে হবে বদ্ধ জীব জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গন্তব্য বিস্মৃত হয়। জীবের প্রকৃত জ্ঞান মায়া দ্বারা আবৃত হয়। জড় জীবনে জড়িয়ে পড়ে। এটিই জীবের বন্দিত্বের কারণ। এ অবস্থা থেকেই মুক্তির কথা বলা হয়ে থাকে।

ভগবানের পারলৌলিক প্রকৃতি বা স্বভাব প্রাপ্ত হয়ে কিভাবে বন্ধনের উর্ধ্বে উঠে মুক্ত হওয়া যায় গীতায় সে শিক্ষাই দেয়া হয়েছে। মুক্তির পথ প্রদর্শন করা হয়েছে।

১০	আমার পরিচালনায় প্রকৃতি সচল-অচল অস্তিত্ব প্রসব করে চলেছে; হে কৌন্তেয়! এই কারণে জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয়।

● **৯.১০** পরমেশ্বর ভগবান জগত পরিচালনা করেন। তিনি নিত্য সক্রিয়। ভগবানের পরিচালনা ব্যাতিত জড় প্রকৃতি কিছুই করতে পারে না। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ নভোমন্ডল থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন। প্রত্যহ তিনি তাঁর কর্মে রত। তিনি জানেন যা ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে এবং যা সেখান থেকে নির্গত হয় এবং যা নভোমন্ডল থেকে নেমে আসে এবং যা নভোমন্ডলে উত্থিত হয়।" (আল-কোরআন ৩২:৫ , ৫৫:২৯ ,৩৪:২)

তাঁর নিয়মমাফিক পরিচালনার কারণে জগৎ সুশৃংখলভাবে পরিবর্তীত ও সম্প্রসারিত হয়। সময়ে ধ্বংস হয় এবং নতুন সৃষ্টির উদয় হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব।" (আল-কোরআন ২১:১০৪)

ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। তাঁর পরিচালনায় জড় প্রকৃতি আপনা থেকে সচল-অচল সবকিছু সৃষ্টি করে চলেছে। সে কারণে জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয়। ভগবানের দৃষ্টিপাত ও আদেশের ফলে এই জড় প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। যেমন বলা হয়েছে,

"কোন কিছুর প্রতি আমার নির্দেশনা, যখন আমি কিছু করার ইচ্ছে করি কেবল বলি: 'হও'! এবং তা হয়ে যায়।" (আল-কোরআন ১৬:৪০)

১১	অজ্ঞ ও মূঢ় ব্যাক্তিগণ সমগ্র সৃষ্টির মহেশ্বরস্বরূপ আমার পরম ভাব সম্পর্কে জানে না বিধায় মনুষ্য দেহধারী মনে করে আমাকে অবজ্ঞা ও উপহাস করে।
১২	নিস্ফল আশা, নিস্ফল কর্ম, নিস্ফল জ্ঞান ও বিক্ষিপ্তচিত্ত মোহাচ্ছন্ন ব্যাক্তিগণ রাক্ষস ও আসুরিক প্রকৃতি আশ্রয় করে অবজ্ঞা করে।

• **৯.১১** ভগবান বলি কিংবা আল্লাহ বলি তাঁকে চিনতে হয় তাঁর গুণ, স্বভাব বা প্রকৃতি দ্বারা। অজ্ঞ ও মূঢ় ব্যাক্তিগণ সমগ্র সৃষ্টির মহেশ্বর ভগবানের পরম ভাব বা গুণাগুণ সম্পর্কে জানে না। তাই তারা মনুষ্য দেহ ধারণকারী তেমন স্বভাবপ্রাপ্ত কাউকে দেখলে অবজ্ঞা বা উপহাস করে। যেমন বলা হয়েছে,

"কিন্তু কখনই তাদের কাছে কোন বার্তাবাহক বা অবতার আসেনি যাদেরকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।" (আল-কোরআন ১৫:১১)

"হে মোহাম্মদ, তারা তোমাকে দেখে বিদ্রূপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে এবং বলে, 'এই কি সে, যাকে আল্লাহ বার্তাবাহক বা অবতাররূপে প্রেরণ করেছেন?'" (আল-কোরআন ২৫:৪১)

"উপহাসকারীরা যা বলে তা ধৈর্য্যের সঙ্গে ধারণ কর। সৌজন্যসূচক কথার মাধ্যমে তাদেরকে পরিহার কর।" (আল-কোরআন ৭৩:১০)

যখন আমরা মানুষ দেখি তখন আমরা তার দেহটাকে দেখি। দেহটাকেই সেই মানুষ বলে চিনি ও জানি। প্রকৃতপক্ষে দেহ হচ্ছে কিছু কোড যা একজনকে পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণে সহায়তা করে। যেমন বলা হয়েছে,

"হে মানব! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।" (আল-কোরআন ৪৯:১৩)

মানবের প্রকৃত সত্ত্বা এই দেহ নয়। দেহের ভেতরে কে বসবাস করে- অসুর নাকি দেবতা, পশু নাকি ভগবান তা দেহের ব্যাহ্যিক রূপ দেখে বোঝা সম্ভব নয়।

ভগবানকে চিনতে, জানতে ও বুঝতে হয় তাঁর স্বভাব, প্রকৃতি, গুণাগুন ও বৈশিষ্ট দেখে। ভগবানের নির্লোভ, নির্মোহ, উদাসীনবৎ, সহজ-সরল ও আনন্দময়, নির্গুণ ভাব বা প্রকৃতি দর্শন করে অজ্ঞ ও মূঢ় ব্যাক্তিরা তাঁকে উপহাস করে। তারা তাঁকে বোকা ভাবে এবং জগতে চলার অনুপযুক্ত বিবেচনা করে।

প্রকৃতপক্ষে তারা ভগবানের ভাব বা প্রকৃতির সাথে পরিচিত নয়। ফলে তারা বুঝতে পারে না এবং এ বিষয়ে বিভ্রান্ত হয় ।

● **৯.১২** অজ্ঞ ও মূঢ় ব্যাক্তিরা ভগবানের কাছে কোন কিছু যাচঞা বা প্রর্থনা না করে দেবতাদের দ্বারস্ত হয়। মনে করে যে দেবতারাই দ্রুত সব কামনা-বাসনা পূর্ণ করবে। ঈশ্বর বিমুখ হওয়ার কারণে তাদের যাগ-যজ্ঞ বা কর্মসমুহ নিস্ফল হয়। পরমেশ্বরে ভক্তিহীন বিধায় তাদের জ্ঞান কাজে আসে না। তাদের শাস্ত্র পান্ডিত্যও নিস্ফল হয়। জীবনের লক্ষ্য অবগত হতে না পেরে তারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও মোহাচ্ছন্ন হয়। বলা হচ্ছে,

"তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। ... এরা নিজেদের নিস্ফল কাজ দ্বারা নিজেদেরকেই নিশ্চিহ্ন করছে।" (আল-কোরআন ৬:৭০)

এভাবে রাক্ষস বা তামসিক ও আসুরিক বা রাজসিক প্রকৃতির মানুষ ভূল ও বিভ্রান্ত জ্ঞানে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভগবানকে অবজ্ঞা করে।

১৩	হে পার্থ! দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় করে মহাত্মাগণ কিন্তু আমাকে সকল সৃষ্টির কারণ অব্যয়-অক্ষয় জেনে অনন্যমনা হয়ে আমার ভজনা করে।
১৪	এই সকল ভক্তরা যত্নের সাথে দৃঢ়ব্রত হয়ে নিরন্তর আমার গুণ-কীর্তন করে এবং নিত্য উপাসনায় যুক্ত থেকে আমাকেই নমস্কার বা সেজদা করে।

● **৯.১৩-১৪** অপরদিকে যারা মহাত্মা তারা দৈবী বা সাত্ত্বিকী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা ভগবানে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে যে তিনিই সৃষ্টির আদি ও মূল কারণ। বিশ্বাস করে যে তিনি অব্যয়-অক্ষয় এবং তাঁর মৃত্যু নেই। অনন্যমনা হয়ে তাঁরা তাঁরই ভজনা করে। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি চিরঞ্জীব! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। অতএব কেবল তাঁর কাছে প্রার্থনা কর খাঁটি উপাসনার মাধ্যমে।" (আল-কোরআন ৪০:৬৫)

"তুমি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা কর যার মৃত্যু নেই।" (আল-কোরআন ২৫:৫৮)

মহাত্মাগণ ভগবানকে অব্যয়-অক্ষয় ও চিরঞ্জীব জেনে অনন্য চিত্তে ভক্তির সাথে কেবল তাঁরই ভজনা বা উপাসনা করে। তারা ভগবানের গুণ-কীর্তন করে ও তাঁর

মহাত্ব প্রচার করে। তাঁরা কোন দেবদেবী, মানুষ বা দেবদেবী তূল্য কোন মহাপুরুষের মহীমা কীর্তন করে না। তাঁরা কেবলমাত্র ভগবান বা আল্লাহর ওপরই ভরসা করে এবং তাঁর কাছেই মস্তক অবনত করে। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার প্রতিপালকের নামের মহিমা প্রকাশ কর, যিনি সুমহান!।" (আল-কোরআন ৮৭:১)

"নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যারাই আছে তারা সবাই আল্লাহর এবং যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে ... তারা রাত্রিদিন তাঁর মহিমা বর্ণনা করে; তারা ক্লান্ত হয় না।" (আল-কোরআন ২১:১৯-২০)

অনন্য চিত্তে ভগবানে বিশ্বাস রেখে তাঁর প্রতি ভক্তি-ভালবাসায় সিক্ত হওয়ার এ পথই হচ্ছে যোগ। এমন মানুষেরা তাদের সকল প্রকারের কাজ-কর্মের মধ্যেও অন্তরে সর্বদা ভগবান বা আল্লাহকে স্মরণ করে। তাঁর উপাসনা করে ও তাঁকেই নমস্কার বা সেজদা করে। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার প্রতিপালককে সেজদা কর এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা কর।" (আল-কোরআন ৯৬:১৯)

"তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হয়ে যাও।" (আল-কোরআন ৭৩:৮)

১৫	জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ভগবানের যজ্ঞ-উপাসনা করে থাকে। কেউ ভগবানকে এক ও অভেদ জেনে তাঁর উপাসনা করে। কেউ তাঁর বহুরূপের উপাসনা করে। আবার কেউ বিশ্বরূপের উপাসনা করে।

● **৯.১৫** ভগবানে বিশ্বাসী ভগবানের উপাসক হলেও সত্যি বলতে ভগবানকে কেউই নিশ্চিতভাবে জানে না। নানারূপ দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী আছে এ বিষয়ে। তাই একেকজন একেক রকমভাবে তাঁকে জানে বা বোঝে এবং নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে সেভাবে ভেবে নিয়ে তাঁর উপাসনা করে।

কেউ ভগবানকে সর্বকারণের কারণ 'এক' ও অভেদ জানেন। তারা ভগবানকে সর্বশক্তিমান ও সর্বশ্রেষ্ঠ জেনে কেবলমাত্র 'একজনার'ই উপাসনা করেন। জ্ঞানের

বিচার-বিশ্লেষণ শেষে সবকিছুর শুরু ও শেষ তারা এক জায়গায় দেখতে পান। তাই অন্য কারও বা কোনকিছুর উপাসনা করেন না। যেমন বলা হয়েছে,

"শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ! তিনি সত্যিকার অধিপতি! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি সন্মানিত আসনের অধিপতি।" (আল-কোরআন ২৩:১১৬)

"নিশ্চয়ই! তোমাদের পালনকর্তা এক।" (আল-কোরআন ৩৭:৪)

অপরদিকে কেউ বিশেষায়িত কর্মের ভিত্তিতে ভগবানের বিভিন্ন রূপের কল্পনা করেন। তারা প্রতিটি কর্মের সর্বেসর্বা হর্তাকর্তারূপে পৃথকভাবে তাঁর বিশেষায়িত প্রতিটি রূপের উপাসনা করে। বস্তুত তারা গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বিশেষায়িত দেব-দেবীদের উপাসনা করেন।

কেউ আবার ভগবানের বিশ্বরূপের উপাসনা করেন। তারা মনে করেন যে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডই ভগবানের একটি রূপ। এমনিভাবে জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে নানাভাবে তাঁর উপাসনা করা হয়। বলা হচ্ছে,

১৬	অমি রীতি-নীতি, আমি যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ কর্ম আমি, আমি রোগ নিবারক ভেষজ, মন্ত্র আমি, আমিই হোমের ঘৃত, আমি অগ্নি, আমিই অর্পণ।
১৭	আমি এই জগতের পিতৃস্বরূপ, মাতৃরূপ, বিধাতা ও পিতামহ। আমিই জানার বিষয়, শোধনকারী ও ওঙ্কার। আমিই ঋক, সাম ও যজুর্বেদ।
১৮	আমিই লক্ষ্য, প্রতিপালক, প্রভূ, সাক্ষী, আশ্রয়, রক্ষাকর্তা ও সুহৃদ। সৃষ্টি আমি, প্রলয় আমি, স্থিতি, আশ্রয় ও শাশ্বত বীজ আমি।
১৯	তাপ প্রদানকারী আমি, আমিই জল আকর্ষনকারী ও বর্ষনকারী। জীবন আমি মৃত্যুও আমি। হে অর্জুন! সৎ-অসৎ উভয়ই আমি।

• **৯.১৬-১৯** ভগবানের শক্তি, রূপ, বিভূতি হচ্ছে অনন্ত। এক একজন এক এক রূপ বা শক্তির উপাসনা করে। এখানে ভগবানের বিভিন্ন রূপের কিছু ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ওপরে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে ভগবান ভিন্ন এসব কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব নেই। তিনিই জগত সৃষ্টির কারণ। শক্তিজাত সমস্ত গুণাগুণের মূল উৎস তিনি। সবকিছু তার থেকে জাত। পৃথকভাবে আমরা যত গুণাগুণসম্পন্ন

জীব বা জড় পদার্থ দেখি এক কথায় তার সবই ভগবান। সব মিলেই তিনি পূর্ণ, এক ও অভেদ। জ্ঞানসম্পন্নগণ তাই সবকিছুতে ভগবানকেই দেখতে পান। ভগবান জীবের কল্যাণে নিজেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করেন। কিন্তু কেন তিনি এসব করেন মূল লক্ষ্য কেউ জানে না। মানুষ জানে কিছু আপাত লক্ষ্য। যেমন বলা হয়েছে,

"হতে পারে পার্থিব জীবন তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা কিংবা ক্ষণকালের জন্য আনন্দ উপভোগ।" (আল-কোরআন ২১:১১১)

ওপরে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে এ সবই ভগবান বা আল্লাহর এক একটি শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। ভগবানের নানান শক্তির মধ্য দিয়েই জগতের সকল কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। বস্তুত সবই ভগবান করেন। তিনিই সৃষ্টির কারণ এবং প্রলয়েও আশ্রয় তিনি। যেমন বলা হয়েছে,

অমিই রীতি-নীতি: "পালনকর্তা তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতি দান করেন, অতঃপর সেটিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করেন।" (আল-কোরআন ২০:৫০)

আমিই লক্ষ্য: "সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহমুখীন।" (আল-কোরআন ৩১:২২) তোমার প্রতিপালক, তিনিই সকল কর্ম বা প্রচেষ্টার মূল বা সর্বশেষ লক্ষ্য।" (আল-কোরআন ৫৩:৪২)

প্রতিপালক, প্রভূ: "তোমার প্রতিপালক মহা প্রাচূর্য্যময়।" (আল-কোরআন ৯৬:৩)

সাক্ষী: "সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট।" (আল-কোরআন ৪:৭৯)

আশ্রয়: "তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।" (আল-কোরআন ৪০:৫৬) "বল আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানবজাতির প্রতিপালকের কাছে।" (আল-কোরআন ১১৪:১)

রক্ষাকর্তা: "রক্ষাকর্তারূপে আল্লাহই যথেষ্ট।" (আল-কোরআন ৪:১৩২)

সুহৃদ: "আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের আর কোন বন্ধু বা সুহৃদ নেই।" (আল-কোরআন ৪:১৩২)

বস্তুত সকল ধর্মগ্রন্থই ভগবান, আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে এমন ধারণাই মানুষের মাঝে তুলে ধরে। মূল বক্তব্যসমুহ সর্বত্রই এক। স্থান, কাল, পাত্রের ভিন্নতার কারণে কিছু পার্থক্য তো থাকবেই।

বলা হচ্ছে ভগবানই এই জগতের পিতৃস্বরূপ, মাতৃরূপ ও বিধাতা। পিতৃরূপে ভগবান পরা বা জীব প্রকৃতিকে বীজরূপে ধারণ করেন। মাতৃরূপে তিনিই অপরা বা জড় প্রকৃতিকে ধারণ করেন। পিতা জড় প্রকৃতিতে জীবের বীজ প্রদান করেন। মাতা যোনি বহনকারী, গর্ভধারণকারী। জড় প্রকৃতি স্বয়ং সৃষ্টিকারী। প্রলয়ে জীবসমুহ বীজ অবস্থায় বিধাতার কাছেই ফিরে যায় এবং সংরক্ষিত থাকে। বোঝার সুবিধার্থে এটি কেবল একটি ধারণা মাত্র।

এখানে 'আমি' শব্দের ব্যাবহার প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। সংকটকালে আশীর্বাদ প্রাপ্ত কারও ওপর যখন ভগবান বা আল্লাহর নির্দেশনা অবতীর্ণ হয় তখন তাঁর বারংবার 'ভগবান বলেছেন' বা 'আল্লাহ বলেছেন' এভাবে বলার সময়, সুযোগ কিংবা প্রয়োজনও থাকে না।

ভগবানের বার্তা বস্তুত তেমন একজনের মাধ্যম দিয়ে সরাসরি নিঃসৃত হয়। তখন 'আমি' শব্দ ব্যাবহার করেই প্রেরকের নির্দেশনা দ্রুততার সাথে তাঁর ভেতর থেকে আপনা-আপনি বের হয়ে আসে। সেটিকে ভগবানের বাণীরূপেই ধরে নিতে হয়। কেননা তখন ব্যাক্তি ব্যাক্তির মধ্যে থাকেন না। অব্যাক্তে বা আড়ালে চলে যান। ভগবানের ভাব ও শক্তি পূর্ণরূপে তাঁর মাঝে জাগ্রত ও প্রকাশিত হয়। তাতে কিন্তু ব্যাক্তি ভগবান হয়ে যান না। ভাব সরে গেলে তিনি আবার সাধারণে পরিণত হয়ে যেতে পারেন। ভাবটাই আসল। এমনই এক প্রসঙ্গে এভাবে বলা হয়েছে,

"যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে ঈসা! হে মরিয়ম পুত্র! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহ ব্যাতিত আমাকে এবং আমার মাতাকেও দুই উপাস্যরূপে গ্রহণ কর?'

সে বলবে, 'আপনি মহিমান্বিত! এটি আমার জন্য শোভনীয় নয় যে আমি এমন কথা বলি যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি কখনও বলে থাকি তবে অবশ্যই আপনি জ্ঞাত; আপনি আমার অন্তরের কথা জানেন কিন্তু আমি জানিনা যা আপনার মনে আছে।

নিশ্চয়ই! আপনিই কেবল অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। আমি তাদেরকে কেবল সে কথাই বলেছি যা আপনি আদেশ করেছেন। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। ...।

অতঃপর যদি আপনি তাদেরকে এ কারণে শাস্তি দেন, তবে নিশ্চয়ই! তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবুও নিশ্চয়ই তারা আপনারই দাস। আপনি, কেবল আপনিই পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী।'" (আল-কোরআন ৫:১১৬-১১৮)

যিনি এভাবে 'আমি' শব্দ ব্যাবহার করে ভগবানের বাণী বা নির্দেশনা প্রকাশ করেন, তিনি নিজেও এ বিষয়ে নিশ্চিত জানেন ও সচেতন থাকেন যে তিনি যে একজন মানুষ সর্বসাধারণ সেটি জানে। অর্থাৎ তিনি ভগবান নন। ফলে তিনি সেটি জেনে-বুঝে ও মেনে নিয়েই সেভাবে বিষয়গুলি উপস্থাপন করেন। তাতে তাঁর নিজ জ্ঞানে তিনি কোন সমস্যা বোধ করেন না। কিন্তু সমস্যা হয় তখন যখন মানুষ বিষয়গুলিকে ভূলভাবে বোঝে বা ব্যাখ্যা করে। তাই বলা হয়েছে,

"বল হে মোহাম্মদ, আমি তোমাদের মতই একজন মরণশীল মানুষ।" (আল-কোরআন ৪১:৬)

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। এ ছাড়া তিনি সব ক্ষমা করেন যাকে ইচ্ছে তাকে। যে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করে সে ভ্রান্তিতে ঘুরে বেরায়।" (আল-কোরআন ৪:১১৬)

ভগবান মায়াযোগে অনেক পর্দার অন্তরালে থাকেন। তিনি সরাসরি কারও সঙ্গে কথা বলেন না। যেমন বলা হয়েছে,

"কোন মরণশীলের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন কোন ওহীর মাধ্যম ব্যাতিত, অথবা কোন পর্দার অন্তরাল বা কোন দূত প্রেরণ করার মাধ্যম ব্যাতিত, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান সে বার্তা পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই! তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।" (আল-কোরআন ৪২:৫১)

"আমি যোগমায়ায় সমাবৃত; সকলের নিকট প্রকাশিত নই।" (গীতা ৭:২৫)

যদি তাই সত্য হয় তাহলে সমসাময়িক কালের মানুষ কিভাবে কোন বাণীকে ভগবানের বাণী বলে নিশ্চিত হবে?

ভগবান কারও মাধ্যম দিয়েই তাঁর বার্তা প্রেরণ করেন। যার মাধ্যম দিয়ে তিনি নির্দেশনা বা বার্তা প্রেরণ করেন সে ব্যাক্তি তাঁর ভাব বা স্বভাব প্রাপ্ত হন। উজ্জীবিত তেমন একজনের ভাব দেখেই তাঁকে চিনে নিতে হবে।

ভগবানের কোন কিছু লাভ করতে হলে তাঁর সমপর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। ভগবানসম ভাব ও জ্ঞানে আপনা থেকে তিনি উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। বস্তুত ভগবানই তাঁকে উজ্জীবিত করেন। ভগবানের অনুগ্রহ ব্যাতিত কোন কিছুই কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়।

শক্তি, সামর্থ, সাহস, জ্ঞান প্রয়োজনীয় সকল কিছু তিনি তাঁর মনোনীত ব্যাক্তির ওপরে অকাতরে বর্ষন করেন। যিনি ভগবানের আশীর্বাদ বা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন তাঁর ভেতরে সমসাময়িক সময়ে ভিন্নরকম এক বোধ ও চেতনা কাজ করে। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে যা তাঁর পক্ষে করা কখনই সম্ভব হত না। তাই উজ্জীবিত তেমন একজনের ভাব দেখেই তাঁকে চিনে নিতে হবে।

উজ্জীবিত তেমন একজন কখনও 'আমি' শব্দটি ব্যাবহার করলেও সেটি দোষের নয়। তিনি কিন্তু তাতে ভগবান হয়ে যান না। সময়ের প্রয়োজনে ভগবানের অনন্ত বৈভবের নির্দিষ্ট কিছু তিনি লাভ করেন মাত্র। বিষয়গুলিকে এভাবে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে। বলা হচ্ছে,

২০	ত্রি-বেদজ্ঞগণ সোমরস পান করে পূত-পবিত্র ও পাপমুক্ত হয়ে যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পূঁজা করে স্বর্গে গমন প্রার্থনা করে। এভাবে তারা পূণ্য লাভ করে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে দেবতাদের ন্যায় সুখ ভোগ করে।
২১	তারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করে পূণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে। এভাবে ত্রি-বেদের রীতি অনুসরণ করে ধর্ম পালনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে আকাঙ্খী ব্যাক্তিগণ গমাগমন করে।

• **৯.২০** যাগ-যজ্ঞপরায়ন ব্যাক্তিগণ ত্রিবেদে উক্ত যাগ-যজ্ঞাদি পালন করে। ত্রিবেদ হচ্ছে ঋক, যজু ও সামবেদ। যজ্ঞ শেষে সোমরস পান করে তারা পূত-পবিত্র ও

পাপমুক্ত হন। যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূঁজা করে তারা স্বর্গে গমন প্রার্থনা বা কামনা করেন। এভাবে তারা জড় জাগতিক প্রকৃতির নিকৃষ্টতা থেকে উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হন। যেমন- স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক ইত্যাদি। এই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হলে এ জগতের থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করা যায়। সেখানে তারা দেবতাদের ন্যায় সুখ ভোগ করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমরা ... এমন এক উদ্যান প্রাপ্তির প্রত্যাশায় পরস্পর ছুটে চল যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত।" (আল-কোরআন ৫৭:২১)

• **৯.২১** তারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করে। অতঃপর পূণ্য ক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্যলোকে পতিত হয়। এভাবে ত্রিবেদের রীতি অনুসরণ করে ধর্ম পালনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে আকাঙ্খী ব্যাক্তিগণ ভগবানের অপ্রাকৃত জগতে উন্নীত না হয়ে বারবার উচ্চলোক-নিম্নলোকে গমনাগমন করে। তারা এভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্রেই আবর্তিত হতে থাকে।

পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য তাই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। যার ফলে আনন্দময় চিরজীবন লাভ করা সম্ভব হবে। আর কখনই এই দুঃখময় জড় জগতে ফিরে আসতে হবে না। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভ হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"এ পার্থিব জীবন কেবল পেরিয়ে যাওয়া আয়েশ-উপভোগ ব্যাতিত আর কিছুই নয়। পরকাল, সেটিই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।" (আল-কোরআন ৪০:৩৯)

"সেখানে তারা বলবে এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না।" (আল-কোরআন ৩৭:৫৮)

"সেখানে তাদের ঘাম বা অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং সেখান থেকে তারা বহিস্কৃতও হবে না।" (আল-কোরআন ১৫:৪৮)

২২	যে ব্যাক্তি অনন্যচিত্তে আমাতে ধ্যানমগ্ন হয়ে আরাধনা করে, নিত্যযুক্ত তাদের সকল অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণজনিত বিষয় আমি বহন করি।

● **৯.২২** যিনি অনন্যচিত্তে ভগবানে ধ্যানমগ্ন হয়ে কেবল তাঁর আরাধনা করেন, নিত্যযুক্ত তেমন ভক্তের প্রয়োজনীয় সকল অলব্ধ বস্তুর সংস্থান এবং লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ ভগবান নিজে করেন। এটাই ভগবান বা আল্লাহর ওপর ভরসা করার ফল। যেমন বলা হয়েছে,

"যে পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন এবং তাকে তার জীবনোপকরণ এমন স্থান থেকে প্রদান করবেন, যেখান থেকে সে প্রত্যাশার কোন ধারণাই করতে পারেনি। যে ব্যাক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।" (আল-কোরআন ৬৫:২-৩)

সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করলে, সর্বভূতের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত থাকলে সংসার ও শরীরের প্রয়োজনীয় যোগান আসবে কিভাবে? এটি একটি প্রশ্ন। সে কারণে বলা হয়েছে যে, তেমন মানুষদের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণজনিত বিষয় ভগবান নিজে বহন করেন।

ভগবান সকলের জন্যই সব সরবরাহ করেন। তবে অন্যান্যদের চেষ্টা করে তা লাভ করতে হয়। কিন্তু নিত্যযুক্ত সত্যিকার ভগবান ভক্তের সে চেষ্টা করতে হয় না। তারা হিসেব-নিকেশ করে সে পর্যায়ে উন্নীত হন না। স্বভাব বশে আপনা থেকে তেমন পর্যায়ে চলে আসেন। তারা জাগতিক বিষয়ে আদৌ মনযোগী নন। তবুও তাদের কোন কিছুই বন্ধ হয়ে থাকে না। তবে এমন দৃষ্টান্ত বিরল! সচরাচর বা সহজেই চোখে পড়ে না। কারণ এমন অনন্যচিত্তও জগতে বিরল। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৩	অন্যান্য দেবতাগণের ভক্ত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে যারা তাদের পূঁজা-অর্চনা করে, হে কৌন্তেয়! তারা প্রকৃতপক্ষে আমারই পূঁজা করে তবে অবিধিপূর্বক।
২৪	আমিই হচ্ছি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভূ বা ফলদাতা। কিন্তু আমার স্বরূপ সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত নয় বিধায় তারা সংসারে পতিত হয়।

● **৯.২৩** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যারা ভগবান ব্যাতিত অপরাপর দেবতাদের পূঁজা-অর্চনা করে, বস্তুত তারাও ভগবানেরই আরাধনা করে। কিন্তু জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে তারা সেটি বোঝে না। এমনকি দেবতারাও ভগবানেরই আরাধনা করে। ফলে সকলের সকল আরাধনা ভগবানের কাছেই পৌঁছে।

দ্রুত ফল লাভের আশায় কিছু মানুষ দেবতাদের আরাধনা করে বা দেবতারূপী মানব বা মহামানবের কাছে যাচঞা করে। কিন্তু ভগবানের অনুমোদন ছাড়া দেবতাদেরও কিছুই দেবার ক্ষমতা নেই। দেবতারাও ভগবানের দ্বারস্ত হয়েই অন্যান্যদের জন্য বরাদ্দ নিয়ে আসেন। তাই বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে প্রত্যেকেই তাঁর নিকট যাচঞাকারী।" (আল-কোরআন ৫৫:২৯)

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা না তোমাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজেদের রক্ষা করতে পারে।" (আল-কোরআন ৭:১৯৭)

"যাদেরকে তারা আহবান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষন করে।" (আল-কোরআন ১৭:৫৭)

"সাবধান! নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপরাপরদের উপাসনা করে তা আসলে কিছুই নয়, নিজেদের কল্পনার পেছনে পড়ে রয়েছে। তারা কেবল অনুমান করছে।" (আল-কোরআন ১০:৬৬)

যারা দেবতাদের আরাধনা করে বস্তুত পরোক্ষে তারা ভগবানেরই আরাধনা করে। কেননা যারা দেবতাদের আরাধনা করে দেবতারা আবার তাদের জন্য ভগবানের কাছেই আরাধনা করে। ফলে দেবোপাসকদের আরাধনা হয় অবিধিপূর্বক; অর্থাৎ নিয়ম বহির্ভূতভাবে। নিয়ম হচ্ছে একমাত্র ভগবানের আরাধনা করা। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমাদের উপাস্য এক; তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।" (আল-কোরআন ২:১৬৩)

"তারাই দয়াময়ের বিশ্বস্ত বান্দা যারা আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কোন উপাস্যের নিকট ক্রন্দন করে না।" (আল-কোরআন ২৫:৬৮)

বস্তুত বুঝে কিংবা না বুঝে প্রত্যেকেই কেবলমাত্র ভগবানের কাছেই যাচঞা করে। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে প্রত্যেকেই আল্লাহর সেজদায় পতিত হয় ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়।" (আল-কোরআন ১৩:১৫)

ভগবান কখনই অনাবশ্যক দেবোপাসনা অনুমোদন করেন না। বলা হচ্ছে,

"পূর্বে আমি যে সকল বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, দয়াময় ব্যাতিত আমি কি কখনও কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম উপাসনার জন্য?" (আল-কোরআন ৪৩:৪৫)

"আল্লাহ বলেন: তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ কর না। উপাস্য কেবলমাত্র একজনই।" (আল-কোরআন ১৬:৫১)

- **৯.২৪** প্রকৃতপক্ষে ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত কর্মযজ্ঞের ভোক্তা। তিনিই কর্মের ফলদাতা প্রভূ। কিন্তু ভগবান সম্পর্কে যাদের যথাযথ জ্ঞান নেই তারা দেবতাদেরকে ঈশ্বর মনে করে। তাদের এমন অজ্ঞতার কারণে তারা মুক্তি লাভ করে না। দেবতারা মুক্তি দিতে পারে না। দেবপাসকগণ ভগবানকে পায় না এবং পরিপূর্ণ মোক্ষ লাভও তাদের হয় না। তারা উচ্চতর-নিম্নতর লোকে গমনাগমন করে। বলা হচ্ছে,

"তারা আল্লাহ ব্যাতিত এমন কিছুর উপাসনা করে, যে তাদের জন্য ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডল থেকে সামান্য জীবনোপকরণও প্রদানের অধিকার কিংবা ক্ষমতাও রাখে না।" (আল-কোরআন ১৬:৭৩)

বলা হচ্ছে যে,

২৫	দেবতাদের উপাসকগণ দেবতাদের প্রাপ্ত হন। পিতৃ-পুরুষগণের উপাসকগণ পূর্ব-পুরুষদের লাভ করেন। ভূত-প্রেতের উপাসকগণ ভূত-প্রেতদেরকে প্রাপ্ত হয়। আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ করে।

- **৯.২৫** যে যার ভক্ত, যে যার আরাধনা করে সে তাকেই প্রাপ্ত হয়। তার ভাব প্রাপ্ত হয়। বাস্তব জীবনেও আমরা দেখি যে, যে যাকে পছন্দ করে সে তার অনুরূপ ভাব নেয়ার চেষ্টা করে বা তাকে অনুসরণ করে। ফলে তার মতই সে আচরণ করে।

প্রকৃতপক্ষে যার যেমন অন্তরের সত্যিকারের বাসনা সে তেমনই প্রাপ্ত হয়। তেমনি দেবতাদের উপাসকগণ দেবতাদের প্রাপ্ত হন। তাদের ভাব বা লোক প্রাপ্ত হন। ভূত-প্রেতের উপাসকগণ ভূত-প্রেতদেরকে প্রাপ্ত হয়। পিতৃ-পুরুষগণের উপাসকগণ পূর্ব-পুরুষদের লাভ করেন।

বিভিন্ন লোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বেদে নিয়ম-বিধি সম্পর্কে বলা আছে। এসব বিধি অনুসরণ করে কাঙ্খিত লোকে যাওয়া সম্ভব বলে বলা হয়। তেমনি যজ্ঞ করে পিতৃলোকও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন বলা হয়েছে,

"যাদের সন্তানেরা বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদেরকে আমি তাদের পিতৃ-পুরুষদের সঙ্গে মিলিত করে দেব।" (আল-কোরআন ৫২:২১)

অপরদিকে যারা কেবল ভগবানের ভক্ত ও উপাসক তারা ভগবানকে লাভ করেন।

২৬	ভক্তি সহকারে যে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দান করে, বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যাক্তির ভক্তি প্রদত্ত সেই উপহার আমি প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।
২৭	হে কৌন্তেয়! যা কিছু তুমি কর, যা কিছু আহার কর, যা কিছু অর্পন কর, যা কিছু দান কর, যা তপস্যা কর- তা আমাকেই অর্পন কর।
২৮	এভাবে সর্বকর্ম আমাতে সমর্পন করে শুভ-অশুভ কর্মফলের বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত হবে। সন্ন্যাসযোগ তথা আমাতে সর্বকর্ম সমর্পনরূপ যোগে যুক্ত হয়ে কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে প্রাপ্ত হবে।

● **৯.২৬** ভগবানকে পাওয়া অত্যান্ত সহজ। এমনকি অত্যান্ত দরীদ্রতম ব্যাক্তিও কোনরকম যোগ্যতা ছাড়াই এর অনুশীলন করতে পারে। এর জন্য কেবল প্রয়োজন হচ্ছে সত্যিকারের ভালবাসা। কি পদমর্যাদা, স্থিতি কি এসবে কিছু আসে যায় না। পন্থাটি এতই সহজ যে, অকৃত্রিম প্রেমভক্তি সহকারে এমনকি একটি পত্র, একটু জল বা ফল পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা যেতে পারে। ভক্তের দেয়া যে কোন কিছু ভগবান সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। তাই ভক্তির ফলাফল পাওয়া থেকে কেউই বাদ পড়ে না। ভগবানকে পাওয়ার জন্য এটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ও সার্বজনীন একটি পন্থা। ভগবান কেবল প্রেমভক্তি চান অন্য কিছুই চান না। যেমন বলা হয়েছে,

"উৎসর্গীকৃত পশুর মাংশ ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না; পৌঁছায় তোমাদের অন্তরের ভালবাসা।" (আল-কোরআন ২২:৩৭)

"কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমুহের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করলে সেটি তো তার হৃদয়ের আল্লাহ প্রীতি-প্রসূত।" (আল-কোরআন ২২:৩২)

তিনি অভক্ত থেকে কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। কারও থেকে তাঁর কিছু পাওয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ শুধুমাত্র তাদের থেকেই গ্রহণ করেন যারা মন্দ কর্ম-পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে।" (আল-কোরআন ৫:২৭)

ধর্মের বিধান পরিপালনের নামে আমরা যত কিছু করি তার লক্ষ্য একটাই। ভগবান বা আল্লাহর প্রতি ভক্তি-ভালবাসা সৃষ্টি করা। নানারকম ধর্মীয় উপাসনা পালনের প্রয়োজন হয় বিশাল সংখ্যক জনসংখ্যাকে একটা নিয়মের মধ্যে রেখে এ পথে চালনা করার জন্য। কেননা ভক্তির লক্ষ্য অর্জিত হলে অপর সকল লক্ষ্য আপনাতেই অর্জন হয়ে যায়। তাই নিয়ম পরিপালনে গাফিলতি থাকা সমীচীন নয়। তাহলে নিয়ম ভেঙ্গে পড়বে। জগতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে।

ভগবান সকলকে জানেন। তিনি সকলের অন্তরের অন্তস্থলের কথাও জানেন। যে তাঁকে সত্যিকারেই ভক্তি করে, সর্বদা অন্তরে তাঁকে স্মরণে রাখে তার জন্য অনেক নিয়মের প্রয়োজন হয় না। প্রতীকী একটু পত্র, পুষ্প, ফল, জল দান করলেও তিনি খুশী। তিনি কেবল অন্তরের ভালবাসা চান। আর কিছুই চান না।

• **৯.২৭** যা কিছু তুমি কর, যা কিছু আহার কর, যা কিছু অর্পন কর, যা কিছু দান কর, যা তপস্যা কর আমাকেই অর্পন কর। এই অর্পন আর কিছুই না। ভগবানের প্রতি ভক্তির প্রকাশ। তাঁর অফুরন্ত দানের কথা স্মরণ ও স্বীকার করে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। সত্য অন্তরে ভগবানের মহাত্ম বুঝতে পাড়ার স্বীকারোক্তিমূলক এ প্রকাশকেই তিনি ভালবাসেন।

বলা হচ্ছে, সব কাজের পূর্বেই সেটি তাঁকে স্মরণ বা নিবেদন করে করা উচিত। এমনকি আহার করলেও পূর্বে তাঁকে স্মরণ করা উচিত। তাঁর অনুগ্রহের কারণেই জীব আমরা আহার করে বেঁচে আছি। এ স্মরণ কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। বাস্তব জীবনে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। বলা হচ্ছে,

"যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা থেকে আহার কর না। সেটি ঘৃণিত কাজ।" (আল-কোরআন ৬:১২১)

"তিনি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন ... যা আল্লাহ ব্যাতিত অপর কারও নামে উৎসর্গ করা হয়।" (আল-কোরআন ২:১৭৩)

অকৃতজ্ঞতা এটি ভয়ংকর অপরাধ। মানুষ নিজেকে দিয়েও এর ভয়াবহতা অনুভব করতে পারে। অকৃতজ্ঞতা সবকিছু রুদ্ধ করে দিতে পারে।

এ স্মরণের মধ্য দিয়ে মানুষ ত্যাগের শিক্ষাও লাভ করে। ছোট ছোট উপহার ভগবানকে নিঃস্বার্থভাবে দান করার মাধ্যমে মানুষ অন্যান্য জীব থেকে শুরু করে সকলের জন্য ত্যাগ করতে শিখে। এভাবেই মানুষ নিষ্কাম হয়ে কর্ম করতে উদ্বুদ্ধ হয়, অভ্যস্ত হয় এবং এর গুরুত্ব বিষয়ে উপলব্ধি করে।

ভক্তির মৌলিক বিধান ব্যাতিত কেউই ভগবানকে কোন কিছু গ্রহণ করাতে পারে না। অন্য কোন উপায়ে পন্ডিত, বিত্তশালী, জ্ঞানী কেউই ভগবানকে কোন কিছু দিয়ে খুশী করতে পারে না। ভক্তি একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন পন্থা। অধ্যায়ের শুরুতে এ বিষয়টিকেই অতি গুহ্য জ্ঞান বলা হয়েছে।

ভক্তি এতই শক্তিশালী একটি মাধ্যম যে মানুষ নিজের চরিত্রকেও বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়টির গুরুত্ব ও মহাত্ম উপলব্ধি করতে পারবে। আল্লাহর গুণেই জীব বা মানুষ গুণান্বিত। আন্তরীকভাবে ভক্তি করলে মানুষও মানুষের এমনকি শত্রুরও সব ক্রুটি-বিচ্যূতি মুহুর্তেই ক্ষমা করে দিতে পারে। একজনকে গ্রহণ করে নিতে পারে। ভক্তির ক্ষমতা অসাধারণ। এর সাথে ক্ষমা করতে পারার ও মন থেকে গ্রহণ করে নিতে পারারও একটি সম্পর্ক বিদ্যমান।

• **৯.২৮** ওপরোক্ত উপায়ে সকল কর্ম ভগবানে সমর্পন করে করা হলে মানুষ শুভ-অশুভ সকল কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এ চেতনায় মানুষ কেবল নিজ স্বার্থে কর্ম করে না। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করে। তাই তাঁর সব কাজ ভগবৎ সেবাময় হয়ে ওঠে। সন্ন্যাস বলতে এখানে ভগবানে সর্বকর্ম সমর্পনকে বোঝান হয়েছে। অনন্য ভক্তি সহকারে যিনি ভগবানের সেবায় জীবন সমর্পন করেছেন তিনিই যথার্থ 'সন্ন্যাসী'। তেমন মানুষ বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবানকেই প্রাপ্ত হন। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।" (আল-কোরআন ৩:৮৫)

এভাবে ভগবানে সমস্ত কর্ম সমর্পন করে কর্ম বন্ধনের শুভ-অশুভ ফল থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে। সন্ন্যাস যোগে যুক্ত আত্মা তথা ত্যাগের এই নীতিতে কর্ম করে মানুষ পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। বলা হচ্ছে,

২৯	সমস্ত জীবের প্রতি আমি সমভাবাপন্ন। আমার কোন প্রিয়-অপ্রিয় নেই। ভক্তিপূর্বক যে আমার ভজনা করে সে আমাতে এবং আমিও তার মধ্যে বিরাজ করি।

- **৯.২৯** ভগবানের ভাব প্রাপ্ত হতে হলে ভগবানকে জানতে ও বুঝতে হবে। সত্যি বলতে এসব বুঝেও কেউ ভগবানের ভাব লাভ করতে পারবে না। যিনি লাভ করবেন তিনি তার অন্তরজনিত আন্তরীক ইচ্ছের কারণে লাভ করবেন এবং সেটিও লাভ করবেন কেবলমাত্র ভগবানেরই কৃপার ফলে।

সেজন্য অবশ্য সবকিছু ত্যাগ করে হলেও সে ভাবকে শ্রেষ্ঠ জেনে ও ভালবেসে নিজের ভেতরে তা লাভ করার মনোবৃত্তি বা ইচ্ছে থাকতে হবে এবং বাস্তবেও সেভাবে চলতে পারতে হবে। অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি থাকলে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। ভগবান কেমন?

ভগবান সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন। সকলে এবং সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি তা সে যে যোনিতেই জন্ম নিক না কেন। তাই তিনি সমস্ত প্রাণীর জীবনের সব রকমের প্রয়োজন উদারভাবে পূর্ণ করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! ... ধনী হোক কিংবা দরীদ্র হোক আল্লাহ সকলেরই নিকটতম।" (আল-কোরআন ৪:১৩৫)

"এমন কত প্রাণী আছে যাদের কেউই নিজেদের খাদ্য নিজেরা মওজুদ করে রাখে না। তাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহই জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন। তিনি সব শোনেন, জানেন।" (আল-কোরআন ২৯:৬০)

তিনি কারও প্রতি এতটুকু বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নন; আবার কেউ তাঁর অতি অতি প্রিয়ও নয়। তিনি পক্ষপাত দুষ্ট নন। নিরপেক্ষ। তবে ভক্তি সহকারে যারা ভগবানের ভজনা-উপাসনা করেন তাঁরা তাঁর সান্নিধ্যেই বিরাজ করেন। তিনিও তাঁদের মাঝে

বাস করেন। তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষ নজর রাখেন। তাদের প্রতি প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট থাকেন। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি প্রসন্ন।" (আল-কোরআন ৫:১১৯)

"তিনি তাদেরকে উদ্যানে নিয়ে আসবেন যার তলদেশে নদীসমুহ প্রবাহিত। সেখানে তারা বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" (আল-কোরআন ৫৮:২২)

৩০	অতি দুরাচারী ব্যাক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে তাঁকে সাধুরূপে মনে করা উচিত। সে পূর্ণজ্ঞানে যথাযথ স্থানে স্থিত।
৩১	অতি দ্রুতই সে ধর্মাত্মায় পরিণত হয় এবং চির প্রশান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! দৃঢ়চিত্তে ঘোষনা কর যে, আমার ভক্ত কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

● **৯.৩০-৩১** আপাতদৃষ্টিতে কাউকে অতি দুরাচারী মনে হলেও যদি কেউ অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের ভজনা করে, তবে বুঝতে হবে যে তার ভেতরে একটি জাগ্রত অন্তর আছে। সে উদাসীন নয়। সে ভাল-মন্দ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। অতএব সে যথাযথ জ্ঞানে স্থিত। তার ভেতরে ভগবানে ভয় ও ভক্তি কিংবা কর্মের পরিণাম বা জবাবদিহীতার বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা আছে। পূর্ণজ্ঞানে যথাযথ স্থানে স্থিত বিধায় তেমন একজনকে সাধুরূপেই গণ্য করা উচিত।

সাময়িক ভূল হলেও অতি দ্রুতই তেমন মানুষ ধর্মাত্মায় পরিণত হয়ে যায়। বস্তুত অন্তরের গভীর থেকে যে ভগবানের ভক্ত তেমন ভক্ত কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। বিচ্যূত হলেও সময়ে যথাযথ স্থানে স্থিত হয়। যেমন বলা হয়েছে,

".. যারা কখনও কোন মন্দ কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেকে কোন ভূলে জড়িয়ে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে- আল্লাহ ব্যাতিত কে পাপ ক্ষমা করতে পারেন? তারা জ্ঞানত যে ভূল করে তার পুনরাবৃত্তি করে না।" (আল-কোরআন ৩:১৩৫)

ভগবানে ভক্তি প্রবণতার এতই মহাত্ম যে ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হয়ে যান। তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তবে এটিও

বুঝতে হবে যে তাদের অন্তর সঠিকভাবে স্থিত বলেই ভগবান তাদেরকে গ্রহণ করে নেন। মায়ার প্রভাব এমন যে ভক্তও কখনও কখনও ফাঁদে পড়ে যায়। ভক্তের আকস্মিক পতন যথাসময়ে বন্ধ হয়ে যায়।

উন্নত স্তর থেকে ভ্রষ্ট হলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ করার জন্য বেদে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান আছে। কিন্তু ভক্তের ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়। নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা করার ফলে তাঁর অন্তর আপনা থেকে নির্মল ও শুদ্ধ হয়ে যায়। ভক্তি এতই শক্তিশালী একটি মাধ্যম যে সবকিছুকে পরিশোধন করে দেয়। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন যারা অজ্ঞতা বা ভূলবশত মন্দ কাজ করে; অতঃপর অনতিবিলম্বে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে।" (আল-কোরআন ৪:১৭)

"বিশ্বাসী বা ভক্তদের সুসংবাদ দিয়ে ঘোষণা কর যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে মহা-পুরস্কার।" (আল-কোরআন ৩৩:৪৭)

৩২	হে পার্থ! স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র এমনকি যদি কেউ পাপ যোনিসম্ভূত হয়, তারাও আমাতে আশ্রয় নিয়ে নিশ্চিতভাবে পরম গতি লাভ করে।
৩৩	পূণ্যবান ব্রাক্ষন ও ক্ষত্রিয় বা রাজর্ষি ভক্তদের কথা আর কি বলব! তারা তো অনিত্য-দুঃখময় এই মর্ত্যলোক প্রাপ্ত হয়েও আমাকে ভজনা করে।
৩৪	আমাতে মনোনিবেশ কর। আমাতে ভক্তিপ্রবন হও। আমার পূঁজাপরায়ন হও। আমাকে নমস্কার বা সেজদা কর। মগ্ন হয়ে আমার সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পারলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

• **৯.৩২** স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র এমনকি তার চেয়েও অধম পাপ যোনিভূক্ত চন্ডাল যাদেরকে প্রচলিত ধারণায় নিচু বা অস্পৃশ্য গণ্য করা হয়, শ্রীকৃষ্ণ বলেন তারাও যদি ভগবানে বিশ্বাসী হন, ভগবানে মনোনিবেশকারী হন, ভক্তি সহকারে সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করেন, তাঁর ভজনা-উপাসনা করেন তবে তারাও পরম গতি লাভ করতে পারেন। চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন। তারাও ভগবানকে প্রাপ্ত হন। ভগবানে ভক্তির এমনই মহাত্ম!

ভগবানকে পেতে উচু-নিচু, জাত-কুল, শিক্ষা-দীক্ষা, পদ মর্যাদা এসবের কিছুই প্রয়োজন হয় না। কেবল তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও ভক্তিপ্রবন হতে হয় এবং সৎ অন্তরে সর্বদা তাঁকেই স্মরণ করতে হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! ... অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" (আল-কোরআন ২৯:৪৫)

"যারা বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়নস্বরূপ বসবাসের উদ্যান।" (আল-কোরআন ৩২:১৯)

ভক্তিযোগে সকলের অধিকার সমান। এতে কোন জাত-কুল, উঁচু-নীচু ভেদাভেদ নেই। এসব ভেদাভেদ জড় জগতের জীবনধারার জন্যই কেবল প্রযোজ্য। মানুষ হিসেবে সকল মানুষই সমান ও এক। পরম লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার অধিকার সবার আছে।

ভক্তি এতই শক্তিশালী মাধ্যম যে, তথাকথিত নীচু বর্ণের শুদ্ধ ভক্তকেও তা পরম সিদ্ধি প্রদান করতে পারে। কেবল ভগবানের স্মরণাপন্ন হলেই এটি সম্ভব হয়।

• **৯.৩৩** ভগবানের স্মরণাপন্ন হলে ভগবান যেখানে স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র এমনকি পাপিষ্ঠদেরকেও গ্রহণ করে নেন সেখানে রাজর্ষিদের আর কি কথা? তারা তো এ জগতই পেয়েছেন। দুঃখময় জগতের সর্বসুখ ভোগ করা সত্ত্বেও তারা ভগবানকে বিস্মৃত হননি। ভক্তি সহকারে তাঁকে স্মরণ করেন। তাঁর ভজনা-উপাসনা করেন। তারা তো পরম গতি প্রাপ্ত হবেনই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সে আশ্বাসই দিচ্ছেন।

• **৯.৩৪** সর্বদা অন্তরে ভগবানকে স্মরণ করতে হবে। তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রবন হতে হবে। তাঁর পূঁজা-উপাসনা বা এবাদতের মাধ্যমে তাঁকে নমস্কার বা সেজদা করতে হবে। পরিপূর্ণভাবে ভগবানে মগ্ন হয়ে তাঁর সাথে যুক্ত হতে পারলে ভগবানকে লাভ করা সম্ভব হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হয়ে যাও।" (আল-কোরআন ৭৩:৮)

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" (আল-কোরআন ৩৩:৪১-৪২)

“সেই সফল যে বিকশিত হয় এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে, অতএব প্রার্থনা করে।” (আল-কোরআন ৮৭:১৪-১৫)

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার উপাসনা কর এবং সৎ কাজ সম্পাদন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।” (আল-কোরআন ২৩:৭৭)

কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, গীতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভগবানের পাশাপাশি আল্লাহর উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে কেন? সত্য হচ্ছে, জগতের সকল মানুষের একজনই স্রষ্টা। কিন্তু তাঁকে নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না। অতএব যিনি ভগবান, তিনিই আল্লাহ, তিনিই গড। সঙ্গাগত যে সকল পার্থক্য তা মানুষের সত্যকে না জানার ফল। তাতে আল্লাহ, ভগবান কিংবা গডের সত্ত্বার কোনই পরিবর্তন হয় না। তিনি অব্যায়-অক্ষয়। পরিবর্তন যদি কিছু করতেই হয় তবে মানুষের ত্রুটিপূর্ণ ধারণাগুলির পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

ভক্তির জ্ঞানকেই এখানে অতি গুহ্য জ্ঞান বলা হয়েছে। লক্ষ্য অর্জনে এ জ্ঞান অব্যার্থ। যার মাধ্যমে ভগবানকে সহজে ও নিশ্চিতভাবে লাভ করা যায়। এ জ্ঞানে কর্ম করে প্রাপ্ত ফল কখনই নিঃশেষ হয় না। তাই অব্যয় ও অক্ষয়। এ পন্থায় অনেক নিয়ম-বিধির জটিলতায়েও প্রবেশ করতে হয় না। তাই ভগবানকে পাওয়ার এটি অতি উত্তম ও সহজ পন্থা। নিয়ম-বিধির জটিলতা নেই বিধায় আপাতদৃষ্টে মনে হলেও তা ধর্ম বিরুদ্ধ নয়।

দশম অধ্যায় : বিভূতি বিস্তারযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ৪২)

সারকথা : পূর্বের দু'টি অধ্যায়ের মতোই ভগবান ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে এখানে ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। ভগবানের ঐশ্বর্য্য, সক্ষমতা যথার্থভাবে জানা থাকলে মানুষ তাঁর মহাত্ম বুঝতে পারে এবং তাঁর প্রতি নত ও নম্র হয়। অধ্যায়ে ভগবানের ঐশ্বর্য্য তুলে ধরা হয়েছে। ভগবান সম্পর্কে জেনে তাঁর প্রতি নত ও নম্র হয়ে কিভাবে তাঁকে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে বলা হয়েছে। ভগবানকে ভালভাবে জেনে যথাযথ উপায়ে কর্ম করলে কর্ম পরিত্যাগের প্রয়োজন হয় না। কর্ম করেও বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায়।

১	শ্রীকৃষ্ণ বলেন: হে মহাবাহো! আরও শ্রবণ কর আমার পরম বচনসমুহ। যেহেতু আমার কথা তোমার ভাল লেগেছে তাই তোমার হিতকামনায় বলছি।
২	না দেবতারা আমার উৎস সম্পর্কে জানে, না মহর্ষিগণ। কেননা সর্বতোভাবেই আমি দেবতা ও মহর্ষিদেরও আদি কারণ।
৩	যে আমাকে জন্মরহিত ও অনাদি এবং সমগ্র জগতের ঈশ্বররূপে জানে, মরণশীলদের মধ্যে সে-ই ভ্রান্তিহীন এবং সকল পাপ থেকেও মুক্ত।

● **১০.১-২** শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানসম্মত কথা শুনে অর্জুন অত্যান্ত প্রীত হন। ভগবান সম্পর্কে ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে। অর্জুনের মঙ্গলার্থে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ঈশ্বর বিষয়ে আরও শ্রবন করতে বলেন।

সহজাত কারণেই মানুষের ভেতরে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকে। সেটিও সৃষ্টিকর্তারই আরোপ করে দেয়া শর্ত। তিনি যেভাবে তাঁর সৃষ্টিকে সৃষ্টি করবেন সৃষ্টি তেমনই আচরণ করবে। সৃষ্টি তার নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে, তার উৎস সম্পর্কে জানতে চায়। কিন্তু কেউ কি সত্যিই এসব বিষয়ে কিছু জানে? কে জানে? পরম পূঁজনীয় দেবতারা নাকি মহান ঋষিগণ?

শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে মনুষের মনে বিদ্যমান দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সকল প্রকার সন্দেহ নিশ্চিতভাবে দুর করে দেন। বলেন ভগবানকে কেউই জানে না। না দেবতারা, না মহর্ষিগণ। ভগবান হচ্ছেন দেবতা ও সকল ঋষিগণেরও স্রষ্টা বা আদি কারণ। ফলে

স্রষ্টা সম্পর্কে জানা সৃষ্টির পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এটি কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে যদি সৃষ্টিকর্তা নিজেই নিজেকে তাঁর সৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ করেন।

স্বর্গের দেবদেবী ও মহর্ষিরাও স্রষ্টাকে জানার চেষ্টা করেন। আজও জানতে পারেননি। ভগবান অচিন্তনীয়। তিনি বিদ্যমান আছেন অথচ তাঁকে জানা যায় না। দেবদেবীরা সকলে এ জগতে সৃষ্টি হয়েছেন। ভগবান এমনকি ব্রহ্মা, শিব এ সকল আদি মহান দেবতাদের থেকেও ভিন্ন। তিনি তাদেরও স্রষ্টা। যেমন বলা হয়েছে,

"যাদেরকে তারা আহবান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষন করে।" (আল-কোরআন ১৭:৫৭)

• **১০.৩** ভগবানকে জন্মরহিত ও অনাদিরূপে জানতে হবে এবং সমগ্র মহাজগতের ঈশ্বররূপে জানতে ও মানতে হবে। অর্থাৎ এ বিষয়ে বা বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে হবে। এগুলি শর্ত। এখানে তর্কের কোন অবকাশ নেই। তবেই মুক্তি ও শান্তির যে পথ এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে সেটি অর্জন করা সম্ভব হবে।

শাস্ত্রকে যে যথাযথ বলে স্বীকার করবে না কিংবা শাস্ত্রের বাণী যে বিশ্বাস করবে না স্বাভাবতই সে সে পথ অনুসরণ করে চলবে না। ফলে সে শান্তিও অর্জন করতে পারবে না। কোন কিছু থেকে ফল পেতে হলে সে পথে চলতে হবে। চলতে হলে মনে সে বিষয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস থাকতে হবে।

যদিও বলা হয়েছে যে, এগুলি শর্ত এবং এসব শর্তে বিশ্বাস আনতে হবে। তবে শর্ত হলেও সাধারণ জ্ঞানেও তা অযৌক্তিক নয়। কেননা এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ড কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে বা কে সৃষ্টি করেছেন এসব বিষয়ে কেউই কিছু জানে না। কোন সৃষ্টি তো সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন সৃষ্টি হয়নি। ফলে একজন ঈশ্বর তো পেছনে আছেন। এটি ভেবে নেয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। অন্তত খুব সাধারণ জ্ঞানেও। ফলে প্রথমেই সমগ্র জগতের স্রষ্টা ও লালন-পালনকর্তারূপে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে হবে। এটি যৌক্তিকতার মধ্যে পড়ে। এটিকে অন্ধত্ব বলে না। অন্ধত্ব ভিন্ন বিষয়।

সৃষ্টিকর্তা আদি এবং তাঁর জন্ম বিষয়ে যেহেতু জানা নেই এবং তা জানা সম্ভবও না তাই তিনি জন্মরহিত ও অনাদি। এ সবই যুক্তির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সত্য। সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টি থেকে তিনি ভিন্ন ও উচ্চতর হওয়াই

স্বাভাবিক। তাই এমন বোধসম্পন্ন মানুষকে ভ্রান্তিহীন বলা হয়েছে। ভগবান সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। যেমন বলা হয়েছে,

“তিনিই আল্লাহ, এক। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেন না, জন্ম নেনও না। তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কেউ নেই, কিছু নেই।” (আল-কোরআন ১১২:১-৪)

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তাঁকে অনাদি বা জন্মরহিত এবং সমগ্র জগতের ঈশ্বররূপে জানলে মানুষকে পাপ মুক্ত বলা হচ্ছে?

শাস্ত্রের কথায় যে বিশ্বাস করবে সে শাস্ত্র নির্দেশিত পথ নির্দেশনা মেনে চলবে। শাস্ত্র নির্দেশিত পথ নির্দেশনা মেনে চললে মানুষ মন্দ পথ এড়িয়ে ভাল পথে চলবে। শাস্ত্র কখনই মন্দ পথে চলতে বলে না। ফলে সে পাপমুক্ত থাকবে। যে পাপমুক্ত থাকবে নিশ্চিতভাবেই সে ভ্রান্তির যে কোন পথ থেকেও মুক্ত থাকবে। তাই এমন বোধসম্পন্ন মানুষকে ভ্রান্তিহীন ও পাপমুক্ত বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

“আল্লাহ অবশ্যই মন্দ কাজের আদেশ করেন না।” (আল-কোরআন ৭:২৮-২৯)

“যে পথ নির্দেশনা অনুসরণ করে সে তা নিজের মঙ্গলের জন্যই করে। আর যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে সে তা নিজেরই বিপক্ষে করে।” (আল-কোরআন ১০:১০৮)

৪	বুদ্ধি, জ্ঞান, সন্দেহ ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি, ক্ষমাশীলতা, সত্যবাদীতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রন, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, ভয় ও অভয়, অহিংসা, সমভাবাপন্নতা, সন্তুষ্টি, তপস্যা, দান, সন্মান-অসন্মান জীবের এই সকল নানা প্রকারের ভাব আমার থেকেই উৎপত্তি। [৪-৫]
৬	সপ্ত মহর্ষি এবং পূর্ববর্তী চারজন ও মনুগণ তথা মানব আমারই ভাবসম্পন্ন। আমার মনের সংকল্প, ইচ্ছে বা প্রেরণা থেকে গ্রহলোকে এইসকল প্রজা তথা সন্তান-সন্ততি সৃজিত হয়েছে।

• **১০.৪-৫** সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টির বা জীবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অস্তিত্বই যার নেই তার তো নিজস্ব কোন গুণাগুণ থাকারই প্রশ্ন আসে না। সৃষ্টির সকল গুণাগুণের উৎস হচ্ছেন তিনি যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব স্রষ্টার গুণাগুণই বিভিন্ন সৃষ্টির ওপর

বিভিন্নভাবে আরোপিত হয়েছে। ফলে সৃষ্টি তথা জড় ও চেতন সকলের সকল গুণাগুণের উৎস তার স্রষ্টা। ঈশ্বর বা ভগবান থেকে সকল গুণাগুন আগত। স্রষ্টাই সকল গুণের ধারক।

ওপরে জীবের যে সকল ভাব বা গুণাগুণের উল্লেখ করা হয়েছে এই সকল গুণের উৎস হচ্ছেন ভগবান। তাঁর কোন গুণই মন্দ না। সকল গুণই জীবন ও জগতের জন্য প্রয়োজনীয়। মানুষের দ্বারা ভূল প্রয়োগে তা মন্দরূপে প্রতিভাত হয়। যারা সক্ষমতার ভূল প্রয়োগ করে তারা ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে। ভাল ও আপতদৃষ্টে প্রতীয়মান মন্দ সকল গুণেরই উৎস হচ্ছেন ভগবান। অন্তরে নিজেকেই গুণসমুহের বিকাশ ঘটাতে হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"মানুষকে পথ চলার ভিন্ন ভিন্ন দু'টি পথ ভাল ও মন্দ প্রদর্শন করেছি। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি উন্নততর বা উচ্চতর পর্যায়ে আরোহণের।" (আল-কোরআন ৯০:১০-১১)

উদ্ধৃত গুণসমুহ ব্রক্ষান্ডে মানব ও দেবতা সকল সমাজে বিদ্যমান। অন্যান্য গ্রহলোকেও আছে। এই গুণসমুহ ভগবানেরই বিবিধ শক্তি ও সক্ষমতার প্রকাশ। এগুলি সবই তাঁর বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যের অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

• **১০.৬** বিশ্ব ব্রক্ষান্ডের প্রজাসকল তথা সন্তান-সন্ততির সৃষ্টি ও বিস্তার সম্পর্কিত একটি ধারণা দেয়া হয়েছে শ্লোকে। ভগবান প্রথম জীবসত্ত্বা 'ব্রক্ষা'কে সৃষ্টি করেন। ব্রক্ষা থেকে সপ্ত ঋষি এবং তাদের পূর্বে আরও চারজন মহর্ষি এবং তারপর চতুর্দশ মনুর সৃষ্টি হয়।

সপ্ত ঋষি হচ্ছেন ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু। চারজন মহর্ষি হচ্ছেন সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার। চতুর্দশ মনু হচ্ছেন স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রক্ষসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি। এই পঁচিশ জন হচ্ছেন সমগ্র ব্রক্ষান্ডের জীবসত্ত্বা তথা প্রজাকুলের আদিপুরুষ।

বোঝার সুবিধার্থে মানবীয় সম্পর্কের আদলে প্রতীকীরূপে ব্রক্ষাকে তাই পিতামহ এবং ভগবানকে প্রপিতামহ এভাবে বলা হয়েছে। এরা সকলে ভগবানের ভাবসম্পন্ন

এবং ভগবানে চিন্তাপরায়ন। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে, গড মানব সৃষ্টি করেন তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবি বা ভাবের আদলে।

সকল সৃষ্টি ভগবানের মনের ইচ্ছে থেকে সৃজিত। ভগবানের ইচ্ছেশক্তি অত্যান্ত গুরুত্ববহ। সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রকৃতি হচ্ছে উপাদান কারণ। অর্থাৎ প্রকৃতিতে সৃষ্টির সকল উপাদান বিদ্যমান। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছে ভিন্ন সৃষ্টি সম্পন্ন হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছে শক্তি হচ্ছে মূল কারণ। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তাই সৃষ্টি করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন। যখন তিনি কোন কিছু স্থির করেন কেবল বলেন, 'হও!' এবং হয়ে যায়।" (আল-কোরআন ৩:৪৭)

জগতে অনন্ত ব্রহ্মান্ড রয়েছে। প্রতিটি ব্রহ্মান্ডে অগনিত গ্রহলোক আছে। প্রতিটি গ্রহলোক নানারকম প্রাণী দ্বারা অধ্যুষিত। সকলেই ওপরোক্ত এই পঁচিশজন থেকে জাত। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনিই সে সত্ত্বা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি মনোসংযোগ করেন নভোমন্ডলের প্রতি এবং এটিকে সাঁজিয়েছেন সপ্ত আসমানরূপে।" (আল-কোরআন ২:২৯)

ব্রহ্মান্ড পরিচালনায় বহু দেব-দেবীগণ বিভিন্ন গ্রহলোকে নিয়োজিত আছেন। তাদের প্রধান হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব ও প্রজাপতিগণ। যেমন বলা হয়েছে,

"শপথ ফেরেশতাদের! যারা মর্যাদাক্রমে সুশৃংখল সারিবদ্ধভাবে নিজেদেরকে বিন্যাস করে রাখে ... তারা বলে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে সুনির্ধারিত স্থান বা অবস্থান এবং আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান থাকি কার্য নির্বাহের জন্য এবং আমরাই আল্লাহর মহাত্ম ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।" (আল-কোরআন ৩৭:১, ১৬৪-১৬৬)

"কে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা ও ব্যাবস্থাপনা করে? .. তবে কি তোমরা তাঁর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন করবে না?" (আল-কোরআন ১০:৩১)

"আল্লাহ নভোমন্ডল থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন।" (আল-কোরআন ৩২:৫)

ব্রহ্মান্ডের অধিবাসীরা বহু প্রজাপতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং সমস্ত প্রজাপতিরা ভগবানের সৃষ্টি। ভগবান হচ্ছেন আদি। ভগবানের অনন্ত বৈভবের এগুলি হচ্ছে কিছু প্রকাশ মাত্র।

৭	আমার এতসব বিভূতি যোগ বা ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে যিনি যথার্থরূপে জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হবেন- এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
৮	আমি সকল কিছুর উৎপত্তির কারণ। আমা থেকেই সবকিছু প্রবর্তিত হয়। এভাবে জেনেই জ্ঞানীগণ আমাকে ভজনা করেন।
৯	চিত্ত যাদের আমাতে অর্পিত, প্রাণ যাদের আমাতে সমর্পিত, তারা আমার সম্পর্কে পরস্পরকে বুঝিয়ে বলে এবং সর্বদা আলোচনা ও গুণ-কীর্তন করে। এতে তারা পরম তুষ্টি লাভ করে এবং অপার আনন্দ অনুভব করে।

● **১০.৭** মানুষ ভগবান এবং তাঁর ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি বিষয়ে যথাযথভাবে জানতে না পারলে তাঁর মহাত্ম উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে তাঁর ওপর যথাযথভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পায় না। তাই বলা হয়েছে,

“তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহাত্ব কামনা করছ না, যখন তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে এবং বিভিন্ন ধাপে ধাপে?” (আল-কোরআন ৭১:১৩-১৪)

বস্তুত মানুষ কোন শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী বা সক্ষমের পূঁজারী। যিনি উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা রাখেন তিনিই হচ্ছেন সক্ষম। তাই ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও সক্ষমতা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হয়। যেমন বলা হয়েছে,

“তোমরা কি আল্লাহ ব্যাতিত এমন কিছুর উপাসনা কর যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না?” (আল-কোরআন ৫:৭৬)

অধ্যায়ে ভগবানের নানান বিভূতি বিষয়ে ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। আধ্যাত্ম বা পারমার্থিক সিদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে ভগবানকে জানা। যখন আমরা ভগবানের বিশালত্ব, মহাত্ম ও তাঁর সর্বময় ক্ষমতার কথা জানতে পারি তখন অন্তর আমাদের

তাঁর প্রতি নম্র হয়ে আসে। গভীর শ্রদ্ধা সহকারে মন থেকে ভগবানকে গ্রহণ করি ও তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রবন হই। তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হই বা তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করি। তখন সন্দেহহীনভাবে কেবলমাত্র তাঁর কাছেই সকল কিছু যাচঞা করি। অন্য কারও দ্বারস্ত হই না।

ভগবানকে পেতে হলে তাই তাঁর বিষয়ে যথাযথভাবে জানতে হয়। যথাজ্ঞানে নিজের ভেতরে প্রেমভক্তি জাগিয়ে তুলতে হয়। প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের সেবার আকাঙ্খা বৃদ্ধি করার জন্য তাই আধ্যাত্ম জ্ঞান বা ভগবদ তত্ত্ব জানা থাকা আবশ্যক।

• **১০.৮** মানুষ মানুষকে সৃষ্টি করেনি। দেবতারাও মানুষকে সৃষ্টি করেনি। উপরন্তু দেবতারাও ভগবানের সৃষ্টি। সবকিছুর সৃষ্টি ও উৎপত্তির কারণ ভগবান। জীবের সকল শক্তি, গুণাগুণ ও সক্ষমতা তাঁর থেকে প্রবর্তিত হয়। বেঁচে থাকার সকল রসদ তিনি সরবরাহ করেন নানান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন মানুষ এভাবে জানার কারণে কেবলমাত্র ভগবানের ভজনা করেন। অন্য কারও আরাধনা করেন না। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ! তোমাদের পালনকর্তা! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব তাঁরই উপাসনা কর। তিনি সকল বিষয়ের প্রতিপালন করেন।" (আল-কোরআন ৬:১০২)

• **১০.৯** ভগবানের বিভূতি ও মহাত্ম জানার কারণে মন-প্রাণ যারা ভগবানে সমর্পন করেন, তারা আর কোথাও কোন কিছু করার কোন কারণ খুঁজে পান না। তারা সেটিকেই একমাত্র লক্ষ্য দেখতে পান। তারা কেবল ভগবানেই মগ্ন থাকে। তাদের সকল কাজ-কর্ম, কথাবার্তা, চলাফেরা সবকিছুতে ভগবানের ভাবনা মিশে থাকে। ফলে তারা নিজেদের মধ্যেও যখন কথা বলেন, কিংবা অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় যান তাদের সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ভগবানের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা ফুটে ওঠে। তাঁরা অন্যদেরকেও ভগবানের মহিমা ও তাৎপর্য্য বুঝিয়ে বলেন এবং জাগতিক বিষয়াদিতে অত্যাধিক জড়িত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেন। এসবেই তারা পরম তুষ্টি লাভ করেন এবং অপার আনন্দ অনুভব করেন।

ভগবানের কর্মকান্ডের প্রক্রিয়াগুলি তারা অনুধাবনের চেষ্টা করেন। যারা জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষনা করেন বস্তুত তারাও বুঝে কিংবা না বুঝে, বিশ্বাস করে কিংবা

না করে ভগবানেরই ভক্ত। তারা তাঁরই সন্ধান করেন এবং তাদের মাধ্যমেই ভগবানের সত্যিকারের মহাত্ম জগতবাসী যথাযথভাবে জানতে পারেন।

১০	যারা সর্বদাই আমাতে আসক্তচিত্ত, প্রীতি সহকারে আমার ভজনা করে তাদেরকে আমি বুদ্ধি-জ্ঞান দান করি যেন তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।
১১	তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের হৃদয়ে বিরাজ করে, জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জলন করে অজ্ঞতাজনিত অন্ধকারকে দুর করি।

● **১০.১০** পূর্বে বলা হয়েছে যে ভগবানকে কেউই জানে না। না দেবতারা, না মহর্ষিগণ। ভগবান হচ্ছেন দেবতা ও সকল ঋষিগণেরও স্রষ্টা ও আদি কারণ। ফলে স্রষ্টা সম্পর্কে জানা সৃষ্টির পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এটি কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে যদি সৃষ্টিকর্তা নিজেই নিজেকে তাঁর সৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ করেন।

ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। কেবল যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তাঁকে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক গবেষনার মাধ্যমে তাঁকে একটু একটু করে জানার চেষ্টা করা যেতে পারে তবে এর শেষ কোথায় জানা নেই। সেভাবে এগুতে গেলে এমনকি প্রলয়ও দেখতে হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে ভক্তিই হচ্ছে একমাত্র উত্তম পথ। যেটিকে এখানে ভক্তি বলা হচ্ছে সেটিকে কোথাও বিশ্বাসও বলা হয়ে থাকে। বিশ্বাস ভিন্ন ভক্তি আসবে না। আবার ভক্তির ফলেও বিশ্বাস জন্মায়।

যারা সর্বদাই ভগবানে আসক্তচিত্ত, অত্যান্ত আন্তরীকতার সাথে তাঁর ভজনা, উপাসনা বা এবাদত করেন বলা হচ্ছে, তেমন ভক্তদের তিনি নিজেই জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেন যেন তারা তাঁকে প্রাপ্ত হয়। ভক্তদের তিনি ভালবাসেন।

● **১০.১১** হৃদয়ে যখন ভগবানের প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি হয় তখন আপন মনেই ভগবানের ভাবনা চলে আসে এবং অন্য চিন্তা স্থান পায় না। ভগবান তাদের হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। অন্ধকারের কালো দুর করে জ্ঞানের আলোয় তাদের ভেতরকে আলোকিত করে দেন। জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। যেমন বলা হয়েছে,

“হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে মনযোগী হও ... তিনি তোমাদের জন্য এমন আলোর পথের দিশা দেবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে।” (আল-কোরআন ৫৭:২৮)

“যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের পথ-নির্দেশনা আরও বৃদ্ধি করে দেন।” (আল-কোরআন ৪৭:১৭)

“তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে হিকমত বা বিশেষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয় সে প্রকৃত অর্থেই প্রভুত কল্যাণপ্রাপ্ত।” (আল-কোরআন ২:২৬৯)

ভক্তের প্রতি ভগবানের ভালবাসা ভক্তের চেয়েও অধিক হয়। তিনি নিজেই তাদের হৃদয়ের অন্ধকার দুর করে দেন এবং জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদেরকে আলোকিত করেন। ভক্তের হৃদয়ে তাঁরই অনুরূপ প্রবৃত্তি জাগে। তাঁর কৃপায় তারা প্রয়োজনীয় সকল কিছু বুঝতে পারেন। এটিও বুঝতে হবে যে এ সবকিছুর কিছু না কিছু প্রক্রিয়া আছে। ভগবানের এতসব বিভূতি বিষয়ে অবগত হয়ে অর্জুন বলেন,

১২	পরম ব্রহ্ম বা সত্য তুমি; তুমি পরম আশ্রয় বা লক্ষ্য। সমস্ত ঋষিরা যেমন দেবর্ষি, নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস তোমাকে পরম পবিত্র পুরুষ বা জীবন্ত সত্ত্বা, স্বয়ং প্রকাশ ও দেবতাদিগেরও আদি, জন্মরহিত ও সর্বব্যাপি বলে থাকেন। তুমি নিজেও আমাকে তা বলছ। [১২-১৩]
১৪	হে কেশব! তুমি আমাকে যা বলেছ এই সমস্তই আমি সত্য বলে স্বীকার করি। হে ভগবান! না দেবতারা না দানবেরা তোমাকে জানে।
১৫	হে সর্বোত্তম জীবন্ত সত্ত্বা! হে সৃষ্টির স্রষ্টা! হে জীব সকলের প্রভূ! হে দেবতাগণের দেবতা! হে মহাবিশ্বের প্রতিপালক! তুমি কেবল নিজেই নিজেকে জান।
১৬	যে সকল বিভূতি দ্বারা সমগ্র লোকসমুহে তুমি পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত আছ, তোমার নিজের সেই দিব্য বিভূতিসমুহ বিস্তারিতভাবে বলতে কেবল তুমিই সক্ষম।

● **১০.১২-১৬** শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রবণ করে অর্জুন বুঝতে পারেন যে ভগবানই বস্তুত সব। এ জগতে আমাদের ব্যাক্তিক লক্ষ্যসমুহ বস্তুত কোন মূল্যই বহন করে না, যদি না তা যিনি যে কারণে আমাদের সৃজন করেছেন তার সাথে আমাদের লক্ষ্যগুলিকে সমন্বিত করতে পারি।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বাণী গভীর মনযোগের সাথে শ্রবন ও অনুধাবন করে ভগবানে জ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁর সকল মহিমাকে অন্তর থেকে স্বীকার করে নেন। এখানে তাঁর অন্তরের সে ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে ভগবান বিষয়ে এমনকি দেবতারাও জানেন না। তারাও তাঁকে সন্ধান করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"যাদেরকে তারা আহবান করে তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে।" (আল-কোরআন ১৭:৫৭)

যাদেরকে আমরা আমাদের পথ-প্রদর্শক জানি তেমন মহাপুরুষ এমনকি দেবতা-ফেরেশতারাও ভগবানকে জানে না, বোঝে না। যেমন বলা হয়েছে,

"সে বলল, 'হে আমার প্রভূ! আমাকে দর্শন দাও যেন আমি তোমাকে দেখি।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, তবে পাহাড়ের দিকে তাকাও যদি সেটি স্ব-স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে তাঁর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন সেটি বিধ্বস্ত হল এবং মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল তখন বলল, 'হে প্রভূ! পবিত্র তোমার সত্ত্বা! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে এলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।" (আল-কোরআন ৭:১৪৩)

প্রকৃত সত্য হচ্ছে ভগবানই একমাত্র জীবন্ত এবং তাঁর থেকেই সকলের মাঝে জীবন ও চেতনার উন্মেষ। তিনি সকল কিছুর উৎস, কারণ ও প্রতিপালক। তাঁর সম্পর্কে তিনি নিজে ব্যাতিত কেউই তাঁকে জানে না। তার বিভূতি তথা শক্তি, মহাত্ম, গুণাগুন ও সক্ষমতা দ্বারা তিনি সর্বত্র ও সবার মাঝে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আল্লাহ সর্বসময়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন।" (আল-কোরআন ৪:১২৬)

যারা তাঁকে বিশ্বাস ও ভক্তি করবে না তারা কখনই তাঁকে জানতে পারবে না। অনুসন্ধানি মন ও ভক্তি ব্যাতিত কখনই কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা যায় না। যে বিষয়ে যার ভক্তি নেই, সে বিষয়ের গভীরে সে প্রবেশ করে না বিধায় তত্ত্বের গুহ্য রহস্যগুলি জানতে পারে না। প্রথমেই বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালবাসা প্রয়োজন কোন কিছু জানতে হলে।

অর্জুন বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে সে অনুভূতি প্রকাশ করেন এবং বলেন, তুমি যেসব বিভূতিসমুহ দ্বারা সমগ্র লোকসমুহে ব্যাপ্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত আছ, দিব্য সেই নিজ বিভূতিসমুহ বিস্তারিতভাবে বলতে কেবল তুমিই সক্ষম। আর কারও পক্ষেই তা প্রকাশ করা সম্ভব না। কেননা কেউই বিষয়গুলি জানে না। অর্জুন জানতে চেয়ে বলেন,

১৭	হে যোগেশ্বর! কি প্রকারে সর্বদা ধ্যানস্ত হয়ে আমি তোমাকে জানতে পারি? হে ভগবান! কোন কোন ভাবে আমি তোমাতে মনোনিবেশ করব?
১৮	হে জনার্দন! তোমার যোগ তথা সৃষ্টি-কৌশল ও বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য ও শক্তিসমুহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আরও বল। তোমার অমৃতময় বাণী শ্রবণ করে আমার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না।

[শ্রীকৃষ্ণকে এখানে যোগেশ্বর বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যোগের ঈশ্বর। যোগ হচ্ছে কৌশল তথা সৃষ্টি কৌশল। সৃষ্টি কৌশলের ঈশ্বর।]

- **১০.১৭** অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চান কিভাবে ধ্যানস্ত হলে পরমেশ্বরকে জানা সম্ভব? কি প্রকারে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে?

যারা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করে গেছেন যুগে যুগে তারাও নানারূপ বিভ্রান্তিতে ছিলেন। কিভাবে ভগবানের উপাসনা করতে হবে? কিভাবে তাঁর প্রতি ধ্যানস্ত হতে হবে? কিভাবে মনোনিবেশ করতে হবে? বিষয়গুলি তাদের কাছেও স্পষ্ট ছিল না।

ভগবান বলি আল্লাহ বলি কোন না কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি মানবসমাজে জ্ঞান পৌঁছে দিয়েছেন। যার জন্য আজ আমরা সুশৃংখল নিয়ম ও সমাজবদ্ধ জীবন পেয়েছি। অন্যথায় আজও হয়তবা আমাদেরকে বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়াতে হত। যেমন

অর্জুন এখানে জানতে চেয়েছেন কিভাবে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। একইভাবে ইব্রাহীম (আঃ) জানতে চেয়ে বলেছেন,

"হে আমাদের পালনকর্তা! .. আমাদেরকে আমাদের উপাসনার উপায় প্রদর্শন কর।" (আল-কোরআন ২:১২৮)

আজও যারা বিশ্বাসী হয়ে ভগবান প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে না তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেরায়। উচ্ছৃংখল জীবনযাপন করে। জীবনের কোন পরম লক্ষ্য তাদের জানা নেই। ফলে লক্ষ্য অর্জনের বাসনা বা চেষ্টাও নেই। বৃথাই এ জীবন ধারণ! তাই বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে আন্তরীক হও এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে কঠোর পরিশ্রম কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আল-কোরআন ৫:৩৫)

• **১০.১৮** 'বিভূতি' হচ্ছে 'অসাধারণ ঐশ্বর্য্য'। এখানে বিভূতি বা ভগবানের ঐশ্বর্য্য বলতে তাঁর শক্তি, সক্ষমতা, গুণাগুণ, ক্ষমতা সবকিছুকে বোঝান হয়েছে যার দ্বারা তিনি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রন ও ধারণ করে রাখেন কিংবা বলা যায় ব্রক্ষ্মান্ড, জীবন ও জগত পরিচালনা করেন।

জগতে বস্তুত সর্বত্রই ঐশী শক্তির প্রকাশ। কিন্তু অতিশয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত যেসব সেগুলিকে তাঁর শক্তির বিশেষ অভিব্যাক্তি বলে মনে করা হয়। বিভূতি দ্বারা এখানে সেগুলিকেই বোঝান হয়েছে। বিভূতিসমুহকে যেন ঈশ্বর মনে করে ভূল না করা হয় সে বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হবে। এক একটি বিভূতি পরমেশ্বরের এক একটি ঐশ্বর্য্যের সামান্য কিছু প্রকাশমাত্র। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহর নিদর্শনসমুহের মধ্যে রয়েছে .. সূর্য্য ও চন্দ্র। সূর্য্য কিংবা চন্দ্রকে সেজদা কর না। বরং আল্লাহকে সেজদা কর যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন।" (আল-কোরআন ৪১:৩৭)

বৈদ্যুতিক শক্তি, রাসায়নিক শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি, তাপশক্তি, আনবিক শক্তি, আলোক শক্তি, শব্দ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, চলৎ শক্তি, মহাকর্ষ, অভিকর্ষ .. ইত্যাদি যত শক্তি বিষয়ে আমরা অধ্যায়ন করি, কিংবা বিজ্ঞান যত বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক

গবেষনা পরিচালনা করে বস্তুত ভগবান বা আল্লাহর বিভূতিরই সন্ধান করে। বিজ্ঞান কেবল বিভূতিসমুহের সন্ধানই করে না, বিজ্ঞান ভগবানের গুণাগুণের প্রচার-প্রসার ও মহাত্ম বর্ণনা করে সবচাইতে যথাযথভাবে। যা জেনে অন্যরাও বিজ্ঞানকে অনুসরণ করতে বা তার সাথে তাদের দর্শনের সামঞ্জস্য বিধান করতে বাধ্য হয়। যারা বিজ্ঞান নিয়ে সাধনা করে তারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই উপাসনায় রত। গভীরভাবে ভেবে দেখুন তো উপাসনা কি? উপাসনায় বস্তুত আমরা কি করি?

অর্জুন ভগবানের সৃষ্টি-কৌশল ও বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য ও শক্তিসমুহ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আরও জানতে চান। কিভাবে তিনি সর্বব্যাপ্ত হয়ে থাকেন, কিভাবে সবকিছুকে ধারণ করে রাখেন ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করেও যেন এ বিষয়ে তাঁর তৃপ্তি মিটছে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৯	হ্যাঁ, কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতিসমুহ সম্পর্কে তোমাকে বলব। কেননা আমার বিভূতি বিস্তারের কোন অন্ত নেই।
২০	হে গুড়াকেশ! আমিই সমস্ত জীবের হৃদয়ে স্থিত আত্মা এবং আমি সমস্ত জীব ও জড়ের আদি, মধ্য ও অন্ত।

● **১০.১৯** ভগবানের সক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাঁর শক্তি-সক্ষমতা অন্তহীন। তিনি সব করতে পারেন। ফলে এ বিষয়ে বলে শেষ করা যাবে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কেবল বোঝার সুবিধার্থে বা ধারণা দেয়ার মানসে প্রধান প্রধান কিছু বিষয় বলা হচ্ছে। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন- তাই করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ২২:১৪, ২৪:৪৫)

"আল্লাহ! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। সবচাইতে সুন্দর নামসমুহ তাঁরই।" (আল-কোরআন ২০:৮)

ঈশ্বর বলি, ভগবান বলি, আল্লাহ বলি, গড বলি তাঁর সকল নামই সুন্দর, মহাত্ব ও তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং তাঁর নামের মাঝেই তাঁর গুণের প্রকাশ। তাঁর গুণেই তাঁর শক্তি ও সক্ষমতার প্রকাশ। তাঁর নামেই তাঁর মহিমা ও ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। আল-কোরআনেও এমনিভাবে আল্লাহর মহাত্বপূর্ণ অনেক নামের উল্লেখ রয়েছে।

তিনি যেমন অতি বৃহতের মধ্যে আছেন, তেমনি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রের মধ্যেও আছেন। অসীম তার বিস্তার! অকল্পনীয় ও ধারণাতীত!

ভগবানের সকল মহাত্ত্ব ও তার বিস্তার উপলব্ধি করা সহজ নয়। সৃষ্টিতেই জীবের সীমাবদ্ধতা আছে। সীমাবদ্ধতা নিয়ে অসীমকে বোঝা সম্ভব না। তবুও মানুষ জানতে চেষ্টা করে। কিন্তু পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা হয়তবা সম্ভব না।

ভগবান জানেন যে জীবেরা তাঁর শক্তি বা বিভূতির কূল-কিনারা করতে পারে না। বোঝার সুবিধার জন্য এখানে তাই কিছু বিধৃত করা হয়েছে। অনেকটা সূত্র ধরিয়ে দেয়ার মতো। জীব ও জড় উভয় জগতেই ভগবানের অন্তহীন শক্তি ও সক্ষমতা বিভিন্নভাবে ব্যাক্ত বা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"এবং পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন রং-বেরঙের বিবিধ বস্তু, সেগুলিতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা বিষয়গুলি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা বা সন্ধান-অনুসন্ধান বা গবেষনা করে।" (আল-কোরআন ১৬:১৩)

ভগবান যোগ মায়ার দ্বারা নিজেকে কোথাও ব্যাক্ত করেন আবার কোথাও অব্যাক্ত রাখেন। যেমন আল্লাহর দু'টি নাম হচ্ছে 'আল্লাহু জাহির' তিনি ব্যাক্ত বা প্রকাশিত এবং 'আল্লাহু বাতিন' তিনি অব্যাক্ত বা অপ্রকাশিত। বিশ্বাসী বা ভক্ত ভগবানের ব্যাক্ত-অব্যাক্ত সকল মহাত্ম উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রবন হন। কিন্তু অপরাপরদেরকে তাঁকে জানা ও বোঝার জন্য জড়-জাগতিক পদ্ধতিতে চিন্তা-ভাবনা বা গবেষনা করতে হয়। গবেষক যা করেন নিবিষ্টচিত্ত হয়ে বস্তুত তাঁরা ভগবানেরই সন্ধান করেন। তাঁর ধ্যানেই মগ্ন তারা থাকেন। বৈজ্ঞানিক গবেষনা বস্তুত সে কাজই করে। এগুলিই সাংখ্যের কাজ। বোঝার সুবিধার্থে ভগবানের অনন্ত বিভূতির কিছু কিছু এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

• **১০.২০** বলা হচ্ছে ভগবানই সমস্ত জীবের হৃদয়ে স্থিত আত্মা। আত্মার উপস্থিতির কারণেই জীবের দেহ জীবন্ত, সচল, চেতনাসম্পন্ন ও বিকাশমান। পরমাত্মা হচ্ছে ভগবানের একটি প্রকাশ। ভগবানের বিশ্বরূপের আত্মা হচ্ছে পরমাত্মা। পরমাত্মা ভগবান প্রবেশ না করা পর্যন্ত জড় জগতেরও কোন রকম বিকাশ হয় না। ভগবানই হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে একমাত্র জীবন্ত সত্ত্বা। তাঁর পরশে অপরাপর সবকিছু জীবন্ত হয়ে

ওঠে। এভাবেই ভগবানের সাথে জীবের সম্পর্ক রক্ষিত হয়। ভগবান সমস্ত জীবের হৃদয়ে স্থিত। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তর্বর্তী হয়ে থাকেন।" (আল-কোরআন ৮:২৪)

পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার সম্পর্ককে উজ্জীবিত রাখতে হলে প্রতিনিয়ত এর পরিচর্য্যা প্রয়োজন। যারা সেটি যথাযথভাবে করে না তাদের প্রকৃত জ্ঞান জাগতিক মোহে আচ্ছাদিত হয় এবং তারা বিভ্রান্ত হয়। বিভ্রান্ত হওয়ার কারণে ভগবানের সাথে সম্পর্কের বিষয়টি ভূলে পথচ্যূত হয়। করণীয় বা কর্তব্যকর্ম ভূলে নিজেই জগতে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। ধন-সম্পদ, ক্ষমতা নানান বিষয়ে আসক্ত হয়। জড় জাগতিক বন্ধন থেকে তাদের মুক্তি লাভ হয় না।

প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের একটি আদি আছে যা তার স্মরণে নেই। একটি মধ্য সময় আছে যা চলমান এবং একটি শেষ সময়ও আছে যে পরিণতি বিষয়ে তার জানা নেই। ভগবান সকলের জন্ম বা সৃষ্টির আদি কারণ। তিনি জীবনের কারণ এবং মৃত্যুরও কারণ। তেমনি এ মহাজগতেরও একটি শুরু ও শেষ আছে এবং একটি চলমান সময় আছে। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং বিশ্ব জগতের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে আল্লাহর কাছে।" (আল-কোরআন ৬:২)

ভগবান হচ্ছেন সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ। তিনি আদি, মধ্য ও অন্ত সব। তিনিই অতীত, তিনিই বর্তমান, তিনিই ভবিষ্যৎ। তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি সব অবগত। উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় এবং জন্ম-মৃত্যু ও জীবনও ভগবান। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনিই আদি তিনিই অন্ত .. তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।" (আল-কোরআন ৫৭:৩)

"আল্লাহ! আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা।" (আল-কোরআন ৩৮:৬৬)

বলা হয়, সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান মহাবিষ্ণুরূপে কারণ সমুদ্রে শায়িত থাকেন। যেমন বলা হয়েছে,

“তিনিই নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন .. তাঁর আসন ছিল পানির ওপরে।” (আল-কোরআন ১১:৭)

২১	আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কদের মধ্যে বিকিরণশীল সূর্য্য, মারুতদের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র।
২২	বেদসমুহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়সমুহের মধ্যে আমি মন এবং জীবসমুহে চেতনা।
২৩	রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে সম্পদের দেবতা কুবের, বসূদের মধ্যে অগ্নি এবং পর্বতসমুহের মধ্যে আমি মেরু।
২৪	হে পার্থ! পুরোহিতদের মধ্যে আমাকে প্রধান বৃহস্পতি বলে জানবে। সেনাপতিদের মধ্যে আমি কার্তিকেয় এবং সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর।
২৫	মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমুহে একাক্ষর ‘ওঁ’ কার, যজ্ঞ সমুহের মধ্যে জপযজ্ঞ এবং স্থাবর বস্তু সমুহের মধ্যে হিমালয়।

. **১০.২১** ভগবানের নানান বিভূতি বিষয়ে এখানে ধারণা তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন বলা হচ্ছে, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ভগবান হচ্ছেন বিষ্ণু নামধারী প্রধান। আকাশে অসংখ্য উজ্জল নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য্য হচ্ছে মুখ্য। অন্তরীক্ষে পঞ্চাশ রকমের বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এগুলির নিয়ন্ত্রনকারী দেবতা হচ্ছেন ‘মরীচি’ যিনি ভগবানের প্রতিনিধি। অর্থাৎ ভগবানই সর্বক্ষেত্রে প্রধান বা সর্বশ্রেষ্ঠ।

• **১০.২২** সাধারণত বেদসমুহের মধ্যে ঋক বেদকেই প্রধান বলা হয়। কিন্তু সামবেদ ছন্দ ও সুর প্রধান বলে ভক্তি মার্গে এটির আকর্ষন শক্তি বিবেচনায় প্রধান্য দেয়া হয়। তাই যাগ-যজ্ঞের ক্রিয়াতে সামবেদকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সামবেদই শ্রেষ্ঠ।

স্বর্গ রাজ্যের প্রধান দেবতা হচ্ছেন ‘ইন্দ্র’। তাঁকে স্বর্গের রাজা বলা হয়। তাঁর শাসনাধীন গ্রহলোককে ইন্দ্রলোক বলা হয়। সকল ইন্দ্রিয় অনুভূতির কেন্দ্র হচ্ছে মন। মনই প্রধান। চেতনা হচ্ছে প্রাণের প্রমানস্বরূপ। জড় ও চেতনের পার্থক্য হচ্ছে এই

যে জীবসত্ত্বার মতো জড়ের চেতনা নেই। চেতন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য। সকল শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যেই ভগবান। তাঁর উপরে কেউ নেই, কিছু নেই। যেমন বলা হয়েছে,

"তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কেউ নেই, কিছু নেই।" (আল-কোরআন ১১২:৪)

• **১০.২৩** একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর বা শিব হচ্ছেন প্রধান। তিনি হচ্ছেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তমোগুণের নিয়ন্ত্রক এবং ভগবানের গুণাবতার। যক্ষ ও রাক্ষসদের অধিপতি 'কুবের' হচ্ছেন দেবতাদের সমস্ত ধন-সম্পদের সংরক্ষক এবং ভগবানের প্রতিনিধি। সুউচ্চ শিখরে ভগবানই মেরু।

• **১০.২৪** যারা প্রকৃতি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ইন্দ্র। বৃহস্পতি হচ্ছেন ইন্দ্রের পুরোহিত। ইন্দ্র যেহেতু সমস্ত রাজাদের মধ্যে প্রধান তাই বৃহস্পতি হচ্ছেন সমস্ত পুরোহিতদের প্রধান। তেমনই শিব-পার্বতীর পুত্র স্কন্দও সমগ্র সেনা বর্গের প্রধান। সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্রই হচ্ছে প্রধান। এগুলি ভগবানের মহাত্ম্যকে ইংগীত করে।

• **১০.২৫** ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব 'ব্রহ্মা' বিভিন্ন ধরণের প্রজাতি সৃষ্টির জন্য কয়েকজন সন্তান সৃষ্টি করেন। সেই সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও তেজস্বী হচ্ছেন মহান ঋষি 'ভৃগু'।

সমস্ত অপ্রাকৃত শব্দের মধ্যে পরব্রহ্মবাচক 'ওঁ' বা ওঙ্কার ধ্বনি ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে কৃষ্ণ ও রাম নাম জপ করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। জগতে যা কিছু পরম মহিমান্বিত তার সবই ভগবানের প্রতীক। তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বত হিমালয় তাঁরই প্রতীক।

যজ্ঞের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যজ্ঞের উল্লেখ আছে। যেমন দ্রব্যযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, ব্রহ্ম যজ্ঞ, তপযজ্ঞ ইত্যাদি। তবে সব যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ বা নামযজ্ঞ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। বৈদিক যুগে দ্রব্যযজ্ঞ বা পশুযজ্ঞের প্রাধান্য ছিল। পরে জ্ঞানযজ্ঞ সে স্থান লাভ করে। পরে ভক্তিতত্ত্বে জপযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে।

বস্তুত সমগ্র জগতই হচ্ছে নাম রূপাত্মক। মন থেকে যে ভাবেরই সৃষ্টি হোক না কেন তার একটি নাম আছে। ভাব, নাম ও রূপ বলা যায় একই। যেমন বলা হয়েছে,

“তিনি আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিলেন। .. অতঃপর ফেরেশতাদের বললেন, ‘এসবের নাম বল।’ তারা বলল, ‘আপনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যাতিত আমাদের কোন জ্ঞান নেই।’ তিনি বললেন, ‘হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম জানিয়ে দাও’।” (আল-কোরআন ২:৩১-৩৩)

সমগ্র ব্রহ্মান্ডের সবকিছুর অন্তরালে একটা না একটা নাম আছে। নাম বস্তুত একটা শব্দ। অতএব সবকিছুর পেছনে একটা শব্দ আছে। নাম বা শব্দের মহাত্ম প্রভূত! এই নামই শব্দব্রহ্ম বলে কথিত হয়। যেমন বলা হয়েছে,

“যখন তিনি কোন কিছু হতে নির্দেশ করেন কেবল বলেন, ‘হও!’ এবং হয়ে যায়।” (আল-কোরআন ২:১১৭)

একটি শব্দই একটি কমান্ড। তাতেই সব হয়ে যায়। শব্দের মহাত্ম প্রভূত! তবে এটিও বুঝতে হবে যে সবকিছুর পেছনেই কিছু না কিছু প্রক্রিয়া আছে। বিষয়গুলি বোঝা তাই এতই সহজ না।

যেমন সব শব্দ তরঙ্গ থেকে সৃষ্ট শব্দ সবাই শুনতে পায় না। যে অন্তর সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করে সে অন্তর অনেক কিছু শুনতে পায়। যেমন বলা হয়েছে,

“যদি তুমি উচ্চকন্ঠে কথা বল, তথাপি তিনি গোপন ভাবনা এমনকি তার চেয়েও গুপ্ত বিষয় জানেন।” (আল-কোরআন ২০:৭)

অন্তরে যে সর্বদা ভগবান বা আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁর নাম জপ করে তিনি তা জানেন। এটি একটি শ্রেষ্ঠ আরাধনা। নাম জপের গুরুত্ব ও মহাত্ম অপরিসীম। মনের ওপর এর প্রভূত প্রভাব আছে।

২৬	সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বদের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধ পুরুষগণে কপিল মুনি।
২৭	অশ্বদের মধ্যে অমৃত মন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা বলে জানবে, হস্তীদের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যের মধ্যে নর অধিপতি।
২৮	অস্ত্রসমুহের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীদের মধ্যে কামধেনু, সন্তান উৎপাদনের কারণ আমি কন্দর্প বা কামদেব এবং সর্পদের মধ্যে বাসুকি।

২৯	নাগদের মধ্যে অনন্ত এবং জলচরদের মধ্যে আমি বরুণ। পিতৃ-পুরুষে অর্যমা এবং দন্ড-দাতাদের মধ্যে আমি যম।
৩০	দৈত্যদের মধ্যে প্রহ্লাদ এবং গ্রাসকারীদের মধ্যে আমি সময় বা কাল; পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদের মধ্যে গরুড়।
৩১	বেগবানদিগের মধ্যে আমি বায়ু; অস্ত্রধারীদের মধ্যে পরশুরাম; মৎস্যদের মধ্যে মকর বা হাঙ্গর এবং নদীসমুহে গঙ্গা।

• **১০.২৬** অশ্বত্থ বৃক্ষ হচ্ছে গাছের মধ্যে সুবিশাল ও সবচেয়ে সুন্দর। দেবতা নারদকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে গণ্য করা হয়। নারদ হচ্ছেন ভগবানের ভক্তরূপের প্রকাশ। গন্ধর্বলোকের অধিবাসীরা সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী। তাদের মধ্যে চিত্ররথ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। সিদ্ধদের মধ্যে কপিলদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞ হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি ভগবানের একজন অবতার।

• **১০.২৭** ভগবানের ভক্ত দেবতা ও ভগবান-বিদ্বেষী অসুরেরা একবার সমুদ্র মন্থনে অংশ নিয়েছিল। এই মন্থনের ফলে অমৃত ও বিষ উত্থিত হয়েছিল এবং মহাদেব এই বিষ পান করে জগতকে রক্ষা করেছিলেন। অমৃত থেকে অনেক জীব উৎপন্ন হয়েছিল। উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব এবং ঐরাবত নামক হস্তী এই অমৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। যেহেতু এই দুটি পশু অমৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তাই তাদের বিশেষ তাৎপর্য আছে।

মনুষ্যের মধ্যে শাসনকর্তা বা নর অধিপতি হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। দৈব গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার কারণে তারা সেই আসনে আসীন হয়েছেন। যদিও ভগবান একাই সকল কিছুর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনকারী। যেমন বলা হয়েছে,

"সৃষ্টির পরিচালনা বা কর্তৃত্বে অংশ নিতে তিনি তাঁর সঙ্গে কাউকেই অংশীদার করেন না।" (আল-কোরআন ১৮:২৬)

• **১০.২৮** বজ্র অসীম শক্তিশালী। ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে। চিন্ময় জগতে গাভীদের যে কোন সময় দোহন করলেই যত পরিমাণ ইচ্ছে দুধ পাওয়া যায়। এদের নাম সুরভী। কন্দর্প হচ্ছেন কামদেব। যার প্রভাবে সুসন্তান উৎপন্ন হয়।

● **১০.২৯** বহু ফণাধারী নাগদের মধ্যে অনন্ত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। জলচরদের মধ্যে বরুণ শ্রেষ্ঠ। পূর্ব-পুরুষদের একটি গ্রহলোক আছে। সেই গ্রহের অধিষ্ঠাতা দেবতা হচ্ছেন অর্যমা। পাপীদের যারা দন্ড দেয় তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে যমরাজ।

● **১০.৩০** দিতি ও অদিতি দুই বোন। অদিতির পুত্রদের বলা হয় আদিত্য। দিতির পুত্রদের বলা হয় দৈত্য। সকল আদিত্যরা ভগবানের ভক্ত এবং সকল দৈত্যরা নাস্তিক। প্রহ্লাদ দৈত্যদের মধ্যে জন্ম নিলেও ভগবানের ভক্ত ছিলেন।

বশীকরণের নানান নিয়ম আছে। কিন্তু কাল বা সময় এই জড় জগতের সব কিছুকেই পরাস্ত করে। সময়ে সবকিছুই বশীভূত হয়। পশুদের মধ্যে সিংহ সবচেয়ে শক্তিশালী ও হিংস্র। পক্ষীকুলে বিষ্ণুর পাখাবিশিষ্ট বাহক গরুড় শ্রেষ্ঠ।

● **১০.৩১** সকল পবিত্রকারকে ভগবানই বায়ু; আরণ্যক অস্ত্রধারীদের মধ্যে তিনি 'পরশুরাম'; মৎস্যকুলে তিনি মকর বা 'হাঙ্গর' এবং প্রবাহিত নদে 'গঙ্গা'। সকল শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যেই তিনি।

৩২	হে অর্জুন! সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি আধ্যাত্ম বিদ্যা এবং যুক্তিবাদীদের সকল যুক্তির মধ্যে আমিই 'উপসংহারিক সত্য' বা সিদ্ধান্ত।
৩৩	সমস্ত অক্ষরের মধ্যে আমি অ-কার এবং সমাস সমুহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব-সমাস। আমিই অনন্ত মহাকাল এবং আমি সর্বদ্রষ্টা কর্মফল দাতা।
৩৪	আমি সর্বহরণকারী মৃত্যু; ভবিষ্যতে উদ্ভব এবং নারীদের মধ্যে কীর্তি, সৌন্দর্য্য, সুমিষ্ট বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৈর্য্য ও ক্ষমা।
৩৫	সামবেদে আমি বৃহৎসাম, ছন্দবিশিষ্ট মন্ত্রে আমি গায়ত্রী, মাসসমুহের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ, ঋতুসমুহের মধ্যে বসন্ত।

● **১০.৩২** সৃষ্টির মধ্যে ভগবান হচ্ছেন আদি, মধ্য, অন্ত। সকল সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল তিনিই বিরাজমান। তিনিই সবকিছু জ্ঞাত। আর কেউ নয়।

"তিনিই আদি তিনিই অন্ত; তিনিই বহির্মূখী, তিনিই অন্তর্মূখী এবং তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।" (আল-কোরআন ৫৭:৩)

মহাবিষ্ণু জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার কাজ করেন। প্রলয় সাধন করেন শিব। ব্রহ্মা হচ্ছেন গৌন সৃষ্টিকর্তা। এই সমস্ত প্রতিনিধিরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবতার। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় অর্থাৎ আদি, মধ্য, অন্ত সর্বত্র কেবল ভগবানই বিরাজমান।

উল্লেখ্য যে, কোন শাস্ত্রে বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা এসব নাম ব্যাবহার করা হয়। আবার কোথাও জিবরাইল, আজরাইল, মিকাইল এ ধরণের নাম ব্যাবহার করা হয়। বস্তুত নাম হচ্ছে প্রতীকী। রসায়ন শাস্ত্রে কিংবা মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্র চিহ্নিতকরণে যেমন কিছু প্রতীকী নাম ব্যাবহার করা হয় বিষয়গুলি তেমন।

প্রতীকী সকল রাসায়নিক পদর্থেরও আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তেমনই সকল ক্ষেত্রে বা বিষয়ে ভাষা, সমাজ বা সংস্কৃতিভেদে এমনি ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। সবক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক নাম ব্যাবহার করা হলে মনোজগতে নাম নিয়ে জটিলতা অনেক হ্রাস পায়। তাই নামসমুহ নিয়ে বিতর্ক কিংবা পছন্দ-অপছন্দ করার খুব একটা গুরুত্ব নেই। অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দর্শন কি বলে বা কি শিক্ষা দেয় সে বিষয়টি অনুধাবন করা। যেমন বলা হয়েছে,

“তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে এমন কতগুলি নাম নিয়ে বিবাদ করতে চাও যা তোমরা নিজেরা সাব্যস্ত করেছ? তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা?” (আল-কোরআন ৭:৭১)

বিদ্যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা হচ্ছে অধিবিদ্যা বা আধ্যাত্মবিদ্যা। বস্তুত মানুষ যদি সঠিকভাবে বিষয়গুলিকে বোঝার চেষ্টা করে, তবে এটি বুঝতে পারবে যে বিদ্যার বিষয় মূলত একটাই এবং সেটি হচ্ছে সমগ্র জগতকে বোঝা বা সৃষ্টি তথা সৃষ্টির মূল উৎসকে জানা। অর্থাৎ ভগবানকে জানা। সেই বিদ্যাই আধ্যাত্ম বিদ্যা বা পারমার্থিক জ্ঞান। সকল বিদ্যাই হচ্ছে ঘুরে-ফিরে আধ্যাত্ম বিদ্যার শাখা-প্রশাখা।

জ্ঞানের বহুবিধ শাখা আছে। বস্তুত সব ভগবানের সন্ধানে রত। আধ্যাত্ম বিদ্যা হচ্ছে ভগবান সম্পর্কিত জ্ঞান। বাস্তব জগতে মানুষ যত সন্ধান-অনুসন্ধান করে, কর্মযজ্ঞ যাই করুক না কেন তার সব ভগবানকে ঘিরেই করে। ভগবানের বাইরে কিছুই নেই। আমরা একটু একটু করে তাঁকে জানার পথে অগ্রসর হই বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন পথে। সেগুলিই বিজ্ঞানের এক একটি শাখা হয়ে আবির্ভূত হয়। আধ্যাত্ম

জ্ঞানই সকল বিদ্যার মূল তাই সর্বশ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্ম বিদ্যা হচ্ছে ব্রহ্ম বা আত্মা সম্পর্কিত বিদ্যা।

যুক্তিবাদীদের সকল যুক্তির 'উপসংহারিক সত্য' অর্থাৎ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভগবানের। যেমন বলা হয়েছে,

"সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহর। তিনি সত্য বলেন এবং তিনি শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।" (আল-কোরআন ৬:৫৭)

● **১০.৩৩** সংস্কৃত বা বৈদিক সাহিত্যের প্রথম অক্ষর হচ্ছে 'অ'। অকার ছাড়া শব্দের উচ্চারণ সম্ভব হয় না। এটি দিয়ে শব্দের সূত্রপাত হয়। তাই শ্রেষ্ঠ। দন্দ্ব সমাসে উভয় পদের প্রাধান্য থাকে বিধায় সেটি শ্রেষ্ঠ।

বিনাশকারীদের মধ্যে কাল হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। কালের প্রভাবে সকলের বিনাশ হয়। কালক্রমে এক মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন বলা হয়েছে,

"মহাপ্রলয়! কি সেই মহা প্রলয়? কিভাবে তুমি জানবে যে মহাপ্রলয় কি? এমন এক দিন, যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এবং পর্বতসমুহ হবে ধূনিত তুলোর মতো।" (আল-কোরআন ১০১:১-৫)

ভগবান সর্বদ্রষ্টা, সাক্ষী। তিনি প্রত্যেকের সবকিছু জানেন। কর্মফল তিনিই দিয়ে থাকেন। যেমন বলা হয়েছে,

"হে মানবসম্প্রদায়, যে কোন কাজই তোমরা কর না কেন, আমি তোমাদের সে কাজের সাক্ষী, যখন তোমরা সে কাজে লিপ্ত হও।" (আল-কোরআন ১০:৬১)

"প্রতিটি প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে এবং পুনরুত্থান দিবসে তোমরা যা অর্জন করেছ তার পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা হবে।" (আল-কোরআন ৩:১৮৫)

"প্রত্যেকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে, তিনি তাদের কর্মের প্রতিফল দেবেন। তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।" (আল-কোরআন ৪৬:১৯)

● **১০.৩৪** সমস্ত হরণকারীদের মধ্যে ভগবান হচ্ছেন সর্বগ্রাসী মৃত্যু। মৃত্যুর উর্ধ্বে আর কোন হরণ নেই। তাই তিনি হরি। আবার ভবিতব্য বস্তুসমুহের মধ্যে তিনি উদ্ভব। তিনি সৃষ্টি করেন। আবার ধ্বংস ও মৃত্যুও ঘটান। যেমন বলা হয়েছে,

“তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন।” (আল-কোরআন ৪০:৬৮)

নারীদের মধ্যে ভগবানই কীর্তি, সৌন্দর্য্য, সুমিষ্ট বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৈর্য্য ও ক্ষমা। প্রথমত নারী-পুরুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্টের দিক থেকে কিছু পার্থক্য আছে। সব গুণ সবার প্রয়োজন আছে বা সবার মধ্যে থাকে। কিন্তু সৃষ্টিগত পার্থক্যের কারণে কারও মধ্যে কোন বিশেষ গুণ বেশী থাকে। উদ্ধৃত গুণসমুহের ক্ষেত্রে নারী সমৃদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ। তাই নারীদের মধ্যে তিনি এই গুণগুলির ধারক।

আবার এই গুণগুলি দ্বারা নারী অনিয়ন্ত্রিত পুরুষকেও নিয়ন্ত্রন করতে পারে। সমাজ ও সৃষ্টি রক্ষার্থে এই গুণগুলি নারীদের জন্য প্রয়োজনীয়। এই গুণগুলি নারীদের অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয় বুদ্ধি বা জ্ঞান সম্মতভাবে তার প্রয়োগও করতে জানতে হবে। সে গুরুত্বকেও তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

• **১০.৩৫** সামবেদ বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা গীত অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীতসমুহের দ্বারা সমৃদ্ধ। এই সঙ্গীতগুলির এক একটিকে বলা হয় বৃহৎ সাম। যার সুর অপূর্ব মাধুর্য্যমন্ডিত এবং মধ্যরাতে গীত হওয়ার রীতি।

সংস্কৃত ভাষায় সুসংবদ্ধ কবিতার মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। যা সুযোগ্য ব্রহ্মণেরা গেয়ে থাকেন। গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। তাই এগুলি ভগবানের প্রতীকস্বরূপ। গায়ত্রী মন্ত্র আধ্যাত্মমার্গে বিশেষভাবে উন্নত মানুষদের জন্য প্রযোজ্য। কেউ যদি এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করেন তবে তিনি ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে পারেন। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হলে জড় প্রকৃতির সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হয়। তাকে ব্রহ্মের শব্দ অবতারস্বরূপ গণ্য করা হয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন এর প্রবর্তক। বৈদিক সভ্যতায় গায়ত্রী মন্ত্র অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমস্ত মাসের মধ্যে অগ্রহায়ন মাসকে শ্রেষ্ঠ গণ্য করা হয়। কেননা ভারতবর্ষে এই সময়ে ক্ষেতের ফসল সংগ্রহ করা হয়। বসন্ত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ঋতু। সকলেই পছন্দ করে। নাতিশীতোষ্ণ ও ফুলে-ফলে সুশোভিত থাকে। এটিকে ঋতুরাজ গণ্য করা হয়। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল ভগবানের জন্য প্রযোজ্য। তাঁরই প্রতীকস্বরূপ।

৩৬	ছলনার খেলাও আমি, তেজস্বীদের তেজ। আমি বিজয়, আমি উদ্যাম, গুণবানের গুণ।

৩৭	বৃষ্ণীদের মধ্যে আমি বাসুদেব এবং পান্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়। মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং কবি তথা চিন্তাশীলদের মধ্যে শুক্রাচার্য্য।
৩৮	শাসকগণের মধ্যে আমি দন্ড; বিজয় প্রত্যাশীদের নীতি। গেপনীয়তায় মৌনতা এবং জ্ঞানবানদের জ্ঞান।
৩৯	হে অর্জুন! সমস্ত বিদ্যমানের যা কিছু বীজ তা আমি। আমি বিনা সচল-অচল যা কিছু হতে পারে তার অস্তিত্ব নেই।

● **১০.৩৬** ছলনার খেলাও আমি, অর্থাৎ ছলনা বা প্রতারণা কিংবা কোন কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ভগবানই শ্রেষ্ঠ। মানুষ এই জড় জগতে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তাই ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে নানারূপ খেলা খেলতে চায়। বলা হচ্ছে সব বৃথা। এসবের প্রয়োজন নেই। কোনদিনই এসব সফল হবে না। ভগবান যা চান তাই হবে। মানুষ এসব পরিত্যাগ করে তাঁর কাছে সমর্পন করাই হচ্ছে সবচাইতে উত্তম, জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্মত আচরণ। যেমন বলা হয়েছে,

"বস্তুত আল্লাহর কৌশল হচ্ছে সর্বোত্তম।" (আল-কোরআন ৮:৩০)

তেজস্বীদের ভেতরে যে শক্তি, তেজ বা উদ্যাম ও প্রেরণা তার উৎসও ভগবান। বস্তুত ভগবানই সব এবং তিনিই সবকিছুতে সর্বশ্রেষ্ঠ।

● **১০.৩৭** বৃষ্ণি বংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন বাসুদেব এবং পান্ডবদের মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের সন্তান। বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী মুনি বা পন্ডিত ব্যাক্তিদের মধ্যে শ্রী ব্যাসদেব হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। তিনি বেদকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কবি বা চিন্তাশীলদের তথা সূক্ষদর্শীদের মধ্যে অসুর বা দৈত্যদের কুলগুরু উশনা বা শুক্রাচার্য্য শ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন অত্যান্ত বুদ্ধিমান ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ। সকল শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যেই ভগবান।

● **১০.৩৮** রাজ্য পরিচালনা বা শাসন ব্যাবস্থাপনায় দন্ড হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা বলা যায় প্রধান হাতিয়ার। এক্ষেত্রে এটিই শ্রেষ্ঠ উপায়। যেমন বলা হয়েছে,

"অসৎ পথ অবলম্বনকারীদের জন্য আছে লৌহ নির্মিত হাতুড়ি, শিকল বা দন্ড।" (আল-কোরআন ২২:২১)

শাসকগণের প্রধান হাতিয়ারের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাও ভগবান। তিনিই সবকিছুকে নিয়মের মধ্যে ধরে রাখেন তার নিজস্ব পন্থায়।

বিজয় প্রত্যাশীদের জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নীতি বা নৈতিকতা অবলম্বন। অতএব বিজয় প্রত্যাশীদের সেই নীতিও তিনি যা তাদেরকে বিজয়ী হতে সহায়তা করে।

মৌনতা অবলম্বন করলে কিছুই প্রকাশ পায় না। তাই গোপনীয়তায় এটিই শ্রেষ্ঠ উপায়। সকল শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে ভগবান। তিনি সর্বোচ্চ। তাঁর উর্ধ্বে আর কেউ নেই, কিছু নেই। জ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তার জ্ঞান। অতএব জ্ঞানীদের মধ্যে তিনি জ্ঞান।

● **১০.৩৯** সব কিছুর কারণ আছে। সেই কারণ বা প্রকাশের বীজ স্বয়ং ভগবান। তিনি ব্যাতিত কোন কিছুর কোন সত্ত্বা বা অস্তিত্ব নেই বা হতে পারে না বা থাকতে পারে না। সব তাঁকে আশ্রয় করে আছে। তাঁর শক্তিতে টিকে আছে। ভগবান বিনা কোন কিছু বিদ্যমান থাকতে পারে না। তিনি সর্বশক্তিমান।

তার শক্তি বিনা যা আছে তাকে বলে 'মায়া' অর্থাৎ 'যা নেই'। তাই বলা হয়েছে, সমস্ত বিদ্যমানের যা কিছু বীজ তা আমি। আমি বিনা সচল-অচল যা কিছু হতে পারে তার অস্তিত্ব নেই। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে? তোমরা সেটি সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টি করি? তোমরা যে বীজ বপন কর সে বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী?" (আল-কোরআন ৫৬:৫৮-৬৪)

সবকিছুর বীজ ভগবান। তাঁর থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি। তিনিই সর্বকারণের কারণ।

৪০	হে পরন্তপ! আমার দিব্য ঐশ্বর্য্যের কোন অন্ত নেই। বিভূতি বিস্তার সম্পর্কে যা কিছু বলা হল তা সংক্ষেপে ও নিদর্শনস্বরূপ।
৪১	ঐশ্বর্য্যশীল, সুন্দরতম, মহিমান্বিত যা কিছু অস্তিত্ব আছে- তা সবই আমার শক্তিজাত বলে জানবে।
৪২	হে অর্জুন! কিন্তু এতসব বিস্তারীত জানার আবশ্যকীয়তা কি? আমি এই সমগ্র জগৎ এক অতি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে স্থিত আছি।

• **১০.৪০** ভগবানের স্বর্গীয় প্রকাশমানতার কোন অন্ত নেই। যা কিছু এখানে বলা হয়েছে তা সীমাহীন প্রাচুর্য্যতার কিছু নির্দেশক মাত্র। বস্তুত এ জগতে আমরা যা কিছু দেখি বা যতটুকু দেখি তার সবই তাঁর কোন না কোন ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। তাঁর মহত্ত্বের কোন শেষ নেই। কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। তিনি যে কোনভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা! ... তিনি সৃষ্টিকে বিকশিত করেন যেমনিভাবে তিনি চান তেমনিভাবে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ৩৫:১)

• **১০.৪১** সকল সুন্দর, ঐশ্বর্য্যশালী ও মহাসৃষ্টি উদ্ভূত হয় ভগবানের স্বর্গীয় দ্যূতির একটুখানি পরশ থেকে। সকল শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যেই তিনি বা তাঁর প্রকাশ। তাঁর নামেই তার গুণ, ঐশ্বর্য্য বা বিভূতির প্রকাশ। তাই বলা হয়েছে,

"তাঁর সকল নামই সবচাইতে সুন্দর বা শ্রেষ্ঠ!" (আল-কোরআন ১৭:১১০)

• **১০.৪২** আমাদের জ্ঞানে আমরা মহাবিশ্বের যতটকু প্রকাশিত দেখতে পাই সেটিও ভগবানের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু বিষয়গুলি অনেকে ধারণা করতে পারে না। অনেকে আবার শাস্ত্রের কথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই একই কথা যখন বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক নাম দিয়ে বলে এবং ইংরেজিতে 'ডার্ক মেটার' কিংবা ল্যাটিন কোন নাম দিয়ে বলে, তখন অনেকেই বিষয়গুলি জেনে এবং ছবি ও ভিডিও উপস্থাপনা দেখে অভিভূত হয়। বস্তুত শাস্ত্রসমুহ যে বিজ্ঞানেরও পথ-প্রদর্শক ও প্রেরণার উৎস সে কথা অনেকেই জানে না।

ভগবান বলেন, এক অতি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা আমি সমগ্র মহাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি। আমাদের ধারণার মহাবিশ্বও অতি অতি ক্ষুদ্র। সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা ভগবানের বিশালত্ব ধারণারও বাইরে। তিনি সবকিছুর সাথে আছেন, সবকিছু তাঁকে আশ্রয় করে বিদ্যমান ও সত্ত্বাযুক্ত হয়ে আছে। যেমন বলা হয়েছে,

"তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে অনুধাবন বা উপলব্ধি করতে পারেনি, যেমন যথাযথভাবে তাঁকে বোঝা উচিত; পুনরুত্থান দিবসে সমগ্র পৃথিবীটাই থাকবে তাঁর

হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমুহ তাঁর দক্ষিন হস্তে ঘুর্ণায়মান বা ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে! তিনি মহিমান্বিত!" (আল-কোরআন ৩৯:৬৭)

পরমেশ্বর ভগবান সকলকে পরিপালন করছেন। মহত্তম জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিঁপড়ে পর্যন্ত সকলের ভেতরে তিনি বিরাজ করেন। জীব ও জড় সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি! তাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই। তাই কেবল তাঁকে ব্যাতিত আর কারও আরাধনা করা উচিত নয়। যেমন বলা হয়েছে,

"শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ বা ভগবান! তিনি সত্যিকার অধিপতি! তিনি ব্যাতিত কোন উপাস্য নেই। তিনি সন্মানিত আসনের অধিপতি।" (আল-কোরআন ২৩:১১৬)

ব্রহ্মা শিবের মত শ্রেষ্ঠ দেবতারাও তাঁর এক একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কেউ যদি ভগবানকে ব্রহ্মা, শিব, দূর্গা, কালি বা দেব-দেবীদের কেউ মনে করে তবে সে ভ্রান্ত পথে আছে। পরমেশ্বর ভগবান সকল জীবসত্ত্বায় পরমাত্মারূপে প্রবিষ্ট হয়ে এই জড় জগতের সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর অংশ প্রকাশরূপে সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মার বিস্তারের মাধ্যমেও তিনি সর্বব্যাপ্ত।

কিন্তু এতসব বিস্তারীত জানার আবশ্যকীয়তা কি? এ কথার অর্থ হচ্ছে এই যে, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এতকিছু জানার খুব প্রয়োজন নেই। এ বিষয়গুলি জানলেও ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব দুর হবে না। না জানলেও হবে না। একই।

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিশ্বাস রেখে ভক্তির সাথে তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করে যাওয়া। তাঁর কাছে অর্থাৎ নিজেকে এবং নিজের ইচ্ছেকে তাঁর ইচ্ছে ও নির্দেশনার কাছে সমর্পন করা। ভবিষ্যতের জন্য সুন্দর কিছু সঞ্চয় কার।

একাদশ অধ্যায় : বিশ্বরূপ দর্শনযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ৫৫)

সারকথা : যথাযথভাবে ভগবানের মহাত্ম অনুধাবনে এলে জীব ভগবানের বিশালত্ব ও নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারে। কেবল তখনই তাঁর প্রতি স্বেচ্ছায় নত ও নম্র হয়। তাঁকে ভক্তি করে এবং ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি অন্তরে গভীর বিশ্বাস গড়ে ওঠে। নিজের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে তাঁর মুখাপেক্ষী হয়।

অধ্যায়ে পূর্বের অধ্যায়সমুহের ন্যায় ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মহাত্ম তুলে ধরা হয়েছে। ভগবানের বিশ্বরূপ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। যেখানে জগতের সবকিছু স্থিত। সেই বিশ্বরূপে সবকিছু অতি আশ্চর্য্যময়, জ্যোতির্ময়, সর্বব্যাপ্ত ও অন্তহীন!

কোন পান্ডিত্য কিংবা পূঁজা-অর্চনা করেও ভগবানের এ রূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। তাহলে কি উপায়ে তাঁর সে জগতে প্রবেশ করা যাবে? অধ্যায়ে সে বিষয়ে বলা হয়েছে।

১	অর্জুন বলেন: আমার প্রতি অনুগ্রহ করে অতি গোপন অধ্যাত্ম বিষয়ে যা তুমি বললে, তা শ্রবণ করে আমার এই মোহ ও বিভ্রম দুর হয়েছে।
২	হে পদ্মলোচন! সত্ত্বাসমুহের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান এবং তোমার অক্ষয় মহাত্ম সম্পর্কে বিস্তারীতভাবে অবগত হলাম।
৩	হে পরমেশ্বর! তোমার সম্পর্কে তুমি যা বলেছ তা ঐরূপই। হে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবসত্ত্বা! তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখতে ইচ্ছে করি।
৪	হে প্রভূ! যদি তুমি মনে কর যে আমি সেই রূপ দেখার যোগ্য; হে যোগেশ্বর! তবে তুমি আমাকে তোমার নিজের সেই অক্ষয় রূপটি দেখাও।

• **১১.১-৪** শ্রীকৃষ্ণের অতি গোপন অধ্যাত্ম আলোচনা শ্রবন করে অর্জুনের মোহ ও বিভ্রান্তি দুর হয়। তিনি জানতে পারেন যে প্রত্যেক জীবসত্ত্বার আবির্ভাব ও অন্তর্ধান ভগবান থেকে হয়। ভগবানের মহাত্ম অফুরন্ত। ভগবানই সব পরিচালনা করেন। 'আমি' 'আমরা' উপলক্ষ্য মাত্র। এভাবে জেনে অর্জুনের 'আমিত্ব'ভাব দুর হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন যথার্থই বলেছেন। ভগবান তাঁর অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ দ্বারা সমগ্র জগতকে ধারণ করে আছেন। তিনি অব্যাক্তরূপে আছেন। তিনি ব্যাক্ত রূপেও আছেন। শ্রীকৃষ্ণের সকল বাণী তিনি বিশ্বাসী অন্তরে গ্রহণ করেন। অতঃপর ভগবানের অব্যয়-অক্ষয় ঐশ্বরিক রূপ দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন-

৫	হে পার্থ! আমার নানা বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট শত-সহস্র নানাবিধ স্বর্গীয় রূপ দেখ!
৬	হে ভারত! দেখ আদিত্যদের, বসূদের, রুদ্রদের, অশ্বিনীদ্বয় ও মরুতগণকে- বিবিধ আশ্চর্য্য সব রূপ দেখ যা আগে কখনও দেখনি।
৭	এখানে আমার এই দেহে একত্রে উপস্থিত সমগ্র স্থাবর-অস্থাবর জগৎ। হে গুড়াকেশ! অন্য আরও যা কিছু তুমি দেখতে ইচ্ছে কর দেখ!
৮	তবে তুমি তোমার নিজের চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখতে সক্ষম হবে না। তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করছি। আমার ঐশ্বরিক সৃষ্টি কৌশল দেখ।
৯	সঞ্জয় বলেন: হে রাজন! এভাবে বলে মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে তাঁর পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখালেন।

• **১১.৫-৯** অর্জুনের ইচ্ছের প্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ শত-সহস্র নানা বর্ণ ও আকৃতির নানাবিধ স্বর্গীয় রূপ তাঁকে দেখতে বলেন। যেখানে আদি পুরুষ আদিত্যগণ, বসূগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীদ্বয়, মরুতগণ সকলেই আছেন। তিনি অর্জুনকে অতি আশ্চর্য্য সব রূপ দেখতে বলেন যা অর্জুন আগে কখনও দেখেননি। মনে যা ইচ্ছে করে তাও দেখে নিতে বলেন। এমনকি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ পর্যন্ত। এই দেহে স্থাবর-অস্থাবর সবকিছু বিদ্যমান। ভগবানের দেহাভ্যন্তরে সমগ্র জগৎ একত্রে উপস্থিত।

ভগবানের সেই রূপ অর্জুনের চর্মচক্ষু বা বর্তমান দৃষ্টিশক্তি দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দান করেন। অতঃপর অর্জুনকে তাঁর ঐশ্বর্য্যময় অকল্পনীয় রূপ দেখতে বলেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন, এভাবে বলে মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে তাঁর পরম রূপের ঐশ্বর্য্য দর্শন করান।

এসব ধারণা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানকেও মহাজাগতিক বিষয়ে ধারণা নিতে অনুপ্রাণীত করেছে এবং একই সাথে পথও দেখিয়েছে। মহাবিশ্বে-মহাকাশে মানুষের জন্য আছে

নানান সম্ভাবনা। সেসব বার্তা পূর্ব থেকেই দেয়া আছে। দিব্যদৃষ্টিতে সেসব যে দেখা সম্ভব তেমন আশার কথাও বলা হয়েছে। মানুষকে উপায় সন্ধান করতে বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডলে তোমাদের জন্য আছে জীবনোপকরণ এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের শপথ! এটি সত্য, যেমন সত্য এই যে তোমরা কথা বলছ।" (আল-কোরআন ৫১:২০-২৩)

১০	সেই বিশ্বরূপ অজস্র মুখ ও চক্ষুবিশিষ্ট, অনেক অদ্ভূত দর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট, অজস্র স্বর্গীয় অলংকার ও দিব্য অস্ত্রসমুহ, দিব্য মাল্য ও বস্ত্রশোভিত এবং দিব্য সৌরভে অনুলিপ্ত ছিল। সবকিছুই ছিল আশ্চর্য্যময়, জ্যোতির্ময়, অন্তহীন ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত! [১০-১১]
১২	যদি আকাশে একসাথে সহস্র সহস্র সূর্য্য উদিত হয় তবে সেই জ্যোতির্ময়তা হয়তবা সেই রূপের সাথে তুলনীয় হতে পারে।
১৩	এ সময়ে অর্জুন পরমেশ্বরের দেহে অনেক ভাগে বিভক্ত সমগ্র জগতকে একসঙ্গে দেখতে পেলেন।

● **১১.১০-১৩** অর্জুন যা দেখেছিলেন তা অবর্ণনীয়। তবুও ভাষার মাধ্যমে যতটুকু প্রকাশ করা যায় সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাই বর্ণনা করেন।

ভগবানের দেহে অর্জুন সহস্র সহস্র গ্রহলোক দেখতে পেলেন। সেই রূপ অজস্র মুখাবয়ব, অজস্র চক্ষু, অনেক অদ্ভূত দর্শনীয় বস্তু, অজস্র স্বর্গীয় অলংকার ও দিব্য অস্ত্রসমুহ, দিব্য মাল্য ও বস্ত্র দ্বারা শোভিত এবং দিব্য সৌরভে অনুলিপ্ত ছিল। সবকিছুই ছিল আশ্চর্য্যময়, অন্তহীন জ্যোতির্ময় ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত!

যদি আকাশে একসাথে সহস্র সহস্র সূর্য্য উদিত হয় তবে সেই জ্যোতির্ময়তা হয়তবা সেই রূপের সাথে কিছুটা তুলনীয় হতে পারে। এ সময়ে অর্জুন পরমেশ্বরের দেহে অনেক ভাগে বিভক্ত সমগ্র জগতসমুহকে একসঙ্গে উপস্থিত দেখতে পান। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও পৃথিবী একত্রিত ছিল অতঃপর আমি তাদেরকে পৃথক করেছি।" (আল-কোরআন ২১:৩০)

"আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে নভোমন্ডল সৃষ্টি করেছি এবং আমি এটিকে করেছি মহা-সম্প্রসারণশীল এবং ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি; প্রসারণকারী কতই না অনুগ্রহশীল!" (আল-কোরআন ৫১:৪৭-৪৮)

বৈদিক শাস্ত্র মতে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সম্বলিত অনন্ত ব্রহ্মান্ড আছে। কোনটি মাটি দিয়ে তৈরী, কোনটি সোনা দিয়ে তৈরী, কোনটি মণি-মাণিক্য দিয়ে তৈরী, কোনটি বিশাল, কোনটি ক্ষুদ্র কিংবা মাঝারি। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং এমন এক উদ্যান প্রাপ্তির প্রত্যাশায় পরস্পর ছুটে চল, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য।" (আল-কোরআন ৫৭:২১)

"নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য ভূ-মন্ডলে আছে সবকিছু এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও কি তোমরা দেখতে পাও না? নভোমন্ডলে তোমাদের জন্য আছে জীবনোপকরণ এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের শপথ! এটি সত্য, যেমন সত্য এই যে তোমরা কথা বলছ।" (আল-কোরআন ৫১:২০-২৩)

পাঠক, ভগবানের বিশ্বরূপের আলোচনা বুঝতে হলে নিজ দেহের আলোকেও বিষয়গুলিকে অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। যেমন বাইবেলে বলা হয়েছে যে, গড মানব সৃষ্টি করেন নিজ প্রতিচ্ছবির আদলে। বিশ্বরূপে যা দর্শন হয় তার প্রতিরূপ এ দেহেও উপস্থিত। তাই নিজেকে দিয়ে ভগবানকে আবার ভগবানকে দিয়ে নিজেকে জানার বা বোঝার চেষ্টা করতে হয়। অর্থাৎ বাহিরকে দেখে ভেতর এবং ভেতরকে দেখে বাহিরকে জানার চেষ্টা করতে হবে। বিষয়গুলিকে তিন স্তরে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীকেও তিনি সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এদের মাঝে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয় ধীরে যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম ...।" (আল-কোরআন ৬৫:১২)

প্রসঙ্গক্রমে কিছু অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করে রাখি। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস কিংবা অন্য যে কোন ক্ষুদ্র বা এককোষী প্রাণীসমুহের দেহেও কিন্তু প্রাণ আছে। এরা এতই ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যায়। যেমন অণুবীক্ষন যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়।

মানবদেহের তুলনায় একটি ভাইরাস কত ক্ষুদ্র! কিংবা একটি ভাইরাসের তুলনায় মানবদেহ কতগুণ বড়! সেই ভাইরাস মানবের দেহেও বাসা বাঁধে। সে যে প্রকৃতিতে বসবাস করে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। কোটি কোটি কোষ ব্রহ্মান্ডের মতো ছড়িয়ে আছে সেখানে। প্রতিটি কোষ কঠিন আবরণ বা মেমব্রেন দ্বারা সুরক্ষিত। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন দুঃসাধ্য প্রায়। অথচ সেই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া এক কোষ থেকে অন্য কোষে সফলভাবে গমন করে। আমাদের জ্ঞানে দ্রুত বা মাত্র কয়েকদিনেই তার বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু তার জ্ঞানে হয়তবা সহস্র দিবস। সে যেখানে বাসা বাঁধে সেটি কারও হাতের অংশ হতে পারে, পায়ের অংশ হতে পারে ইত্যাদি। মানবের পূর্ণাঙ্গ দেহ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান আছে কিনা জানা নেই। সে যে দেহে বাসা বাঁধে সে দেহ বা প্রকৃতি তার জীবনোপকরণ সরবরাহকারী।

আমরা যেখানে বা যে প্রকৃতিতে বসবাস করি সেটিও এক দেহাভ্যান্তর। কিন্তু সে সম্পর্কে আমাদের পূর্ণাঙ্গ কোন ধারণা নেই। এত বিশাল! কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র সেখানে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন দুঃসাধ্য প্রায়। কোটি কোটি আলোকবর্ষ দুরে। মেমব্রেন বা মহাকর্ষ শক্তি ভেদ করে যেতে হয়। একটি ভাইরাস কি আমাদের একটি কোষ থেকে আরেকটি কোষে যেতে তেমন সমস্যায় পরে না? মহাবিশ্বের তুলনায় কত ক্ষুদ্র এ পৃথিবী। পৃথিবীর তুলনায় কত ক্ষুদ্র একজন মানুষ!

যে ভাইরাসটি জীবের একটি কোষে প্রবেশ করে সমগ্র দেহের বিচারে সে কোষটি কত ক্ষুদ্র! খালি চোখে দেখা যায় না। সেখানে ভাইরাস আরও কত ক্ষুদ্র! সেখানে কোটি কোটি ভাইরাস নতুনভাবে উৎপন্ন হয়। সেখানে সে সংসার ধর্ম গড়ে তোলে। তার তুলনায় দেহ কত বড়! মহাবিশ্ব আমাদের কাছে যেমন। কে আমাদের প্রতিপালন করছেন?

১৪	অতঃপর অর্জুন বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে মস্তক অবনত করে করজোড়ে পরমেশ্বরকে প্রণাম করেন এবং বলেন-
১৫	হে দেব! তোমার দেহে সমস্ত দেবতাদেরকে দেখেছি। স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত কিছু দেখেছি। পদ্মাসনে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে দেখেছি। মহর্ষিগণ ও স্বর্গীয় সর্পসমুহকে দেখেছি।

১৬	হে জগদীশ্বর! আমি তোমার বিশ্বরূপে অজস্র বাহু, উদর, মুখ ও চক্ষু দেখেছি। সর্বত্র তোমার অনন্ত রূপ দেখেছি এবং তোমার কোন আদি, মধ্য ও অন্ত দেখতে পাচ্ছি না, হে বিশ্বরূপ!
১৭	মুকুটসজ্জিত, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিময়, তেজরশ্মি যা চোখে দেখার মত নয়, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় অপরিমেয় প্রভাবিশিষ্ট তোমাকে সর্বদিকে দেখেছি।

- **১১.১৪-১৭** বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হন। গভীর শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে করজোড়ে ভগবানকে প্রণাম করেন এবং ওপরের কথাগুলি বলেন। যেমন বলা হয়েছে,

"মুসা বলল, 'হে আমার প্রভূ! আমাকে দর্শন দাও!' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। তবে পর্বতের দিকে দৃষ্টি দাও, যদি সেটি স্ব-স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তবেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।'

অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পর্বতে তাঁর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটি বিধ্বস্ত হল এবং মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল তখন বলল, 'হে প্রভূ! পবিত্র তোমার সত্ত্বা! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে এলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।" (আল-কোরআন ৭:১৪৩)

অর্জুন এক স্থানে বসে ব্রহ্মান্ডের সবকিছু দর্শন করেন। বিশ্বরূপে তিনি অজস্র বাহু, উদর, মুখ ও চক্ষু দেখতে পান। সর্বত্র তাঁর রূপ অনন্ত। যার কোন আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। দেব দেহে তিনি সমস্ত দেবতাদেরকে দেখতে পান। সর্বদিকে দীপ্তিময় তেজরশ্মি যা চোখে দেখার মতো ছিল না। সব প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় অপরিমেয় প্রভাবিশিষ্ট ছিল। যেমন বলা হয়েছে,

"যা দেখেছে সে বিষয়ে রাসূলের অন্তর অসত্য বলছে না। তোমরা কি তার সঙ্গে সে বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? নিশ্চয়ই! সে তাকে আরও একবার দেখেছিল। সপ্ত আসমানের সর্বশেষ সীমানায় বটবৃক্ষের (সিদরাতুল মুন্তাহার) ধারে (যে সীমানা কেউ অতিক্রম করতে পারে না), যার নিকটবর্তী বসবাসের স্বর্গীয় উদ্যান; যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। দৃষ্টি

এদিক-ওদিক সরেনি কিংবা লক্ষ্যচ্যূতও হয়নি। নিশ্চয়ই! সে তার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনাবলী দেখেছিল।" (আল-কোরআন ৫৩:১১-১৮)

অর্জুন বলেন,

১৮	তুমিই অক্ষর; একমাত্র জানার বিষয়। তুমিই এই মহাবিশ্বের পরম আশ্রয়; তুমি অব্যয়-অক্ষয়; তুমি শাশ্বত ধর্মের তথা সত্য ও ন্যায়ের রক্ষক; তুমিই সনাতন জীবসত্ত্বা- এই আমার মত।
১৯	আদি, মধ্য ও অন্তহীন তুমি; অনন্ত বীর্যশালী ও অন্তহীন বাহুবিশিষ্ট। চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় তোমার চক্ষুসমুহ। তোমাকে দেখেছি প্রজ্জলিত অগ্নিতূল্য মুখবিশিষ্ট। স্বীয় তেজ দ্বারা তুমি সমগ্র মহাবিশ্বকে উষ্ণ রেখেছ।
২০	তুমি এক। তুমিই স্বর্গ-মর্ত্য ও এর মধ্যবর্তী সর্বত্র এবং সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ। হে মহান! তোমার এই অদ্ভূত ভয়ংকর উগ্র রূপ দেখে ত্রিভূবন হতবিহ্বল-বিচলিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়!
২১	ঐ সমস্ত দেবতারা তোমাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে করজোড়ে তোমার মহিমা বর্ণনা করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ শান্তির বাণী ও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে তোমার স্তুতির দ্বারা স্তব করছেন।
২২	রুদ্র ও আদিত্যগণ, বসুগণ এবং সাধ্যনামক দেবতাগণ, বিশ্ব দেবগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয় ও মরুতগণ, পিতৃ-পুরুষগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে তোমাকে দর্শন করছে।
২৩	হে মহাবাহো! তোমার অজস্র মুখ, চক্ষু; অজস্র বাহু, ঊরু, পা; অজস্র উদর এবং ভয়ংকর অজস্র দন্ত দর্শন করে গ্রহলোকসমুহ বিচলিত-হতচকিত ও ভীত এবং আমিও।
২৪	হে বিষ্ণু! তোমার আকাশ স্পর্শী জ্বলন্ত বহু বর্ণবিশিষ্ট বিস্ফোরিত মুখমন্ডল, উজ্জল বিশাল চক্ষু দর্শন করে অন্তরাত্মা আমার ব্যাথিত-বিচলিত। আমি ধৈর্য্য ও প্রশান্তি ধরে রাখতে পারছি না।
২৫	তোমার ভয়াবহ দন্ত ও প্রলয় অগ্নিসম জলন্ত মুখ সকল দেখে আমার দিকভ্রম

	হচ্ছে এবং আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। হে, দেবতাদের দেবতা! হে, ধরিত্রীর আশ্রয়! তুমি প্রসন্ন হও।

• **১১.১৮-২৫** ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন বিস্ময়াভিভূত হন। আবেগে আপ্লুত হয়ে স্বীকার করে বলেন যে, তুমি অক্ষর-অবিনাশী; পরম লক্ষ্য তুমি; তুমিই মহাবিশ্বের পরম আশ্রয়, অব্যয়-অক্ষয়, শাশ্বত ধর্মের তথা সত্য ও ন্যায়ের রক্ষক তুমি, নিত্য জীবসত্ত্বা তুমি। এই আমার মত।

সর্বত্র তোমার অনন্ত রূপ দেখেছি। না অন্ত, না মধ্য না এর কোন আদি আছে। তেজঃদীপ্ত, সর্বত্র প্রভাবিশিষ্ট তোমাকে দেখেছি। স্বীয় তেজ দ্বারা তুমি সমগ্র মহাবিশ্বকে উষ্ণ করে রেখেছ।

চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় তোমার চক্ষুসমুহ। তোমাকে দেখেছি প্রজ্জলিত অগ্নিতূল্য মুখবিশিষ্ট। দেবতা ও সিদ্ধ পুরুষগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে করজোড়ে তোমার মহিমা বর্ণনা করছেন। শান্তির বাণী ও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে তোমার স্তুতির দ্বারা স্তব করছেন। যেমন বলা হয়েছে,

"প্রায়শই আকাশ ওপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। ফেরেশতাগণ তখন তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশ করে এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (আল-কোরআন ৪২:৫)

উল্লেখ্য যে, শাস্ত্রে দ্বাদশ আদিত্য (১২), অষ্ট বসু (৮), একাদশ রুদ্র (১১), এবং ইন্দ্র (১) ও প্রজাপতি (১) এই মোট তেত্রিশ (৩৩) দেবতার উল্লেখ আছে।

ভগবানের ভয়ংকর অদ্ভূত রূপ দেখে ত্রিভূবন হতবিহ্বল! তেমনি অর্জুনও ভীত। এ রূপ দেখে তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। মনে ধৈর্য্য ও প্রশান্তি ধরে রাখতে পারছেন না। করজোড়ে মিনতি করে বলেন, তুমি প্রসন্ন হও!

অর্জুন বলেন,

২৬	সমস্ত নৃপতিগণ সহ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ দলবদ্ধভাবে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধাগণও তোমার ভয়ানক করাল দন্তবিশিষ্ট মুখসমুহের মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করছে। কারও কারও মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে এবং দন্ত মাঝে লেগে থাকতে দেখা যাচ্ছে। [২৬-২৭]

২৮	নদীসমুহের বহু জলপ্রবাহ যেমন সমুদ্র অভিমুখে প্রবেশ করে, তেমনই নরলোকের এই বীরযোদ্ধাগণ তোমার জ্বলন্ত মুখগহ্বরে প্রবেশ করছে।
২৯	পতঙ্গ যেমন মরণ নেশায় দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, ঠিক তেমন নেশায় এই সকল লোকেরা দ্রুতবেগে তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করছে।
৩০	হে বিষ্ণু! তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখসমুহের দ্বারা চতুর্দিকে লোকসমুহকে লেহন করে গ্রাস করছ এবং তোমার দীপ্তিসমুহের শক্তিশালী তেজ্বরশ্মি দ্বারা আবৃত করে সমগ্র জগতকে সন্তপ্ত করছ।
৩১	হে উগ্ররূপ! বল কে তুমি? তোমাকে প্রণাম করি। হে দেবতাদের দেবতা! তুমি প্রসন্ন হও! হে আদি জীবন্ত সত্ত্বা! তোমাকে জানতে ইচ্ছে করি। যেহেতু তোমার প্রবৃত্তি তথা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিষয়ে জানি না।

• **১১.২৬-৩১** অর্জুন দেখতে পান কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত সমস্ত নৃপতিগণ এবং উভয় পক্ষের প্রধান যোদ্ধাগণ ভগবানের ভয়ানক করাল দন্তবিশিষ্ট মুখগহ্বরে দ্রুতবেগে প্রবেশ করছে। কারও কারও মস্তক ইতিমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে দন্ত মাঝে লেগে আছে। নদীর জলপ্রবাহ যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমনই নরলোকের বীরযোদ্ধারা ভগবানের জ্বলন্ত মুখগহ্বরে দ্রুতবেগে প্রবেশ করছে।

পতঙ্গ যেমন মরণ নেশায় দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমন নেশায় সকল লোকেরা দ্রুতবেগে মুখবিবরে প্রবেশ করছে। জ্বলন্ত মুখসমুহের দ্বারা ভগবান চতুর্দিকের লোকসমুহকে লেহন করে গ্রাস করছেন এবং শক্তিশালী তেজ্বরশ্মি দ্বারা সমগ্র জগতকে সন্তপ্ত করছেন।

প্রসঙ্গক্রমে অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলে রাখি। এভাবেই জীবসমুহের মুখগহ্বরেও খাদ্যবস্তু প্রবেশ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। অতঃপর এক একটি কণা দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়। যেতে পথে সেখানেও জীবেরা আনন্দ-বেদনায় সময় বা জীবন অতিবাহিত করে। এক সময় দ্রুতবেগে অগ্নিতে প্রবেশ করে। সেখানে প্রক্রিয়াজাত হলে কৃষ্ণগহ্বর প্রয়োজনীয় সবকিছু শুষে নেয়। নির্যাস পৌঁছে যায় বিভিন্ন লোকে। দেহ নামক সমগ্র জগত সন্তপ্ত হয়। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও কি তোমরা দেখতে পাও না?" (আল-কোরআন ৫১:২০-২১)

ভগবানের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন হতবিহ্বল। বলেন, হে উগ্রমূর্তী! কে তুমি? আমাকে বল। কি তোমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩২	সময় বা কাল আমি; ধরিত্রীর সংহারক; লোকসমুহকে সংহার করতে এখানে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমাকে ছাড়াও এখানে উপস্থিত বিপক্ষদলের যোদ্ধাগণের কেউই থাকবে না।
৩৩	অতএব, তুমি উঠে দাড়াও! যশ লাভ কর! শত্রুকে জয় করে সমৃদ্ধশালী রাজ্য ভোগ কর। আমার দ্বারা এরা পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচী! তুমি কেবলই উপলক্ষ্য মাত্র।
৩৪	দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অপরাপর বীর যোদ্ধাগণকেও আমি হত করে রেখেছি! তুমি কেবল বধ কর! ব্যাথিত বা বিচলিত হয়ো না। যুদ্ধে শত্রুদেরকে জয় করবে! যুদ্ধ কর!

• **১১.৩২-৩৪** ভগবান বলেন, কাল আমি; সময় আমি; আমি ধরিত্রীর সংহারক। লোকসমুহকে সংহার করতে এখানে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমাকে ছাড়াও এখানে উপস্থিত বিপক্ষদলের যোদ্ধাগণের কেউই জীবিত থাকবে না। সকলকেই সংহার করা হবে।

ভগবান হচ্ছেন কাল বা সময়। সময়ের হাতেই সবকিছু। সময়ের সাথে সবকিছুই তাঁর পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। প্রত্যেকেই তার প্রাপ্য বুঝে পায়। সময় সবকিছুকে গ্রাস করে, বিনাশ করে এবং সমাধানও করে। অর্জুন যুদ্ধ না করলেও যে কোনভাবে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেরই বিনাশ হবে। এমনকি এ জগতও বিনাশ হয়ে যাবে। কোন কিছুকেই কেউ রক্ষা করতে পারবে না সময়ের হাত থেকে। প্রকৃতির নিয়মকে তিনি সেভাবেই সাঁজিয়ে রেখেছেন। সবকিছু তাঁরই ইচ্ছে ও পরিকল্পনায় সম্পন্ন হয়। এখান থেকে সে বিষয়ে ইংগীত পাওয়া যায়। বলা হচ্ছে,

"যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তিনি তোমাদের ছাড়াই অন্যায়কারীদের শাস্তি দিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করতে চান।" (আল-কোরআন ৪৭:৪)

"তোমরা যদি নিজেদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই নিজেদের অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসত।" (আল-কোরআন ৩:১৫৪)

"তিনি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং বিশ্ব জগতের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে আল্লাহর কাছে।" (আল-কোরআন ৬:২)

ভগবান অর্জুনকে দৃঢ়চিত্তে উঠে দাড়াতে বলেন। বলেন, জগতের যশ লাভ কর। শত্রুকে জয় কর। সমৃদ্ধশালী রাজ্য ভোগ কর। আমার দ্বারা পূর্বেই এরা সকলে নিহত হয়েছে। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অপরাপর বীর যোদ্ধাগণকেও আমি হত করে রেখেছি! তুমি কেবল বধ কর!

উল্লেখ্য যে, রাজ্যসভায় সর্বসম্মুখে পঞ্চ পান্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদির বস্ত্রহরণ করা হয়েছিল। এতবড় পাপ ও অন্যায় সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও ভীস্ম, দ্রোণাচার্যের মতো গুরুজনেরা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। দুর্যোধন থেকে সামান্য অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির কারণে তারা নিজেদের সত্ত্বাকে বিকিয়ে দিয়ে মেরুদন্ডহীন হয়ে পড়েছিলেন।

দুর্যোধনের অন্যায় আচরণের পক্ষাবলম্বনকারীরাও একই ভূল ও অন্যায়ের দোষে দোষী। শ্রীকৃষ্ণ সে বার্তা তাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এসেছেন। তাদের মনোবলকে ভেঙ্গে চূরমার করে ধ্বংস করে দিয়ে এসেছেন। অথচ মনোবলই যুদ্ধ জয়ের অন্যতম হাতিয়ার। তারা এখন মৃত। তাদেরকে তিনি পূর্বেই হত করে রেখে এসেছেন। যুদ্ধজয় তাদের দ্বারা আর সম্ভব নয়। যুদ্ধে তারা ইতিমধ্যেই পরাস্ত হয়েছে। এবার তাদের কেবল নিহত হওয়ার পালা।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, তুমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। যা করার আমি করে এসেছি। সকল বীর যোদ্ধাগণ আমার দ্বারা ইতিমধ্যেই হত হয়েছে। তুমি কেবল যুদ্ধ কর। তাদেরকে বধ কর। যুদ্ধ জয় তোমারই।

যুদ্ধের ফলাফল যা হওয়ার তা নির্ধারণ হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ সেটি বুঝতে পেরেছেন। ভগবান প্রজ্ঞাময়! তিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ জানেন। তাই তিনি এভাবে বলেন। যেমন বলা হয়েছে,

"স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে এবং তিনি এই বলে উত্তর দেন যে, আমি তোমাদের সাহায্য করব হাজার ফেরেশতা দ্বারা যারা একের পর এক আগমন করবে। বস্তুত আল্লাহ তো এর মাধ্যমে কেবল শুভ সংবাদ দান করেন যেন তোমাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। বিজয় তো আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ মহাশক্তিধর, প্রজ্ঞাময়!" (আল-কোরআন ৮:৯-১০)

ভগবানের পরিকল্পনাতে সবকিছু পরিচালিত হয়। বিজয় আসে অন্তরে অধিষ্ঠিত ভগবানের পক্ষ থেকে। তিনি প্রজ্ঞাময়। ভগবানে সমর্পন করে যিনি তাঁর ইচ্ছে ও পরিকল্পনায় কর্ম করেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান। জগতের সৃষ্টি ও বিনাশের সকল কাজ ভগবানের নিখুঁত পরিকল্পনায় সম্পন্ন হয়। সৃষ্ট জীবের প্রকৃতপক্ষে এ জগতে কাজ কি?

জীবের কাজ হচ্ছে ভগবানের সহায়ক হয়ে কাজ করা। সৃষ্টি পরিচালনায় তিনি যেভাবে চান সেভাবে তাতে অংশ নেয়া। যিনি ভগবানের ইচ্ছায় কাজ করেন এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন এরই পুরস্কার ভগবান দিয়ে থাকেন। বস্তুত জীবের সেটিই করণীয়। জীবাত্মারা এর মাধ্যমে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে,

"লড়াই কর আল্লাহর পথে তথা সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে অর্থাৎ আল্লাহর কারণে।" (আল-কোরআন ২:১৯০)

৩৫	সঞ্জয় বলেন: কেশবের এসব বাণী শ্রবণ করে অর্জুন কর জোড়ে কম্পিত কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে ভীত ভীত চিত্তে প্রণাম করে পুনরায় বলেন-
৩৬	হে ঋষিকেশ! তোমার নামের-গুণের মহাত্ম বর্ণনা করে এ ধরিত্রী হৃষ্ট হয় এবং অনুরক্ত হয়। রাক্ষসগণ তথা অসৎ পথ অবলম্বকারীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে এবং সমস্ত সিদ্ধ পুরুষগণ তথা সঠিক পথ অবলম্বনকারীরা তোমাকে সন্মান প্রদর্শন করে। এ সবই যথাযথ অবস্থানে আছে।

৩৭	হে মহান! হে অসীম! হে দেবতাগণের দেবতা! হে জগতের আশ্রয়! তুমি ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও আদি। কেন তোমাকে সবাই সন্মান প্রদর্শন করবে না? নিত্য-অনিত্যের উর্ধ্বে শ্রেষ্ঠ যে অ-ক্ষর তথা পরব্রহ্ম তাও তুমি।
৩৮	হে অনন্তরূপ! তুমি দেবতাগণের আদি; আদি জীবসত্ত্বা। তুমিই এ জগতের শেষ আশ্রয়। তুমি জান্তা এবং জানার বিষয়ও তুমি। তুমি এই বিশ্বব্যাপি অবস্থান কর!
৩৯	তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, জল, চন্দ্র। প্রজাপতি (পিতামহ ব্রহ্মা) এবং প্র-পিতামহ (ব্রহ্মারও জনক)। তোমাকে সহস্রবার প্রণাম করি। পুনরায় নমস্কার করি। আবারও তোমাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।
৪০	তোমাকে সম্মুখ দিক থেকে প্রণাম করি। তোমাকে পশ্চাৎ দিক থেকে প্রণাম করি। হে সর্বস্ব! তোমাকে সর্বদিক থেকে নমস্কার করি। হে অনন্ত বীর্য! অসীম বিক্রমশালী! তুমি সমগ্র জগত ব্যাপিয়া পরিব্যাপ্ত আছ। অতএব তুমিই সব!
৪১	তোমার প্রকৃত মহিমা না জেনে বন্ধু ভেবে অজ্ঞতাবশত কিংবা ভালবেসে 'হে কৃষ্ণ' 'হে যাদব' 'হে সখা' যা কিছু বলেছি; বিশ্রাম কিংবা শয়নকালে, আহারে উপবেশন কালে- একা কিংবা কারও সমক্ষে পরিহাস ছলে যা কিছু অসন্মান করা হয়েছে, হে অচ্যুত! তুমি আমাকে তার সবকিছু ক্ষমা করে দাও। [৪১-৪২]
৪৩	হে অতূল্য প্রভাবসম্পন্ন! তুমি এই বিশ্ব চরাচরের পিতৃতূল্য, পূঁজনীয়, গুরু, গুরুগণেরও শ্রেষ্ঠ। ত্রিভূবনেও তোমার সমকক্ষ কেউ নেই। তাহলে তোমার চেয়ে অধিক অন্য কোথায়?
৪৪	অতএব আমি অবনত দেহে প্রণামপূর্বক দন্ডবৎ তোমার কৃপা প্রার্থনা করছি। পুত্রের প্রতি পিতা যেমন, বন্ধুর প্রতি বন্ধু যেমন, প্রিয়ার প্রতি প্রিয় যেমন- হে দেব! তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর।
৪৫	হে দেব! তোমার অদৃষ্টপূর্ব এই রূপ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি, আবার ভয়েও চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে। হে দেবতাগণের দেবতা! হে জগতের আশ্রয়!

	আমাকে তোমার পূর্বের রূপই প্রদর্শন কর। তুমি প্রসন্ন হও!
৪৬	আমি তোমাকে পূর্বের সেই মুকুট পরিহিত, গদাধারী, চক্রহস্ত রূপে দেখতে ইচ্ছে করি। হে সহস্র বাহুধারী! বিশ্বমূর্তীতে তুমি সেই চতুর্ভূজ মূর্তীতেই আবির্ভূত হও!

• **১১.৩৫-৪৬** ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন বিস্ময়াভিভূত হন। প্রণাম করতে করতে ভীত কণ্ঠে বলেন, হে ভগবান তোমার নামের গুণ-কীর্তন দ্বারাই এ ধরিত্রী হৃষ্ট হচ্ছে। সকলে তোমার অনুরক্ত হচ্ছে। অসৎ পথ অবলম্বকারীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দিগ্বিদিক পলায়ন করছে এবং সঠিক পথ অবলম্বনকারীরা তোমাকে যথাযথ সন্মান প্রদর্শন করছে। এ সবই যথাযথভাবে হচ্ছে।

অর্জুন বলেন, কেন তোমাকে সবাই সন্মান প্রদর্শন করবে না? তুমি তো এমনকি ব্রহ্মা অপেক্ষাও আদি। সকলের কর্তা। দেবতাদেরও দেবতা। জগতের আশ্রয়! তুমিই অ-ক্ষর। কার্য-কারণের অতীত বা উর্ধ্বে তুমি।

তুমিই ভগবান। আদি, শাশ্বত জীবসত্ত্বা। তুমিই জগতের পরম আশ্রয়। তুমি জান্তা এবং জানার বিষয়ও তুমি। তোমার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত এই সমগ্র মহাবিশ্ব!

এ জগতে তুমিই সব! তুমিই বায়ু, তুমিই যম; তুমিই অগ্নি, তুমিই জল; চন্দ্র তুমি, প্রজাপতি ব্রহ্মাও তুমি এবং তুমিই প্র-পিতামহ। তোমার সমকক্ষ কেউ নেই।

তোমার প্রকৃত মহিমা না জেনে বন্ধু ভেবে অজ্ঞতাবশত কিংবা ভালবেসে 'হে কৃষ্ণ' 'হে যাদব' 'হে সখা' ইতিপূর্বে এভাবে যা কিছু বলেছি, কিংবা পরিহাস ছলে যা কিছু অসন্মান করেছি ক্ষমা করে দাও।

তোমার অদৃষ্টপূর্ব এই বিশ্বরূপ দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। একই সঙ্গে আমার মন ভয়ে বিচলিত হয়েছে। তুমি প্রসন্ন হও এবং আমাকে তোমার পূর্বের দেব রূপ প্রদর্শন কর।

তোমাকে আমি পূর্বের ন্যায় মুকুট পরিহিত, গদাধারী, চক্র হস্তে তথা চতুর্ভূজ বা চারবাহু বা হস্তবিশিষ্ট রূপে দেখতে ইচ্ছে করি। অর্জুন ভগবানকে ভয়ংকর বিশ্বরূপের পরিবর্তে চতুর্ভূজ রূপে দর্শনের ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য যে, ভগবানের বিশ্বরূপ এ জগতের মতোই জড় ও অনিত্য। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে তাঁর যে দিব্য রূপ তা হচ্ছে চতর্ভূজ নারায়ণ রূপ।

আকাশে অসংখ্য গ্রহ অছে। প্রতিটি গ্রহে ভগবান ভিন্ন ভিন্ন নামে বিরাজ করেন। অর্জুন ভগবানের কাছে তাঁর বৈকুন্ঠলোকের একটি রূপ দেখতে চান।

প্রত্যেকটি বৈকুন্ঠলোকে ভগবানের নারায়ন রূপ চতর্ভূজ। অর্থাৎ চার বাহু বা হাত বিশিষ্ট। তাঁর সেই চার হাতে বিভিন্নভাবে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই প্রতীকী চিহ্নগুলি ধারণ করেন। এই চারটি প্রতীক কোন হাতে কিভাবে তিনি ধারণ করেন সে অনুসারে নারায়ন ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন। এগুলি সবই ভগবানের অভিন্ন রূপ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪৭	হে অর্জুন! আমি প্রসন্ন হয়ে স্বীয় সৃষ্টি কৌশলে তোমাকে এই তেজময়, আদি-অন্তহীন পরম বিশ্বরূপ দেখালাম যে রূপ তুমি ভিন্ন অন্য কেউ পূর্বে কখনও দেখেনি।
৪৮	হে কুরুশ্রেষ্ঠ! না বেদ অধ্যায়ন করে, না যজ্ঞ অনুশীলন করে, না দান করে এবং না কোন পূণ্য কর্মের দ্বারা, না কোন কঠোর তপস্যার দ্বারা মনুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন আর কেউ এ রূপ দেখেছে।
৪৯	আমার এই প্রকার ভয়ংকর রূপ দর্শন করে তুমি ব্যাথিত ও বিমর্ষ হয়ো না। ভয়মুক্ত হয়ে প্রসন্নচিত্তে পুনরায় তুমি আমার সেই পূর্ব রূপ দর্শন কর।

• **১১.৪৭-৪৯** অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অত্যান্ত প্রিয়ভাজন। তাই তিনি তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে তাঁর আদি-অন্তহীন সমগ্র জগতব্যাপী তেজদীপ্ত বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছেন। যে রূপ অর্জুন ভিন্ন পূর্বে কেউ কখনও দেখেনি।

অর্জুন ভগবানের যে অভাবনীয় রূপ দেখেছেন তা না বৈদিক জ্ঞান লাভ করে, না কোন যজ্ঞ অনুশীলনের দ্বারা, না দান করে, না পূণ্য কর্মের দ্বারা, না কঠোর তপস্যার দ্বারা দেখা সম্ভব। কেবল ভগবান নিজে যদি কারও প্রতি প্রসন্ন হয়ে তা দেখাতে চান তবেই সেটি দেখা সম্ভব। তিনি কেবল তাঁর ভক্তকে এই রূপ প্রদর্শন করেন।

ভগবানের ভয়ংকর বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন বিচলিত হন। তিনি তাঁকে চার বাহুবিশিষ্ট সৌম্য মুর্তিতে বা চতুর্ভূজ রূপে দেখতে ইচ্ছে করেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে

বলেন, সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে প্রসন্নচিত্তে তুমি যা দেখতে চেয়েছ সেই রূপ দর্শন কর। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন,

৫০	বাসুদেব অর্জুনকে এভাবে বলে স্বীয় রূপ দেখালেন। মহাত্মা পুনরায় প্রসন্ন মূর্তী ধারণ করে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করেন।
৫১	অর্জুন বলেন: হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য-সুন্দর মনুষ্য রূপ দেখে এবার আমি স্থিরচিত্ত ও প্রকৃতস্থ হলাম।

• **১১.৫০-৫১** সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন, অতঃপর বাসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর সেই রূপ প্রদর্শন করেন যা তিনি দেখতে চেয়েছেন। সৌম্যমূর্তী ধারণ করে বিচলিত অর্জুনকে তিনি আশ্বস্ত করেন। সৌম্য-সুন্দর মনুষ্য রূপ দর্শন করে অর্জুন স্বাভাবিক ও স্থিরচিত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৫২	আমার এই অতি দুর্লভ যে রূপ তুমি দেখেছ দেবতারাও সর্বদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্খী।
৫৩	তুমি আমার যে রূপ দেখেছ তা না বেদ, না তপস্যা, না দান, না যজ্ঞ দ্বারা কেউ দেখতে পারে।
৫৪	হে পরন্তপ! হে অর্জুন! শুধুমাত্র অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই আমি যেরূপ তত্ত্বত তা একজন জানতে, দেখতে ও আমার জগতে প্রবেশ করতে পারে।
৫৫	হে পান্ডুপুত্র! যে আমাতে সমর্পন করে কর্ম করে, যে আমামুখী হয়, যে একান্ত আমারই ভক্ত ও আসক্তি রহিত এবং সর্বজীবে শত্রুভাব রহিত- সে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

• **১১.৫২-৫৫** অর্জুন ভগবানের যে রূপ দর্শন করেছেন দেবতারাও ভগবানের সে দুর্লভ রূপের দর্শনাকাঙ্খী। কিন্তু কেবল অর্জুনের সে রূপ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। কেননা ভগবান নিজে তাঁকে সে রূপ দেখিয়েছিলেন।

ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা সহজ বিষয় নয় যদি না ভগবান স্বয়ং কাউকে কৃপা করেন। এমনকি বেদপাঠ, তপস্যা, দান-দক্ষিণা, পূঁজা-অর্চনা নানা প্রকার চেষ্টা-সাধনা করেও সে রূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। এগুলি সে পথ নয় যা দ্বারা ভগবান যা

তা একজন দেখতে পাবে, কিংবা তাঁর জগতে প্রবেশ করতে পারবে। কেবলমাত্র অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই ভগবানকে একজন তত্ত্বত জানতে, বুঝতে ও দর্শন করতে পারে। অতঃপর তাঁর জগতে প্রবেশ করতে পারে।

ভগবানকে পেতে হলে তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পন করতে হবে। সকল কর্ম তাঁরই কারণে করতে হবে। তাঁর ইচ্ছে ও নির্দেশনায় চলতে হবে। ভক্তিপ্রবন হয়ে তাঁরই ভাবনায় নিমগ্ন থেকে জীবনে চলতে হবে। যারা একান্তই তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত এবং সে কারণে জগতের সকল বিষয় আসক্তি বা আকর্ষনকে পরিত্যাগ করতে পেরেছেন ও সর্বজীবে বৈরীভাব রহিত হতে পেরেছেন- তেমন ভক্তই ভগবানকে লাভ করেন।

দ্বাদশ অধ্যায় : ভক্তিযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ২০)

সারকথা : জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জড় জগতের যন্ত্রনাময় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম সুখ ও অপার আনন্দের জীবন লাভ করা এবং ভগবানই হচ্ছেন ধর্ম প্রদর্শিত সেই পরম সুখের স্থান। তিনিই লক্ষ্য। তাই ভগবানকে পাওয়ার সাধনা করতে হবে।

ভগবানকে পেতে হলে জন্ম-মৃত্যুর সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। ভগবানের প্রিয়ভাজন হয়ে কিভাবে তাঁকে পাওয়া যাবে অধ্যায়ে সে কথা বলা হয়েছে। অতএব সন্ন্যাস নয় কর্মের মধ্য দিয়েই ভগবানের প্রিয়ভাজন হয়ে তাঁকে পওয়ার সাধনা করতে হবে। সে পথই এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে।

১	অর্জুন বলেন: এভাবে সতত চিত্ত অর্পন করে যেসব ভক্ত তোমার উপাসনা করে এবং যারা ব্রহ্মরূপ অব্যাক্ত অ-ক্ষরের উপাসনা করে তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সাধক?

• **১২.১** পূর্ব অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে না বেদ অধ্যায়ন করে, না কঠোর তপস্যা করে, না দান-দক্ষিণা করে, না পূঁজা-অর্চনা করে ভগবান যা তা একজন জানতে পারে। শুধুমাত্র অনন্য ভক্তির মাধ্যমে সেটি অর্জন করা সম্ভব। যে তাঁকে অনন্য ভক্তি সহকারে সর্বদা স্মরণ করে তেমন ভক্তই ভগবানের তাত্ত্বিক জগতে প্রবেশ করতে পারেন। তাই বলা হয়েছে,

"... অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।" (আল-কোরআন ২৯:৪৫)

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাই জানতে চান যে কি প্রকারে ভগবানে মনোনিবেশ করা উত্তম। দু'টি উপায় আছে। একটি হল তাঁর সবিশেষ বা ব্যাক্তিক রূপের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর ধ্যান, আরাধনা বা উপাসনা করা এবং অপরটি হল কোন রূপের আরাধনা না করে তাঁর ইন্দ্রিয়াতীত অব্যাক্ত ও নৈর্ব্যাক্তিক বা নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানমগ্ন হয়ে আরাধনা করা যাকে অ-ক্ষর বলা হয়।

সবিশেষবাদীরা ভগবানের কোন একটি রূপকে কল্পনায় রেখে তাঁর আরাধনা করেন। নির্বিশেষবাদীরা যেহেতু কোন রূপকে কল্পনা করে বা মাধ্যম ধরে আরাধনা

করেন না, ফলে বলা যায় তারা নিজের ওপর বা নিজ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে তাঁর উপাসনা করেন। অর্জুন জানতে চাইছেন সগুণ ঈশ্বর উপাসক ও নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে? কোনটি উত্তম বা যথাযথ পন্থা। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২	সতত আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করে শ্রদ্ধা সহকারে যারা আমার উপাসনা করে আমার মতে তারাই শ্রেষ্ঠ সাধক।
৩	কিন্তু যারা সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে, সমস্ত জীবের কল্যাণে রত হয়ে, ইন্দ্রিয়সমুহকে সংযত করে, অব্যাক্ত, অনির্দিষ্ট, সর্বব্যাপী, অচিন্তনীয়, ধ্রুব, অক্ষর বা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করে তারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। [৩-৪]
৫	কিন্তু অব্যাক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত সাধকদের ক্লেশ অধিকতর হয়। কেননা অব্যাক্ত বিষয়ে নিষ্ঠা লাভ করা দেহধারীদের জন্য কষ্টকর হয়।

• **১২.২** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সর্বদা ভগবানের সাথে চিত্তযুক্ত হয়ে, অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিবিষ্ট মনে যে ভগবানের কোন সবিশেষ রূপ বা মূর্তীর উপাসনা করে সে শ্রেষ্ঠ সাধক। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ বা ব্যাক্তিক রূপের উপাসনাকে উত্তম বলছেন।

• **১২.৩-৪** অতঃপর পরবর্তী শ্লোকেই তিনি আবার বলছেন যে, যারা সকল ইন্দ্রিয় সংযত করে, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে, সমস্ত জীবের কল্যাণে রত হয়ে- ভগবানের অব্যাক্ত বা ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত যা সবকিছুকে অধিভূক্ত করে রেখেছে তথা সর্বব্যাপী, অচিন্তনীয় অর্থাৎ যাকে ধারণা বা কল্পনা করা যায় না, ধ্রুব বা নিশ্চল বা অপরিবর্তনীয় তথা অক্ষয়-অক্ষর ভগবানের নৈর্ব্যাক্তিক বা নিরাকার রূপের বা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তারা ভগবানকে প্রাপ্ত হন।

যারা ভগবানের সবিশেষ রূপের আরাধনা করেন না তারা নির্বিশেষ রূপের আরাধনা করার মধ্য দিয়ে পরোক্ষে সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করেন। তারাও পরিশেষে ভগবানকে প্রাপ্ত হন। এখানে সে কথাই বলা হয়েছে।

কেউ যদি ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে চায় তবে তাকে ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে, সকলের প্রতি সেবা পরায়ণ হতে হবে, সমস্ত প্রাণীর কল্যাণে ব্রত হতে হবে। যখন উপলব্ধি করা যায় যে একই পরমাত্মা সর্বত্র সবার মাঝে বিরাজ করেন তখন

কারও প্রতি হিংসাভাব থাকে না। উচু-নিচু, মানুষে-পশুতে ভেদাভেদ থাকে না। সর্বত্র একই আত্মা বিরাজমান এমন অনুভূতি জাগে। বাইরের আবরণটিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না। তখনই মানুষ সকলের প্রতি সেবা পরায়ণ ও সমস্ত প্রাণীর কল্যাণে ব্রত হতে পারে।

যে সমস্ত আধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের নির্বিশেষ তত্ত্ব জানতে প্রয়াসী তাদেরকে নির্বিশেষবাদী বা জ্ঞানযোগী বলা হয়। আর যারা ভক্তির সাথে ভগবানের সবিশেষ রূপের সেবা করেন তাদেরকে বলা হয় সবিশেষবাদী বা ভক্তিযোগী। তবে সবিশেষ ও নির্বিশেষ সকল ক্ষেত্রের জন্যই জ্ঞান ও ভক্তি এ দু'টোরই প্রয়োজন আছে।

- **১২.৫** সাধারণ মানুষদের জন্য ভগবানের সবিশেষ কোন একটি রূপকে কল্পনায় রেখে তাঁর আরাধনা করতে সুবিধা হয়। তারা সেই রূপে প্রথমে ভক্তি করতে শেখে। তারপর মনোজগতে সেই রূপকে কল্পনা করে উপাসনা করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১টি কাঠি + ১টি কাঠি = ২টি কাঠি। এভাবে বাস্তবে কাঠি উপস্থাপন করে ১+১ = ২ হয় বিষয়টি বোঝাতে সহজ হয়। জ্ঞান অর্জনের প্রাথমিক স্তরে এভাবে শেখান হয়। কিন্তু বাস্তবে কোন বস্তুকে উপস্থাপন না করে ১+১ = ২ এভাবেও শেখান যায়। উত্তর বা একই লক্ষ্য অর্জন হবে।

পার্থক্য হচ্ছে এক নিয়মে কাঠি উপস্থাপন করা হচ্ছে। অপর নিয়মে কোন বস্তু উপস্থাপন না করে কল্পনায় বিষয়টি অনুধাবন করে কর্ম সম্পাদন করা হচ্ছে। যারা জ্ঞানের একটু উচ্চস্তরে উন্নীত হতে পেরেছেন তাদেরকে বোঝাবার জন্য বাস্তবে কোন বস্তু উপস্থাপনের প্রয়োজন হয় না। তারা মনোজগতে কল্পনায় বিষয়গুলিকে সমাধান করে নেন। তবে প্রাথমিক স্তরে বা যাদের সেভাবে অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় তাদের জন্য সবিশেষ রূপের আরাধনা করা সহজবোধ্য হয়। বিষয়টি এক পর্যায়ে মানসিক অভ্যস্ততায়েও পরিণত হয়ে যায়। সেখান থেকে সরে আসা মনোজগতেও কঠিন বোধ হয়। তখন আর সেটি পরিত্যাগ করা যায় না।

যারা নির্বিশেষ রূপে অভ্যস্ত তাদের জন্য কিন্তু সেটি কঠিন কিছু নয়। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে অব্যাক্তের উপাসনা করা কিছুটা দুরূহ হয়। কেননা দেহধারীদের জন্য নির্বিশেষ কিছু উপলব্ধি করা বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা দুস্কর বোধ হতে পারে। সেক্ষেত্রেও মনের মধ্যে কে কি কল্পনা করে বা ভেবে বসে

আছে সেটিও বোঝা সম্ভব না। অবশ্য প্রথম থেকে নির্বিশেষে অভ্যস্ত হলে সেটিও একসময় সহজ হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৬	হে পার্থ! যারা সকল কর্ম আমাতে সমর্পন করে, অনন্যচিত্তে ভক্তিপরায়ন হয়ে আমাতে ধ্যানস্থ হয়ে উপাসনা করে- আমাতে আবিষ্টচিত্ত তাদেরকে আমি মৃত্যুময় এই সংসারসমুদ্র থেকে অচিরেই উদ্ধার করি। [৬-৭]
৮	আমাতে মন স্থাপন কর এবং বুদ্ধিমত্তাকে আমাতে নিবিষ্ট কর। দেহান্তরে নিঃসংশয়ে আমাতেই বসবাস করবে।
৯	আর যদি চিত্ত আমাতে স্থির করতে না পার তবে, হে ধনঞ্জয়! অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে পাওয়ার চেষ্টা কর।
১০	যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার প্রতি কর্মপরায়ণ হও। আমার কারণে কর্ম করেও সিদ্ধি লাভ করবে।
১১	যদি তাও করতে অপারগ হও, তবে আমাতে কর্ম অর্পনরূপ যোগের আশ্রয় নিয়ে সংযতচিত্তে সকল কর্মের ফল প্রাপ্তির বাসনা ত্যাগ কর।
১২	অভ্যাস থেকে জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান শ্রেয়। ধ্যান থেকে কর্মের ফল প্রাপ্তির বাসনা পরিত্যাগ করা উত্তম। কেননা ত্যাগ থেকে শান্তি লাভ হয়।

• **১২.৬-৭** পরমেশ্বর ভগবান যাদেরকে ভালবাসেন তিনি নিজেই তাদেরকে সকল প্রকারের বিপদ ও যাতনা থেকে উদ্ধার করেন। কাদেরকে তিনি ভালবাসেন? তিনি ভালবাসেন তাঁর ভক্তদের। কারা তাঁর ভক্ত?

সত্যিকার ভক্ত তিনি যিন তাঁকে বিশ্বাস করেন। তাঁর ওপর ভরসা রাখেন। ভরসা রাখেন বিধায় কোন কর্মকে তিনি তার নিজের মনে করেন না। নিজের ভেবে বা নিজের জন্য কর্মও করেন না। সকল কর্ম ভগবানে সমর্পন করেন। সকল কর্ম ভগবানে সমর্পন করার মানে কি? অর্থাৎ তিনি যে কাজ করেন তিনি মনে করেন জীবন দিয়েছেন যিনি কর্ম তাঁরই জন্য। তিনি তাঁর জন্য তাঁর মনে করে সকল কর্ম করেন। নিজে সে কাজের ফল ভোগের অধিকারী তিনি তেমনও মনে করতে পারেন না। তাই কর্মের ফলও ভগবানের বিচারের ওপর ছেড়ে দেন। তিনি কেবল আপন

মনে নিজের কর্তব্যকর্ম পালন করেন। তেমন মানসিক উচ্চতায় তার ভাবনা কাজ করে। সমর্পনের ওপর আর কোন ধর্ম নেই। সমর্পন চরম ভক্তি ও ভরসারই প্রকাশ। বলা হচ্ছে,

"তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য, অতএব তাঁর প্রতি সমর্পন কর।" (আল-কোরআন ২২:৩৪)

"আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর ওপর ভরসা করে।" (আল-কোরআন ৩:১৫৯)

সত্যিকার ভক্ত সর্বদা অন্তরে ভগবানকে স্মরণ করেন। মুহূর্তের জন্যও ভূলে যান না। সকল কাজের মাঝেও তাঁরই ধ্যানমগ্ন থাকেন। তাই নিবিষ্টচিত্ত হয়ে তাঁরই উপাসনা করেন। শুদ্ধ ভক্তের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে তিনি স্থান-কাল কোন কিছুই বিবেচনা না করে অবিচলিতভাবে সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করেন। তেমনি ভগবানও তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে এক মুহূর্তের জন্যও ভূলে যান না। এই অনন্য ভক্তির কারনে ভগবান তাদের কাছে সুলভ হন। বলা হচ্ছে,

"তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হয়ে যাও।" (আল-কোরআন ৭৩:৮)

".. আমার উপাসনা কর এবং আমার স্মরণার্থে উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর।" (আল-কোরআন ২০:১৪)

ভগবান সকলের প্রতি করুণাময়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত থাকেন। এই প্রকার ভক্তকে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। এই ধরণের ভক্তকে তিনি পর্যাপ্ত জ্ঞান দান করেন। যেন তিনি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে তাঁর ধামে প্রবেশ করতে পারেন। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে ইচ্ছে করেন, তিনি তার জন্য তাঁর প্রতি সমর্পনের পথ প্রশস্ত করে দেন। ... আর এটিই তোমার পালনকর্তার সরল পথ। ... তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে শান্তির আবাস।" (আল-কোরআন ৬:১২৫-১২৭)

তিনি তাদেরকে জন্ম-মৃত্যু নামক এই সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেন। জন্ম-মৃত্যু থেকে কেবল তিনিই রক্ষা বা উদ্ধার করতে পারেন। বলা হচ্ছে,

"তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যাতিত তোমাদের জন্য না কোন রক্ষাকর্তা, না কোন সাহায্যকারী আছে।" (আল-কোরআন ৯:১১৬)

ভগবানের গুণে জীবাত্মাও গুণান্বিত। মানুষ তাই নিজেকে দিয়েও ভগবানকে চিনতে, জানতে ও বুঝতে পারে। মানুষের প্রকৃতিও এমন যে কেউ যদি অতি নিষ্ঠুর কিংবা হিংস্র প্রকৃতির মানুষও হয়, তথাপি তাঁকে যদি কেউ সত্য অন্তরে ভক্তি করে তবে তার প্রতি তার অন্তর নরম হয়ে যায়। তাকে সে অন্তর থেকে সাদরে গ্রহণ করে নেয় বা নিতে পারে। ভক্তির মহাত্ম অপরিসীম! ভক্তের জন্য ভগবান সব করতে পারেন। যাকে তিনি উদ্ধার করতে চান তাদের উদ্দেশ্যে এভাবে বলা হয়েছে,

"যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে অতঃপর সঠিক কাজ করে আল্লাহ তাদের মন্দ কাজকে ভাল কাজে রূপান্তর করে দেবেন।" (আল-কোরআন ২৫:৭০)

ধর্মানুশীলনের যত মার্গ আছে তার সবকিছুর ফল কেবল এই ভক্তির মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। এটিই হচ্ছে ভক্তির অনন্য বিশেষত্ব। ভক্তিযোগ সহজ-সরল এবং শুদ্ধ।

• **১২.৮** দেহান্তরকালে যে যে ভাব স্মরণ করে বা যে যে ভাবে অবস্থান করে সে সে ভাব প্রাপ্ত হয়। তাই মন-প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তাকে সর্বদা ভগবানে স্থির রাখতে বলা হয়েছে। অন্তরে সর্বদা তাঁকে স্মরণ করতে বলা হচ্ছে। সকল কর্মের মাঝেও তাঁরই ধ্যানস্ত থাকতে বলা হচ্ছে। সর্বদা তাঁর চিন্তা হৃদয়ে থাকলে দেহান্তর কালেও তাঁরই ভাবনা বিরাজ করবে এবং সে ভাব প্রাপ্ত হয়ে তাঁরই মাঝে বসবাস করার সুযোগ লাভ হবে।

সত্যি বলতে যিনি সর্বদা ভগবানে ধ্যানমগ্ন থাকেন ইহজগতেও তিনি তাঁর মাঝেই প্রশান্তিতে বসবাস করেন। তেমন একজনের হৃদয় জড়-জাগতিক স্তরে অবস্থান করে না।

• **১২.৯** ভগবানকে পেতে হলে তাঁর প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হতে বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি একবারে সেটি করতে না পারে, তবে ধাপে ধাপে তেমন পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কতগুলি সুন্দর উপায়ের কথা বলা হয়েছে।

স্থিরচিত্তে ভগবানে মনোনিবেশ করার জন্য ধীরে ধীরে সে অভ্যাস গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ চিত্তকে বিষয়-বাসনা থেকে প্রত্যাহার করে পুনঃ পুনঃ ভগবানের ভাবনায় বা ধ্যানে স্থাপন করতে হবে। তাই অভ্যাস যোগে কথাটি বলা হয়েছে। সময় নিয়ে বিষয়টিকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। যা যা করলে মনে ভগবানের প্রতি ভক্তির উদয় হয় সেসবের অনুশীলন করতে হবে।

● **১২.১০** যদি কেউ ওপরে উদ্ধৃত নিয়মে অভ্যাস গড়ে তুলতে না পারে তবে তাদেরকে ভগবানের জন্য কর্ম করতে বলা হয়েছে। ভগবানের ভাবনায় কর্ম করেও তাঁর প্রতি মনোনিবেশের অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হবে। তাই ভগবানের প্রতি কর্তব্যপরায়ন হয়ে সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করতে হবে।

● **১২.১১** যদি কেউ সেটিও করতে অপারগ হয় তবে বলা হচ্ছে যে, সকল কর্ম ভগবানে সমর্পন করে সংযতচিত্তে কর্মের ফল প্রাপ্তির বাসনা ত্যাগ কর। তাহলেও লক্ষ্য অর্জন হবে। এটিই নিষ্কামকর্ম। বস্তুত লোভ বা কোনকিছু প্রাপ্তির বাসনাই মানুষকে জগতের প্রতি অধিক আকর্ষন করে। সে কারণে মানুষ কর্ম করে। এগুলি পারমার্থিক ভাবনা থেকে মানুষকে দুরে সরিয়ে রাখে।

অতএব কর্মের ফল ত্যাগ করে ভগবানে সমর্পিত হয়ে যে কর্ম করে, সে ভগবানের প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভক্তির কারণেই এতবড় ত্যাগ করতে পারে। তাই কেবল এ একটি কাজ করতে পারলে তার ভেতরে ভগবানের ভাবনার উদয় হবে।

● **১২.১২** অভ্যাসের দ্বারা চিত্ত নিরোধ করে মন-প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তাকে ভগবানে নিবিষ্ট করা যেতে পারে। কিন্তু সেটি না বুঝে কিংবা যথাযথ জ্ঞান ছাড়াও গড়ে উঠতে পারে। তাতে কল্পনাপ্রসূত ভক্তি গড়ে উঠলেও ভগবানকে সত্যিকারভাবে জানা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই বলা হচ্ছে অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান শ্রেয়। জ্ঞানের চর্চ্চার মাধ্যমে ভগবানকে জেনে তবেই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উত্তম। যথাযথ জ্ঞানের কারণে সেক্ষেত্রে অভ্যাসও গড়ে উঠতে পারে।

আবার অপরের লব্ধ জ্ঞান অর্জন করে ভগবানের প্রীতি অর্জন করা অপেক্ষা নিজের উপলব্ধিবোধ থেকে বিষয়গুলি জেনে-বুঝে করা উত্তম। তাই বলা হচ্ছে কারও অর্জিত জ্ঞান লব্ধ করা অপেক্ষা ধ্যান উত্তম। ধ্যান থেকেও জ্ঞান অর্জন হয় এবং সেটি হয় নিজের বোধ থেকে। সেটিই হচ্ছে বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা।

তবে ধ্যানরত থাকাকালীন অবস্থায় চিত্ত সমাহিত হলেও ধ্যান ভঙ্গে ফলাসক্তির সৃষ্টি হতে পারে। তাই বলা হচ্ছে, ধ্যান থেকেও উত্তম হচ্ছে কর্মফল প্রাপ্তির বাসনা পরিত্যাগ করা।

এ জগতে মানুষ কর্ম করে তার নিজের কোন না কোন বাসনা পুরণার্থে। কর্ম থেকে যে ফল বেরিয়ে আসে সেটি তার বাসনা পুরণ করে। সে ফল যদি ত্যাগ করা হয় তবে তার আর রইল কি? অর্থাৎ সে সবকিছু ত্যাগ করে দিল। কিন্তু এতবড় ত্যাগ সে কি কারণে বা কিভাবে করে? সে তা করে ভগবানের কারণে।

ভগবানের কারণে যে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, বস্তুত সে ভগবানে সর্বোচ্চ ভক্তি প্রদর্শনকারী। অতএব এই স্তরে যে উপনীত হতে পারে সে সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে। ত্যাগ থেকে শান্তি লাভ হয়। কেননা জাগতিক বিষয়-চিন্তাই মানুষকে উপদ্রব করে। বিষয়চিন্তা থাকলে অভ্যাস, জ্ঞান কিংবা ধ্যান কোন কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হয় না। বিষয় আসক্তি ও ফল ত্যাগেই প্রকৃত শান্তি লাভ হয়। সেক্ষেত্রে কোন পিছুটান থাকে। জীবন হয় মুক্ত ও স্বাধীন।

কর্মফল ত্যাগ করতে করতে সেটিও অভ্যাসে পরিণত হলে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের ইচ্ছে জাগে। জ্ঞান লাভ হলে বিষয়গুলি অনুধাবনের জন্য নিজের ভেতরে ভাবনা আসে বা নিজে ধ্যান করে। এভাবেও ক্রমোন্নতি হয়। তবে যে একবারে নিজে থেকে ভক্তিতে মনোনিবেশ করতে পারে সেটি শ্রেষ্ঠ উপায়। তাতে সময়েরও অপচয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৩	সকল জীবের প্রতি দ্বেষবর্জিত, বন্ধু-ভাবাপন্ন ও কৃপাবিশিষ্ট, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহঙ্কার বা মিথ্যে অহম থেকে মুক্ত; সুখে-দুঃখে যে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সন্তুষ্টচিত্ত, যোগেযুক্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ় সংকল্পযুক্ত এবং মন-প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তা যার আমাতে অর্পিত- তেমন ভক্তই আমার প্রিয়। [১৩-১৪]
১৫	যার কারণে কেউ উদ্বেগে বা বিপত্তিতে পতিত হয় না এবং যে নিজেও উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না; হর্ষ, ক্রোধ, ভয়-উদ্বেগ থেকে যে মুক্ত- সেও আমার প্রিয়।
১৬	নিস্পৃহ, পবিত্র, দক্ষ-নিপুণ, উদাসীন-নিরপেক্ষ, মানসিক দুঃখবোধ শূন্য,

	সর্ববিধ উদ্যাম পরিত্যাগকারী আমার যে ভক্ত সে আমার প্রিয়।
১৭	কোন কিছুতেই যে অতি উচ্ছসিত হয় না, আবার দ্বেষও পোষন করে না; যে শোকে মূহ্যমান হয়ে যায় না, আবার কোন কিছুতে অতি আকাঙ্খাও পোষন করে না; শুভ-অশুভ, পাপ-পূণ্যত্যাগী ভক্তিযুক্ত তেমন ভক্তই আমার প্রিয়।
১৮	শত্রু-মিত্র ও মান-অপমানে যে সমভাবাপন্ন; শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখে যে সমভাবাপন্ন, সর্ববিষয়ে আসক্তিরহিত; নিন্দা-স্তুতিতে যে একই প্রকার, সংযত বাক; যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তিতেই যে তুষ্ট; গৃহ আসক্তি শূন্য ও স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন- ভক্তিযুক্ত তেমন মানুষই আমার প্রিয়। [১৮-১৯]
২০	অমৃতরূপ উক্ত ধর্মের বাণীতে সশ্রদ্ধ ও আমামুখী হয়ে যারা উপাসনা বা কর্ম সম্পাদন করে তেমন ভক্ত আমার অতীব প্রিয়।

• **১২.১৩-২০** সকল জীবের প্রতি দ্বেষবর্জিত, বন্ধু-ভাবাপন্ন, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহঙ্কার বা মিথ্যে অহম থেকে মুক্ত; সুখে-দুঃখে যে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সন্তুষ্টচিত্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ় সংকল্পযুক্ত এবং মন-প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তা যার পরমেশ্বরে অর্পিত- তেমন ভক্তই ভগবানের প্রিয়।

যার কারণে কেউ উদ্বেগে বা বিপত্তিতে পতিত হয় না এবং যে নিজেও উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না; হর্ষ, ক্রোধ, ভয়-উদ্বেগ থেকে যে মুক্ত- সে ভগবানের প্রিয়।

নিরপেক্ষ, পবিত্র, দক্ষ-নিপুণ, উদাসীন ও উদ্বেগশূন্য, সকল কর্ম প্রচেষ্টার ফলভোগের বাসনাত্যাগী ভগবানের যে ভক্ত সে তাঁর প্রিয়।

কোন কিছুতেই যে অতি উচ্ছসিত হয় না, আবার দ্বেষও পোষন করে না; যে শোকে মূহ্যমান হয়ে যায় না, আবার কোন কিছুতে অতি আকাঙ্খাও পোষন করে না; শুভ-অশুভ সবই যে পরিত্যাগ করতে জানে- ভক্তিযুক্ত তেমন ভক্তই ভগবানের প্রিয়।

শত্রু-মিত্র, মান-অপমানে যে সমভাবাপন্ন; শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখে যে সমভাবাপন্ন, কু-সঙ্গ বর্জিত; নিন্দা-স্তুতিতে যে একই প্রকার, সংযত বাক; যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তিতেই যে তুষ্ট; গৃহ আসক্তি শূন্য ও স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন- ভক্তিযুক্ত তেমন মানুষই ভগবানের প্রিয়।

অমৃতস্বরূপ ধর্মের উক্ত বাণীসমুহ অনুসরণ করে শ্রদ্ধাবান হয়ে যারা যথাযথভাবে ভগবানের উপাসনা করে বা কর্ম করে তেমন ভক্ত ভগবানের অতীব প্রিয়। এসব গুণ ব্যাতিত কখনই শুদ্ধ হওয়া যায় না। তবে সত্যিকার ভক্তকে এসব গুণ চেষ্টা করে অর্জন করতে হয় না। ভগবানের ভক্তের ভেতর যে জ্ঞান প্রবেশ করে তা তাকে এসব সদগুণে আপনা থেকে ভূষিত করে। তাই বলা হয়েছে,

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ভাল কাজ করে তারাই উদ্যানের অধিবাসী হওয়ার প্রকৃত অধিকারী; তারা সেখানেই বসবাস করবে।" (আল-কোরআন ২:৮২)

পরম লক্ষ্য অবগত হয়ে ভগবানকে পাওয়ার জন্য যখন ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তখন সেটিই হচ্ছে 'ভক্তিযোগ'।

ত্রয়োদশ অধ্যায় : ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ

(শ্লোক সংখ্যা ৩৫)

সারকথা : জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জড় জগতের যন্ত্রনাময় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং বন্ধন মুক্ত হয়ে পরম সুখ ও অপার আনন্দের জীবন লাভ করা। ভগবানই হচ্ছেন সেই লক্ষ্য বা ধর্মীয় সেই প্রাপ্তব্য পরম সুখের স্থান। তাই ভগবানকেই পাওয়ার সাধনা করতে হবে।

ভগবানকে পেতে হলে জন্ম-মৃত্যুর সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য যিনি জানেন জড় প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থাটি তিনি জানেন। তারাই পরম গতি লাভ করেন। পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে জড় বন্ধনে আবদ্ধ হন না। এটিই মুক্তি। অতএব শোকে মুহ্যমান হয়ে কর্ম ত্যাগ না করে যথাযথ জ্ঞানে কর্ম করে বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জ্ঞানে মুক্তির উপায় নিহিত আছে। এ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে অধ্যায়ে সে কথা বলা হয়েছে।

১	অর্জুন বলেন: হে কেশব! আমি প্রকৃতি ও পুরুষ; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ে জানতে চাই।
২	শ্রীকৃষ্ণ বলেন: হে কৌন্তেয়! এ দেহই হচ্ছে ক্ষেত্র। এভাবেই অভিহিত হয়ে থাকে। যিনি এ দেহকে জানেন তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়।
৩	হে ভারত! আমাকে সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলে জানবে এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে জানাই হচ্ছে জ্ঞান। এটাই আমার অভিমত।

● **১৩.১** অর্জুন প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, পুরুষ শব্দটি এখানে স্ত্রী-পুরুষ বা লিঙ্গাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। পুরুষ শব্দটি দ্বারা এখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জীবসত্ত্বাকে বোঝান হয়েছে।

● **১৩.২** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, দেহই হচ্ছে ক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্র। ক্ষেত্র হচ্ছে জড় প্রকৃতি। জড় প্রকৃতির নিজস্ব কোন চেতনা নেই। কিন্তু দেহকে যিনি জানবেন তাঁকে অবশ্যই

চেতনাসম্পন্ন হতে হবে। দেহকে যিনি জানেন তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। জীব বা পুরুষই হচ্ছে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। অতএব জীবের সত্ত্বা বা আত্মাই হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ। আত্মা হচ্ছে জীবের প্রকৃত স্বরূপ। আত্মাই 'আমি' বা 'নিজ' এর প্রতিনিধিত্ব করে। আত্মা জীবন্ত ও চেতনাসম্পন্ন। জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞের সান্নিধ্য লাভে জড় প্রকৃতিতে চৈতন্যের উদয় হয়।

সাংখ্যের এই প্রকৃতি ও পুরুষই হচ্ছে উপনিষদের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। গীতায় প্রকৃতি-পুরুষ এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞকে যথাক্রমে অপরা ও পরা প্রকৃতি বলে অভিহিত করা হয়েছে। ক্ষেত্র হচ্ছে জড় প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছে জীব প্রকৃতি।

জীবের দেহ ও আত্মা এক নয়। দু'টি পৃথক বিষয়। দেহ হচ্ছে জড় প্রকৃতি। যার কোন চেতনা বা বোধ নেই। কিন্তু আত্মা হচ্ছে জীবন্ত ও চেতনাসম্পন্ন।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে দু'টি ধাপে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে ভগবানের বিশ্বরূপ দেহ বা ক্ষেত্র। ভগবানের বিশ্বরূপ দেহস্থিত এই ক্ষেত্রে আমাদের বসবাস। এটিই হচ্ছে আমাদের জড় জাগতিক প্রকৃতি। অপরটি হচ্ছে প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের দেহ বা ক্ষেত্র। সেটিও জড় প্রকৃতি।

একইভাবে দুই প্রকারের ক্ষেত্রজ্ঞ আছে। একটি হচ্ছে প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের আত্মা বা জীবাত্মা। যাকে জড় দেহের প্রকৃত মালিক বা প্রভূ বলা হয়। অপরটি হচ্ছে ভগবানের বিশ্বরূপ দেহের আত্মা যাকে পরমাত্মা বলা হয়।

এটিও বুঝতে হবে যে পরমাত্মা ভিন্ন স্বতন্ত্র জীবের কোন অস্তিত্ব বা আশ্রয় নেই। প্রতিটি জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার সংযোগ রয়েছে। সংযোগ ছুটে গেলে স্বতন্ত্র জীব প্রাণহীন-নির্জীব জড় পদার্থ ব্যাতিত আর কিছুই না। পরমাত্মাই জীবনের একমাত্র বা মূল উৎস। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ! ... তিনিই জীবন্ত! চিরঞ্জীব! শাশ্বত বা সনাতন!" (আল-কোরআন ২:২৫৫)

• **১৩.৩** জীবাত্মা স্ব স্ব দেহ বা ক্ষেত্রকে জানে। সেটিকেও পরিপূর্ণভাবে জানে না। উপরন্তু ভগবান সম্পর্কে অল্পই জানে। কিন্তু পরমাত্মা বা ভগবান জানেন সব। তিনি পরিপূর্ণ বিশ্বরূপ দেহ বা ক্ষেত্রকে জানেন এবং তার মধ্যে স্থিত সকল ক্ষেত্র ও

ক্ষেত্রজ্ঞকে জানেন। অতএব পরম পুরুষোত্তম বা সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা ভগবান হচ্ছেন পরম ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে তিনি তার সব জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। অন্তরে যা কিছু আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত।" (আল-কোরআন ৬৪:৪)

"দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে ধারণা-কল্পনা করতে পারে না, অথচ তিনি সকল ধারণা-কল্পনাকে জানেন। তিনি সূক্ষদর্শী, চেতনাসম্পন্ন।" (আল-কোরআন ৬:১০৩)

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তা জানবেন না? তিনি সূক্ষদর্শী, সম্যক জ্ঞাত।" (আল-কোরআন ৬৭:১৪)

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে জানাই হচ্ছে জ্ঞান। অর্থাৎ ক্ষেত্র তথা দেহ, প্রকৃতি, পরিবেশ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ তথা জীবের সত্তা বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ এবং দেহ ও আত্মার পার্থক্য ইত্যাদি সকল বিষয়ে জানা হচ্ছে জ্ঞান। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। একবাক্যে ভগবানকে জানাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। কেননা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সবই হচ্ছেন ভগবান।

ওপরোক্ত সকল বিষয়গুলিই হচ্ছে জ্ঞেয় বা জানার বিষয়। এ জগতে আমরা যত লেখা-পড়া করি, যত জ্ঞান অর্জন করি, যত সন্ধান-অনুসন্ধান করি, বিজ্ঞানের বা কর্মের যত প্রকারের শাখা-প্রশাখা বস্তুত সকলের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য ভগবান। সবকিছু ভগবানকে ঘিরে। সর্বত্র তাঁকেই জানার ও বোঝার চেষ্টা। তিনি জানার পরম ও একমাত্র বিষয়। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার প্রতিপালক, তিনিই সকল কর্ম বা প্রচেষ্টার মূল বা সর্বশেষ লক্ষ্য।" (আল-কোরআন ৫৩:৪২)

প্রসঙ্গক্রমে কিছু অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করে রাখি। যেমন জীবের দেহ তার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে চলে। কিন্তু দেহে যখন বহিরাক্রমন হয়, যেমন ভাইরাস বা অন্য কোন অনুজীব প্রবেশ করে তখন প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বা ধর্মের ব্যাত্যয় ঘটে। দেহমধ্যে সে অনিয়ম বা অধর্মোচিত আচরণ করতে শুরু করে। দেহ নামক ধর্মক্ষেত্র তখন কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়। ক্ষেত্রে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়।

দেহে বা ক্ষেত্রে তখন ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রাম শুরু হয়। সৃষ্টি ও জীবন রক্ষার্থে তখন নির্দিষ্ট নিয়ম বা ধর্মকে রক্ষা করা কর্তব্য হয়ে দাড়ায়। নয়ত ধর্মচ্যূতির কারণে ক্ষেত্রে বিশৃংখলা ও অশান্তি দেখা দিতে পারে। এমনকি জীবের মৃত্যুও হতে পারে। ধর্ম রক্ষা বা শত্রুর মোকাবেলায় স্বধর্মোচিত আচরণ বা নিয়তকর্ম করা তখন প্রত্যেক দায়িত্ব প্রাপ্তের নিজ নিজ কর্তব্য। সেটি নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থেই প্রয়োজন।

দেহাভ্যন্তরে যারা সে দায়িত্বে নিয়োজিত তাদেরকে সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হয়। নয়ত যে জগতে তাদের বসবাস তার নাশ মানে সকলের নাশ। অন্তরস্ত জীবসমুহের দায়িত্ব তাই তার বা দেহের প্রভূর কারনে কর্তব্য পালন করা। সে কারণে জীবের সৃষ্টি। এটি প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবদেহের অভ্যন্তরের কথা।

স্বতন্ত্র জীবদেহের বাইরেও এক ধর্মক্ষেত্র আছে। যে ক্ষেত্রে বা প্রকৃতিতে আমাদের বসবাস। এটি আমাদের বা স্বতন্ত্র দেহের বাইরের ক্ষেত্র। কিন্তু একইসাথে বিশ্বরূপ দেহের অভ্যন্তরের ক্ষেত্র। যেখানে সবকিছু একটা নিয়ম বা ধর্ম মেনে চলে। জগত তাই সুশৃংখলভাবে চলমান আছে।

এই ধর্মক্ষেত্রেও যখন অধর্মের উত্থান বা প্রবেশ ঘটে তখন সেখানেও কুরুক্ষেত্রের মতো সংগ্রাম শুরু হয়। ধর্ম ও অধর্মের লড়াই শুরু হয়। যা কৌরব ও পন্ডবদের মধ্যে ঘটে চলেছে।

বস্তুত আমরা বাহিরকে দেখে ভেতরকে বুঝতে শিখি। কখনও ভেতরকে বুঝে বাহিরকে বুঝি। যখন দেহে অধর্মের উত্থান হয় তখন তা প্রতিহত করতে নিজ নিজ স্বধর্মের আচরণ করা প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। সৃষ্টিকে রক্ষা করা হচ্ছে জীবের প্রধান ও সর্বোচ্চ ধর্মোচিত আচরণ। সৃষ্টি কিংবা প্রজন্ম রক্ষার্থে তখন নিজেকেও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতে হয়। ধর্ম সে শিক্ষা দেয়। সৃষ্টি রক্ষার্থে তথা জীবন, জগত ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণে যা অতীব প্রয়োজনীয়।

এ তো গেল জড় প্রকৃতির প্রেক্ষিতে ধর্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্রের আলোচনা। এছাড়াও সূক্ষ দেহ বা মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতেও তেমনি আরেক ধর্ম-অধর্ম বা কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম আছে। যা সুস্থ চিন্তা ও অসুস্থ চিন্তা দ্বারা সংঘটিত হয়। তাই চিন্তার ক্ষেত্রেও নিয়ম বা ধর্ম এবং অনিয়ম বা অধর্ম ও এদের সংঘর্ষ বা আরেক কুরুক্ষেত্রকে বিবেচনায় রাখতে হয়। যা মানসিক সুস্থতা ও অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

এটিরও দুটি প্রেক্ষিত আছে। একটি নিজ দেহাভ্যন্তরে ঘটে। অপরটি বিশ্বরূপ দেহাভ্যন্তরে ঘটে। যেটি বিশ্বরূপ দেহাভ্যন্তর সেটিই নিজ দেহের বাইরে ঘটে। প্রকৃতি ও পরিবেশে ঘটে। তাই সুস্থ চিন্তার প্রচার-প্রসারে কাজ করা তথা যুদ্ধ, জেহাদ বা সংগ্রাম করাও এক গুরু দায়িত্ব বা ধর্মোচিত আচরণ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪	সেই ক্ষেত্র কি এবং কিরূপ এবং কি রকম বিকারযুক্ত ও কি থেকে উৎপত্তি; ক্ষেত্রজ্ঞ কিরূপ এবং কেমন তার প্রভাব- তা সংক্ষেপে আমার থেকে শোন।
৫	ঋষিগণ বা জ্ঞানীজন বেদের বিবিধ লেখায় এসব বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। বিশেষত বেদান্ত সূত্রের দ্বারা তা নিশ্চিত ও যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

• **১৩.৪-৫** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে বিভিন্ন গুণীজনেরা পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন সময়ে উপনিষদে তাদের মতামত তুলে ধরেছেন। বেদান্ত দর্শন সেসবকে যুক্তিযুক্তভাবে কার্যকারণ সূত্ররূপে দেখিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তসহ ব্যাখ্যা করেছে।

উল্লেখ্য যে, বেদ বলতে সব রকমের বৈদিক শাস্ত্রকে বোঝায়। তবে চতুর্বেদ হচ্ছে ঋকবেদ, সামবেদ, যযুর্বেদ ও অথর্ববেদ। বেদকে শ্রুতি বলা হয় যা হচ্ছে সরাসরি ভগবানের বাণী। যেমন মুসলমানদের কোরআনকে আল্লাহর বাণী বলা হয়। আল্লাহর বাণী ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ) রাসূল মোহাম্মদ (সাঃ) এর নিকট পৌঁছে দেন।

প্রতিটি বেদে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চারটি ভাগ রয়েছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ হচ্ছে বেদের কর্মকান্ড যেখানে ধর্মীয় রীতি-নীতি বিবৃত হয়েছে। অপরদিকে আরণ্যক ও উপনিষদ জ্ঞানকান্ড নামে পরিচিত [দ্রষ্টব্য গীতা ২:৩৯]।

বেদের এই উপনিষদই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত নামেও পরিচিত। বেদান্ত মানে বেদের অন্ত বা শেষ। যা বেদের সার বা অন্ত তাই বেদান্ত। বেদান্তে জীব, আত্মা, ব্রহ্ম বিষয়ে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক আলোচনা করা হয়েছে। সেই বেদান্ত দর্শনেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে বিভিন্ন ঋষিগণের সার কথা যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে এখানে সে কথাই বলা হয়েছে।

ক্ষেত্র হচ্ছে বিকারযুক্ত অর্থাৎ প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন বা বিকার হচ্ছে। কিভাবে তার পরিবর্তন হচ্ছে, কোথা থেকে পরিবর্তন আসছে, কি তার কারণ, কি তার উদ্দেশ্য, ক্ষেত্র বা দেহ গঠনের উপাদানগুলি কি, কিভাবে গঠিত হয়েছে, কিভাবে এর কার্যাদি সম্পন্ন হয়, কার নিয়ন্ত্রনে দেহ কাজ করে, ক্ষেত্রজ্ঞের স্বভাব কি, কেমন তাঁর প্রভাব, জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য ইত্যাদি সকল বিষয় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সামনে বিস্তারীতভাবে তুলে ধরেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৬	পঞ্চ মহাভূত এবং অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যাক্ত হচ্ছে মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় ও এক মন, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইচ্ছে-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, সংঘাত এবং চেতনা ও ধৈর্য্য- এগুলিকে সবিকার ক্ষেত্র বলে। [৬-৭]
৮	অমানিত্ব, দম্ভহীনতা, অহিংসা, সহনশীলতা, সরলতা, গুরুসেবা, পরিচ্ছন্নতা, একনিষ্ঠতা এবং আত্মসংযম; ইন্দ্রিয় বিষয়ে নিস্পৃহতা ও অনহঙ্কার; জন্ম-মৃত্যু, বার্ধক্য-রোগ এসবের কষ্টকর দিকসমুহ উপলব্ধি করা; স্ত্রী-পুত্র, গৃহস্থালী বিষয়াদিতে উদাসীনতা ও অনাসক্তি এবং ভাল-মন্দ প্রাপ্তিতে সমচিত্ততা; অনন্য ভক্তি সহকারে আমাতে একান্তভাবে যুক্ত, নির্জন অবস্থানে বসবাস, জনাকীর্ণতায় অরুচি, নিত্য আধ্যাত্ম জ্ঞানের সংস্পর্শতা এবং পরম সত্যের দার্শনিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও অনুসন্ধান- এগুলিকে জ্ঞান বলা হয়। যা এর বিপরীত তাই অজ্ঞতা বা অজ্ঞানতা। [৮-১২]

• **১৩.৬-৭** প্রকৃতি হচ্ছে অনাদি-অনন্ত। জড় জগতের মূল উপাদান হচ্ছে প্রকৃতি। এর মধ্যেই জগত সৃষ্টির সকল উপাদান নিহিত। এই জড় প্রকৃতিই হচ্ছে ক্ষেত্র। ক্ষেত্র হচ্ছে সবিকার। প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন বা বিকার হচ্ছে। এই ক্ষেত্র যেভাবে গঠিত হয়েছে এখানে সে বিষয়ে বলা হয়েছে।

প্রকৃতিরই নামান্তর হচ্ছে ত্রিগুণ, অব্যাক্ত বা প্রধান। ত্রিগুণ হচ্ছে প্রকৃতির তিনটি গুণ। এগুলি হচ্ছে সত্ত্বঃ (Harmony), রজঃ (Energy, Activity) ও তমঃ (Resistance, Inertia)। এই তিন গুণ ত্রৈগুণ্য নামে পরিচিত। তিন গুণের স্বভাব পরস্পর বিরোধী। সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ বা জ্ঞান। তমের স্বভাব অপ্রকাশ বা মোহ, রজের স্বভাব প্রকৃতি বা কর্ম প্রবণতা।

তিন গুণের সাম্যাবস্থা হচ্ছে প্রকৃতির অব্যাক্ত অবস্থা। প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টিকালে সাম্য ভঙ্গ হয়। সাম্য ভঙ্গ হলে পরিণামে ব্যাক্ত জগত সৃষ্টি হয়।

সৃষ্টিকালে প্রকৃতির সাম্য ভঙ্গ হলে প্রথম যে পরিণাম ঘটে তাকে 'মহতত্ত্ব' বলে। মহতত্ত্ব আবার যে পরিণাম প্রাপ্ত হয় সেটিকে বলে 'অহঙ্কার'। অহংকার হচ্ছে আমিত্বভাব। আমিত্বভাব বা অহংকারের কারণে সব পৃথক হতে শুরু করে। অহঙ্কারের শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি হয়। এক ভঙ্গ হয়ে বহুর উৎপত্তি হয়। এর প্রবৃদ্ধি দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে সেন্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করে। [দ্রষ্টব্য গীতা ৭:৬]

একদিকে সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ দ্বারা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যথা হস্ত, পদ, বাক, পায়ু, উপস্থ (৫) এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক (৫) এবং উভয়েন্দ্রিয় মন (১) এই একাদশ ইন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে তমগুণের প্রবৃদ্ধি দ্বারা পঞ্চ সূক্ষভূত উৎপন্ন হয়। সূক্ষভূতকে তন্মাত্রও বলে। তন্মাত্র অর্থ 'কেবল তাহাই'। অর্থাৎ স্থুলভূতের যা সার কেবল তাই। ঐ সূক্ষভূতই। যেমন আকাশকে সূক্ষ অবস্থায় পরিণত করলে থাকে শব্দ। ফলে শব্দ হচ্ছে আকাশের তন্মাত্র।

সূক্ষভূতের মধ্যে নিহিত আছে পাঁচটি ইন্দ্রিয় বিষয় যথা- রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ (৫)। সেখান থেকে পঞ্চ মহাভূত বা স্থুলভূত সৃষ্টি হয়। এগুলি হচ্ছে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা বা পৃথিবী (৫)। এই স্থুল ভূতের পরিণামে জগত সৃষ্টি হয়। এই হল প্রকৃতির পরিণাম বা সৃষ্টিকর্ম। বস্তুত এগুলিই বিজ্ঞানের গবেষনা বা সাংখ্য দর্শনের বিষয়বস্তু।

সৃষ্টিকর্মের অপর তিনটি বিষয় হচ্ছে অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যাক্ত (৩)। সাংখ্য দর্শন মতে এই চব্বিশটি (২৪) সমষ্ঠিগতভাবে হচ্ছে ক্ষেত্র, দেহ বা জড় প্রকৃতির উপাদান। এগুলির সমন্বয়ে জড়দেহ বা কর্মক্ষেত্র গঠিত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মূল প্রকৃতি হচ্ছে ১টি। তার বিকার বা বিকৃতি হচ্ছে ৭টি। সাতটির মধ্যে মহতত্ত্ব ১টি, অহংকার ১টি এবং পঞ্চ সূক্ষভূত ৫টি। অতএব মূল প্রকৃতিসহ মোট তত্ত্ব হচ্ছে ৮টি। জড় প্রকৃতিকে সবিকার ক্ষেত্র বলে। কেননা

প্রতিনিয়ত এর বিকার, পরিবর্তন বা বিকৃতি হচ্ছে। বিকৃতি এ অর্থে যে এদের প্রত্যেকটি অন্য তত্ত্বের কারণ। এগুলি প্রকৃতি হলেও অন্য তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত তাই বিকৃতি। যেমন মহতত্ত্ব হচ্ছে মূল প্রকৃতির বিকৃতি কিন্তু অহংকারের প্রকৃতি।

ওপরে উদ্ধৃত ৮টি তত্ত্বের বিকৃতি হচ্ছে আরও ১৬টি। এগুলি হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫টি, কর্মেন্দ্রিয় ৫টি ও মন ১টি এবং স্থুলভূত ৫টি। তাহলে সর্বমোট তত্ত্ব হচ্ছে (৮+১৬) ২৪টি। ওপরোক্ত ২৪টি তত্ত্ব হচ্ছে জড় প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। কিন্তু আমরা জানি যে জড় প্রকৃতি ছাড়াও ভগবানের আরও একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রকৃতি আছে। সেটি হচ্ছে পুরুষ বা জীব প্রকৃতি। অতএব পুরুষ সহ সৃষ্টি বিষয়ে সর্বমোট তত্ত্ব হচ্ছে ২৫টি। উল্লেখ্য যে, পুরুষ প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়। স্বতন্ত্র।

জড় প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের নিম্নপর্যায়ের প্রকৃতি। জড় জগত হচ্ছে ভগবানের অনন্ত শক্তির একটি সাময়িক প্রকাশ। ভগবানই হচ্ছেন এই জড় জগত সৃষ্টির মূল বা আদি কারণ। জড় প্রকৃতি সৃষ্টির যে সমস্ত উপাদান তা ভগবানেরই বিভিন্ন শক্তি। প্রকৃতি হচ্ছে জড়। প্রকৃতির স্বভাব হচ্ছে পরিণাম। তাই এটি প্রসবধর্মী। স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করে।

পুরুষ বা জীব হচ্ছে চেতনাসম্পন্ন। পুরুষ বা জীবের সান্নিধ্যে প্রকৃতিতে চৈতন্যের উদয় হয়। জীব বা পুরুষ হচ্ছে নির্বিকার, অকর্তা, সাক্ষী ও ভোক্তা। সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত থাকে। ফলে প্রকৃতির গুণ জীবে এবং জীবের গুণ প্রকৃতিতে পড়ে। তাই অচেতন হলেও প্রকৃতিকে চেতন এবং অকর্তা হলেও জীবকে কর্তা মনে হয়। সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই মিলে হচ্ছে পূর্ণ বা মূলতত্ত্ব।

ইচ্ছে-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ, সংঘাত এগুলি হচ্ছে স্থুল দেহের অন্তর্গত পঞ্চ মহাভূতের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ। জীবনের লক্ষণ চেতনা ও ধৈর্য্য হচ্ছে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ দেহের প্রকাশ। অতিরিক্ত এই কয়টি বিষয়ও এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। এগুলি মনেরই গুণ।

জীবদেহে প্রাণের ক্রিয়া বা চেষ্টা চাঞ্চল্যের যে একটা প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় সেটিই হচ্ছে 'চেতনা'। আবার মন-প্রাণ ইত্যাদির ক্রিয়া যে শক্তির দ্বারা স্থির থাকে সেটি হচ্ছে 'ধৈর্য্য'। দেহে এইরূপ একটি পৃথক শক্তিকেও স্বীকার করা হয়। এটিও জড় দেহের গুণ। এছাড়াও আছে সংঘাত বা সংহতি।

জড়দেহ হচ্ছে এই সব কয়টি উপাদানের অভিব্যাক্তি। দেহের বিকার বা পরিবর্তন হয়। দেহকে তাই সবিকার ক্ষেত্র বলা হয়েছে। দেহের পরিবর্তন ছয় রকমের। জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, বংশবৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ বা মৃত্যু। ক্ষেত্র হচ্ছে অস্থায়ী জড় বস্তু। কিন্তু ক্ষেত্রের মালিক বা প্রভূ তথা ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছে এসব থেকে ভিন্ন বা পৃথক।

ক্ষেত্রের উপাদান, বিষয়াবলী, কার্যাবলী ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা বিকার বা পরিবর্তনের কারণ এই শ্লোকে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হয়েছে।

শস্যক্ষেতে বীজ বপন করলে ফসল ফলে। জীব আমরা সে ফসল ভোগ করি। তদ্রূপ দেহরূপ ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ কর্মের বীজ বপন করলে তার ফল ভোগ করতে হয়। পুরুষ বা জীবসত্ত্বা তথা ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা হচ্ছে সে ফলের ভোক্তা।

● **১৩.৮-১২** জীব, পুরুষ, ক্ষেত্রজ্ঞ এ সবগুলি দ্বারা আত্মাকে বোঝান হয়ে থাকে। আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। ক্ষেত্র বা জড়দেহে আত্মা বন্দি হয়ে আছে। এ বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হওয়াই হচ্ছে লক্ষ্য। এ বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যে জ্ঞান সে জ্ঞান অর্জনের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

প্রথমে 'অমানিত্ব' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। অমানিত্ব হচ্ছে অপরের থেকে মর্যাদা প্রাপ্তির আকাঙ্খা করে উদ্বিগ্ন না হওয়া। যার ভেতরে যথাযথ জ্ঞান প্রবেশ করেছে তিনি কখনও এ কারণে উদ্বিগ্ন হবেন না। তাঁর ভাবনা ভগবানকে নিয়ে। তিনি অপরের থেকে অর্থাৎ এ জগতে কে তাঁকে মর্যাদা বা গুরুত্ব দিল কিংবা দিল না এমনতর ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আদৌ ভাবেন না। এমন জ্ঞান হচ্ছে আত্ম উপলব্ধিজনিত পারমার্থিক জ্ঞান লাভের ফল। এর বিপরীত আচরণ অর্থাৎ যিনি এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হবেন সেটি তার নির্জ্ঞানতার ফল। অতএব বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত হতে হলে ভেতরে এমন জ্ঞান বিকাশ লাভ করতে হবে।

'সহনশীলতা' হচ্ছে অপরের থেকে অসন্মান বা অপমান সহ্য করার ক্ষমতা। যার ভেতরে পারমার্থিক জ্ঞান প্রবেশ করেছে তাঁর ভাবনা ভগবানকে নিয়ে। জগতে কে তাঁকে অপমান করল সেটি তাঁর কাছে কোন গুরুত্ব বহন করে না। তিনি ভগবানের কাছে মর্যাদাবান হওয়ার প্রত্যাশা রাখেন। কপটচারী ও অজ্ঞের করা অসন্মান তার

কাছে কোন মূল্য বহন করে না। মুক্তি প্রত্যাশীর ভেতরে সে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটতে হবে।

'সরলতা' হচ্ছে কূটচাল না চেলে সত্য খুলে বলা। সত্যের জ্ঞান যার ভেতরে প্রবেশ করেছে সে সকল কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সত্য বলার সাহস রাখে। সরলতা তাই যথাযথ জ্ঞানের ফল। বন্ধন মুক্তির প্রত্যাশা থাকলে এ গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

'পরিচ্ছন্নতা'র দুটি দিক আছে। একটি বাইরের দিক এবং অপরটি ভেতর বা অন্তরের দিক। সঠিক জ্ঞান অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে ও রাখে। বাইরের পরিচ্ছন্নতারও অন্তরের পরিচ্ছন্নতার ওপর প্রভাব থাকে। পরিচ্ছন্ন অন্তর ভিন্ন মুক্তি লাভ হয় না।

'অবিচলতা' বা স্থিরতা হচ্ছে দৃঢ়-সংকল্প। যথাযথ জ্ঞানের প্রবেশ ভিন্ন মানুষ জীবন সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। জীবন সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে চিত্ত স্থির হয় না। চিত্ত স্থির না হলে অবিচল বা দৃঢ়-সংকল্প হওয়া যায় না। চিত্তের স্থিরতা বা অবিচলতা হচ্ছে জ্ঞানের পরিণাম। মুক্তির জন্য চিত্তের স্থিরতা আবশ্যক।

'নিরহঙ্কার' এর অর্থ হচ্ছে জড় শরীরটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে না করা। অর্থাৎ মিথ্যে আমিত্ববোধ পরিত্যাগ করা। পরমার্থ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান ভিন্ন প্রকৃত নিরহঙ্কারী হওয়া যায় না। জ্ঞানের পরিণামেই এমন গুণ অর্জন সম্ভব হয়। এ গুণই আত্মার বন্দি দশা থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়।

জড় জগতে জীব জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি নামক নানান দুর্দশায় পতিত হয়ে আছে। বিষয়গুলি উপলব্ধি করতে হবে। এ জ্ঞান বা উপলব্ধিবোধ পারমার্থিক উন্নতির পথে প্রেরণা হয়ে কাজ করে। অন্যথায় প্রেরণা পাওয়া যায় না। পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ হলে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা গৃহের প্রতি 'অনাসক্তি' মানে এই নয় যে তাদের প্রতি অনুভূতি থাকবে না। পারমাথির্ক উন্নতির বাঁধাস্বরূপ হলে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। যেমন বলা হয়েছে,

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যেও রয়েছে তোমাদের শত্রু (যারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত করতে পারে), অতএব তাদের বিষয়ে সতর্ক থেক।” (আল-কোরআন ৬৪:১৪)

কিছু পেলে আমরা সুখী হই এবং না পেলে দুঃখ বোধ করি। কিন্তু যদি ভগবানে মগ্ন হওয়া যায় তবে জাগতিক পাওয়া না পাওয়া, সুখ-দুঃখ বিচলিত করতে পারে না। মনেও শান্তি আসে। কেউ যখন পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করে ও অন্তরে তা ধারণ করে তখন বৈষয়িক লোকদের সাথে মেলামেশা করতে ইচ্ছে বোধ করেন না। এ লক্ষণগুলি জ্ঞানের পরিণাম ও বন্ধন মুক্তির সহায়ক।

অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানে একান্তভাবে যুক্ত থাকা, নির্জন স্থানে বসবাস, জনাকীর্ণতায় অরুচি, নিত্য আধ্যাত্ম জ্ঞানের সংস্পর্শতা, পরম সত্যের দার্শনিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও অনুসন্ধান এ সবই জ্ঞানের লক্ষণ। এগুলি সবই ক্ষেত্রজ্ঞকে জানার বা বোঝার উপায়। জীবন ও কর্মের লক্ষ্যকে বোঝার উপায়। অর্থাৎ ভগবানের সেবা করা উচিত সেটি বুঝাই হচ্ছে জ্ঞানের পূর্ণতা। এর বিপরীত যা কিছু তাই হচ্ছে অজ্ঞতা।

কেতাবী জ্ঞানই কেবল জ্ঞান নয়। জ্ঞান হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। নিজে উপলব্ধি করা। যা আচরণ পরিবর্তনে প্রেরণা হয়ে কাজ করে। ওপরোক্ত সদগুণগুলি অর্জন যথাযথ জ্ঞান লাভের পরিণাম। বিপরীত যা কিছু তাই অজ্ঞতা।

এই শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপী ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ উপলব্ধির উপযোগী জ্ঞান আহরণের পন্থা বিবৃত হয়েছে। শ্লোকে যেসব গুণ বিষয়ে বলা হয়েছে সে সব গুণ অর্জন মুক্তির সহায়ক। জ্ঞানের পরিনাম হচ্ছে এ গুণগুলি অর্জন করা। যা মুক্তির উপায়।

উল্লেখ্য যে, আত্মা হচ্ছে জীবের প্রকৃত স্বরূপ। আত্মার স্বরূপ হচ্ছে জড় প্রকৃতির গুণের অতীত। অর্থাৎ ব্রহ্মভূত বা সহজ-সরল ও আনন্দময়। কিন্তু যে কোন প্রকারে আত্মা জড় প্রকৃতিতে পতিত হয়েছে এবং প্রকৃতির সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জড়দেহে আবদ্ধ হয়েছে। ত্রিগুণ তাকে জন্ম-মৃত্যুর জীবন চক্রে বেঁধে ফেলেছে। পারমার্থিক জ্ঞান এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে।

ওপরোক্ত কথাগুলি কেবল জীবাত্মার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেননা পরমাত্মা অচ্যুত। পরমাত্মা ত্রিগুণের অতীত বা উর্ধ্বে বিরাজ করেন। কখনই গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। গুণ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৩	এবার আমি জ্ঞাতব্য বিষয়ে বলব যা জেনে অমৃতস্বরূপ বা মোক্ষ লাভ হয়। এটি অনাদি; আমার নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্ম। এটি ব্যাক্তও না আবার অব্যাক্তও না।
১৪	সর্বত্র তাঁর হস্ত ও পদ; সর্বত্র অক্ষি, শিরঃ ও মুখবিশিষ্ট এবং সর্বত্র শ্রবনেন্দ্রিয় হয়ে জগতে সবকিছুকে আবৃত করে স্থিত।
১৫	সকল ইন্দ্রিয়ের গুণজনিত অনুভূতির প্রকাশ তাঁরই কারণে। অথচ সকল ইন্দ্রিয় ও তার প্রতিক্রিয়া বিবর্জিত; আসক্তিবিহীন ও সকল কিছুর ধারক। নির্গুণ অথচ সকল গুণের ভোক্তা ও পোষক।
১৬	সচল-অচল সমস্ত কিছুর ভেতরে ও বাহিরে বিদ্যমান। ক্ষুদ্রতা ও সূক্ষতাহেতু তা জ্ঞানের গোচরীভূত নয়। যদিও বহু বহু দুরে তথাপি সন্নিকটেই।
১৭	যদিও সর্বভূতে বিভক্তরূপে বোধ হয়, বস্তুত অবিভক্ত ও এক হয়ে বিদ্যমান। যদিও সকল জীবের প্রতিপালক, তবে জানবে যে সবকিছু গ্রাস করে এবং সৃষ্টি করে।
১৮	সমস্ত জ্যোতিষ্কের জ্যোতি। অন্ধকারের অতীত বলা হয় তাঁকে। সেই জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানের লক্ষ্য। সকলের হৃদয়ে স্থিত।
১৯	এভাবেই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হল। আমার ভক্তগণই এসব জেনে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়।

• **১৩.১৩** এবার জ্ঞাতব্য বা জানার বিষয় অর্থাৎ যা জানতে হবে সে বিষয়ে বলা হচ্ছে। বস্তুত জানার বিষয় হচ্ছে এমন যা জানার জন্য এ জীবনে মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকে। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি পুরণ হয়ে গেলে মানুষ জ্ঞান অন্বেষনে প্রবৃত্ত হয়। সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে শুরু করে। নানান প্রশ্নের উত্তর সে জানতে চায়। জানতে

পারলে আত্মা তৃপ্তি লাভ করে। অমৃতস্বরূপ বোধ হয়। মোক্ষ লাভের উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

বলা হচ্ছে, জ্ঞাতব্য বা জানার বিষয় হচ্ছে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের নির্বিশেষ রূপ। ব্রহ্ম অনাদি-অনন্ত। চিরকাল বিরাজমান। এর উপত্তি বা উৎস সম্পর্কে কারও জানা নেই।

ব্রহ্ম কি? বলা হচ্ছে যার মধ্যে সমস্ত কিছু স্থিত, যিনি সবকিছুর মধ্যে আছেন, যা সর্বব্যাপি, যার সত্ত্বায় সবকিছু সত্ত্বাবান, যিনি এক ও নিত্য তিনিই ব্রহ্ম।

ভগবানের সত্ত্বা থেকে কিভাবে জীবসত্ত্বা প্রকাশ পেল সেটি জানা নেই। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র প্রাণী পর্যন্ত সকলে ব্রহ্মে স্থিত। আর ব্রহ্ম স্থিত পরমেশ্বর ভগবানকে আশ্রয় করে। অতএব জগতে যা কিছু আছে সব ভগবানের অধীন বা আশ্রয়ে বিদ্যমান। জীবাত্মাকেও ব্রহ্ম বলা হয়। তবে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম বা 'আনন্দ-ব্রহ্ম'।

উল্লেখ্য যে, মানবদেহ একদিনে পরিপূর্ণতা লাভ করে না। বহু বহু যোনি ভ্রমন করে বহু দেহ ধারনের পর জীবাত্মা নরদেহ ধারণ করেছে। প্রথমে জীবাত্মা জড়রূপে জন্মগ্রহন করে। 'অন্ন' হচ্ছে জড়ের প্রতীকরূপ। তাই জড়দেহকে বলা হয় আত্মার 'অন্নময়' কোষ। এটি পঞ্চ ভূতাত্মক স্থুল শরীর। এই স্তরে আত্মাকে অন্নময় পুরুষ বলা হয়।

ক্রমে অন্ন থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ ইতর প্রাণীর জন্ম হয়। তখন আত্মা ধারণ করে 'প্রাণময়' কোষ। তখন আত্মাকে বলা হয় প্রাণময় পুরুষ। এ পর্যায়ে প্রাণ ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়।

ক্রমে মনের উদ্ভব হয়। তখন মননশীল জীব মানুষের উদ্ভব হয়। আত্মা ধারণ করে 'মনোময়' কোষ। এ পর্যায়ে আত্মাকে বলা হয় মনোময় পুরুষ। এ পর্যায়ে মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সৃষ্টি হয়। মনের কারনেই ইতর প্রাণী ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষীত হয়।

মনোময় কোষের পরে আত্মার উর্ধ্বগতি হচ্ছে 'বিজ্ঞানময়' কোষ। এ পর্যায়ে বুদ্ধির উদ্ভব হয়। বিজ্ঞান অর্থ হচ্ছে সত্যজ্ঞান। আত্মা তখন বিজ্ঞানময় পুরুষে পরিণত হয়।

অতপর 'আনন্দময়' কোষ। বিজ্ঞানময় পুরুষই আনন্দময়ে পূর্ণতা লাভ করে। যিনি সত্যরূপ ও জ্ঞানরূপ ধারণ করেন তিনিই আনন্দরূপ লাভ করেন। এই অবস্থায় জীব ভাগবত জীবন লাভ করে। ভগবানের মধ্যেই অবস্থান করে। এরূপই হচ্ছে জীবের ক্রমবিকাশ।

ব্রহ্ম উপলব্ধির এই পাঁচ স্তরকে বলা হয় ব্রহ্ম পুচ্ছম। এই পঞ্চ কোষ বা পঞ্চ পুরুষ এক ব্রহ্মেরই বিভিন্ন বিভাব। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম বা 'আনন্দ-ব্রহ্ম'। তাঁর সেই দিব্য আনন্দ উপভোগ করার জন্য তিনি ক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় রূপে প্রকাশিত হন [দ্রষ্টব্য গীতা ২:৭২]।

এ সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের গভীরে প্রবেশ করতে হয়। ব্রহ্মসূত্রের অনুশাসনগুলি কার্যকারণ অনুসারে সূচারুরূপে সাজানো আছে। প্রথম সূত্রে ক্ষেত্র তথা কর্মক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে যা হচ্ছে ব্রহ্ম জ্ঞান। দ্বিতীয়টিতে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবসত্ত্বার কথা বলা হয়েছে যা হচ্ছে পরমাত্মার জ্ঞান এবং তৃতীয়টিতে বিবিধ প্রকার প্রকাশমান সত্ত্বার আশ্রয়স্বরূপ সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা ভগবানের কথা বলা হয়েছে।

ভগবানকে উপলব্ধি করতে হলে তাই তিনভাবে অনুধাবন করতে হয়। ১. নির্বিশেষ ব্রহ্ম, ২. সকলের হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মা ও ৩. সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে বিদ্যমান সবিশেষ ভগবান এক।

অনাদি-অনন্ত ক্ষেত্র হচ্ছে ব্রহ্ম; এই প্রকৃতি। সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ; প্রাণ ও চেতনার উৎস। অতঃপর সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে ভগবান পূর্ণাঙ্গরূপে-এক। যেমন মানবদেহে অসংখ্য কোষ আছে। সব মিলিয়েই মানুষ একজন। বিষয়টি তেমন। ভগবান এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্মান্ডের সবকিছুর সমন্বয়ে তিনি এক। পরম তত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছে ভগবান 'এক' এটি বোঝা।

ব্রহ্ম হচ্ছে অব্যাক্ত অবিনশ্বর বস্তু। আবার ব্যাক্ত নশ্বর জগত। তাই এটিকে ব্যাক্তও না আবার অব্যাক্তও না বলা হয়েছে।

আত্মা ও পরমাত্মা এই উভয় ক্ষেত্রজ্ঞ সম্পর্কে জানার মাধ্যমে জীবনে অমৃতের স্বাদ আস্বাদন হয়। জড় জগতের সংস্পর্শে এলে জীবাত্মা জড় প্রকৃতির গুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্বরূপ থেকে সাময়িক বিচ্যুত হয়। সাময়িক বলা হচ্ছে, কেননা

এমনটা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ সে জড় প্রকৃতির প্রভাবাধীন থাকে। প্রভামুক্ত হলে সে তার নিজস্ব স্বভাবে ফিরে যায়। বিষয়গুলি জানা থাকলে বন্ধন মুক্তি বা মোক্ষ লাভের উপায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

• **১৩.১৪** ব্রহ্ম সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে ব্রহ্মের সর্বব্যাপি রূপে তাঁর অসংখ্য হাত, মাথা, পা, চক্ষু ও কর্ণ আছে। এভাবে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ সর্বসময়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন।" (আল-কোরআন ৪:১২৬)

"কত স্বচ্ছ তাঁর দৃষ্টি! কি তীক্ষ্ণ তার শ্রবনশক্তি!" (আল-কোরআন ১৮:২৬)

"পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বব্যাপি, সর্বজ্ঞ।" (আল-কোরআন ২:১১৫)

• **১৩.১৫** চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এক একটি ইন্দ্রিয় আমাদেরকে জগতের এক একটি বিষয়ে ধারণা দেয়। এই ধারণা কে পায়? কোথায় প্রকাশ হয়? কে প্রকাশ করে? বলা হচ্ছে,

"তোমরা যা শোন ও দেখ প্রকৃতপক্ষে কে তা শোনে ও দেখে?" (আল-কোরআন ১০:৩১)

".. আল্লাহই সত্য বা সত্যের প্রকাশক ও স্পষ্ট ব্যাক্তকারী।" (আল-কোরআন ২৪:২৫)

সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির প্রকাশ ক্ষেত্রজ্ঞের কারণে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। ইন্দ্রিয়জনিত যত অনুভব-অনুভূতির প্রকাশ সব তাঁর কারণে। কেবলমাত্র তিনিই চেতনসম্পন্ন।

জীবদেহে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে চিনি-জানি বা দেখতে পাই। আজকাল তারবিহীন সংযোগের প্রযুক্তি মানুষও ব্যাবহার করে। বিশ্বরূপ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞের ইন্দ্রিয় বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই। তাই সাধারণভাবে ইন্দ্রিয় বিবর্জিত বলি। তবে অবশ্যই তাঁর জানার বা উপলব্ধির কোন প্রক্রিয়া আছে।

যদিও তিনি সকল গুণ ও অনুভূতিকে জানেন কিন্তু সেসবের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না। সকল প্রকার প্রতিক্রিয়া বিবর্জিত। তিনি তাঁর মতো বিদ্যমান। কেবল দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা। স্বাক্ষীস্বরূপ। জগতের সকলকিছুকে তিনি একাই ধারন করে আছেন। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ! .. সর্বসত্ত্বার ধারক।" (আল-কোরআন ২:২৫৫)

সকল কিছুর ধারক হওয়া সত্ত্বেও কোন কিছুতে তিনি আসক্ত নন। তিনি নির্গুণ। সকল গুণের প্রভাবের উর্ধ্বে অবস্থান করেন। প্রকৃতির গুণসমুহের অতীত। যেমন বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে স্বাধীন।" (আল-কোরআন ৩:৯৭, ২৯:৬)

তিনি আসক্তিরহিত। তবে গুণের কারণে যা কিছু উপভোগ হয় তার প্রকৃত ভোক্তা তিনি। তিনি নির্গুণ হলেও সকল গুণের ঈশ্বর। গুণসমুহের নিয়ন্ত্রক। গুণসমুহকে তিনিই পরিপালন করেন।

• **১৩.১৬** সচল-অচল সকল সৃষ্টির ভেতরে ও বাহিরে তিনি বিদ্যমান। যেমন বলা হয়েছে,

".. তিনিই বহিঃমূর্খী, তিনিই অন্তঃর্মূখী।" (আল-কোরআন ৫৭:৩)

এমনকি পদার্থের অণু-পরমাণু থেকে জীবের প্রতিটি কোষে কোষে বিদ্যমান। ক্ষুদ্রতা ও সূক্ষতাহেতু জ্ঞানের গোচরীভূত নন। যেমন বলা হয়েছে,

"দৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহকে ধারণা বা কল্পনা করতে সক্ষম নয় .. তিনিই সূক্ষদর্শী ও সচেতন।" (আল-কোরআন ৬:১০৩)

বলা হচ্ছে, যদিও বহু বহু দুরে তথাপি সন্নিকটেই। যেমন বলা হয়েছে,

"... আমি তাদের গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" (আল-কোরআন ৫০:১৬)

"যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চায় হে মোহাম্মদ, বস্তুত আমি তো অতি সন্নিকটে।" (আল-কোরআন ২:১৮৬)

• **১৩.১৭** প্রতিটি পৃথক জীবসত্ত্বাকে দেখে ক্ষেত্রজ্ঞকেও পৃথক বোধ হয়। কিন্তু বলা হচ্ছে তিনি অবিভক্ত এবং এক হয়ে বিদ্যমান। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনিই আল্লাহ, এক।" (আল-কোরআন ১১২:১)

ব্রহ্মে বা প্রকৃতিতে বিচরণ করে জীবসমুহ বেঁচে আছে। জীবসমুহের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় সকলকিছু প্রকৃতিতে বিদ্যমান। তিনিই সব সরবরাহ করে চলেছেন এবং সকলকে লালন-পালন করছেন। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ তিনিই তোমাদের প্রতিপালক।" (আল-কোরআন ৬:১০২)

"তিনিই ... তোমাদের জন্য আকাশ থেকে রসনা প্রেরণ করেন। কিন্তু কেউই সেসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না ...।" (আল-কোরআন ৪০:১৩)

"যদি তিনি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে যে তোমাদেরকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করবে?" (আল-কোরআন ৬৭:২১)

বলা হচ্ছে, যদিও সকল জীবের প্রতিপালক তবে তিনি সবকিছুকে গ্রাস করেন এবং সৃষ্টি করেন। ব্রহ্ম বা প্রকৃতি সৃষ্টির সময় সবকিছুকে তাদের আদি বা সুপ্ত অবস্থা থেকে বিকশিত করে। অতঃপর সবকিছু তাঁর শক্তিকে আশ্রয় করেই স্থিত হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনিই আল্লাহ! সৃষ্টিকর্তা; শূন্য থেকে রূপদাতা।" (আল-কোরআন ৫৯:২৪)

"তিনিই সৃষ্টি করেন অতঃপর পুনরাবৃত্তি ঘটান।" (আল-কোরআন ৮৫:১৩)

বিনাশ বা প্রলয়কালে তিনি সবকিছুকে গ্রাস করেন। বিনাশের পরে আবার সবকিছু তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিতে তাঁর কাছে ফিরে যায়। যেমন বলা হয়েছে,

"মহাপ্রলয়! কি সেই মহা প্রলয়? কিভাবে তুমি জানবে যে মহাপ্রলয় কি? এমন এক দিন, যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এবং পর্বতসমুহ হবে ধূনিত তুলোর মতো।" (আল-কোরআন ১০১:১-৫)

"তিনি নভোমন্ডল থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছু তাঁর সমীপে পৌঁছাবে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় সহস্র সহস্র বছর।" (আল-কোরআন ৩২:৫)

বিজ্ঞানীদের বলার বহু পূর্বেই এসব বার্তা মানব সমাজে দেয়া হয়েছে। তবে বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানের সাথে এ সকল দিক নির্দেশনার কোন বিরোধ বা প্রতিযোগীতা নেই। শাস্ত্রে মূল সূত্র ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষকে দু'ভাবেই উৎসাহিত করা হয়েছে,

এক: জ্ঞানের আলোকে সৃষ্টিকে জানতে চেষ্টা করা। এভাবে সৃষ্টিকর্তার মহাত্ম আবিষ্কার, উদঘাটন বা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পন করা।

দুই: কোনরূপ সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে ভগবান বা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদেরকে তাঁর প্রতি সর্বতোভাবে সমর্পন করা। তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখা। বিশ্বাস ও ভক্তি ছাড়া ভরসা করা যায় না। ভগবানকে পাওয়ার তাই এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখে।" (আল-কোরআন ৩:১৫৯)

● **১৩.১৮** ব্রহ্মান্ডের সকল জ্যোতিষ্কের জ্যোতির উৎস তিনি। তিনি জ্যোতির্ময়! তাঁর থেকেই সকলে জ্যোতি পায়। বস্তুত ব্রহ্মান্ডে অন্ধকার নেই। যা আছে সেটি আলোর প্রতিবন্ধক। তাই অন্ধকারের অতীত বলা হয় তাঁকে। এই প্রতিবন্ধকতার কারণে জড় জগতকে আলোকিত করতে চন্দ্র, সূর্য্য কিংবা বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ নভোঃমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের জ্যোতি! তাঁর জ্যোতির উপমা এমন যেন একটি আধার যার মাঝে আছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মাঝে স্থাপিত। কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। প্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত হয় পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল হতে; যা প্রাচ্যের নয় প্রতীচ্যেরও নয়। যার তৈল কোন অগ্নির স্পর্শ ছাড়াই যেন আপনা হতে আলো বিকিরণ করে চলেছে। জ্যোতির পর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন তাকে তাঁর আলোর পানে পথ প্রদর্শন করেন। এমনিভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা তুলে ধরেন।" (আল-কোরআন ২৪:৩৫)

তিনিই জ্ঞান, জ্ঞানের বা জানার বিষয় এবং জ্ঞানের পরম লক্ষ্য। বস্তুত জগত ভগবানময়। এখানে ভগবান ব্যাতিত আর কিছুই নেই। এ জগতে আমরা যত কাজ

করি, যতকিছু করি, যতকিছু জানি বা জানার চেষ্টা করি আমরা ভগবানকেই একটু একটু করে আবিষ্কার করি বা জানি। জগতে জানার সকল বিষয় হচ্ছেন ভগবান। বুঝে কিংবা না বুঝে আমরা যা জানতে চাই বা লক্ষ্য নির্ধারণ করি তাও ভগবান। অতএব জানার বা জ্ঞানের লক্ষ্যও তিনি।

ব্রহ্মজ্ঞান, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান সত্যি বলতে এগুলো সবই ভগবানকে ঘিরে। জ্ঞানের শুরু ভগবান থেকে আবার ভগবানের কাছে গিয়ে জ্ঞান শেষ হয়। বস্তুত সবই প্রকৃতি, পরিবেশ, দেহ ও ব্রহ্মান্ড সম্পর্কিত জ্ঞান। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার প্রতিপালক, তিনিই সকল কর্ম প্রচেষ্টার মূল বা সর্বশেষ লক্ষ্য।" (আল-কোরআন ৫৩:৪২)

জ্ঞানও মানুষকে আলোকিত করে। জ্ঞান আলোকময়। জীব জ্ঞানের আলোকেও আলেকিত হয়। কিন্তু জড় জগতের কোন প্রতিবন্ধক সেই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। সেটি হচ্ছে অজ্ঞতা। পূর্বেই বলেছি যে, জগতে সকল জ্ঞানই ভগবানকে ঘিরে। ফলে অজ্ঞতারূপ প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষ ভগবানকে বুঝতে পারে না। জড় জগতের মায়ায় পতিত হয়। এই মায়া হচ্ছে প্রতিবন্ধক। অজ্ঞতাকে তাই দুর করতে হবে।

লক্ষণীয় যে, গীতা ও কোরআনের উদ্ধৃতি দু'টোতেই ভগবান বা আল্লাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আলো বা জ্যোতিস্কের পাশাপাশি জ্ঞানের আলোর আলোচনাও তুলে ধরা হয়েছে। ১৩-১৮ পর্যন্ত শ্লোকে মূলত জীবাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বলা হচ্ছে যে, তিনি সকলের হৃদয়ে স্থিত। পরম নিয়ন্ত্রকরূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তবর্তী হয়ে থাকেন।" (আল-কোরআন ৮:২৪)

ভগবানকে পেতে হলে তাই হৃদয়ে ধ্যান দিতে হবে। তার জন্য দৈবী গুণাবলী অর্জন করে নিতে হবে। অতঃপর হৃদয়ের ভাষা বা নির্দেশনা বুঝে নিজেকে নিয়ন্ত্রনে রেখে চলতে জানতে হবে।

• **১৩.১৯** শ্রীকৃষ্ণ এভাবেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান-জ্ঞাতব্য বিষয়ে সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তবে ভগবানের এতসব বিষয় জেনেও সকলে তাঁর ভাব লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র বিশ্বাসী ও ভক্তগণই সে ভাব লাভ করতে পারেন।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছাড়া কেউ কারও কথা মন-প্রাণ দিয়ে শোনে না। আবার বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ভিন্নও কেউ কোন কথা মন দিয়ে শোনে না। যেখানে যার মন নেই সেখানে তার আগ্রহ নেই। আগ্রহ ভিন্ন কি করে জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করা যাবে? জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ ভিন্ন কি করে মর্ম অনুধাবন করা যাবে? মর্ম অনুধাবন ভিন্ন কি করে সত্যকে জানা যাবে? সত্যকে না জানলে কি করে মানুষ তা নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে পালন করবে? তাই বলা হয়েছে ভক্তরাই কেবল এসব বিষয় উপলব্ধি করতে পারে। কেননা তারা উপদেশ বার্তায় মনোনিবেশ করে। যেমন বলা হয়েছে,

"যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শ্রবন করে অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে, তাদেরকেই আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই উপলব্ধিবোধসম্পন্ন মানুষ।" (আল-কোরআন ৩৯:১৮)

ভক্ত আগ্রহের সাথে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে। সত্যকে সন্দেহাতীতভাবে জানতে পারে। অন্তর সে জ্ঞানে তুষ্ট হয়। ফলে বিশ্বাস জন্মায়। বিশ্বাস জন্মালে ভক্তি-শ্রদ্ধা আসে। তখন তা অর্জনে সাধনা করে। সাধনার ফলস্বরূপ পরিপালন করে। তখন সে স্বরূপ বা ভাব তথা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হতে পারে। উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মভাব হচ্ছে ত্রিগুণাতীত ও আনন্দময়।

৬-৭ পর্যন্ত শ্লোকে মূলত জড় উপাদানগুলি ও জীবনের লক্ষণসমুহের কিছু অভিব্যাক্তি তুলে ধরা হয়েছে। এগুলির সমন্বয়ে জড়দেহ বা কর্মক্ষেত্র গঠিত হয়েছে। ৮-১২ নং শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপী ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ উপলব্ধির উপযোগী জ্ঞান আহরণের পন্থা বিবৃত হয়েছে এবং ১৩-১৮ নং শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এভাবেই বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২০	প্রকৃতি ও পুরুষ বা জীবসত্ত্বা উভয়ই শুরুহীন বা অনাদি বলে জানবে এবং তাদের বিকার বা রূপান্তর ও গুণসমুহ প্রকৃতিজাত বলে জানবে।
২১	প্রকৃতিকে কার্য-কারণের হেতু বলা হয় এবং জীবসত্ত্বাকে সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু বলা হয়,
২২	যেহেতু জীব প্রকৃতিতে অবস্থান করে প্রকৃতিজাত গুণসমুহ ভোগ করে এবং

	প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবেই জীব ভাল-মন্দ যোনিতে জন্ম লাভ করে।

● **১৩.২০** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই শুরুহীন বা অনাদি বলে জানবে। তাদের শুরুর কোন ইতিহাস জানা নেই। সৃষ্টির পূর্বেও তারা বিদ্যমান ছিল। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি থেকে প্রকৃতি-পুরুষ তথা এ জগত ও জীবন প্রকাশিত হয়েছে।

ইতিপূর্বে বেদান্ত অনুসারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে বলা হয়েছে। সেটিই আবার এখানে কয়েকটি শ্লোকে সাংখ্যদৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষ হিসেবে বলা হচ্ছে।

এক একটি জড়দেহ হচ্ছে এক একটি জড় জগত। এই জড় জগতসমুহে পুরুষ বা জীবসত্ত্বা তথা প্রতিটি জীবের আত্মা ভিন্ন ভিন্ন নানারকম দেহ ধারণ করে আবদ্ধ হয়ে আছে। পূর্বেকৃত কর্ম অনুযায়ী দেহপ্রাপ্ত হয়ে ভাল-মন্দ ফলভোগ করছে।

প্রতিটি স্বতন্ত্র জীব হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ। সেইসব জড়দেহে আবদ্ধ জীবের আত্মা বা জীবাত্মা কিন্তু ব্রহ্মভূত। অর্থাৎ ভগবানের অংশ প্রকাশ হিসেবে আত্মা ভগবানের গুণেই গুণান্বিত। ভগবানের সেবা করা বা তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করা জীবের একমাত্র কাজ। সেটিই যজ্ঞের ক্রিয়া।

জড়দেহে আবদ্ধ জীবসত্ত্বা জড় প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্ত্বঃ, রজঃ ও তম এর কোন একটি দ্বারা আকৃষ্ট হয়। গুণের প্রভাবে জীব আকৃষ্ট হলে সে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়। স্বকীয়তা হারায় এবং জড়দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বন্দিত্বকে বরণ করে। অথচ আত্মার প্রেক্ষিতে সমস্ত জীব একই রকম। কিন্তু তাদের এই বিকার বা বিকৃতির কারণ হচ্ছে প্রকৃতি তথা প্রকৃতিজাত গুণসমুহ।

মূল কাজ বিস্মৃত হয়ে জীব যখন জড় জগতের প্রতি ভীষনভাবে আকৃষ্ট হয় তখন সে কঠোর জীবন সংগ্রামে পতিত হয়। প্রকৃতির গুণের প্রভাবে স্বভাব অনুসারে ভাল-মন্দ কর্ম করে এবং কর্মানুসারে পরবর্তী জীবনে পুনরায় দেহ ধারণ করে জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অতএব জীবের পরবর্তী রূপান্তর কেমন হবে তার কারণও হচ্ছে এই প্রকৃতি। প্রাপ্ত দেহের স্বভাব অনুসারে জীব ভাল-মন্দ ফল ভোগ করে। তাই সতর্ক করে বলা হয়েছে,

"হে মানুষ! তোমাদের কৃত অনাচার কেবল তোমাদের বিপক্ষেই যাবে। পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করে নাও; অতঃপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।" (আল-কোরআন ৩৫:৫)

'আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন' কথাটির অর্থ হল বিচার দিবসে সকলকে ভগবান বা আল্লাহর মুখোমুখী দন্ডায়মান হতে হবে। পার্থিব জীবনে কৃত সকল কর্মের কারণে জবাবদিহী করতে হবে এবং তদানুসারে ফল প্রাপ্ত হতে হবে।

প্রকৃতির গুণের প্রভাবে প্রকৃত জ্ঞান আচ্ছন্ন হলে জীব ভগবান বিমুখ হয়। জীব যতক্ষণ ভগবানের সেবাবিমুখ থাকে ততক্ষণ ভগবানের পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করতে পারে না। তাদেরকে জড় জগতে কর্ম করার সুযোগ দেয়া হয়। যেন তারা নিজেদেরকে পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে। সেটিই হচ্ছে এই জড় সৃষ্টির রহস্য। সে কারণে এত এত উপদেশ ও দিক নির্দেশনা। যেন ভাল কর্ম করে ভাল ফল অর্জন করতে পারে। তাই বলা হয়েছে,

"যে পথ নির্দেশনা অনুসরণ করে সে তা নিজের মঙ্গলের জন্যই করে। আর যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে সে তা নিজেরই বিপক্ষে করে।" (আল-কোরআন ১০:১০৮)

"তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে তোমাদের মধ্যে কর্ম ও আচরণে কে শ্রেষ্ঠ।" (আল-কোরআন ১১:৭)

• **১৩.২১-২২** কর্ম করে দেহ। জীব কিছুই করে না। জীব হচ্ছে অকর্তা। দেহমধ্যে জীব সদা নির্বাক, নিশ্চল-নিশ্চুপ। অর্থাৎ দেহের কর্ম বিষয়ে জীব উদাসীন বা নিরপেক্ষ। তবে সকল কর্মের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

দেহ কখন কর্ম করে? কর্ম করার পূর্বে একটি কারণ দরকার হয়। ব্যাহ্যিক প্রকৃতি ও পরিবেশ হচ্ছে সে কারণ। যা ভগবানের নিয়ন্ত্রনে। তাই জীবেরও প্রকৃত পরিচালক হচ্ছেন ভগবান।

ব্যাহ্যিক প্রকৃতিতে প্রথম কোন একটি ক্রিয়া সংঘটিত হয়। ইন্দ্রিয় সে ক্রিয়া বিষয়ে দেহে সংবাদ প্রেরণ করে। জীবদেহ হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবৎ। সে মুহুর্তেই প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। প্রদর্শিত এ প্রতিক্রিয়াই জীবের কর্মরূপে গণ্য হয়। কর্ম সংঘটিত হলে জীব সে বিষয়ে সচেতন হয়।

কর্ম কিন্তু দেহ তার স্বভাব অনুসারে আপনা থেকেই করে। স্বভাব হচ্ছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণজাত। অর্থাৎ দেহ কিভাবে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করবে বা কোন কর্মটি করবে সেটি তার স্বভাবের ওপর নির্ভর করে। অতএব দেহ দ্বারা কৃত কার্যের কারণ নিহিত থাকে স্বভাব বা প্রকৃতিতে।

অপরদিকে দেহ কর্ম করে, কিন্তু দেহ দ্বারা কৃত কর্মের ভাল-মন্দ ফল ভোগ করে দেহস্থিত জীব বা তার সত্ত্বা। অতএব দেহ কর্মের কারণ হলেও সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু বা কারণ হচ্ছে জীব। জীবই প্রকৃতিতে অবস্থান করে প্রকৃতিজাত গুণসমুহের ফল ভোগ করে। খুব সহজ একটি উদাহরণ তুলে ধরে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি।

মনে করি একটি পুরুষ প্রজাপতি অনেকক্ষন পাতার ওপর বসে আছে। সে কিছুই করছে না; নিশ্চল-নিশ্চুপ; অকর্তা। যেই না আরেকটি স্ত্রী হলুদ প্রজাপতি পাশ দিয়ে উড়ে গেল অমনি সে তার পিছু নিল। ব্যাহ্যিক প্রকৃতিতে আরেকটি প্রজাপতি উড়ে যাওয়াতে দেহ তার স্বভাববশত পিছু নিয়েছে। অর্থাৎ ব্যাহ্যিক প্রকৃতি হচ্ছে দেহকে আন্দোলিত বা কর্মে নিয়োজিত করার প্রথম কারণ বা প্রেরণা।

প্রকৃতিতে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাটির কারণে দেহ তার আন্দোলিত হয়ে ছুটোছুটি করছে। কর্ম করেছে। জীব কিন্তু দেহ মধ্যে নিশ্চল-নিশ্চুপ বসে আছে। তবে দেহ কি কর্ম করবে বা কেমন প্রতিক্রিয়া করবে অর্থাৎ সে স্ত্রী প্রজাপতির পিছু নেবে নাকি নিশ্চুপ বসেই থাকবে এটি নির্ভর করে সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ তার গুণজাত স্বভাবের ওপর। রজগুণে প্রভাবিত হলে সে স্ত্রী প্রজাপতির পিছু নিতে পারে। সত্ত্বগুণে প্রভাবিত হলে বসে ধ্যানমগ্ন হতে পারে। এমনিভাবে দেহের কার্য-কারণের হেতু হচ্ছে জড় প্রকৃতিজাত স্বভাব। তবে দেহ দ্বারা কৃত তার সেই কর্মের শেষ পরিণতির ভাল-মন্দ ভোক্তা হচ্ছে দেহমধ্যে স্থিত জীবসত্ত্বা।

কর্ম করলে ফল লাভ হয়। ফল লাভ হলে ফল ভোগ করতে হয়। ফলভোগের জন্য দেহ ধারণ করতে হয়। দেহান্তরকালে অতীত কর্মের ভাল-মন্দ বিচার অনুযায়ী জীব ভাল-মন্দ যোনি প্রাপ্ত হয়। যেমন সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে দেব যোনিতে, রজগুণের প্রাধান্যে মনুষ্য যোনিতে এবং তমগুণের আধিক্যে পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ হয়ে জন্ম নিতে পারে। প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবের কারণে ভাল-মন্দ যোনিতে

এভাবে জীবের জন্ম লাভ হয়। অতঃপর কোন নির্দিষ্ট জড়দেহ ধারণ করার কারণে জীবসত্ত্বা তদানুরূপ ফল ভোগ করে।

কোন বিশেষ দেহ প্রাপ্ত হলে জীব সেই জড় দেহের প্রকৃতির নিয়মে চলতে বাধ্য হয়। প্রাপ্ত দেহের সেই নিয়ম পরিবর্তন করার তার কোন সাধ্য নেই। এটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম বা নিয়তি। যেমন সে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হতে পারে, আবার পশু-পাখি বা কীট-পতঙ্গের দেহ প্রাপ্ত হতে পারে। তখন সেই জড় দেহের নিয়ম অনুসারে তাকে চলতে হয়। এটি পরিবর্তন করার তার কোন সাধ্য নেই। যদি সে নিচু পর্যায়ের নারকীয় দেহ প্রাপ্ত হয়, তবে তাকে ভাল কাজ করে পুনরায় উচ্চতর বা মনুষ্য জীবন লাভ করতে হবে। অপরদিকে মনুষ্যত্বের পরবর্তী সোপান হচ্ছে ব্রক্ষাত্ব লাভ করা। কিভাবে ব্রক্ষাত্ব লাভ করা যায় গীতায় সে পথই প্রদর্শন করা হয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থানরত অবস্থায় জীব ভিন্ন ভিন্ন রকমের সুখ-দুঃখ অনুভব করে। এই ভাল-মন্দ দেহ বা আবাসন অর্জনের জন্য জীব নিজেই দায়ী। যেমন মন্দ কর্মের মন্দ ফল প্রাপ্তি বিষয়ে বলা হয়েছে,

"তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।" (আল-কোরআন ১০১:৯)

'হাবিয়া' কি? এটি হচ্ছে নরক বা নারকীয় জীবন। হাবিয়াকে ইংরেজীতে এভাবে বলা হয়েছে, The Bereft and Hungry One will be his/her Mother.

"তাদেরকে বলা হবে, শাস্তি এ কারণে যে তোমরা পৃথিবীতে অন্যায় কাজ সাধনের মাধ্যমে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে তোমরা অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে। অতএব প্রবেশ কর তোমরা নরকের দরজা দিয়ে চিরকাল বসবাসের জন্য। কতই না নিকৃষ্ট অহঙ্কারী ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের আবাসস্থল।" (আল-কোরআন ৪০:৭৫-৭৬)

জীব যতক্ষণ স্বভাবের গুণের প্রভাবের দ্বারা এভাবে মোহাচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ তাকে কর্মফল অনুযায়ী এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরীত হতে হয়। পরিপূর্ণভাবে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীব জন্ম-মৃত্যু চক্রের এ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এটিই কর্ম বন্ধন।

এক জীবনে জীব নিজের যেমন সংস্কার সাধন করে তেমনই হয় তার পরবর্তী ফলভোগ বা দেহ প্রাপ্তি। তাই বলা হয়েছে,

"প্রত্যেক ব্যাক্তির ভেবে দেখা উচিৎ আগামীর জন্য সে কি প্রেরণ করবে। অতএব আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অবগত।" (আল-কোরআন ৫৯:১৮)

জীব যদি দৈবী সম্পদে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে তবে তার কর্ম হবে ভাল। ফল লাভ হবে ভাল। উন্নত দেহ ধারণ করবে। উচ্চলোকে গমন করবে। কিন্তু যদি সে আসুরিক সম্পদ সমৃদ্ধ হয় তবে মন্দ কর্ম করবে এবং মন্দ ফল ভোগ করবে। নিকৃষ্ট দেহ ধারণ করবে। তাই সতর্ক করে বলা হয়েছে যে,

"হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য (পুনরুত্থান বা পুনর্জন্ম)। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে মোহিত করতে না পারে।" (আল-কোরআন ৩৫:৫)

"বল হে মোহাম্মদ, আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়েই উদ্বুদ্ধ করি যে, তোমরা আল্লাহর কারণে দু দু'জন করে কিংবা এক একজন করে জাগরিত হও এবং চিন্তা-ভাবনা কর; তোমাদের সঙ্গী .. তোমাদের কাছে আসন্ন এক কঠোর শাস্তি বা পরিণতি বিষয়ে একজন সতর্ককারী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (আল-কোরআন ৩৪:৪৬)

২৩	তথাপি এই দেহে ভোক্তারূপ এক পরম সত্ত্বা রয়েছেন যিনি সাক্ষী, অনুমোদন দাতা ও পালনকর্তা পরমেশ্বর। তাঁকে পরমাত্মাও বলা হয়।

• **১৩.২৩** জীবদেহ জড় বস্তু ব্যাতিত আর কিছু নয়। তার প্রাণ বা চেতনার প্রকাশ আত্মার উপস্থিতির কারণে। জীবাত্মা জড় দেহে থেকে একটি বিশেষ ক্ষেত্রের কার্য উপভোগ করে। বলা হচ্ছে যে, এই দেহে ভোক্তারূপ আরও এক পরম সত্ত্বা রয়েছেন যিনি সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ জীবের সঙ্গে থাকেন। তিনি পরমাত্মা।

ব্রহ্ম বা প্রকৃতি যেমন ভগবানের একটি প্রকাশ, তেমনি পরমাত্মা ভগবানের আরও একটি প্রকাশ। যার উপস্থিতিতে বা পরশে সব চেতনাসম্পন্ন হয়। তিনি পরম ভোক্তা। জীব যা কিছু করে পরমাত্মা তার সকল কর্মের সাক্ষী। সর্বত্র তাঁর হাত, পা, মাথা, চোখ, কান আছে। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।" (আল-কোরআন ৫৭:৪)

"তুমি যে কাজেই ব্যাস্ত থাক না কেন ... কিংবা যে কাজই তোমরা কর না কেন, আমি তোমাদের সে কাজের সাক্ষী।" (আল-কোরআন ১০:৬১)

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ পর্যবেক্ষণকারী, বান্দাদের সবকিছু দেখেন।" (আল-কোরআন ৩৫:৩১)

উল্লেখ্য যে, ভগবানের এই সাক্ষী থাকার বিষয়টি গুরুত্ব বহন করে না যদি না কর্মের বিচারে জীবের পরবর্তী জীবনের ভাল-মন্দ নির্ধারণ হয়।

তিনি প্রতিটি জীবের অন্তরে থেকে জীবাত্মার ভোগ-বাসনাগুলি মঞ্জুর করেন। পরমাত্মার অনুমোদন ব্যাতিত জীবাত্মা কিছুই করতে পারে না।

একটু গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করলে মানুষ নিজেও বিষয়টি বুঝতে পারবে যে, যখন সে কিছু একটা করার বা না করার ইচ্ছে অনুভব করে তখন ভেতর থেকে কেউ একজন 'হা' অথবা 'না' বলে। সম্মতি দেয় বা অসম্মতি জ্ঞাপন করে। এখানে তিনিই সেই অনুমোদন দাতা। যার অনুমোদন পেলে মানুষ কর্মে প্রেরণা পায়! শক্তি পায়! বস্তুত মানুষ কেবল ইচ্ছে প্রকাশ করে। কিন্তু বাস্তবায়ন করার শক্তি ভেতর ও বাহির উভয় দিক থেকে সরবরাহ করেন অনুমোদন দাতা। পরমাত্মার অনুমোদন ব্যাতিত জীবাত্মা কিছুই করতে পারে না।

মানুষ কখনও কখনও তাঁর সম্মতি ও অসম্মতিকে উপেক্ষাও করে। তার ভেতরে সে প্রবণতা আছে। কিন্তু তিনি দিক নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন। শাস্ত্রে তাঁর দিক নির্দেশনা দেয়া আছে। কি করা যাবে কি করা যাবে না বলা আছে। সেটিও তাঁর অনুমোদন ও অননুমোদন সম্পর্কিত বিষয়। আবার প্রতিনিয়ত ভেতরে ভাল-মন্দ পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। মানুষের স্বাধীনতা আছে মেনে চলার বা না চলার। এখানেই জীবের পরীক্ষা ও ভাল-মন্দের বিচারের বিষয়টি চলে আসে।

ভগবান জীবকে উচ্চতর পরম প্রকৃতিতে উন্নীত হওয়ার পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি চান জীব পরীক্ষাত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর পর্যায়ে গমন করুক। কিন্তু জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীব প্রায়শই ভূল পথে চলে। বন্ধন থেকে মুক্ত হতে না পেরে জন্ম-মৃত্যুর জীবন চক্রে আবর্তীত হতে থাকে।

সে কারণেই সকলকে ভগবান বা আল্লাহতে বিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। যেন সকলেই তাঁর দিক-নির্দেশনায় চলে এবং মুক্তি লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। জ্ঞানসম্পন্ন

মানুষ তাই ঈশ্বরের বার্তায় বিশ্বাস স্থাপন করে আনন্দময় জীবনের পথে অগ্রসর হয়। ভগবান জীবকে পরম প্রকৃতিতে নিয়ে যাবার জন্য সদা উদগ্রীব।

ভগবানই সকলের পালনকর্তা। প্রকৃতির মাঝে সবকিছু সরবরাহ করে জীবসমুহকে তিনি পরিপালন করে চলেছেন। তিনিই পরমাত্মা। তাঁর কারণেই সকলে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও চেতনাসম্পন্ন! শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৪	জীবসত্ত্বা এবং জড় প্রকৃতির গুণ সম্বলিত মিথষ্ক্রিয়ার এই দর্শনকে যিনি এভাবে বোঝেন, সর্বতোভাবে বিদ্যমান থেকেও তিনি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন।

• **১৩.২৪** দেহ ও আত্মা এক নয়; পৃথক। আত্মা হচ্ছে জীবের প্রকৃত সত্ত্বা। দেহ হচ্ছে জড় প্রকৃতি এবং আত্মা হচ্ছে জীব প্রকৃতি। জীবসত্ত্বা বা আত্মার উপস্থিতির কারণে জড়দেহ সচল, কর্মক্ষম ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। অপরদিকে জড় প্রকৃতিকে ধারণ করে জীবাত্মা দেহ দ্বারা কৃত কর্মের ফল ভোগ করে। আত্মা বা জীব প্রকৃতি হচ্ছে ভোক্তা।

বলা হচ্ছে, ওপরে উদ্ধৃত জড় প্রকৃতি ও জীব প্রকৃতি এবং তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বিষয়ে জ্ঞান লাভ হলে মুক্তির যোগ্যতা অর্জন হয়। তাই এভাবে বলা হয়েছে যে, জীবসত্ত্বা এবং জড় প্রকৃতির গুণ সম্বলিত মিথষ্ক্রিয়ার এই দর্শনকে যিনি বোঝেন, সর্বতোভাবে বিদ্যমান থেকেও তিনি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন।

কথাটির অর্থ কি? অর্থ হচ্ছে, জড় প্রকৃতির গুণসমুহের দ্বারা জীব প্রকৃতি জড় দেহে আবদ্ধ হয়ে আছে। জীব প্রকৃতিকে জড় প্রকৃতি সম্বলিত দেহ থেকে মুক্ত হতে হলে জড় দেহের সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই গুণসমুহের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে হবে। তাহলে গুণসমুহ দেহ মধ্যস্ত জীব সত্ত্বাকে আর বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না।

গুণের অতীত এ নির্গুণ অবস্থা বা ভাবটিই হচ্ছে ব্রহ্মভাব বা ভগবানের ভাব বা স্বভাব। তাই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে ভগবানের ভাব বা স্বভাব লাভ করতে হবে। তাহলে গুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্মের বন্ধনে আর আবদ্ধ হতে হবে না। কোন পিছুটান থাকবে না। মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হবে। মুক্ত স্বাধীন জীবন প্রাপ্ত হবে।

বস্তুত এমন ভাব নিয়েই জীব জড় জগতে আগমন করে। কিন্তু জড় প্রকৃতির সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে তার শুদ্ধ চেতনা কলুষিত হয়। সে কর্তব্যচ্যূত ও লক্ষ্যচ্যূত হয়। জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুক্তি মেলে না। মুক্ত হতে হলে তাকে তাই স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

বলা হচ্ছে, জীব ও জড়ের পার্থক্য এবং তাদের মিথস্ক্রিয়া ও মোক্ষ লাভ সম্পর্কিত এ দর্শনটি যারা বোঝেন সর্বতোভাবে সকল কর্মে বিদ্যমান থেকেও তাদেরকে পুনরায় জড় জগতে জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে দর্শনটি জানলে বা বুঝলেই যে তাঁকে আর জন্ম গ্রহণ করতে হবে না বিষয়টি তেমন নয়।

কথাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, দর্শনটি যিনি বোঝেন তিনি স্বাভাবতই মুক্তি লাভের প্রক্রিয়াটি জানেন। ফলে বিশ্বাসী হলে তিনি মোক্ষ লাভের প্রয়াসী হবেন। আন্তরীকতার সাথে যিনি সচেষ্ট হন তিনি চেষ্টায় সফলও হন। তখনই জড় জগতের পরিবেশ থেকে পরম প্রকৃতিতে প্রবেশ করতে পারেন। পরম প্রকৃতিতে জাগতিক সকল যন্ত্রনার উপশম হয়।

জ্ঞান লাভের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়গুলি জানা ও বোঝা। অতঃপর মুক্তি লাভে সচেষ্ট হওয়া। চেষ্টা বা সাধনায় নিযুক্ত হওয়াটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে যথাজ্ঞানে চেষ্টা করা হয়ে ওঠে না। প্রেরণাও পাওয়া যায় না। মুক্তিও লাভ হয় না। জ্ঞানই হচ্ছে মুক্তির প্রেরণা! জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। এটি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

জড় প্রকৃতির উর্ধ্বে পরম প্রকৃতির ভগবৎ ধাম রয়েছে। যেখানে পরম জীবসত্ত্বা ভগবান নিত্য বিরাজমান। সেই পরমাত্মাকে কিভাবে জানা যাবে? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৫	কেউ কেউ আপনাতে আপনি ধ্যানমগ্ন হয়ে আত্মাকে দর্শন করেন, কেউ সাংখ্য যোগের মাধ্যমে এবং আবার অন্য অনেকে কর্ম যোগে তাঁকে দর্শন করেন।
২৬	কেউ কেউ এভাবে না জেনে অন্যদের কাছে শ্রবণ করে তাঁর উপাসনা করে। তারাও শ্রবণ পরায়ন হয়ে মৃত্যুময় এ জগত সংসার অতিক্রম করে।

• **১৩.২৫** পরমেশ্বর ভগবানকে কি চর্ম চক্ষুতে দেখা যায় বা দেখা সম্ভব? যিনি ভগবানকে দেখতে চান তিনি বস্তুত অনুভব করেন। জ্ঞান চক্ষুতে দেখেন। সেটিও ভগবানেরই আশীর্বাদ। যাকে তিনি নিজেকে বুঝতে দিতে চান তিনি নিজেই তার সে চক্ষু উন্মোচন করে দেন। কিন্তু সেজন্য সাধনা করতে হয়। অন্তরাত্মাকে ভীষনভাবে ধূর্ততাশূন্য ও পরিচ্ছন্ন বা পবিত্র হতে হয়। সর্বদা তাঁকে স্মরণ করতে হয়।

আপনাতে আপনি বা নিজেই নিজের ভেতরে বা আত্মাতে ধ্যান দিতে হবে। ভগবানের ভাবনায় আত্মাতে সমাধিস্ত বা ধ্যানমগ্ন হয়ে ডুবে যেতে হবে। তাঁকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। তাঁকে জানা, বোঝা বা দর্শনের এটি একটি উপায় বা পথ। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হয়ে যাও।" (আল-কোরআন ৭৩:৮)

সাংখ্যযোগে জীব ও জড়ের পার্থক্যের জ্ঞান দ্বারা বা এককথায় জ্ঞানের আলোচনা ও গবেষনার মাধ্যমে তাঁকে জানার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে কাজ সাধারণত বিজ্ঞান করে থাকে। সত্যের সন্ধানের প্রচেষ্টায় যা কিছু করা হয় তা ভগবানকে জানার চেষ্টা। এটিও একটি পথ। যেমন বলা হয়েছে,

"সত্যকে ভিত্তি করে আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা এ বার্তায় বিশ্বাস রাখে।" (আল-কোরআন ২৯:৪৪)

"আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য চিন্তা-ভাবনার উপকরণ আছে (যারা বিষয়সমুহ নিয়ে গবেষনা/বৈজ্ঞানিক গবেষনা করে)।" (আল-কোরআন ২৪:৪৪)

"যারা এ বার্তায় নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য পৃথিবীতে আছে নিদর্শনাবলী এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও কি তোমরা দেখতে পাও না?" (আল-কোরআন ৫১:২০-২১)

কেউ কর্মযোগে ভগবানকে দর্শন করেন। কর্মযোগ হচ্ছে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করা। সেটি করা হয় ভগবানের কারণে। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে জীবন ও জগতের সেবা করে ভগবানের সান্নিধ্য লাভের সাধনা করা হয়। তাঁকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা

হয়। এভাবেও তাঁর দর্শন লাভ করা যায়। ভক্তের চেষ্টা বা সাধনায় তুষ্ট হলে ভগবান তার জ্ঞান চক্ষু উন্মোচন করে দেন যা দ্বারা তিনি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারেন। বলা হচ্ছে,

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। কিন্তু যে বিশ্বাস করে ও ভাল কাজ করে সেই নিকটবর্তী হবে।" (আল-কোরআন ৩৪:৩৭)

বস্তুত সকলকে ভগবানের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টাতেই রত থাকতে হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (আল-কোরআন ২৪:৪২)

• **১৩.২৬** কেউ কেউ ওপরোক্ত উপায়ে উপলব্ধি না করেও অন্যদের থেকে ভগবান বিষয়ে শ্রবণ করে তাঁর প্রতি ভক্তিপরায়ন হন। সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস রেখে তাঁকে সর্বদা স্মরণ করেন। তাঁর উপাসনা করেন। তাঁর সেবা করেন। তারাও শ্রবণ পরায়ন হয়ে সঠিক পথে চলার কারণে মৃত্যুময় এ জগত সংসার অতিক্রম করতে পারেন।

অতএব ধ্যানের মাধ্যমে, জ্ঞানের চর্চা-সাধনার মাধ্যমে, নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করার মাধ্যমে কিংবা নিরবিচ্ছিন্ন ভক্তির মাধ্যমে তাঁকে জ্ঞানের চোখে দর্শন বা উপলব্ধি করা যেতে পারে। ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এগুলি হচ্ছে তাঁকে দর্শন করার উপায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৭	হে ভারতশ্রেষ্ঠ! স্থাবর-অস্থাবর অস্তিত্বশীল যা কিছু উৎপন্ন হয়, তা সবই এ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফল বলে জানবে।

• **১৩.২৭** জড় প্রকৃতি বা ক্ষেত্র এবং জীবসত্ত্বা বা ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়েই সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। অতএব জগতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল এ দুয়ের সংযোগ ও সমন্বয়ে সাধিত হয়েছে।

নারী ও পুরুষ যেমন। এক এক প্রকৃতির যোনি দেশে জড়দেহ সৃষ্টির এক এক প্রকারের মূর্তী বা ছাঁচ তৈরীর সমস্ত উপাদান রয়েছে। আরেক প্রকৃতিতে সত্ত্বার বীজ সংরক্ষিত আছে। উভয়ের সংযোগে নতুন জড় ও জীবের অস্তিত্বসম্পন্ন জীবদেহ

উৎপন্ন হচ্ছে। জড়ের মধ্যে চেতনার আবির্ভাব ঘটছে। চেতনা জড়ের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কর্মের ফল ভোগ করছে। তাই বলা হয়েছে,

"তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রের মতো।" (আল-কোরআন ২:২২৩)

শস্যক্ষেত্র এখানে একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ মাত্র। বস্তুত এটি একটি প্রকান্ড সৃষ্টিকর্ম বিষয়ক ক্ষেত্র। অগনিত কর্মীবাহিনী এখানে কর্মে রত থাকে। এটি একটি প্রকৃতি যেখানে নতুন কোন জড়দেহ বা প্রকৃতির সৃষ্টি হয়। তবে আত্মার সংস্পর্শ ছাড়া এর বিকাশ হয় না। আত্মা হচ্ছে পরম প্রকৃতিজাত বা ব্রহ্মভূত। জড় প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষেত্রের সাথে পরম প্রকৃতি আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফলে জগতে যত স্থাবর-অস্থাবর অস্তিত্বশীল যা কিছু আছে সব উৎপন্ন হচ্ছে। তবে সবকিছুর সমন্বয় সাধিত হয় পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছের প্রভাবে। তিনিই কর্মানুযায়ী সৃষ্টির বীজ অনুরূপ প্রকৃতিতে স্থাপন করেন। ভগবানের ইচ্ছেশক্তি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ২৪:৪৫)

তিনি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বা জড়-চেতন সকল প্রকৃতির নিয়ন্তা। কার্য-কারণের হেতু তিনি। তিনিই জড় প্রকৃতিতে চেতন প্রকৃতিকে স্থাপন করেন। ফলে সবকিছু প্রকাশিত ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। সৃষ্টিকালে প্রকৃতি-পুরুষ সংযুক্ত থাকে। ফলে প্রকৃতির গুণ জীবে এবং জীবের গুণ প্রকৃতিতে পড়ে। তাই অচেতন হলেও প্রকৃতিকে চেতন এবং অকর্তা হলেও জীবকে কর্তা বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৮	বিনাশশীল সমস্ত জীবে যিনি অবিনাশী পরমাত্মাকে সমভাবে স্থিত দর্শন করেন- তিনিই প্রকৃতপক্ষে দর্শন করেন।
২৯	পরমাত্মাকে যিনি সর্বত্র সমভাবে উপস্থিত দেখেন তিনি কখনই নিজেকে মানসিকভাবে অধঃপতিত করেন না। ফলে তিনি পরম গতি লাভ করেন।
৩০	যিনি দেখেন যে কর্মসমুহ সর্বতোভাবে প্রকৃতির কারণেই ক্রিয়াশীল হয় এবং আত্মা কিছুই করে না তথা অকর্তা- তিনিই যথাযথভাবে বিষয়গুলিকে

	দেখেন।
৩১	যখন কেউ জীব সত্ত্বাসমুহের পৃথক অস্তিত্বকে একই প্রকৃতিতে বা ব্রহ্মে অবস্থিত দেখতে পান এবং দেখেন যে, সত্ত্বাসমুহ সেই একই প্রকৃতি বা ব্রহ্ম থেকে সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে- তখন তিনি ব্রহ্মচেতন লাভ করেন।
৩২	হে কৌন্তেয়! অনাদি-অনন্ত ও নির্গুণত্বের কারণে পরমাত্মা অব্যয়-অক্ষয়। শরীরে অবস্থান করেও আত্মা কিছুই করেনা, না কোন কিছুতে লিপ্ত হয়।

• **১৩.২৮** সমস্ত জীবকে আমরা সাধারণভাবে বিনাশশীল বলি। বস্তুত জীবের বিনাশ হয় না। বিনাশশীল কেবল জড়দেহ। সকল জীবের ভেতরে একই অবিনাশী পরমাত্মা বিদ্যমান। যিনি বিষয়গুলিকে সেভাবে দেখেন বলা হচ্ছে, তিনি বিষয়গুলিকে সঠিকভাবে দেখেন। একই পরমাত্মা সকলের ভেতরে সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। দেহের বিনাশ হলেও আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ে বর্তমান থাকে। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহর সত্ত্বা ব্যাতিত সবকিছু ধ্বংস হবে।" (আল-কোরআন ২৮:৮৮)

জীবদেহসমুহ নানা প্রকার বা আকৃতির ও স্বতন্ত্র বা পৃথক হওয়া সত্বেও একই পরমাত্মা সকলের মধ্যে বিরাজমান। যেমন বলা হয়েছে,

"... তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন।" (আল-কোরআন ৫৭:৪)

• **১৩.২৯** যখন কেউ বুঝতে শিখে যে সকল জীবে এমনকি তার নিজের ভেতরেও মহামহীম পরমেশ্বর ভগবান বিদ্যমান, তখন তিনি নিজেকে উচ্চ ও মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানে দেখতে পান। জগতের মহান অধিপতির সংসর্গে নিজেকে উপলব্ধি করতে পেরে নিজেকে তিনি শ্রেয় জ্ঞান করতে শেখেন। ফলে তিনি নিজেকে নিজে কখনই অধঃপতিত হতে দেন না। ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

অপরদিকে যারা সে উপলব্ধিবোধে পৌঁছাতে পারেনি, নিজের মর্যাদা ও সামর্থের বিষয়ে তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস নেই। নিজেদের শক্তি, সামর্থ ও সক্ষমতা বিষয়ে তারা সচেতন নয়। আত্মবিশ্বাসহীনতার কারণে মানসিক শক্তিকে কাজে লাগাতে তারা ব্যার্থ হয়। পরম গতি লাভেও তাই তারা ব্যার্থ হয়। এ ধরণের মানসিক অবস্থার মূল কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা। এরাই তমসাচ্ছন্ন। তমঃ গুণে আচ্ছন্ন।

আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন মানুষ লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে বিশ্বাসী। নিজেকে নিজে তাই যোগ্য করে গড়ে তোলেন। তাদের নিজেদের ভেতরে সে প্রচেষ্টাও থাকে। বিষয় আসক্তি পরিহার করেন। নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রন করতে জানেন। তারা ভগবানমুখী হয়ে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অগ্রসর হন। নিজেকে বিকশিত করেন। তাদের চেষ্টা-সাধনার কারণে তারা পরম গতি প্রাপ্ত হন। যেমন বলা হয়েছে,

"সেই সত্যিকার অর্থে সফল যে আত্মাকে বিকশিত করে এবং সেই সত্যিকার অর্থে ব্যার্থ যে এটিকে স্থবির করে রাখে।" (আল-কোরআন ৯১:৯-১০)

• **১৩.৩০** ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেহ ব্যাহ্য প্রকৃতি থেকে বার্তা পায়। দেহ হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবৎ। দেহ তার স্বভাব অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। তাতেই জীব কর্ম করছে বলে মনে করা হয়। বস্তুত কর্ম করে দেহ। জীব বা আত্মা কিছু করেন না। অকর্তা হয়ে বিদ্যমান থাকে।

যিনি দেখেন যে, তার দ্বারা যত কর্ম সাধিত হচ্ছে বস্তুত সব প্রকৃতি ও দেহের মিথষ্ক্রিয়া। তিনি নিজে কিছু করছেন না। বলা হচ্ছে যে, তিনিই বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে দেখেন।

দেহ দ্বারা কৃত কর্মের সাথে তেমন একজন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন না। দেহ ও আত্মার বা নিজের পার্থক্য বিষয়ে তিনি যথাযথভাবে অবগত। এই জ্ঞান বা বোধের কারণে দেহ যেমন কর্মই করুক না কেন কর্মের বন্ধনে জ্ঞানত তিনি আবদ্ধ হন না। নিজেকে তিনি মুক্ত রাখতে জানেন। তিনিই বন্ধন মুক্ত।

• **১৩.৩১** যিনি দেখেন যে, জীবসত্ত্বাসমুহ একই ব্রহ্ম বা পরম প্রকৃতিতে অবস্থান করছে, সকলের ক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্র এক এবং সেই ক্ষেত্র থেকেই সবকিছু নানাভাবে সর্বত্র বিস্তার লাভ করছে, এমন বোধ বা চেতনাই হচ্ছে ব্রহ্মচেতনা। তিনি ব্রহ্ম চেতন লাভ করেছেন। বিষয়গুলিকে তিনি যথার্থভাবে দেখেন। এ চেতনাই মোক্ষ লাভের অনুকূল।

• **১৩.৩২** জড় দেহের বিকার আছে। কিন্তু আত্মা অব্যয়-অক্ষয়। এর কারণ কি? দেহের বিকারের প্রধান কারণ জড় প্রকৃতির গুণ। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমগুণ। গুণগুলির প্রভাব জীবের প্রকৃত জ্ঞানকে হরণ করে। দেহকে ভীষণভাবে কর্মে প্রবৃত্ত করে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত করে এবং জীবের জীবনী শক্তিকে ক্ষয় করে।

পরমাত্মা নির্গুণ। প্রকৃতির কোন গুণ তাঁকে প্রভাবিত বা বিচলিত করতে পারে না। ক্ষয়কারী গুণের প্রভাব না থাকার কারণে তিনি অব্যয়-অক্ষয়। শরীরে অবস্থান করেও আত্মা কিছুই করে না। কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না। দেহে উপস্থিত থেকেও কিভাবে লিপ্ত না হয়ে থাকতে পারে? উক্ত ধারণাকে বোঝাবার সুবিধার্থে উদাহরণ উদ্ধৃত করে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩৩	সর্বব্যাপ্ত আকাশ যেমন সূক্ষতাহেতু কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না, দেহের সর্বত্র অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আত্মা তেমনই কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না।
৩৪	হে ভারত! একমাত্র সূর্য্যই যেমন সমগ্র জগতকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী তেমনই এই সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে।
৩৫	জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা যারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্যটি জানেন এবং প্রকৃতির বন্ধন থেকে জীবের মুক্ত হওয়ার পন্থাটি জানেন- তারা পরম গতি লাভ করেন।

• **১৩.৩৩** আত্মা কিভাবে নিজেকে কর্মে লিপ্ত না করে শরীর জুড়ে বিদ্যমান থাকতে পারে? বলা হচ্ছে, আকাশ যেমন সর্বত্র বা জগত জুড়ে পরিব্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও কোন কিছুর সাথে তার সংস্পর্শ নেই বা কোন সংস্পর্শ উপলব্ধ হয় না, আত্মাও ঠিক তেমনিভাবে সমগ্র দেহজুড়ে পরিব্যাপ্ত।

দেহের সর্বত্র উপস্থিত থেকে আত্মা দেহকে সকল কার্য নির্বাহে সহায়তা করে। কিন্তু আকাশের মতোই নিজে কোন কিছুতে যুক্ত থাকে না। যেহেতু আত্মা দেহ দ্বারা কৃত কোন কর্মে নিজে লিপ্ত হয় না, তাই দেহ দ্বারা সম্পন্ন সকল কর্মের দোষ-গুণ থেকেও মুক্ত থাকতে পারে। দেহের কর্ম আত্মাকে আবদ্ধ করে না।

জীবাত্মা কিভাবে শরীরের সাথে যুক্ত থাকে এবং কিভাবে দেহ বিনাশের পর চলে যায় সূক্ষতা হেতু বিষয়গুলি বোধগম্য হয় না।

• **১৩.৩৪** একটি মাত্র সূর্য্য সমগ্র জগত বা ক্ষেত্রকে আলোকিত করে প্রকাশ করে। ক্ষেত্রী বা আত্মার উপস্থিতি তেমনই দেহরূপ ক্ষেত্রকে ক্রিয়াশীল ও আলোকিত করে প্রকাশ করে। আত্মার কারণে দেহ চেতনাসম্পন্ন। চেতনাই হচ্ছে দেহে আত্মার উপস্থিতির প্রমান।

সমগ্র দেহ ও জগত সম্পর্কিত যে জ্ঞান উপলব্ধ হয় তা কেবলমাত্র আত্মার উপস্থিতির কারণেই উপলব্ধ হয়। আত্মা সমগ্র দেহজুড়ে পরিব্যাপ্ত এবং তার প্রভাবও সমগ্র দেহে বিস্তৃত। আত্মার উপস্থিতির কারণে দেহ নামক ক্ষেত্র এবং সমগ্র জগত বা বিশ্বরূপ ক্ষেত্রও আমাদের কাছে প্রকাশিত ও পরিচিত। আত্মা জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছু প্রকাশ বা উন্মোচন করে দেয়।

• **১৩.৩৫** জ্ঞানই মানুষকে সবকিছু বুঝতে সহায়তা করে। জ্ঞান অর্জন গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানের কারণে দৃষ্টি উন্মোচিত হলে মানুষ জানতে পারে ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কি? ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্যটি বুঝতে পারে। পার্থক্য বুঝতে পারলে মুক্তির উপায় জানতে পারেন। যিনি সে পন্থা সম্পর্কে জানেন তিনিই পরম গতি লাভ করতে পারেন।

বস্তুত উপায় জানলেই গতি লাভ হয় না। তবে এটা সত্য যে প্রথমে বিষয়গুলি জানতে হবে। জ্ঞান লাভ হলে মানুষ প্রেরণা পায়। অতঃপর মুক্তি লাভের ইচ্ছে হলে চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। পরিশেষে চেষ্টা, সাধনা বা কর্মটিই গুরুত্বপূর্ণ। তবেই পরম গতি লাভ করা সম্ভব হতে পারে।

ক্ষেত্র হচ্ছে জড়দেহ বা জড় প্রকৃতি। ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছে আত্মা। জড় দেহে ক্ষেত্রজ্ঞের প্রবেশ ঘটেছে। জড় প্রকৃতির সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে সে জড় দেহে আবদ্ধ হয়েছে। কর্ম করে চলেছে এবং ফল ভোগ করছে। কর্ম ও ফলভোগের এ চক্রে পড়ে তাকে বার বার ভাল-মন্দ যোনিতে জন্ম নিতে হচ্ছে। মুক্তি মিলছে না।

মুক্ত হতে হলে বন্ধন ছিন্ন করে বের হয়ে আসতে হবে। বলা হচ্ছে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্যটি যিনি জানেন প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থাটি তিনি জানেন। অর্থাৎ জড়দেহ ও আত্মা যে পৃথক সেটি সর্বপ্রথম বুঝতে হবে। অতঃপর দেহ কর্ম করলেও আত্মা বা নিজেকে জ্ঞানত দেহের কর্মে সম্পৃক্ত মনে করা যাবে না। দেহ দেহর কাজ করছে। কিন্তু নিজে উদাসীনবৎ অকর্তা হয়ে বিদ্যমান থাকতে হবে। তবেই পরম গতি বা মোক্ষ লাভ সম্ভব হবে। এটিই হচ্ছে গুণের অতীত নির্গুণ ভাব বা ব্রহ্মের স্বভাব।

চতুর্দশ অধ্যায় : গুণত্রয় বিভাগযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ২৭)

সারকথা : অধ্যায়ে প্রকৃতির ত্রিগুণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ত্রিগুণই জীবকে জড়দেহে বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। ত্রিগুণের উর্ধ্বে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারলে ভগবানের ভাব লাভ করা যায়। তখন আর জন্ম নিয়ে জড়দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় না। এটিই জড় প্রকৃতির বন্ধন থেকে জীবের মুক্তি। বন্ধন মুক্তিতেই সকল যন্ত্রনার অবসান। বিষয়গুলি জানা থাকতে হবে। তবেই মানুষ তার লক্ষ্য বিষয়ে অবগত হয়ে তা অর্জনে সচেষ্ট হতে পারবে।

ধর্মসমুহ সুখ-শান্তির যে বাণী শুনিয়ে থাকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানকে পাওয়া। ভগবানকে পেলে বন্ধন মুক্ত হয়ে চির সুখের জীবন লাভ করা সম্ভব। কিভাবে সেটি লাভ করা যাবে অধ্যায়ে সে বিষয়ে বলা হয়েছে।

১	শ্রীকৃষ্ণ বলেন: পুনরায় আমি তোমাকে সকল জ্ঞানের উত্তম জ্ঞান সম্পর্কে বলব, যা জেনে সকল মুনিগণ এ জগত থেকে পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন।
২	এই জ্ঞানে আশ্রয় নিলে আমারই প্রকৃতি লাভ করা সম্ভব। ফলে সৃষ্টিকালে জন্ম গ্রহণ করতে হয় না এবং প্রলয়কালে ব্যাথিতও হয় না।

● **১৪.১** আত্মা মুক্ত স্বাধীন। পরম প্রকৃতিজাত। ব্রহ্মভূত। কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না। অকর্তা। কিন্তু জড় জগতে এসে প্রকৃতির গুণের প্রভাবে জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অতঃপর স্বভাব অনুযায়ী কর্ম করে ভাল-মন্দ যোনিতে জন্ম নেয় এবং সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

প্রকৃতির যে গুণসমুহের কারণে আত্মা দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয় সে গুণসমুহ কি? কি তাদের বৈশিষ্ট? কিভাবে কাজ করে? এদের লক্ষণগুলি কি? ফলাফলই বা কি? কিভাবে এর বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হওয়া যায়? অধ্যায়ে সে সব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

অতীতেও মুনিগণ এ জ্ঞানকে আশ্রয় করেই সিদ্ধি লাভ করে দেহের বন্ধন থেকে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সে উত্তম জ্ঞান বিষয়ে বলছেন।

• **১৪.২** এ জ্ঞানে আশ্রয় করে চললে পরম প্রকৃতি লাভ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ ভগবানের ভাব বা স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করা যায়। ভগবান প্রকৃতির গুণ দ্বারা প্রভাবিত হন না। ফলে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হতে হয় না। সৃষ্টিকালে জন্ম নিতে হয় না এবং প্রলয়কালে কষ্টে পতিত হতে হয় না।

যাকে আমরা 'আমি' বা 'নিজ' বলে সম্বোধন করি সেই 'আমি' বা 'নিজ' হচ্ছে আমাদের দেহস্থিত 'আত্মা'। আত্মা হচ্ছে পরম প্রকৃতিজাত। অর্থাৎ ভগবানের অংশ হিসেবে ভগবানের প্রকৃতিজাত। তাই জীবাত্মারও জন্ম বা মৃত্যু নেই।

জীবাত্মা যখন দেহে আবদ্ধ হয় এবং জড় প্রকৃতির ত্রিগুণের প্রভাবের কবলে পড়ে তখন মোহগ্রস্ত হয়। সে স্বরূপ ভূলে স্বকিয়তা হারায়। জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে পড়ে যায়। বারবার জড়দেহ ধারণ করে। এ অবস্থা থেকে উদ্ধার হয়ে নিজস্বতায় ফিরে যেতে হবে। তাহলেই জড় জাগতিক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি মিলবে।

শ্রীকৃষ্ণ সেই উত্তম জ্ঞানের কথা বলছেন। যে জ্ঞানে চললে জড় প্রকৃতির ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়। জড়দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় না। ফলে সৃষ্টিকালে জন্ম নিতে হয় না। সৃষ্টিকালে যেহেতু জন্ম নিতে হয় না সেহেতু প্রলয়কালেও কষ্টে পতিত হতে হয় না। সকল যন্ত্রনার অবসান হয় এবং পরম শান্তি লাভ হয়। জন্ম-মৃত্যুর জীবন চক্র বা সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি মিলে। যেমন বলা হয়েছে,

"যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা বা দাস তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত ব্যাবস্থা। ... তারা বলবে, এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না প্রথম মৃত্যু ব্যাতিত। .. নিশ্চয়ই! এটিই মহাসাফল্য।" (আল-কোরআন ৩৭:৪০-৬০)

৩	হে ভারত! এই মহা প্রকাশই হচ্ছে ব্রহ্ম; আমার গর্ভাধানের স্থান বা যোনিস্বরূপ। তাতে আমি সৃষ্টির বীজ অর্পণ করি। তা থেকে সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়।
৪	হে কৌন্তেয়! সকল যোনিতে যে সমস্ত মূর্তীসমুহ উৎপন্ন হয়, ব্রহ্ম হচ্ছে তাদের সকলের মাতৃরূপ যোনি এবং আমি বীজদাতা পিতৃরূপ সত্ত্বা।

● **১৪.৩** এ মহাপ্রকাশই হচ্ছে ব্রহ্ম; অর্থাৎ এই প্রকৃতি; যে প্রকৃতিকে আমরা আমাদের সম্মুখে ব্যাক্ত বা প্রকাশিত দেখতে পাই। এটিই হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টি বা গর্ভাধানের স্থান বা যোনিস্বরূপ। এটি হচ্ছে ক্ষেত্র। ক্ষেত্রে চেতনরূপ সৃষ্টির বীজ বা ক্ষেত্রজ্ঞকে অর্পণ করা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞকে পূর্বের কর্মানুরূপ ক্ষেত্রের সাথে সংযোজন করা হয়। এই সংযোজন হচ্ছে গর্ভাধান। যা ভগবানের ইচ্ছেতে হয়ে থাকে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে জীবের উৎপত্তি হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনিই সেই আল্লাহ! যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমনিভাবে তিনি তুষ্ট হন তেমনিভাবে। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।" (আল-কোরআন ৩:৬)

মহাবিশ্ব যতটুকুকে আমরা প্রকৃতিরূপ প্রকাশিত বা ব্যাক্ত দেখতে পাই তাই ব্রহ্ম। সমগ্র আমাদের কাছে অপ্রকাশিত বা অব্যাক্ত। এই প্রকাশিত অংশটুকু যোনিস্বরূপ। বিশ্বরূপের গর্ভাধানের স্থান। জীবসমুহের সৃষ্টির স্থান। প্রতিটি সৃষ্টির বীজ এখানে অর্পন করা হয়। তাই এত এত জীবের উৎপত্তি। প্রকৃতি জীবসমুহের লালন-পালন করে। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই! তোমাদের পালনকর্তা এক। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী যা কিছু আছে সকল কিছুর পালনকর্তা তিনি।" (আল-কোরআন ৩৭:৪-৫)

● **১৪.৪** প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের যোনিতে সেই জীবের প্রতিরূপ যে সমস্ত মূর্তীসমুহ বা জীবের সৃষ্টি হয়, সেই স-ক-ল জীবের যোনিসমুহের মাতৃরূপ যোনি হচ্ছে ব্রহ্ম। অর্থাৎ আমরা যে জড় প্রকৃতিকে দেখি সেটি। সকল সৃষ্টির বীজ এই যোনিতে অর্পন করেন ভগবান। তাই পিতৃস্বরূপ বলা হয়েছে। বস্তুত তিনি জন্ম দেনও না, জন্ম নেনও না। যেমন বলা হয়েছে,

"বল: তিনিই আল্লাহ! ... তিনি জন্ম দেনও না! জন্ম নেনও না!" (আল-কোরআন ১১২:১-৪)

তিনি হচ্ছেন স্রষ্টা। সৃষ্টি করেন। তাই ব্রহ্ম থেকে অসংখ্য ব্রহ্মান্ড ও ব্রহ্মান্ডসমুহের সকল জীবসমুহের উদ্ভব ঘটে। পূর্বকৃত কর্মের বিচারে সৃষ্টির বীজ তদানুরূপ প্রাপ্য

যোনি বা ক্ষেত্রে অর্পন করেন ভগবান। জীব ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয় এবং প্রাপ্ত সেই দেহের প্রকৃতি অনুসারে সুখ-দুঃখ বা কর্মের ফল ভোগ করে।

৫	হে মহাবাহো! সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই গুণসমুহ প্রকৃতিজাত; যা অব্যয় জীবসত্ত্বাকে দেহে আবদ্ধ করে রাখে।

- **১৪.৫** ক্ষেত্র হচ্ছে জড় প্রকৃতি। কিন্তু জীবসত্ত্বা বা ক্ষেত্রজ্ঞ কোন জড় বিষয় নয়। জীবসত্ত্বা হচ্ছে অব্যয়-অক্ষয় বা বিকারহীন এবং চেতনা সম্পন্ন। এমন চৈতন্যসম্পন্ন গুণের ধারককে কিভাবে ক্ষেত্রে বেঁধে রাখা যাবে?

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হচ্ছে জড় প্রকৃতির তিন গুণ যা জীবাত্মাকে ক্ষেত্রে আবদ্ধ করে রাখে। আকর্ষন করে। জীব মোহগ্রস্ত হয়। তার প্রকৃত জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। মোহমুগ্ধ হয়ে নিজেই জড় বন্ধন ছেড়ে যেতে চায় না। কখনও অসহায় হয়ে ফিরে যেতে পারে না। জ্ঞান আচ্ছন্ন হওয়ায় স্বরূপ বিস্মৃত হয়। নিজের করণীয় ভূলে যায়। জগতে নিজেই আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। অথচ তার কর্তব্য ছিল ভগবানের সেবা করা।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সামনে সত্যের জ্ঞান তুলে ধরেন। যে জ্ঞান জড় জগতের মিছে বন্ধনের অসারতাকে বুঝতে সহায়তা করে। জীবনের লক্ষ্যকে বুঝতে সহায়তা করে। যুদ্ধের ময়দানে এসে অর্জুন যে ভ্রান্ত জ্ঞানে স্বধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এ জ্ঞানে তিনি তার অর্থহীনতা বুঝতে পারবেন।

একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে ভগবান বোধসম্পন্ন জগতবাসীর সামনে সত্যের জ্ঞান তুলে ধরেছেন। জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন মানুষ এর মধ্য দিয়ে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বিষয়ে জানতে পারবেন। মুক্তির পথের দিশা খুঁজে পাবেন এবং সে পথ অবলম্বন করবেন। ভগবান সকলের কাছে তেমনটি প্রত্যাশা করেন। তাই তিনি সমগ্র মানবজাতির সামনে কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জ্ঞান নামক এমন পথ নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন। বলা হচ্ছে,

“যে পথ নির্দেশনা অনুসরণ করে সে তা নিজের মঙ্গলের জন্যই করে। আর যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে সে তা নিজেরই বিপক্ষে করে।” (আল-কোরআন ১০:১০৮)

শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৬	হে নিষ্পাপ! এদের মধ্যে সত্ত্বগুণ সবচেয়ে নির্মল, প্রকাশকারী ও পাপশূন্য। সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ করে।
৭	রজোগুণ অনুরাগাত্মক। আকাঙ্খা ও আসক্তির উৎপাদক বলে জানবে। হে কৌন্তেয়! তা জীবকে কর্মের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে।
৮	হে ভারতপুত্র! তমোগুণ অজ্ঞতা জাত। সমস্ত জীবের মোহকারী বলে জানবে। মতিভ্রম, অলসতা, নিদ্রা এসব দ্বারা আবদ্ধ করে।

- **১৪.৬** উল্লেখিত তিনটি গুণের মধ্যে সাত্ত্বিক গুণকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। সত্ত্বগুণ উৎকৃষ্ট মানসিকতার প্রকাশ। সবচেয়ে নির্মল, স্বচ্ছ ও পাপশূন্য। বৈদিক মতে সত্ত্বগুণের অর্থ হচ্ছে উন্নত জ্ঞান ও অধিকতর সুখানুভূতি।

সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন মানুষই হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে যার সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা। এরা জ্ঞান অর্জনে আকৃষ্ট হন এবং জ্ঞানগত বিষয়ের সাধনায় তুষ্টি অনুভব করেন। এরা দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি, শিক্ষক বা জ্ঞানী হয়ে থাকেন।

যিনি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তিনি জড় জগতের দুঃখ-কষ্ট দ্বারা ততটা প্রভাবিত হন না। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত জীব সাধারণত পাপ কর্ম থেকে অনেকটা মুক্ত থাকেন। তাই তাদের ভেতরে আনন্দানুভূতি থাকে।

সাত্ত্বিক গুণ মোক্ষের অনুকূল হলেও পরিপূর্ণ মোক্ষের অবস্থা নয়। কেননা সত্ত্বগুণও মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করে। জ্ঞানী হওয়ার কারণে যেহেতু তাদের জীবনমান উন্নত হয় ফলে সুখের বাসনা দ্বারা তারা আবদ্ধ হয়। সুখের এ অবস্থা তারা পরিত্যাগ করতে চায় না। যতক্ষণ তাদের এমন আকর্ষন থাকবে ততক্ষণ তাদেরকে দেহ ধারণ করতে হবে। দেহ ধারণ করলে গুণের অধীন হতে হবে। অথচ মোক্ষাবস্থা হচ্ছে সকল গুণের অতীত বা উর্ধ্বের অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মাবস্থা।

সাধুসঙ্গ বা জ্ঞানের অহমিকাও তাদেরকে আবদ্ধ করে। আমিত্ববোধ থেকে অহমিকার উদ্ভব হয়। আমিত্ববোধ থাকলে মোক্ষলাভ হয় না। আত্মার অহঙ্কারকে নাশ করে পরমাত্মায় নিজেকে সমর্পন না করা পর্যন্ত সত্ত্ব জ্ঞানীও বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন। অতএব কিছুই আমার নয় এই ভাব লাভ করে গুণাতীত হতে হবে।

পরমেশ্বরে নিরবিচ্ছিন্ন ভক্তির মাধ্যমে তেমন গুণ অর্জন করা সম্ভব। সে পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে প্রথমে সত্ত্বগুণে অধিষ্টিত হতে হবে। অতঃপর সত্ত্বগুণকেও ছাড়িয়ে আরও উর্ধ্বে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে। তবেই পরমেশ্বরের ভাব লাভ করা সম্ভব হবে। তার জন্য মন থেকে সকল কামনা-বাসনা দুর হতে হবে।

● **১৪.৭** রাজসিক বা রজঃ গুণ হচ্ছে অনুরাগাত্মক বা বিষাদময়তার প্রকাশ। রজোগুণ জীবের মধ্যে অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্খা সৃষ্টি করে। আবার প্রাপ্ত বস্তুর প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করে। রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষ সকাম কর্মে লিপ্ত থেকে যতটা সম্ভব সম্পদ আহরণ করার চেষ্টা করে। তবে অনেকে সৎ কাজেও উপার্জিত অর্থ ব্যায় করে।

রজোগুণের বৈশিষ্ট হচ্ছে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষন। একে বলা হয় রজোগুণ। মানুষের মধ্যে যখন রজোগুণ বৃদ্ধি পায় তখন তার জাগতিক সুখভোগের আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। সে তখন ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করতে চায়। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য রজোগুণে অধিষ্ঠিত মানুষ সমাজে অথবা জাতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ কামনা করে এবং সুখী পরিবার কামনা করে। এগুলি হচ্ছে রজোগুণের প্রভাব।

মানুষ যখন এইসব কামনা করে তখন তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তারা কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়। ফলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্ত্রী-সন্তান ও সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য, মান-মর্যাদা বজায় রাখার জন্য তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সমগ্র জড় জগত বলা যায় প্রকৃতপক্ষে রজোগুণের ওপর অধিষ্ঠিত।

● **১৪.৮** তামসিক বা তমঃ গুণ হচ্ছে অজ্ঞতার প্রকাশ। জীব সত্ত্বাকে মোহগ্রস্তকারী। মতিভ্রম, অলসতা, ঘুম এসব দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। তমোগুণ উন্নতির পরিবর্তে অধঃপতিত করে। তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হলে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। এ ধরণের মানুষ অলস বা কর্মবিমুখ হয় এবং অতিরিক্ত ঘুম কাতর হয়। তারা জ্ঞান আহরণে মোটেও উৎসাহী নয়। কর্মেও উৎসাহী নয়। মাদকের প্রতি আসক্ত হয়। তমোগুণ সঠিক জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে। এরা না নিজের মঙ্গল না অপরের মঙ্গল করতে পারে। এখানে নিদ্রা অর্থ কেবল ঘুমই নয়, অমানিশা বা অজ্ঞতাকেও বোঝান হয়েছে।

৯	হে ভারত! সত্ত্বগুণ সুখের অনুভূতি দ্বারা আবদ্ধ করে, রজোগুণ কর্মের দ্বারা

	এবং তমোগুণ মতিভ্রমের দ্বারা জ্ঞান আবৃত করে আবদ্ধ করে।
১০	হে ভারতপুত্র! রজোগুণ ও তমোগুণকে পরাভূত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। এভাবেই সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করে রজোগুণ এবং একইভাবে সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করে তমোগুণ প্রবল হয়।

- **১৪.৯** জীবসত্ত্বা জড় প্রকৃতির সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই অবস্থাগুলি দ্বারা শর্তযুক্ত বা জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে যায়। সত্ত্বগুণ ত্রিগুণের মধ্যে সবচাইতে উত্তম। মোক্ষের অনুকূল। তথাপি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হলেও মোক্ষলাভ হয় না। এটিও বন্ধনের কারণ। সত্ত্বগুণ সুখানুভূতি ও জ্ঞানের সঙ্গ বা আসক্তি দ্বারা জীবকে জড় জগতে আবদ্ধ করে।

রজঃগুণ সকাম কর্মের আসক্তি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। সকাম কর্ম হচ্ছে যে কর্মের ফল কর্তা ভোগ করার বাসনা রাখে। অর্থাৎ তারা চিত্তের বাসনা পুরণার্থে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়। তমোগুণ মতিভ্রমের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করে এবং বন্ধনে আবদ্ধ করে। ফলে এদের দ্বারা না নিজের, না অপরের, না সমাজের কোন মঙ্গল হয়।

- **১৪.১০** প্রতিটি জীবের ভেতরে সকল গুণই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু একেক জনের ভেতরে একেকটি গুণ একেক সময়ে প্রবল হয়। এর পেছনে যেমন পূর্ব জনমের সংস্কারের একটি প্রভাব থাকে যা ভেতর থেকে স্বভাবরূপে কাজ করে; তেমনি প্রকৃতি ও পরিবেশেরও প্রভাব থাকে যা বাহির থেকে কাজ করে।

পারিপার্শ্বিক নানান বিষয়ের প্রভাবের কারণে জীবের ভেতরে এই তিন গুণের আধিপত্য বিস্তারের একটি প্রতিযোগীতা সব সময় চলমান থাকে। অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণকে পরাভূত করে কখনও সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। একইভাবে সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করে রজোগুণ এবং এভাবেই সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করে কখনও তমোগুণ প্রবল হয়। ফলে একেকজন একেকভাবে জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তবে জীবের আবদ্ধতার কারণ এই ত্রিগুণ।

গুণসমুহের এই প্রতিযোগীতা বা পরিবর্তনের সুযোগ থাকার বিষয়টি একটি আশীর্বাদস্বরূপও বলা চলে। কেননা কেউ যদি সচেষ্ট হয় তবে সে ক্রমান্বয়ে তমঃ থেকে সত্ত্বে উন্নীত হতে পারে। এর ফলে নিম্ন থেকে উচ্চতর পর্যায়ে আরোহন করার

সম্ভাবনার দুয়ার খোলা থাকে। সকল গুণের উর্ধ্বে উঠে মুক্তি লাভে নিজেকে সক্ষম করে তুলতে পারে। অন্যথায় তমোগুণ থেকে কোনদিন কেউ মোক্ষলাভ করতে পারত না। তবে নিঃসন্দেহে মোক্ষের জন্য নিজ প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন বলা হয়েছে,

"মানুষকে পথ চলার ভিন্ন ভিন্ন দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি- ভাল ও মন্দ। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি উন্নতর বা উচ্চতর পর্যায়ে আরোহনের।" (আল-কোরআন ৯০:১০-১১)

১১	যখন এই দেহে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে তখনই সত্ত্বগুণ প্রবল হয়েছে বলে জানবে।
১২	হে ভারতশ্রেষ্ঠ! রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে লোভ, কর্ম করার ইচ্ছা, কর্ম উদ্যোগ, অস্থিরতা, বিষয়-ভোগে আসক্তি ও বাসনার সৃষ্টি হয়।
১৩	হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে অজ্ঞতা-অন্ধকারাচ্ছন্নতা, নিষ্ক্রিয়তা, মতিবিভ্রম, মোহগ্রস্ততা উৎপন্ন হয়।

• **১৪.১১** কিভাবে জানা যাবে যে কার ভেতরে কোন গুণটি অধিক সক্রিয়? বলা হচ্ছে, দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয়দ্বার যখন তীক্ষ্ণ চেতনা সম্পন্ন হয়ে ওঠে, মস্তিষ্কে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে তখন বুঝতে হবে যে সে মানুষের ভেতরে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়েছে। এইগুণে অধিষ্ঠিত হলে দর্শন, শ্রবন সবকিছু যথাযথ হয়। অন্তরে নির্মল ও পবিত্র ভাব আসে। চেহারায় সুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সেটি সাত্ত্বিক অবস্থা।

• **১৪.১২** রজোগুণে গুণান্বিতরা লোভ দ্বারা চালিত হয়। লোভের কারণে কর্মস্পৃহাও বৃদ্ধি পায় ও কর্মে উদ্যোগী হয়; তবে প্রাপ্তির বাসনায় চিত্তে অস্থির ভাব কাজ করে। তারা বিষয়ভোগে ভীষনভাবে আসক্ত হয়। চিত্তে কখনই সন্তুষ্টি আসে না। একটির পর একটি বাসনা তাদের লেগেই থাকে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে তাদের থাকে প্রচন্ড আসক্তি। এসবের কোন শেষ নেই। এইগুলি রজোগুণের বৈশিষ্ট।

• **১৪.১৩** তমোগুণে অজ্ঞতা কাজ করে। অজ্ঞতার কারণে নিষ্ক্রিয়তা কাজ করে। তাদের চিন্তায় সুস্থতা কাজ করে না। মতিভ্রম হয়। কোন কিছুতে মোহগ্রস্ত হয়ে জীবনের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করে। সঠিক জ্ঞান ও চেতনা কাজ করে না। এগুলি

তমোগুণের লক্ষণ। তামসিক মানুষ নিয়মে চলে না। খেয়াল-খুশী মতো চলে। উদ্দেশ্যবিহীন আচরণ করে।

১৪	দেহধারী জীব যখন সত্ত্বগুণ বর্ধিতাবস্থায় প্রলয় তথা মৃত্যুমুখে পতিত হন- তারা মহর্ষিদের উত্তম ও নির্মল লোকসমুহ প্রাপ্ত হন।
১৫	রজোগুণে মৃত্যু হলে কর্মের ফলভোগের বাসনায় আসক্তদের সংসর্গে জন্ম হয়। তেমনই তমোগুণে মৃত্যু হলে- মূঢ় যোনিতে জন্ম নেয়।

- **১৪.১৪** সাত্ত্বিক গুণ বর্ধিতাবস্থায় যখন কারও মৃত্যু হয় তারা মহর্ষিদের উত্তম ও নির্মল লোকসমুহ প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মালোক বা উচ্চতর গ্রহলোকে গমন করেন এবং স্বর্গসুখ ভোগ করেন। সেখানে মহাঋষি ও ভগবানের মহান ভক্তরা বাস করেন। যেমন বলা হয়েছে,

".. অবশ্যই আল্লাহ ভালদের থেকে মন্দদের পৃথক করবেন।" (আল-কোরআন ৩:৯)

- **১৪.১৫** রজোগুণে মৃত্যু হলে কর্মের ফলভোগের বাসনায় আসক্তদের সংসর্গে জন্ম হয়। তমোগুণ বর্ধিত অবস্থায় মৃত্যু হলে আত্মা অধঃপতিত হয়। এমনকি পশুযোনি পর্যন্ত প্রাপ্ত হতে পারে। এটিই নারকীয় জীবন। তাদের জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গের রাজ্যেও জন্ম হতে পারে। যেমন বলা হয়েছে,

".. দুষ্টদের সকলকে তিনি এক এক করে সমবেত করবেন এবং তাদেরকে নরকে প্রেরণ করবেন।" (আল-কোরআন ৮:৩৭)

এমন পরিণতিতে পতিত হলে জীবকে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে দেহান্তরীত হতে হতে পুনরায় মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এককোষ বিশিষ্ট জীব থেকে মনুষ্য প্রজাতিতে উপনীত হতে লক্ষ লক্ষ যোনি অতিক্রম করে আসতে হয়। জীবের কোন জন্মে কত যোনী অতিক্রম করতে হয় শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে। যেমন স্থাবর জন্মে ২০ লক্ষ, জলচর ৯ লক্ষ, কূর্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ এবং বানর প্রজাতিতে ৪ লক্ষ যোনী অতিক্রম করে তারপর মনুষ্য জন্ম লাভ করতে হয়। অতঃপর কর্ম সাধন দ্বারা দেব জীবন লাভ করার যোগ্য হতে পারে।

এসব জ্ঞান জানা থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। জানা থাকলে মানুষ কর্মের পরিণতি বিষয়ে জানতে পারবে এবং করণীয়ও বুঝতে পারবে। সকলের উচিত নিজেদেরকে সাত্ত্বিক আচরণের দিকে উন্নীত করা। সেটি মানব জীবনের আপাত লক্ষ্য বলা যেতে পারে।

শাস্ত্রে তাই গুণভেদ অনুসারে কর্মভেদ ও উপাসনা প্রণালীরও ভেদ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সব সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তমঃ ও রজঃ গুণকে প্রশমিত করে সত্ত্বঃ গুণে উৎকর্ষ সাধন করা। ফলশ্রুতিতে সত্ত্বঃ গুণকেও অতিক্রম করে ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং প্রকৃতির বন্ধন দশা থেকে মুক্ত হওয়া।

মনুষ্যত্বের পরবর্তী সোপান হচ্ছে ব্রহ্মত্ব লাভ করা। ব্রহ্ম নির্গুন। প্রকৃতির গুণ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। মানুষকেও সে পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে। তবেই জাগতিক সকল যন্ত্রনা থেকে সত্যিকারের মোক্ষ বা মুক্তি লাভ হবে।

১৬	সাত্ত্বিক পূণ্য কর্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখময় এবং তামসিক কর্মের ফলকে অজ্ঞতা বলা হয়।
১৭	সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ থেকে লোভের সৃষ্টি হয় এবং তমোগুণ থেকে অজ্ঞতা, প্রমাদ ও মোহাচ্ছন্নতার জন্ম হয়।
১৮	সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যাক্তিগণ উর্ধ্বলোকে গমন করে। রজোগুণসম্পন্ন ব্যাক্তিগণ মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে এবং জঘন্য গুণ-বৃত্তিসম্পন্ন তামসিক ব্যাক্তিগণ নিম্নে গমন করে।

• **১৪.১৬** সাত্ত্বিক কর্ম পূণ্য কর্ম। পূণ্য কর্মের ফল নির্মল ও সুখপ্রদ হয়। তাই সাত্ত্বিক কর্মের ফল পবিত্র ও সুখপ্রদ। রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ বা বিষাদময় হয়। কেননা রজোগুণে মানুষ অত্যান্ত বাসনা প্রবণ হয়। তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার কোন অন্ত নেই। মর্যাদা বা অবস্থান ধরে রাখার বসনায় তাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হতে হয়। ফলে রাজসিক কর্মে পেশা ও বৃত্তি ক্লেশকর হয়। শারীরিক ও মানসিক শান্তি আসে না।

তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞতা। তমোগুণে মানুষ অজ্ঞতার গভীর অমানিশায় পতিত হয়। মাদকাসক্ত হয়। উন্মাদ হয়ে ওঠে। জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।

প্রকৃত সুখ পেতে হলে তাই সত্ত্বগুণে উন্নীত হতে হবে। সমগ্র জগত যদি রজঃ ও তমোগুণের দাসত্ব করে তবে প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। যদি সমাজের কিছু মানুষও সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয় তাহলে শান্তির সম্ভাবনা থাকে।

- **১৪.১৭** সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঈশ্বরীয় অনুভূতি উৎপন্ন হয়। রজোগুণ লোভের সৃষ্টি করে এবং তমোগুণ প্রমাদ, মোহাচ্ছন্নতা ও অজ্ঞতার জন্ম দেয়।
- **১৪.১৮** সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যাক্তিগণ উর্ধ্বলোকে গমন করে। জগতের উর্ধ্বে স্বর্গলোক আছে। সেখানে সকলে অত্যান্ত উন্নত। সত্ত্বগুণের মাত্রা অনুসারে উচ্চতর লোকসমুহের ভিন্ন ভিন্ন লোকে জীব উন্নীত হয়। বলা হচ্ছে,

"... পরকালে তোমার পালনকর্তার কাছে আছে জীবিকার নানান উপকরণ, তাদের জন্য যারা নিজেদেরকে মন্দ কর্ম ও পথ থেকে রক্ষা করে চলে।" (আল-কোরআন ৪৩:৩৫)

সর্বোচ্চলোক হচ্ছে সত্যলোক বা ব্রহ্মালোক। যেখানে ব্রহ্মান্ডের প্রধান পুরুষ ব্রহ্মা বাস করেন। শ্রেষ্ঠ অবস্থা সত্ত্বগুণ মানুষকে এই স্তরে উন্নীত করতে পারে। তবে সত্ত্বগুণে স্বর্গে গমন হলেও মোক্ষ লাভ হয় না। স্বর্গ থেকেও কর্মদোষে পতন হতে পারে।

রজঃ গুণসম্পন্ন ব্যাক্তিগণ মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। অর্থাৎ কেউ যদি পরিপূর্ণভাবে রজোগুণে থাকে তাহলে সে ধনি কিংবা ক্ষমতাবান হয়ে এই পার্থিব জগতে তথা নরলোক বা মানবলোকে অবস্থান করতে পারে।

রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণের মাধ্যবর্তী অবস্থা। তবে গুণসমুহের মিশ্রিতভাব থাকার কারণে এ ধরণের গুণসম্পন্ন মানুষের উচ্চে গমন কিংবা নিম্নে পতিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। যেমন বলা হয়েছে,

"স্বর্গবাসীরা নরকবাসীদের আহবান করে বলবে, 'আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আমরা সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছ?' তারা বলবে 'হাঁ, অবশ্যই।' ... উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর বা পর্দা থাকবে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। ... যদিও তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি তবে আকাংখা রাখে।" (আল-কোরআন ৭:৪৪-৪৬)

বলা হচ্ছে, আরাফে অবস্থানকারীরা মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে। তারা সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান থাকবে। কেননা তাদের ভাল কাজ এতটা শক্তিশালী নয় যার জন্য তারা স্বর্গে যেতে পারে; আবার তাদের মন্দ কাজও এতটা দুর্বল নয় যার জন্য তারা নরকে গমন করবে না (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৭:৪৪-৫৩)।

জঘন্য গুণ ও বৃত্তিসম্পন্ন তামসিক ব্যাক্তিগণ নিম্নে গমন করে। তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে থাকার ফল বিপজ্জনক। এটি হচ্ছে এই জড় প্রকৃতির সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুণ। মনুষ্য জন্মের নীচে পক্ষী, পশু, সরীসৃপ, বৃক্ষ ও লক্ষ লক্ষ প্রজাতি রয়েছে এবং তমোগুণের প্রভাব অনুসারে মানুষ সেই সমস্ত জঘন্য অবস্থায় পতিত হয়। নিচু পর্যায়ে বা নরকের দিকে গমন করে। এদের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন বা অন্ধকার। তাদেরকে উচ্চে উন্নীত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং সেজন্য প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। বলা হচ্ছে,

"নরক। সেখানে তারা পুড়তে থাকবে যা দুষ্টদের বিশ্রামাগার। এখানে রয়েছে উত্তপ্ততা ও হিম শীতলতা। .. রয়েছে এ রকমের চরম পর্যায়ের আরও শাস্তি।" (আল-কোরআন ৩৮:৫৬-৫৮)

ত্রিগুণই হচ্ছে দেহ প্রপ্তি বা বিভিন্ন যোনি প্রাপ্তির কারণ। যারা এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করতে পারেন তারাই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। মোক্ষ লাভ করেন। বলা হচ্ছে,

"তোমার প্রতিপালক! তিনিই সকল কর্ম-প্রচেষ্টার সর্বশেষ লক্ষ্য।" (আল-কোরআন ৫৩:৪২)

"আল্লাহর সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (আল-কোরআন ১১:৪)

১৯	দ্রষ্টা যখন দেখেন যে এই গুণসমুহ ব্যাতিত কর্মে অন্য কোন কর্তা নেই এবং গুণসমুহের অতীত পরমাত্মাকে জানতে পারেন- তখন তিনি সেই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব বা ত্রিগুণের উর্ধ্বের অবস্থা লাভ করেন।
২০	জীব দেহে উদ্ভূত এই ত্রিগুণ অতিক্রম করে জন্ম-মৃত্যু, জরা-দুঃখ থেকে বিমুক্ত হয়ে অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ করেন।

• **১৪.১৯** বিষয়সমুহকে যিনি যথাযথভাবে দর্শন করেন তিনি দেখেন যে, বস্তুত তিনি নিজে কিছু করেন না। অর্থাৎ আত্মা কিছু করে না। পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রভাব এবং গুণ থেকে সৃষ্ট জড় দেহের ভাব বা স্বভাব দেহকে এক এক ধরণের কাজ করতে বাধ্য করে। অর্থাৎ জীব বা আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ কর্মের প্রকৃত কর্তা নয়। সে কোন কাজ সৃষ্টি করে না, করে না এবং করায়ও না। উদাসীনবৎ, নির্লিপ্ত-নির্বিকার তথা অকর্তা। ব্যাহ্য পরিবেশ ও প্রকৃতি কোন ক্রিয়া দ্বারা জড়দেহকে আন্দোলিত করে। দেহ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবৎ স্বভাব অনুসারে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। তাতেই জীব কর্ম করছে বলে মনে করা হয়। অতএব গুণসমুহই হচ্ছে কর্মের প্রকৃত কর্তা।

বিষয়সমুহকে যিনি এভাবে বুঝতে শিখেছেন তিনি নিজেকে কর্মের কর্তা মনে করেন না। এ জ্ঞানে তার কর্মজনিত আমিত্ববোধ লোপ পায়। তখন তিনি নিজের ভেতরে উপস্থিত গুণসমুহের অতীত পরমাত্মাকে বুঝতে শেখেন। কেবল তখনই তিনি সেই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব বা ত্রিগুণের উর্ধ্বের নির্গুণ অবস্থা লাভ করার জ্ঞান বা যোগ্যতা অর্জন করেন।

কর্মের প্রকৃত কর্তা প্রকৃতি। তবে পেছনে ভগবান। কেননা প্রকৃতি ভগবানের অধীন। প্রকৃতি ও স্বভাব দেহকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। যখন কেউ বিষয়গুলিকে এভাবে বুঝতে পারেন তখন তিনি প্রক্রিয়াটি জানতে পারেন এবং সেই ভাব লাভ করার যোগ্য বিবেচিত হন। তাই বলা হয়েছে যে, সে সেই ভাব লাভ করে। বস্তুত সেই ভাব লাভ করতে হলে কেবল জানলে হবে না। তা অর্জনের জন্য সাধনাও করতে হবে। ত্রিগুণের উর্ধ্বের এ ভাবই হচ্ছে ব্রহ্মভাব। কেননা ব্রহ্ম নির্গুণ। কোন গুণ তাকে বিচলিত বা প্রভাবিত করতে পারে না।

উল্লেখ্য যে পূর্ব জনমের কৃত কর্ম, ইচ্ছে ও প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারে জীব ভিন্ন ভিন্ন জড়দেহ প্রাপ্ত হয় বা কোন বিশেষ দেহে আবদ্ধ হয়। ফলে সেই দেহের প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারে বদ্ধ জীব জড় জগতে কর্ম করতে বাধ্য হয়। প্রাপ্ত দেহ অনুসারে কর্ম করে সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

• **১৪.২০** জড় দেহে বিদ্যমান থাকা সত্বেও ওপরোক্ত জ্ঞানে যিনি জ্ঞানান্বিত হন, তিনি প্রকৃতির গুণসমুহের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। এমনকি বর্তমান দেহে বসবাস করেও দিব্য জীবনের অপ্রাকৃত আনন্দ ও অমৃতসূধা পান করেন। এর ফলে

জীব জন্ম-মৃত্যু, জরা-দুঃখ থেকেও বিমুক্ত হন। তাই উদ্ধৃত প্রক্রিয়াটিকে ভালভাবে বুঝতে হবে। গীতায় সে দিক-নির্দেশনাই দেয়া হয়েছে। অর্জুন বলেন,

২১	হে প্রভূ! কি কি লক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে জীব এ ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন? কেমন তাঁর আচরণ এবং কিভাবে এই তিন গুণ অতিক্রম করেন?

• **১৪.২১** কিভাবে জানা যাবে যে একজন ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হলে? কি তাদের লক্ষণ? কেমন তাদের আচরণ এবং কিভাবেই বা তাঁরা গুণের প্রভাব অতিক্রম করেন? অর্জুন বিষয়গুলি জানতে চান। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২২	হে পাণ্ডুপুত্র! জ্ঞান, কর্মপ্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভূত হলেও যে দ্বেষ করে না এবং সেগুলি নিবৃত হলেও আকাঙ্খা করে না,
২৩	উদাসীনের মতো স্থিত এবং গুণসমুহের দ্বারা বিচলিত নয়; কেবল গুণসমুহ স্বীয় কার্যে প্রবৃত্ত হয় এভাবে জেনে যে অবস্থান করে এবং চঞ্চল হয় না;
২৪	সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন, যে স্বরূপে অবস্থিত এবং মাটির ঢেলা, পাথর ও স্বর্ণের টুকরোকে যে সমদৃষ্টিতে দেখে; প্রিয়-অপ্রিয়, নিন্দা-স্তুতি বিষয়ে যে সমভাবাপন্ন ও ধৈর্য্যশীল;
২৫	মান-অপমানে যে সমভাবাপন্ন; শত্রু-মিত্রে যে সমজ্ঞানসম্পন্ন এবং সকল প্রচেষ্টা বা কর্ম উদ্যোগ পরিত্যাগী- সে প্রকৃতির গুণসমুহের উর্ধ্বে স্থিত বলে বলা হয়।

• **১৪.২২-২৩** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সত্ত্বগুণের প্রভাবে জ্ঞান, রজোগুণের প্রভাবে কর্ম-প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের প্রভাবে মোহ আবির্ভূত হলেও যিনি কোন প্রকার দুঃখবোধ থেকে ভেতরে দ্বেষ পোষন করেন না এবং সেগুলি নিবৃত হলেও যিনি সুখবোধ থেকে কোন কিছুর আকাংখাও করেন না তেমন লক্ষণ দেখে বোঝা যাবে যে সে মানুষ গুণাতীত।

যিনি সবকিছু দেখছেন-শুনছেন কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া করছেন না, উদাসীনবৎ স্থিত, গুণসমুহের দ্বারা মোটেও বিচলিত নন অর্থাৎ ত্রিগুণের কোন গুণ তাকে কোন কর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করতে পারে না; দেহ কর্ম করলেও যিনি মনে করেন যে

গুণসমুহ জড় দেহের ওপর কর্মরত আছে; আমার সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক নেই- আমি অকর্তা এবং এভাবে মনে করার কারণে যিনি অচঞ্চল থাকতে পারেন তিনিই গুণাতীত।

জীব যখন গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে তখন সে দেহের বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারছে, ততক্ষণ তাকে গুণের প্রভাবের প্রতি উদাসীন থাকার চেষ্টা করতে হয়।

● **১৪.২৪-২৫** এমন মানুষ সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন হন। তিনি জানেন জীবনের মতো এগুলিও অনিত্য বিষয়। চিরস্থায়ী নয়। কিছু দিন বা সময়ের জন্য কেবল সহ্য করে যেতে হবে। এগুলিতে তিনি বিচলিত হন না। দুঃখেও তিনি কাতর হন না, সুখেও অতি উদ্বেলিত হন না।

এমন মানুষ স্বরূপে স্থিত। তিনি জড় জগতের মিছে মায়া ও নিজ স্বরূপ তথা ভগবানের সাথে সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন ও অবগত। তাই সবকিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তার কাছে মাটির ঢেলা, সোনা, পাথর সব সমান। কোন কিছু তাঁর কাছে পৃথকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন কিছুই তাঁকে তাঁর স্বরূপ থেকে বিচ্যূত করতে পারে না। তাঁর প্রিয় বলে কিছু নেই, অপ্রিয় বলেও কিছু নেই। নিন্দা-স্তুতিতেও সমভাবাপন্ন ও ধৈর্য্যশীল। কেননা ভগবানই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। অন্য কোন কিছু বা কোন বিষয়ে তিনি আগ্রহী নন।

মান-অপমানে এমন মানুষ বিচলিত হন না। জগতে কে তাঁকে সন্মান দিল কিংবা কে তাঁকে সন্মান দিল না এটি তাঁর কাছে আদৌ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাঁর কাছে কেবল ভগবানই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ধৈর্য্যশীল। ভগবানের দেয়া ফলাফল বিষয়ে আগ্রহী।

সকল প্রচেষ্টা বা কর্ম উদ্যোগ পরিত্যাগী। তিনি জানেন জগতে তাঁর কিছু করণীয় নেই। কেবল ভগবানের সেবা করা ব্যাতিত। সেটিই প্রকৃত কর্ম। তাই সুখ-স্বচ্ছন্দ, ভোগ-উপভোগ জাতীয় কর্ম উদ্যোগ পরিত্যাগ করেন। এমনই তাঁদের লক্ষণ।

তবে বুঝতে হবে যে এসব গুণ অর্জন করা কোন সাধারণ বিষয় না। দেহধারীদের জন্য এভাবে চলা কঠিন। তারা প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করবেই। জাগতিক বিষয়ে আসক্ত হবেই। কিন্তু এতদ্বসত্বেও সম্পর্ক যাদের পরমেশ্বরের সাথে গভীর, দৃষ্টি তাঁদের শুধু

ঈশ্বরেই নিবিষ্ট থাকে। অন্য সকল কিছু তাদের কাছে তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। তাই তারা নির্বিকার ও উদাসীনবৎ থাকতে পারেন। ঈশ্বর প্রীতিই এর একমাত্র কারণ। এমন মানুষই ত্রিগুণাতীত বা নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত। কিভাবে তারা ত্রিগুণকে অতিক্রম করতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৬	ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে যে আমার সেবা করে, সে প্রকৃতির এই সমস্ত গুণসমুহকে অতিক্রম করে এবং ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হয়।
২৭	এবং আমিই সেই ব্রহ্মের অব্যয় ও শাশ্বত আশ্রয় এবং ধর্মীয় সুখের একান্ত কাম্য অমৃত বা মোক্ষ।

● **১৪.২৬** ভগবানের অংশ বা প্রকৃতিজাত বলে জীব বা জীবাত্মা প্রকৃতিগতভাবেই ব্রহ্মভূত। ত্রিগুণের অতীত। এটিই তার স্বরূপ, প্রকৃত রূপ বা বৈশিষ্ট। কিন্তু কোন কারণে দেহে আবদ্ধ হওয়ার ফলে জড় প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে মোহগ্রস্ত হয়। ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্তি দ্বারা কলুষিত হয়। জড় জগতের সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের কোন একটির আকর্ষনে দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়। কর্তব্য বিস্মৃত হয়। জগতে আধিপত্য করার বাসনা জাগ্রত হয়। ত্রিগুণের এসব প্রভাব অতিক্রম করা কঠিন।

বলা হচ্ছে, ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে যিনি ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন, কেবলমাত্র তেমন মানুষই প্রকৃতির এইসকল গুণকে অতিক্রম করতে পারেন এবং ব্রহ্মভূত স্তরে তথা নির্গুণ স্তরে উন্নীত হতে পারেন। নির্গুন ভাব বা ব্রহ্মভূত হলে গুণসমুহের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়। তাই বলা হয়েছে,

"... তোমার প্রতিপালকের প্রতি কর্তব্য পালনে মনযোগী হও এবং ভাল কাজ কর। আবার বলি তোমার কর্তব্য পালনে মনযোগী হও এবং বিশ্বাস স্থাপন কর। আরও একবার বলি তোমার কর্তব্য পালনে মনযোগী হও এবং সঠিক কাজ কর। আল্লাহ সৎকর্মীদের ভালবাসেন।" (আল-কোরআন ৫:৯৩)

ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখলে বা তাঁর প্রতি যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করলে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হওয়া সহজ হয়। ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি পরম ভক্তিই পারে মানুষকে জগতের মিছে মায়া অতিক্রম করে সেই স্তরে নিয়ে

যেতে। ভগবানে মনোনিবেশ করে বুদ্ধি ও মনকে বিষয় বাসনা থেকে দুরে রাখা হয়। অতঃপর যখন জ্ঞানসম্মতভাবে ভগবানে মগ্নতার স্তরে উন্নীত হওয়া যায় তখন লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে হলে তাঁর মতো বা তাঁর পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে। জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভূত স্তরে পৌঁছাতে হবে। গুণগতভাবে ব্রহ্মের সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারলে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব হয়। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহর সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (আল-কোরআন ১১:৪)

এটিই লক্ষ্য। ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়ার এ ধারণাকেই সাংখ্যমতে 'কৈবল্য' বলে। চিত্তের এই শুদ্ধিই হচ্ছে যথার্থ 'মুক্তি' বা 'নির্বান'।

জগত দুঃখময়। দুঃখের কারণ হচ্ছে ত্রিতাপ। ত্রিমুখী দুঃখ। এগুলি হচ্ছে অধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও অধিদৈবিক। যেমন হিংস্র জন্তু-দানবের কারণে উদ্ভূত দুঃখ হচ্ছে অধিভৌতিক। জরা-ব্যাধিজনিত দুঃখ হচ্ছে আধ্যাত্মিক এবং দৈব দুর্যোগজনিত দুঃখ হচ্ছে অধিদৈবিক। সাংখ্যের কৈবল্য ও বৌদ্ধের নির্বানে এসব দুঃখ থেকে নিবৃতির কথা বলা হয়েছে। তবে আনন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। উপনিষদের ব্রহ্ম দুঃখ নিবৃতির উর্ধ্বে আনন্দময়।

উল্লেখ্য যে, সাধনার মাধ্যমে যিনি ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত হন বা ব্রহ্ম জ্যোতিতে অধিষ্ঠিত হন গুণগতভাবে তিনি পরম পুরুষোত্তম বা সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা ভগবানের সমপর্যায়ে উন্নীত হন। ভগবানের সমপর্যায়ভূক্ত হওয়া কি আদতেই সম্ভব?

বলা হচ্ছে, প্রথম মানব-মানবী আদম ও হাওয়া স্বর্গে বসবাস করতেন। শয়তান কুমন্ত্রনা দিয়ে বলল,

"... তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য এ বৃক্ষ এ কারনেই নিষিদ্ধ করেছেন যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা কিংবা চিরজীবি হয়ে যাও।" (আল-কোরআন ৭:২০)

বাইবেলে বলা হয়েছে সর্প অ্যাডাম ও ইভকে কুমন্ত্রনা দিয়ে বলল, "গড জানেন যে, যদি তোমরা এ গাছের ফল খাও তবে তোমাদের দৃষ্টি উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং তোমরা গডের সমপর্যায়ে ভাল ও মন্দের জ্ঞান প্রাপ্ত হবে।"

উদ্ধৃতি দু'টি এখানে কেন তুলে ধরা হয়েছে? অর্থাৎ বাইবেল-কোরআন সকল গ্রন্থেই আল্লাহ বা গডের সমপর্যায়ের গুণ লাভের বিষয়ে ইংগীত দেয়া হয়েছে সেটি তুলে ধরার জন্য। সে পর্যায়ে উন্নীত হওয়া সম্ভব। কোন না কোন উপায় আছে। গীতায় সে পথই সত্যের আলোকে বাস্তব ও যুক্তিসম্মতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

- **১৪.২৭** ভগবানের তিনটি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ হচ্ছে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরম জীবসত্ত্বা স্বয়ং ভগবান। অতএব ভগবৎ তত্ত্ব বুঝতে হলে এই তিনটি বিষয়কে স্বচ্ছভাবে বুঝতে হবে।

পরমার্থ উপলব্ধির প্রথম স্তর হচ্ছে ব্রহ্ম উপলব্ধি। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে পরমাত্মার উপলব্ধি। পরমতত্ত্বের চরম স্তরের উপলব্ধি হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম বা সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা ভগবানকে উপলব্ধি করা। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা এদের উভয়টিই হচ্ছে পরম পুরুষ বা জীবসত্ত্বা ভগবানের অধীন।

ওপরে ব্রহ্ম বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই মহা প্রকাশ হচ্ছে ব্রহ্ম; যে প্রকৃতিতে জীব বসবাস করে। এর ব্যাক্ত ও অব্যাক্ত দু'টি ভাব আছে। প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৃতি কোথায় স্থিত? বলা হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন [দ্রষ্টব্য গীতা ৮:২২]। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আল্লাহ সর্বসময়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন।" (আল-কোরআন ৪:১২৬)

ভগবান হচ্ছেন অব্যয়-অক্ষয়, অনাদি-অনন্ত। তিনিই অক্ষর। ভগবান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। ব্রহ্মেরও আশ্রয় বা অধিষ্ঠান স্থল হচ্ছেন ভগবান। ব্রহ্ম ভগবানকে আশ্রয় করেই স্থিত। ব্রহ্মের হচ্ছে নির্গুণ ভাব। কিন্তু ভগবানের ভাব সগুন ও নির্গুণ।

ধর্ম আমাদেরকে সুখ ও শান্তির বাণী শোনায়। সুখ ও শান্তিই হচ্ছে জীবনের একান্ত কাম্য বিষয়। যা প্রাপ্ত হলে জাগতিক যন্ত্রনা থেকে মুক্তি লাভ হয়। জীব যে সুখ ও শান্তির অন্বেষনে ছুটে বেড়াচ্ছে তাও লাভ করা সম্ভব হয়। বলা হচ্ছে, ভগবানই হচ্ছেন সে ধর্মীয় অমৃত সুখের একান্ত কাম্য বিষয়। তিনিই লক্ষ্য। ভগবানকে লাভ করলেই সে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায়। মোক্ষের লক্ষ্যও হচ্ছেন ভগবান। যিনি ব্রহ্ম জ্যোতিতে অধিষ্ঠিত হতে পারেন তিনি গুণগতভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের

সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারেন। যা কিনা সকল ধর্মে উদ্ধৃত একমাত্র পরম শান্তির আশ্রয় স্থল। অতএব অমৃত সুখ পেতে হলে ভগবানকে পেতে হবে। ভগবানকে কিভাবে পাওয়া সম্ভব গীতা সে পথই প্রদর্শন করেছে। বলা হচ্ছে,

"পরিশেষে সকল কর্মের পরিণামই আল্লাহ অভিমুখীন।" (আল-কোরআন ৪২:৫৩)

"আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত এক সঠিক প্রতিশ্রুতি।" (আল-কোরআন ১০:৪)

পঞ্চদশ অধ্যায় : সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা

(শ্লোক সংখ্যা ২০)

সারকথা : অধ্যায়ে প্রতীকী একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের উদাহরণ তুলে ধরে সৃষ্টি তথা জগতের উৎপত্তি ও এর বিস্তৃতি বিষয়ে ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। জীব কিভাবে জড় জগতে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে, জীবনের লক্ষ্য কি এবং কিভাবেই বা তাকে সেই লক্ষ্যে তথা বন্ধন মুক্ত হয়ে উৎসে ফিরে যেতে হবে সে বিষয়ে বলা হয়েছে। জীবন ও জগত সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র বৃক্ষের উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

জীবন ও জগত সম্পর্কিত সঠিক ধারণা থাকলে জাগতিক ক্ষুদ্র কোন বিষয়ে মানুষের শোকে কাতর হওয়ার কথা না। জীবন ও জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকার কারণেই মানুষ জাগতিক বিষয়গুলিতে অতি মনযোগী হয় এবং বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অধ্যায়ে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিষয়ে ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। যা জানার পর জড় বন্ধনের কারণে অনর্থক শোকে বিহ্বল না হয়ে মানুষ যথাযথ জ্ঞানে কর্মে মনোনিবেশ করতে উদ্বুদ্ধ হবে এবং মোক্ষ লাভে তৎপর হবে। এটিই জীবনের লক্ষ্য।

১	শ্রীকৃষ্ণ বলেন: উর্ধ্বমুখী মূল এবং নিম্নমুখী শাখাবিশিষ্ট অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে যা অব্যয়-অক্ষয়; যার পত্রসমুহ বৈদিক ছন্দস্বরূপ। তাকে যিনি জানেন তিনিই বেদবিদ।
২	তার গুণসমুহ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিষয়রূপ পল্লববিশিষ্ট শাখাসমুহ অধঃ-উর্ধ্বে বিস্তৃত হচ্ছে। মনুষ্য সমাজে কর্মের বন্ধনস্বরূপ মূলসমুহ নিম্নদেশেও ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে।
৩	এমন বৃক্ষের স্বরূপ ইহজগতে উপলব্ধি করা যায় না। না এর আদি আছে, না অন্ত আছে, না এর স্থিতি আছে। এমন অশ্বত্থ বৃক্ষের দৃঢ়মূল ভিত্তিকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করতে হবে। অতঃপর অন্বেষন করতে হবে যেখানে গমন করলে পুনরায় ফিরে আসতে হয় না। তাকে অবশ্যই সেই আদি সত্ত্বার স্মরাণাপন্ন হতে হবে স্মরণাতীত কাল হতে যার থেকে

	সবকিছুর প্রবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটেছে। [৩-৪]
৫	অহমবোধ শূন্য, নির্মোহ, আসক্তি মুক্ত, আধ্যাত্ম চিন্তায় নিত্যতা, কামনা-বাসনা বিবর্জিত, সুখ-দুঃখ নামক দ্বন্দ্বসমুহ থেকে মুক্ত বিবেকী ব্যাক্তিগণই সেই অব্যয় অবস্থা প্রাপ্ত হন।
৬	যেখানে গেলে আর প্রত্যাবর্তন করতে হয় না। না সূর্য্য, না চন্দ্র, না অগ্নি তাকে আলোকিত করতে পারে। সেটিই আমার পরম ধাম।

- **১৫.১** একটি বৃক্ষের উদাহরণের মাধ্যমে সমগ্র ব্রহ্মান্ড, এর বিস্তৃতি, জড় ও জীব, জড় জগতে জীবের বন্ধন, জীবনের লক্ষ্য, মুক্তির উপায় সবকিছু তুলে ধরা হয়েছে।

কল্পনার চোখে এমন এক অশ্বত্থ বৃক্ষকে দেখতে হবে যার মূল, ভিত্তি, শুরু বা উৎপত্তি স্থল হচ্ছে উর্ধ্বে। অর্থাৎ ক্ষর-অক্ষর হতেও শ্রেষ্ঠ যে জীবসত্ত্বা সেই পরব্রহ্ম যার উৎপত্তির মূল। তাই উর্ধ্বমুখী মূল বলা হয়েছে। কারণ তার শুরু হয়েছে ব্রহ্মান্ডের সর্বোচ্চ গ্রহলোক থেকে। সেখান থেকে ডাল-পালারূপে সমগ্র জগত সংসার সৃষ্টি হয়েছে ও তার বিস্তার ঘটেছে বিষয়গুলিকে এভাবে বুঝতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতির মাঝেই এই জগত সংসারের বিস্তার ঘটেছে এবং ভগবান হচ্ছেন এর মূল কারণ। এখানে সামগ্রীক বিষয় বা এ জগত সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

সেই বৃক্ষের শাখাগুলি নিম্নমুখী। তাই উর্ধ্বমুখী মূল এবং নিম্নমুখী শাখাবিশিষ্ট বলা হয়েছে। গ্রহ-নক্ষত্ররূপী শাখা-প্রশাখাসমুহ সমগ্র ব্রহ্মান্ড জুড়ে ছড়িয়ে আছে। সৃষ্টির ক্রম মহত্তত্ত্ব, অহংকার ইত্যাদির পরিণাম এগুলি। সেইসব গ্রহ-নক্ষত্রাদিতে দেবাদি যোনি ও পশু যোনিতে জীবসমুহের জন্ম হচ্ছে। এই বৃক্ষকে অব্যয়-অক্ষয় বা চিরন্তনরূপে বলা হয়েছে। কেননা অনাদিকাল থেকে এভাবে বিদ্যমান। যার শুরুর ইতিহাস জানা নেই।

সেই বৃক্ষের পত্রসমুহ যেন বৈদিক ছন্দস্বরূপ। অসংখ্য পত্র। যেমনটি বেদে বিবিধ বিধি-বিধান, রীতি-নীতি, সূত্র ইত্যাদি আছে তেমন। বেদের এতসব সূত্র, রীতি-নীতি, বিধি-বিধান কেন? বেদ অধ্যায়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা। অর্থাৎ বৃক্ষের মূল বা উৎসকে জানা।

যিনি তেমন বৃক্ষের সকল পত্রসমুহকে পরিপর্ণূভাবে জানতে পেরেছেন তিনিই বেদবিদ। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সব বিষয় জানেন। বেদের সব সূত্র জানেন অর্থ ভগবানকে জানেন। অন্যকথায় যিনি ভগবানকে জানেন তিনি বেদবিদ বা বেদজ্ঞ। তিনি বৃক্ষের সকল পত্র, ছন্দ বা সূত্র সম্পর্কে অবহিত।

যখন কাউকে বেদবিদ বলা হয়, তখন বুঝতে হবে যে জড় জগতের আসক্তিরূপ বন্ধন ছিন্ন করে লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণভাবে অবগত। জীবনের লক্ষ্য বিষয়েও তিনি ওয়াকিবহাল। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা বেদে বলা আছে। বেদবিদ বা বেদজ্ঞ বৃক্ষের সকল পত্র তথা বৈদিক ছন্দ বা জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে ধারণ করেন।

• **১৫.২** সেই বৃক্ষের পল্লবসমুহ শব্দ-স্পর্শরূপ ইন্দ্রিয়ের বিষয়স্বরূপ। প্রকৃতির গুণের সংস্পর্শে এসে পল্লববিশিষ্ট শাখাসমুহ পুষ্ট হয়ে উর্ধ্ব ও অধোমুখে প্রসারিত হচ্ছে। প্রকৃতির গুণসমুহ হচ্ছে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ। অধোমুখী শাখাগুলিতে বৈচিত্রময় বিবিধ নিকৃষ্ট জীবের প্রকাশ এবং উর্ধ্বমুখী শাখাগুলিতে আছে দেবতা ও উচ্চ প্রজাতির জীবসমুহ। প্রকৃতির ত্রিগুণের সংস্পর্শে এসে জীবেরা কেউ উচ্চতর পর্যায়ের দিকে গমন করছে এবং কেউ অধঃপতিত হচ্ছে। কেউ দেবাদি যোনি প্রাপ্ত হয়ে উর্ধ্বলোকে বা স্বর্গলোকে গমন করছে। কেউ পশু যোনি প্রাপ্ত হয়ে নরকের দিকে যাচ্ছে।

বৃক্ষের নিম্ন বা অধোদেশে বিস্তৃত মূলসমুহ যেন মাটি কামড়ে ধরে আছে। এগুলি মনুষ্য সমাজে বাসনারূপ কর্মের বন্ধনস্বরূপ। শক্তভাবে জড় জগতের বন্ধনে জীবকে আবদ্ধ করে রেখেছে।

• **১৫.৩-৪** বলা হচ্ছে, ইহজগতে বসবাস করে মায়াবদ্ধ জীব এমন বৃক্ষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। না এর আদি বোঝা যায়, না অন্ত না স্থিতি। যেমন এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকেও বোঝা যায় না।

বলা হচ্ছে, এমন অশ্বত্থ বৃক্ষের বাসনারূপ দৃঢ়মূল ভিত্তিকে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করতে হবে। বাসনাই বন্ধনের কারণ। এ বন্ধনকে বৈরাগ্যের দ্বারা ছিন্ন করতে হবে। বাসনা নিবৃত হয়ে জগত সংসারের উৎসের সন্ধান করতে হবে। এখানে বৈরাগ্য কেন প্রয়োজন?

জাগতিক বিষয়ে যতক্ষণ জীবের আসক্তি থাকবে ততক্ষণ সে পারমার্থিক বিষয়ে মন দিতে পারবে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় উপভোগে মত্ত হবে। অতএব বৈরাগ্য দ্বারাই নিজেকে জগতের সকল বন্ধন থেকে সর্বপ্রথম মুক্ত করতে হবে। অতঃপর উৎসের বা বৃক্ষের ভিত্তিমূলের সন্ধান করতে হবে। অন্বেষন করতে হবে যেখানে গমন করলে পুনরায় এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

সেজন্য সেই আদি সত্ত্বার স্মরণাপন্ন হতে হবে। যার থেকে স্মরণাতীত কাল থেকে সবকিছুর প্রবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটেছে। তাই ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করতে হবে। কিন্তু ভগবানের কৃপা ভিন্ন এ অসাধ্য সাধন করা সম্ভব নয়।

এমন একটি বৃক্ষ বিষয়ে যখন কেউ জ্ঞান রাখেন এবং যখন বোঝেন যে এই উৎসের সন্ধান করা জীবের মূল কাজ, কেবল তখনই তিনি বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টায় রত হতে অনুপ্রাণীত হবেন এবং উৎসের সন্ধান করবেন। মানুষকে উর্ধ্বমুখী বা উৎসমুখী হতে হবে বিষয়টি বোঝাতে বা স্মরণ করিয়ে দিতে অশ্বত্থ বৃক্ষের এ উদাহরণটি তুলে ধরা হয়েছে।

- **১৫.৫** বৈরাগ্য দ্বারা যে অব্যয় অবস্থায় অধিষ্ঠিত হতে পারলে মানুষ জগতের মোহ পরিত্যাগ করে উৎসের সন্ধানে রত হতে পারবে, সেই গুণাগুন বা মানসিক অবস্থা অর্জন সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

সেই অব্যয় অবস্থা প্রাপ্ত হতে হলে নিজের ভেতরে থাকা অহঙ্কারবোধ বা আমিত্ববোধ পরিত্যাগ করতে হবে। কিছুই আমার বা আমাদের না সেটি উপলব্ধি করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত কিছু ভগবানের সেটি বুঝতে পারা, স্বীকার করা ও অন্তরে ধারণ করা। নিজের করা কর্মের কৃতিত্বও নিজে নেয়ার মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করতে হবে। তাই এভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে,

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! যিনি নভোঃমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের পালনকর্তা এবং পালনকর্তা বিশ্ব জগতসমুহের। নভোঃমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে তাঁরই মহিমা। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়!" (আল-কোরআন ৪৫:৩৬-৩৭)

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর!' অর্থাৎ এখানে নিজের বা নিজেদের কোন কৃতিত্ব নেই। এ মন্ত্রেই আমিত্ববোধের নাশ ও ভগবানে সমর্পন প্রতিষ্ঠা পায়। মনুষ্য সমাজ এ জগত সংসারের অধিকারী বা অধিপতি এভাবেই এমন ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে হবে।

মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আমিত্ববোধের ভ্রান্ত ধারণাই মানুষকে জগতে ভীষনভাবে আবদ্ধ করে ফেলে।

মানুষকে নির্মোহ হতে হবে। জাগতিক বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করতে হবে। ভগবানে মনোনিবেশ করতে হবে। কামনা-বাসনা বিবর্জিত হতে হবে। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, হাসি-কান্না এমনসব দ্বান্দ্বিক বিষয়গুলিতে সমভাবাপন্ন হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যেন কোন কিছু নিজেকে উদ্বেলিত করতে না পারে। নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হবে। এসব গুণাবলীর অধিকারী হতে পারলে সিদ্ধি লাভের যোগ্যতা অর্জন হয়। তবেই অব্যয় অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

যতক্ষণ মন এ অবস্থায় স্থিতি লাভ না করে ততক্ষণ জাগতিক বন্ধনও ছিন্ন হয় না। বৈরাগ্য মানুষের ভেতরে এ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। এখানেই বৈরাগ্যের গুরুত্ব ও যথার্থতা।

• **১৫.৬** উদ্ধৃত সেই অব্যয় অবস্থা প্রাপ্ত হলে যেখানে পৌঁছান সম্ভব হয় সেটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ধাম বা আবাস। চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নি দ্বারা তা আলোকিত নয়। সেখানে সকল গ্রহ জ্যোতির্ময়। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ নভোঃমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের জ্যোতি! তাঁর জ্যোতির উপমা এমন যেন একটি আধার যার মাঝে আছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মাঝে স্থাপিত। কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। প্রদীপটি প্রজ্বলিত হয় পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল হতে; যা প্রাচ্যের নয় প্রতীচ্যেরও নয়। যার তৈল কোন অগ্নির স্পর্শ ছাড়াই যেন আপনা হতে আলো বিকিরণ করে চলেছে। জ্যোতির পর জ্যোতি!" (আল-কোরআন ২৪:৩৫)

বৈকুন্ঠলোক নামক এই সমস্ত গ্রহে উজ্জল জ্যোতির দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। তাদের সর্বোচ্চ শিখরে ভগবানের আলোয়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয় ভগবানের আলয় থেকে। জীব যখন জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সেখানে ফিরে যেতে পারে, তখন তাকে আর জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। বলা হচ্ছে,

"সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থান স্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতই না উত্তম!" (আল-কোরআন ২৫:৭৬)

যারা জড় জগতের প্রতি অত্যান্ত আসক্ত তাদের পক্ষে সেই আসক্তি ছিন্ন করা কঠিন। তাহলে কিভাবে মুক্ত হয়ে সেই পরম অবস্থানে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে? সে পথই গীতায় প্রদর্শন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

৭	জীব জগতের জীবসমুহ আমারই সনাতন এক একটি অংশ। মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃতিতে অবস্থান করে সংসার জগতে আকর্ষিত হচ্ছে বা কঠোর সংগ্রাম করে চলেছে।
৮	বায়ু যেমন ফুলের সূক্ষ গন্ধবিশিষ্ট কণা বয়ে নিয়ে যায়, দেহের অধিপতি ঈশ্বর তথা জীবাত্মা তেমনি দেহান্তরকালে এই ইন্দ্রিয়সমুহকে সঙ্গে নিয়ে যায়।
৯	জীব কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা ও মনকে আশ্রয় করে বিষয়সমুহ উপভোগ করে।

• **১৫.৭** ভগবান সর্বশক্তিমান। নিজেকে তিনি অনন্তরূপে প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানও শক্তির রূপান্তরের কথা বলে। জীবসত্ত্বাসমুহ হচ্ছে তাঁর মহাশক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশস্বরূপ বা এক একটি আংশিক প্রকাশ। ভগবানের অনুসদৃশ অংশগুলি গুণগতভাবে ভগবানের বৈশিষ্টে বৈশিষ্টমন্ডিত। যেমন সোনার একটি কণাও সোনা বিষয়টি তেমন। জীবের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মা; জড়দেহ নয়। ভগবানের অংশ প্রকাশ বিধায় আত্মা ভগবানের বৈশিষ্টেই বৈশিষ্টমন্ডিত। আত্মার মৃত্যু নেই। চিরজীবি।

ভগবান বিভিন্ন বৈকুন্ঠলোকের অধীশ্বর রূপেও প্রকাশিত হন। কেবলমাত্র জীব-জন্তু কিংবা মানুষই নয় এমনকি জড় জগতের নিয়ন্ত্রনকারী- ব্রহ্মা, শিব এমনকি বিষ্ণু পর্যন্ত ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। তবে তাদের প্রকাশ সাময়িক নয়। তারা সকলে নিত্য। অংশ প্রকাশ যার যার অবস্থানে থেকে ভগবানের সেবা করে চলেছেন। সেটিই তাঁদের কর্তব্য। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যারাই আছে তারা সবাই তাঁরই এবং যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁকে উপাসনা করতে অহংকারবোধ করে না, এমনকি পরিশ্রান্তও হয়

না। তারা রাত্রিদিন তাঁর মহিমা প্রকাশ বা বর্ণনা করে এবং এটিই করণীয়; তারা ক্লান্ত হয় না।" (আল-কোরআন ২১:১৯-২০)

অপরদিকে ভগবানের অংশ প্রকাশ জীবাত্মা জড় জগতে প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা প্রভাবিত বা আকর্ষিত হয়। ফলে মোহগ্রস্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়। ভোগ-উপভোগে মত্ত হয়ে নিজেই জড় জগতে প্রভূত্ব বা আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। অথচ জীব ভগবানের দাস বই আর কিছু নয়। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে কেউ নেই যে দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না।" (আল-কোরআন ১৯:৯৩)

এ বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে জীবকে স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত হতে না পারছে, ততক্ষণ জড় জগতে অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃতিতে অবস্থান করে তাকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়।

আত্মা যখন জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তখন পরম গ্রহলোকে অনুকূল দেহ প্রাপ্ত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করার আনন্দ উপভোগ করে। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনি তাদেরকে উদ্যানে নিয়ে আসবেন যার তলদেশে নদীসমুহ প্রবাহিত। সেখানে তারা বসবাস করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" (আল-কোরআন ৫৮:২২)

● **১৫.৮** বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে যায়, ঈশ্বর দেহত্যাগকালে তেমনি মনসহ পঞ্চ ইন্দ্রিয়সমুহকে সঙ্গে নিয়ে যায়। এই ঈশ্বর কে? এখানে জীবকে তার দেহের প্রভূ, ঈশ্বর বা নিয়ন্তারূপে বলা হয়েছে। জীবাত্মাই হচ্ছে দেহের ঈশ্বর। ঈশ্বর দেহত্যাগকালে কি গ্রহণ করে নিয়ে যায়? দেহত্যাগকালে জীব জীবনের ধারণাগুলি বয়ে নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যায়?

দেহত্যাগ করে জীবের আত্মা দেহান্তরীত হয়। দেহান্তরকালে জীব ব্যাবহার অনুপযোগী দেহ ত্যাগ করে ব্যাবহার উপযোগী নতুন দেহ ধারণ করে। জীবসত্ত্বাসমুহ এ জীবনে নিজের যেমন সংস্কার সাধন করেছে যাবার কালে সে সে ধারণাসমুহ সঙ্গে নিয়ে যায়। কিভাবে নিয়ে যায়? বলা হচ্ছে, দেহান্তরকালে ইন্দ্রিয়সমুহকে সঙ্গে নিয়ে যায়। এর মাধ্যমেই সে তার সংস্কারের ধারণা বহন করে নিয়ে যায়। পূর্ব জনমের

ধারণা বা সংস্কার যেমন তার বর্তমান জীবনের ভিত্তি রচনা করে, তেমনি বর্তমান জীবনের ধারণা তার পরের জনমের ভিত্তি রচনা করে।

দৈবী অথবা আসুরিক যেমন তার সংস্কার সাধন হয়েছে তেমন কর্ম ও স্বভাব অনুসারে তার পরবর্তী ভাল-মন্দ দেহ প্রাপ্তি হয়। বর্তমান শরীর ও কার্যকলাপ তার পরবর্তী দেহের পটভূমি রচনা করে। নতুন দেহে সে নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ লাভ করে এবং তৎ পরবর্তী জীবনের ভাল-মন্দ দেহ প্রাপ্তির ভিত্তি রচনা করে।

- **১৫.৯** যেমন চেতনায় একজন নিজেকে গড়ে তুলবে দেহান্তরীত হলে তেমন ভাল-মন্দ দেহ সে প্রাপ্ত হবে। এইভাবে জীব একটি নির্দিষ্ট ধরণের দেহ ধারণ করে ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয়। যা মনের সঙ্গে একসাথে সম্পৃক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট প্রকারের অনুভূতির গুণাগুণ লাভ করে ও উপভোগ করে। জীবনের ধারণাও তার সে আঙ্গিকে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ দেহ অনুসারে ইন্দ্রিয় অনুভূতি ও উপভোগ পার্থক্যপূর্ণ হতে পারে। এমনকি একইরকম দেহ প্রাপ্ত হলেও ইন্দ্রিয় গুণাগুণের পার্থক্যের কারণে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উপভোগ পার্থক্যপূর্ণ হতে পারে। তাই একই মানব শরীর প্রাপ্ত হলেও জীবন সম্পর্কিত ধারণা সকলের একরকম নয়।

কর্মদোষে নিম্ন বা নরকগামী হতে হতে কেউ যদি এককোষ বিশিষ্ট জীবেও পরিণত হয়, তবে লক্ষ লক্ষ যোনি অতিক্রম করে পুনরায় তাকে মনুষ্য প্রজাতিতে উপনীত হতে হবে।

জীবের কোন জনমে কত যোনি অতিক্রম করতে হয় শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে। যেমন বলা হয়েছে স্থাবর জন্মে ২০ লক্ষ, জলচর ৯ লক্ষ, কূর্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ এবং বানর প্রজাতিতে ৪ লক্ষ যোনি অতিক্রম করে তারপর আবার মনুষ্য জন্ম লাভ করতে হবে। অতঃপর কর্ম সাধন দ্বারা দেব জীবন লাভ করার যোগ্য হতে পারে। বলা হচ্ছে,

"যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল আছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানাযোগে উড়ে বেরায় তারা সকলে তোমাদেরই মতো।" (আল-কোরআন ৬:৩৮)

১০	দেহে অবস্থান করে জীব কিভাবে বিষয়ভোগ করে কিংবা কিভাবে দেহ ত্যাগ করে- অজ্ঞরা তা দেখতে পায় না কিন্তু জ্ঞানচক্ষুস ব্যাক্তিগণ দেখতে পান।

১১	যত্নশীল যোগী বা ব্যাক্তিগন আপনাতে অধিষ্ঠিত এই আত্মাকে দর্শন করে থাকেন। কিন্তু যত্নশীল হয়েও আত্মজ্ঞান রহিত অসচেতন মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

● **১৫.১০** দেহে কে স্থিত, কে প্রকৃতির গুণের সাথে যুক্ত হয়ে জীবনকে উপভোগ করে, মৃত্যুকালে কে এবং কিভাবে দেহ ত্যাগ করে চলে যায়- অজ্ঞ জনেরা সেসব বিষয় বুঝতে পারে না। কিন্তু যাদের জ্ঞান আছে তারা বিষয়গুলি জানেন।

দেহের দুইটি ভাগ আছে। একটি হচ্ছে স্থুল দেহ এবং অপরটি হচ্ছে সূক্ষ শরীর। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়সমুহ এই ২৪ টি তত্ত্ব নিয়ে দেহ গঠিত যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

মৃত্যু হলে স্থুল দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সূক্ষ শরীর নিয়ে জীব দেহান্তরীত হয়। সে তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ধারণা, শিক্ষা যা কিছু বর্তমানে অর্জন করেছে সে সকল ধারণা এই সূক্ষ শরীরের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে যায়। ঠিক বায়ু যেমন ফুলের সূক্ষ গন্ধবিশিষ্ট কণা বয়ে নিয়ে যায় তেমন।

পূর্বে কৃত কর্ম অনুযায়ী নতুন দেহ ধারণ করে ঐ সূক্ষ শরীর নিয়েই জীব পাপ-পূণ্য ফল ভোগ করে। এ কারণে সংস্কার বা স্বভাব পূর্ব জন্ম ও কর্মানুযায়ী হয়। তবে জন্মগ্রহণকালে পিতামাতার দেহ থেকে যা কিছু আকর্ষন করে নেয় তাতে তার স্বভাবের কিছু পরিবর্তন হয়।

এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে সূক্ষ শরীর বলা হয়েছে। যদিও এর সাথে আরও কিছু সংযোজন আছে। তাই বলা হয়েছে যে, জীব কিরূপে দেহান্তরীত হয় ও কর্মের ফলভোগ করে অজ্ঞরা তা দেখতে পায় না, কিন্তু জ্ঞানচক্ষুস ব্যাক্তিগণ দেখতে পান।

● **১৫.১১** জীব কে? তার প্রকৃত স্বরূপ কি? জীব কিভাবে দেহে আবদ্ধ হয়ে বিষয় ভোগ করে, কিংবা কিভাবে তার দেহান্তর ঘটে আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত যত্নশীল যোগী বা ব্যাক্তিগন বিষয়সমুহ দর্শন করেন। কিন্তু যত্নশীল হয়েও আত্মজ্ঞান রহিত অসচেতন মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

কেবল শাস্ত্র অধ্যায়ন করে এ উপলব্ধিবোধে আসা যায় না। বিষয়গুলি নিজে অন্তর থেকে অনুধাবন করার জন্য আত্মায় সমাধিস্ত হয়ে ধ্যানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাধনা করতে হয়। নিজের ভেতরে জানার আগ্রহ থাকতে হয় এবং

সে কারণে ইন্দ্রিয়সমুহকে জয় করে এগুতে হয়। ব্যাহ্য প্রবৃত্তিতে অন্তর ডুবে থাকলে সে উপলব্ধিবোধ জন্মাবে না। তাই যোগে অধিষ্ঠিত হতে হয়। বলা হচ্ছে,

১২	সূর্য্যস্থিত যত তেজ সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করে এবং চন্দ্র ও অগ্নিতেও যত তেজ সেই তেজ আমারই বলে জানবে।
১৩	আমি গ্রহে প্রবিষ্ট হয়ে স্বীয় শক্তি দ্বারা জীবসমুহকে ধারণ করে আছি এবং রসময় চন্দ্র হয়ে সর্বপ্রকার উদ্ভিদকে পুষ্ট করি।
১৪	আবার আমিই জীবসমুহের দেহকে আশ্রয় করে জঠরাগ্নি হয়ে বহির্মূখী ও অন্তর্মূখী প্রাণবায়ু সংযোগে চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।
১৫	আমি সকল জীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট এবং আমার থেকেই আসে স্মৃতি, জ্ঞান ও তার বিলোপ। আমিই সকল বেদের জ্ঞাতব্য; বেদান্তের প্রণেতা আমি এবং আমিই বেদের জান্তা।

● **১৫.১২-১৩** সূর্য্যস্থিত যে তেজ সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করে এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ সেই তেজের উৎস ভগবান। আলোক শক্তি, তাপ শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি বিজ্ঞানে আমরা যত প্রকারের শক্তি সম্পর্কে লেখাপড়া করি তার সব ভগবানের অনন্ত শক্তির এক একটি প্রকাশ। মানুষ আমরা আলোচনা করি। অধ্যায়ন করি। আবিস্কার করি। অতঃপর ভগবানের শক্তিকে ব্যাবহার করতে শিখি। সকল শক্তির উৎস একমাত্র ভগবান। এ জগত বস্তুত ভগবানময়।

তাঁরই শক্তি উদ্ভিদসমুহকে পুষ্ট করছে। তা থেকে জীবসমুহ পুষ্ট হয়ে শক্তি আহরণ করছে। শক্তির রূপান্তর ঘটছে। তাঁরই শক্তি জগতকে ধারণ করে আছে। মহাকর্ষ শক্তি, অভিকর্ষ শক্তি সব কিছুর কারণ তিনি। তাঁর বিবিধ শক্তি গ্রহসমুহে প্রবেশ করছে। অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে আছে। তিনি সর্বকারণের কারণ। গ্রহ-নক্ষত্র যা কিছু ব্রক্ষাণ্ডে ভাসমান সে সবকিছুই তাঁর শক্তিতে স্থিত। যেমন বলা হয়েছে,

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য্য ও চন্দ্র। তারা প্রত্যেকে ভাসমান নিজ নিজ পথে।" (আল-কোরআন ২১:৩৩)

"তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার ওপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি; যারা পাখা বিস্তারকারী ও সংকোচনকারী? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে উর্ধ্বে স্থির রাখেন।" (আল-কোরআন ৬৭:১৯)

• **১৫.১৪** উদরের রস ও অগ্নি তথা বিবিধ এনজাইম ও এসিড বহির্মূখী ও অন্তর্মূখী প্রাণবায়ুর সংযোগে খাদ্যদ্রব্য হজম করতে সহায়তা করে। এ সবই তাঁর বিবিধ শক্তি ও সক্ষমতা থেকে জাত! তিনিই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা করেন। আবার প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য গ্রহণ করে নেন। এভাবে দেহমধ্যে শক্তির সঞ্চার করেন। তিনি ভিন্ন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আমরা জীবন উপভোগ করি তাঁর কৃপায়। বস্তুত ভগবান শব্দের মধ্যে, শরীরের মধ্যে, বায়ুতে এমনকি উদরে পরিপাক শক্তিরূপেও অধিষ্ঠিত।

এখানে উদ্ধৃত চার প্রকারের খাদ্য হচ্ছে চর্ব, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়। সব খাদ্য পরিপাকের শক্তির উৎস একমাত্র ভগবান।

• **১৫.১৫** ভগবান কেবল সর্বব্যাপ্তই নন, পরমাত্মারূপেও তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। এভাবেও তিনি সর্বব্যাপ্ত। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তবর্তী হয়ে থাকেন।" (আল-কোরআন ৮:২৪)

জ্ঞানকে ধারণ করে রাখার যে স্মৃতিশক্তি তারও উৎসও ভগবান। তিনি জীবকে স্মৃতিশক্তি দান করেন। তাই তারা বিষয়সমুহ স্মরণ বা ধারণ করে রাখতে পারে। কি জানতে হবে সে জ্ঞানও কোন এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনিই জীবের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেন। জ্ঞানের কারণও তিনি। তিনিই জ্ঞানের প্রেরণা। আবার আরেক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সব বিস্মৃত করিয়ে দেন। ফলে মানুষ যা জেনেছিল সে তা আর স্মরণ রাখতে পারে না। যেমন বলা হয়েছে,

".. তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা বয়সের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে; ফলে তারা যা জেনেছিল তার কিছুই আর তাদের জ্ঞানের মধ্যে থাকবে না।" (আল-কোরআন ১৬:৭০)

এত বিশাল যে জ্ঞানের ভান্ডার বেদ সে বেদে জানার একমাত্র বিষয়ও হচ্ছেন ভগবান। বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধি করার মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের

কথা জানতে পারা যায়। বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। পরিশেষে জীবনের পরম লক্ষ্য ভগবানের কাছে উপনীত হওয়া যায়।

সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ড বেদে উদ্ধৃত সকল কিছুর বাস্তব প্রতিবিম্ব। বেদ ভগবানকে উপলব্ধি করার দিক-নির্দেশনা দেয় ও পথ প্রদর্শন করে। পরম জীবসত্ত্বা ভগবান হচ্ছেন পরম লক্ষ্য। বিজ্ঞান যা করে সে বস্তুত বেদ পাঠ করে। বাস্তবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটু একটু করে বেদকে জানে। বিজ্ঞান কাকে জানে? বিজ্ঞান ভগবানের সন্ধান করে। ভগবানই জানার একমাত্র বিষয় বা লক্ষ্য। ভগবান ভিন্ন জগতে আর কিছুই নেই। জগত ভগবানময়! যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার প্রতিপালক! তিনিই সকল কর্ম প্রচেষ্টার সর্বশেষ লক্ষ্য।" (আল-কোরআন ৫৩:৪২)

"পরিশেষে সকল কর্মের পরিণামই আল্লাহ অভিমুখীন।" (আল-কোরআন ৪২:৫৩)

কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবার বেদান্তের প্রণেতাও হচ্ছেন ভগবান। তিনিই শাস্ত্র গ্রন্থের সবকিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রকাশ করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"অতঃপর নিশ্চয়ই! গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব আমারই।" (আল-কোরআন ৭৫:১৯)

"আল্লাহই সত্য ও সত্যের প্রকাশক বা স্পষ্ট ব্যাক্তকারী।" (আল-কোরআন ২৪:২৫)

বলা হচ্ছে, আমিই সকল বেদের জ্ঞাতব্য; বেদান্তের প্রণেতা আমি এবং আমি বেদের জান্তা। বেদসমুহের একমাত্র জ্ঞাতব্য হচ্ছেন ভগবান। আবার কোনরূপে তিনি বেদান্তের অর্থ প্রকাশক। ফলে তিনিই বেদবিদ। অধ্যায়ের শুরুতে যে বৃক্ষের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে তিনি তার মূল বা উৎস। একমাত্র তিনিই সব জানেন। যেমন বলা হয়েছে,

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? তিনি সূক্ষদর্শী, সম্যক জ্ঞাত।" (আল-কোরআন ৬৭:১৪)

১৫. সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা

বেদ মানুষকে সঠিক পথ নির্দেশ করে। যেন মানুষ যথাযথভাবে জীবন গড়ে তুলতে পারে এবং প্রকৃত আলয় তথা ভগবৎ ধামে ফিরে যেতে পারে। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত এক সঠিক প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয়ই! সৃষ্টিকে তিনি প্রথমত অস্তিত্বে নিয়ে আসেন, অতঃপর পুনরাবর্তন করেন, যেন তিনি তাদের পুরস্কৃত করেন যারা বিশ্বাস করে এবং ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে ভাল কাজ করে। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" (আল-কোরআন ১০:৪)

বাইবেলে বলা হয়েছে, তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে। শরীরের ঘাম ঝরিয়ে তোমাদেরকে আহার সংগ্রহ করতে হবে যতদিন না ফিরিয়ে আনা হবে।

সফলতার সাথে উৎসে ফিরে যাবার জন্য মানবজাতির দিক-নির্দেশনারূপে আসমানী বা ঐশী তথা শাস্ত্র গ্রন্থসমুহ অবতীর্ণ হয়েছে। অবতার বা নবী-রাসূলগণের আগমান ঘটেছে। উদ্ভ্রান্ত মানুষ এর মধ্য দিয়ে জীবনের লক্ষ্য জানতে পেরেছে। সঠিক পথের দিশা লাভ করেছে। জীবন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা লাভ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৬	জগতে দুই প্রকারের জীবসত্ত্বা আছে। ক্ষর ও অ-ক্ষর। জড় জগতে সকল জীবই ক্ষর এবং পারলৌকিক জগতে সকল জীবকেই অ-ক্ষর বলা হয়।
১৭	তবে এর থেকেও ভিন্ন এক সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা আছেন যাকে পরমাত্মা এভাবেও বলা হয়। তিনি অব্যয়-অক্ষয় ঈশ্বর যিনি ত্রি-ভূবনে প্রবিষ্ট হয়ে লালন-পালন করে চলেছেন ।
১৮	যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অ-ক্ষরের চেয়েও উত্তম, তাই লোকমুখে, পুরাণে বা বৈদিক শাস্ত্রে পুরুষোত্তম বা সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা নামেই খ্যাত।
১৯	হে ভারতপুত্র! সন্দেহমুক্ত হয়ে যিনি আমাকে এভাবে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ এবং সবভাবেই আমাকে ভজনা করেন।
২০	হে নিষ্পাপ! এভাবেই আমার দ্বারা শাস্ত্রের সবচেয়ে গোপনীয় অংশ উদ্ধৃত হল। হে ভারত! এই তত্ত্ব অবগত হয়ে বুদ্ধিমান অবশ্যই কৃতার্থ হবে।

● **১৫.১৬** জগত সংসারে দুই প্রকারের জীবসত্ত্বা আছে। ক্ষর ও অ-ক্ষর। ক্ষর হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু, বিনাশশীল বা পরিবর্তনশীল। অ-ক্ষর হচ্ছে অক্ষয়, অবিনাশী।

জীবাত্মা বা জীবসত্ত্বা হচ্ছে ভগবানেরই প্রকৃতিজাত তাই অক্ষর। কিন্তু জড় জগতে জড়দেহে আবদ্ধ থাকায় দেহের পরিবর্তনের কারণে তাঁকে পরিবর্তনশীল মনে হয়। পারলৌকিক জগতে জড় পদার্থ দিয়ে দেহ তৈরী হয় না। তাই সেখানে দেহের কোন পরিবর্তন নেই। সেখানে সকলে অ-ক্ষর। যেমন বলা হয়েছে,

"যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ; অতঃপর সঠিক পথে চলে ... তারাই হবে উদ্যানের অধিকারী। সেখানে তারা চিরজীবি হবে তাদের কর্মের প্রতিফলস্বরূপ।" (আল-কোরআন ৪৬:১৩-১৪)

জড় জগতে সকল জীব ক্ষর। উদ্যানে বা পারলৌকিক জগতে সকলে চিরজীবি বা অ-ক্ষর। সেখানে জরা-ব্যাধি, জন্ম-মৃত্যু নেই।

● **১৫.১৭** সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা কিন্তু ভিন্ন, যাকে পরম আত্মা বা পরমাত্মা এভাবেও বলা হয়। যিনি ত্রি-ভূবনে প্রবিষ্ট হয়ে সকলের প্রতিপালন করে চলেছেন; তিনিই অব্যয়-অক্ষয় ঈশ্বর।

বদ্ধ ও মুক্ত উভয় প্রকার জীবের মধ্যে পরম প্রাণময় পুরুষ বা এক জীবসত্ত্বা আছেন। তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম বা পরম জীবসত্ত্বা ভগবান। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা তিনি, যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তাও তিনি, সকল কিছুর তিনিই প্রভূ, তিনিই সাক্ষী ও আশ্রয়। সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান সকলের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। জ্ঞান ও উপলব্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে।

● **১৫.১৮** ক্ষর হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু বা বিনাশী। ভগবান হচ্ছেন চিরঞ্জীব! অতএব তিনি ক্ষরের অতীত বা উর্ধ্বে। আবার তিনি অক্ষরের মধ্যেও সর্বোত্তম। তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠদের শ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ! তাঁর সমকক্ষ বা উর্ধ্বে আর কেউ নেই কিছু নেই। হতে পারে না। যেমন বলা হয়েছে,

"তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কেউ বা কিছু নেই।" (আল-কোরআন ১১২:৪)

"বল (মানব সম্প্রদায়কে): আল্লাহর নিকট ক্রন্দন কর, কিংবা দয়াময়ের (ভগবানের) নিকট ক্রন্দন কর; যার কাছেই তুমি ক্রন্দন কর না কেন- একই। তাঁর সকল নামই সবচাইতে সুন্দর।" (আল-কোরআন ৭:১১০)

নামেই তাঁর শক্তি-সক্ষমতা ও মহাত্ত্বের পরিচয়। যে নামেই তাঁকে ডাকা হোক না কেন সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান। পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না। তাই লোকমুখে, পুরাণে বা বৈদিক শাস্ত্রে পুরুষোত্তম তথা সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা নামে তিনি উদ্ধৃত হয়ে থাকেন। পুরুষ শব্দটি এখানে লিঙ্গাত্মক অর্থে ব্যাবহৃত হয়নি। পুরুষ দ্বারা এখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জীবসত্ত্বাকে বোঝান হয়েছে।

• **১৫.১৯-২০** সৃষ্টি ও স্রষ্টা বস্তুত এসব বিষয়ে আজও নিশ্চিতভাবে কেউই কিছু জানে না। যদি নিশ্চিতভাবে জানত তবে এত আলোচনার প্রয়োজন হত না। স্রষ্টা সগুণ নাকি নির্গুন, দ্বৈত নাকি অদ্বৈত এত এত বাদ-মতবাদেরও সৃষ্টি হত না। সংশয় মানুষকে অবিচল হয়ে দাড়াতে বাধাগ্রস্ত করে। বলা হচ্ছে,

"সত্য তথা আল্লাহ, পুনরুত্থান, পরকাল, কর্মফল, বিচার দিবস এসব বিষয়ে তোমরা নানান মতাদর্শী বা বিরোধপূর্ণ। কিন্তু সেই সত্যচ্যূত হয় যে অবতীর্ণ বার্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; বিশ্বাস করে না।" (আল-কোরআন ৫১:৮-১১)

"হে মোহাম্মদ! যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথে চালিত করবে। তারা কিছুই অনুসরণ করে না অলীক কল্পনা ব্যাতিত এবং তারা যা করে তা কেবল অনুমান।" (আল-কোরআন ৬:১১৬)

".. এসব বিষয়ে তাদের কোন প্রকৃত জ্ঞান নেই। তারা অনুসরণ করে অনুমানের এবং অনুমান কখনই সত্যের স্থান নিতে পারে না।" (আল-কোরআন ৫৩:২৮)

বলা হচ্ছে, যিনি দ্বিধাহীন চিত্তে পরম পুরুষোত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ জীবসত্ত্বা ভগবানকে স্বীকার করে নেন, বা তাঁর ওপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস রাখেন এবং সে বিশ্বাসে অবিচল থেকে কর্ম করেন তিনিই জ্ঞানী, তিনিই সর্বজ্ঞ।

১৫. সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা

বিশ্বাস থেকে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। আত্মবিশ্বাসই জীবন চলার পথে অমূল্য সম্পদ। বস্তুত বিশ্বাসীই বিশ্বাস থেকে প্রকৃত ফল ভোগ করেন। তারা কোন কিছু অনুমান করে কিংবা সংশয়ে ডুবে থেকে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করেন না।

বিশ্বাসী অবচিল চিত্তে কর্মে প্রবৃত্ত হন। তিনি ভগবানকে লক্ষ্য ধরে জ্ঞান অন্বেষন করেন। তিনি জানেন যে সর্বোত্তম জীবসত্ত্বা ভগবানই সব বা সমগ্র। ভগবান ভিন্ন জগতে কিছু নেই। সব তাঁর আশ্রয়ে বিদ্যমান। সকল কর্মের লক্ষ্যও তিনি। ফলে সকল কর্মের মধ্য দিয়ে তেমন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কেবল ভগবানেরই ভজনা করেন।

এভাবে শাস্ত্রের সবচেয়ে গোপনীয় অংশ অর্থাৎ সংশয়, অনুমান, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, তর্ক-বিতর্ক পরিত্যাগ করে একটি নিশ্চিত 'বিশ্বাস' নিয়ে জীবনে চলতে হবে এখানে সে কথা বলা হয়েছে। তবেই মানুষ জীবন চলার পথে উপকৃত হবে। নিজেকে চিনতে ও জানতে পারবে। ভেতরে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হবে। আত্মবিশ্বাসই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এই গুঢ় রহস্য যিনি অবগত হবেন এবং এ কথার অন্তর্নিহিত অর্থ যিনি যথার্থই অনুধাবন করতে পারবেন তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই জ্ঞানী। একমাত্র বোধসম্পন্ন জ্ঞানীই এসব কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করবেন এবং বাস্তব জীবনে সে জ্ঞানের প্রয়োগ থেকে উপকারীতা লাভ করবেন। উপকার লাভ করে নিঃসন্দেহে তিনি কৃতার্থ হবেন।

ষোড়শ অধ্যায় : দৈবাসুর সম্পদ বিভাগযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ২৪)

সারকথা : মানুষের মাঝে দুই ধরণের প্রবৃত্তি আছে। একটি হচ্ছে দৈবী প্রবৃত্তি যা দেবতাতূল্য এবং অপরটি হচ্ছে আসুরিক বা অসুর ভাবাপন্ন প্রকৃতি। দৈবী সম্পদ মোক্ষ লাভের অনুকূল। আসুরিক স্বভাব বন্ধনের কারণ।

জড় বন্ধন থেকে মোক্ষ লাভ করাই হচ্ছে জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য। অতএব দৈবী সম্পদ অর্জন করতে হবে এবং আসুরিক প্রবৃত্তিকে বর্জন করতে হবে। বিষয়গুলি ভালভাবে জেনে যথাজ্ঞানে চললে মোক্ষ লাভ সম্ভব। অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরিক সম্পদ বিষয়ে বলা হয়েছে। দৈবী ও আসুরিক গুণাগুণকেই সম্পদ বলা হয়েছে।

১	শ্রীকৃষ্ণ বলেন: নির্ভীকতা, চিত্তের পবিত্রতা, জ্ঞানযোগে অবস্থিতি, দান, আত্মসংযম এবং যজ্ঞ অনুশীলন, শাস্ত্র অধ্যায়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদীতা, ক্রোধহীনতা, বৈরাগ্য, শান্তি, অপরের দোষ না ধরা, জীবে দয়া, লোভহীনতা, নম্রতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজদীপ্ততা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, পরিচ্ছন্নতা, মাৎসর্যহীনতা, অভিমান শূন্যতা- হে ভারত! এসব গুণ দৈবীসম্পদ অভিমুখী ব্যাক্তির হয়ে থাকে। [১-৩]
৪	দম্ভ, গর্ব, অভিমান এবং ক্রোধ, রূঢ়তা ও অজ্ঞানতা; হে পার্থ! এগুলি আসুরিক সম্পদ অভিমুখী ব্যাক্তিদের হয়ে থাকে।
৫	দৈবী সম্পদ মুক্ত করে; আসুরিক সম্পদ বন্ধনের নিমিত্ত হয়। দুঃখ কর না, হে পান্ডব! দৈবী সম্পদজাত তুমি।

• **১৬.১-৩** দৈবাসুর সম্পদ হচ্ছে দৈবী ও আসুরিক সম্পদ। দৈবী সম্পদ হচ্ছে দেবতাতূল্য প্রকৃতি, স্বভাব বা গুণাবলী। আসুরিক সম্পদ হচ্ছে অসুর প্রকৃতি, স্বভাব বা গুণাবলী। সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ দৈব গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকে। এখানে দৈব গুণাবলীসমুহ তুলে ধরা হয়েছে যেমন,

নির্ভীকতা- উদ্ধৃত গুণাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথমে নির্ভীকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দৈব প্রকৃতিজাতদের অন্যতম একটি গুণ হচ্ছে নির্ভীকতা। তারা পরমেশ্বরে

বিশ্বাসী। যখন বিশ্বাস দৃঢ় হয় তখন সাহস আসে। ভগবানই রক্ষাকর্তা সেটি তারা বিশ্বাস করেন। তিনি সবসময় সাথে আছেন। তারা তাঁর ওপর ভরসা করেন। তবে সেজন্য অবশ্য তাকে সুপথে চলতে হয়। সুপথে চলার কারণে এমন সাহসের উদয় হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"বল: আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁর ওপরই নির্ভর করে।" (আল-কোরআন ৩৯:৩৮)

পবিত্রতা- পবিত্রতা বলতে দৈহিক, আত্মিক, মানসিক সব ধরণের পবিত্রতাকে বুঝিয়ে থাকে। দৈব প্রকৃতিজাত মানুষ সকল ধরণের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকেন। কেবল দেহ ও মনে নয় আচরণেও পবিত্র হতে হয়। কর্মে পবিত্র হতে হয়। এর জন্য অন্যায় বা অপরাধ প্রবণতা ও কূটচাল বা ষড়যন্ত্রহীন হয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"... সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন ... যারা পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ যত্নবান।" (আল-কোরআন ২:২২২)

"পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ও মন্দ চক্রান্ত এবং মন্দ চক্রান্ত তাকেই ঘিরে ধরে যে তা সৃষ্টি করে।" (আল-কোরআন ৩৫:৪৩)

জ্ঞানযোগে অবস্থিতি- জ্ঞান চর্চায় রত থাকা দৈবী গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত। জীবনের সকল কাজ বস্তুত পারমার্থিকতার সাথে সম্পর্কিত। কোন কিছু ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই সর্বপ্রকার জ্ঞানের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকা দৈব প্রকৃতিভূক্ত। যেমন বলা হয়েছে,

"যাকে বিশেষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করা হয় সে প্রকৃত অর্থেই প্রভুত কল্যাণপ্রাপ্ত।" (আল-কোরআন ২:২৬৯)

দান- সদুপায়ে উপার্জন এবং ভগবানের পথে দান করা দৈবী গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত। ভগবানের পথে বা আল্লাহর রাহে বা রাস্তায় দান করার বিষয়টিকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে। জীবন, জগত ও সকল জীবের কল্যাণে করা দানই যথাযথভাবে করা দান হিসেবে বিবেচিত। দানের বিষয়টি কেবল নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বলা হচ্ছে,

"যে দান করে ও কর্তব্যপরায়ন এবং সত্য ও সুন্দরে বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই! আমি তার পথকে সহজ-সারল্যের দিকে সহজতর করে দেব।" (আল-কোরআন ৯২:৫-৭)

দম বা আত্মসংযম- ইন্দ্রিয়সমুহকে নিয়ন্ত্রনে বা সংযত রাখা দৈবী গুণসম্পন্ন মানুষের অন্যতম গুণ। আত্মসংযম সকলের জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছে।

যজ্ঞ- যজ্ঞ হচ্ছে সংযমাগ্নিতে আহুতি, ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি, প্রাণ-অপানে আহুতি, জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি ইত্যাদি আরাধনার প্রক্রিয়া অনুশীলন করা। দৈবী গুণের অধিকারীরা ধর্মপরায়ন হয়ে থাকেন। তারা সকল কাজ ভগবানের তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকেন। তাই তারা নিঃস্বার্থ হয়ে কল্যাণমূলক কাজ করেন। ভগবানের ভাবনায় করা কর্মই হচ্ছে যজ্ঞ।

স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ- দৈবী গুণসম্পন্ন মানুষ ধর্মপরায়ন হন। তারা পারমার্থিক জ্ঞান আহরণে নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। এতে পরমেশ্বরের স্মরণ ও চিত্ত শক্তিশালী হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"কোরআন (অবতীর্ণ গ্রন্থ) পাঠ কর সুপরিমিতভাবে (যথার্থ অনুধাবনের জন্য), (হে মোহাম্মদ) আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্ববহনকারী বাণী (যা সত্য উপলব্ধিতে সহায়ক)।" (আল-কোরআন ৭৩:৪-৫)

তপস্যা- দেহ, মন ও জিহ্বার তপস্যা অনুশীলন করতে হয়। যেন পারমার্থিকতা অর্জনের পথে এগুলির অযাচিত ব্যাবহার বাধাস্বরূপ না হয়। দৈবী গুণসম্পন্ন মানুষ এসব বিষয়ে সতর্ক থাকেন।

সরলতা- অন্তঃকরণের সরলতা গুরুত্বপূর্ণ। সরলতা দৈব গুণসম্পন্নদের অন্যতম বৈশিষ্ট। সকলের উচিত সহজ-সরল জীবন যাপন করা। অহিংসা- দৈবী গুণসম্পন মানুষ হিংসাপরায়ন হয়ে কারও ক্ষতি করেন না। যথার্থ অহিংসা হচ্ছে কারও জীবনের ক্রমন্নতি বা প্রগতি রোধ না করা। সত্যবাদীতা- তারা সত্য প্রকাশ করেন। সত্য কথা বলেন। সত্য গোপন কিংবা বিকৃতি করেন না। শ্রুতি- নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তারা শ্রবণ করেন। ক্রোধ- ক্রোধকে দমন করেন। ক্রোধ হচ্ছে রজোগুণ ও কামের পরিণতি। ক্রোধের উদ্রেগ হলে সহিষ্ণু হয়ে তা দমন করতে হয়। বৈরাগ্য- জাগতিক বিষয়ে তারা আসক্তিরহিত হন। কেবল ভগবানে মনোনিবেশ করেন। শান্তি- তারা শন্তিপ্রিয় হন। তাই শন্তি অন্বেষন করেন।

পরনিন্দা না করা- এ ধরণের মানুষ অনর্থক অপরের দোষ দর্শন করেন না। পেছনেও মন্দ আলোচনা-সমালোচনা করেন না। যেমন বলা হয়েছে,

"... একে অন্যের পশ্চাতে নিন্দা কর না।" (আল-কোরআন ৮৯:১২)

তারা সমদর্শী হয়ে সকল জীবের প্রতি দয়াশীল হন। তাদের ভেতরে লোভ কাজ করে না। নম্র ও বিনয়ী হন। জঘন্য ও নির্লজ্জ কর্ম করেন না। স্থিরচিত্ত হন। ধীর-স্থির ও ভেবে-চিন্তে কাজ করেন। চিত্তের চঞ্চলতা দমন করেন। কোন প্রচেষ্টাতে উত্তেজিত বা নিরাশ হন না। শোক করেন না। দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলেন।

তেজ- তেজ শব্দটি বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের জন্য ব্যাবহার করা হয়েছে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হচ্ছে অত্যান্ত শক্তিশালী হয়ে দুর্বলকে রক্ষা করা। তাদের তথাকথিত অহিংসার নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়। তবে প্রয়োজনে দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করা যেতে পারে।

ক্ষমা- ক্ষমাশীলতা দৈবী গুণ। ধৈর্য্য- ধৈর্য্যশীল হওয়া দৈবীগুণের অন্তর্ভূক্ত। মাৎসর্যহীনতা- দৈবী গুণসম্পন্ন মানুষ কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ন হন না।

উল্লেখিত গুণাবলীসমুহ হচ্ছে দিব্য গুণাবলী। দৈবী গুণ মানুষকে ধীরে ধীরে সকল তত্ত্বের গুঢ় রহস্য উপলব্ধির স্তরে উন্নীত হতে সহায়তা করে। অসূর স্বভাববিশিষ্টদের মধ্যেও সুপ্ত অবস্থায় সকল গুণ বিদ্যমান থাকে। তবে যে যেটিকে জাগ্রত করে তোলে তার ভেতরে সেটিই উজ্জীবিত হয়। তখন সেটি তার স্বভাব বা বৈশিষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

সদগুণ মানুষকে সৎ পথ চালনা করে। ভেতরে সৎ সাহসের সঞ্চার করে। এমন গুণসম্পন্ন মানুষেরাই ভগবানে যথাযথরূপে নিজেদেরকে সমর্পন করতে পারেন। তাদের অন্তর তাদেরকে ভূল পথে চালনা করে না।

● **১৬.৪** দম্ভ, গর্ব, অভিমান এবং ক্রোধ, রূঢ়তা ও অজ্ঞতা এইসব গুণাবলী আসুরিক ভাবাপন্ন। আসুরিক চরিত্রের লোকেরা দম্ভ প্রদর্শন করে। তারা যখন ধর্মানুষ্ঠান আয়োজন করে সেগুলিকেও তারা তাদের দম্ভ প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার করে। প্রকৃত ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করে না। ধন-সম্পদের গর্বে তারা এতই গর্বিত ও দাম্ভিক হয়ে ওঠে যে অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন

করার চেষ্টা করে। অথচ সম্পদ কোন অবৈধ উপায়ে পূঁঞ্জিভূত করা হয়েছে সে বিষয়টিকে তারা আদৌ বিবেচনায় নেয় না।

তারা চায় সকলে তাদের সন্মান করবে, পূঁজা করবে। অন্যথায় তাদের অভিমান ক্রোধে পরিণত হয়ে কঠোর ও নিষ্ঠুর আচরণে পরিণত হয়। তাদের মধ্যে নম্রতা নেই। রুক্ষ আচরণ আছে। বস্তুত এ সবই তাদের জ্ঞানহীন কর্মকান্ড। তারা কি করা উচিত, কিভাবে করা উচিত, কি করা উচিত নয় এসব নিয়ে ভাবে না। খামখেয়ালীপনায় কাজ করে। সব মন্দ গুণগুলি তাদের মধ্যে প্রবল হয়ে প্রকাশ পায়। এগুলি রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির মানুষদের চরিত্র।

যে যেমন সম্পদ আহরণ করে নিজেকে গড়ে তোলে সেভাবে তার স্বভাব গড়ে ওঠে। স্বভাব বা চরিত্র ব্যাক্তির জাগতিক সকল কাজের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই নিজের যথাসম্ভব উচ্চ মানের সংস্কার সাধন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

পূর্ব জনমে জীব নিজের যেমন সংস্কার করেছে তার প্রভাব এ জনমে পরিলক্ষিত হয়। আবার এ জনমে যেভাবে সংস্কার সাধন করবে পর জনমে তার প্রভাব থাকবে। তাই মোক্ষ লাভের জন্য রজঃ ও তমঃ গুণ প্রশমিত করে অন্তকরণে দৈবী সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয় করে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"মানুষকে চলার ভিন্ন ভিন্ন দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। দৈবী অভিমুখী ও অসুর অভিমুখী। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি উচ্চতর পর্যায়ে আরোহনের।" (আল-কোরআন ৯০:১০-১১)

• **১৬.৫** দৈবী সম্পদ বা গুণাবলী মোক্ষ লাভের অনুকূল। আসুরিক সম্পদ সংসার বন্ধনের কারণ। অর্জুন হচ্ছেন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ করা তাঁর ধর্ম। যুদ্ধ মানেই হিংস্রতা। তবে কি অর্জুন অসুর স্বভাব প্রাপ্ত? এমন প্রশ্ন মনে উদীত হতেই পারে।

শ্রীকৃষ্ণ আশ্বস্ত করে বলছেন, 'দুঃখ কর না, হে পান্ডব! দৈবী সম্পদজাত তুমি।' অর্জুনের যুদ্ধে জড়িয়ে পরা আসুরিক মনোভাব থেকে হয়নি। বরং অসুরদের মোকাবেলা করার জন্য সেটি ছিল তাঁর কর্তব্যকর্ম। অর্জুন আক্রমনকারী কিংবা সীমালঙ্ঘনকারীদের দলভূক্ত নন। বরং তিনি ছিলেন নির্যাতিতদের দলভূক্ত এবং অন্যায় প্রতিরোধকারী। যেমন বলা হয়েছে,

“লড়াই কর ন্যায়ের পথে ... কিন্তু বিরোধীতার সূত্রপাত কর না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” (আল-কোরআন ২:১৯০)

“নিপীড়ন-নির্যাতন করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।” (আল-কোরআন ২:১৯১)

৬	এই জগতে দুই প্রকারের সৃষ্ট জীব আছে। দৈব ও অসুর। দৈবী বিষয়ে বিস্তারীতভাবে বলা হয়েছে। হে পার্থ! আসুরিক বিষয়ে আমার থেকে শোন।
৭	আসুরিক ব্যাক্তিরা কিসে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং কি থেকে নিবৃত থাকতে হবে তা জানে না। তাদের মধ্যে না পবিত্রতা, না শিষ্ঠাচার, না সত্যতা বিদ্যমান।
৮	তারা জগতকে মিথ্যে, অবলম্বনহীন, ঈশ্বরবিহীন ও কাম থেকে উৎপন্ন এবং কাম ব্যাতিত এর আর কোন লক্ষ্য নেই বলে মনে করে।
৯	এমন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে নষ্ট-আত্মা, বিকৃত ও স্বল্প বুদ্ধির উগ্রকর্ম ব্যাক্তিরা অহিতকারী আচরণে প্রবৃত্ত হয়। তারা জাগতের ধ্বংস-যজ্ঞের জন্যই সৃষ্টি হয়।
১০	তারা দুষ্পুরণীয় কামকে আশ্রয় করে দম্ভ ও মানে মদমত্ত হয়ে মোহবশত শাস্ত্র বিরুদ্ধ মনগড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং অপবিত্র কাজে প্রবৃত্ত হয়।
১১	মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপরিমেয় বিষয়চিন্তাকে আশ্রয় করে, কাম উপভোগই জীবনের পরম উদ্দেশ্য এভাবে নিশ্চিত জেনে, আশারূপ শত শত রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, কাম-ক্রোধপরায়ন ব্যাক্তি কাম উপভোগের জন্য অন্যায় উপায়ে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ে সচেষ্ট হয়। [১১-১২]
১৩	আজ আমার এত এত লব্ধ হয়েছে। মনোবাসনা অনুসারে আরও এত এত প্রাপ্ত হব। এত এত আছে, আবার ভবিষ্যতে আমার এই এই ধন-সম্পদও হবে। অমুক আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। অন্যদেরকেও হত্যা করব। আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগকারী; আমি পরিশুদ্ধ, শক্তিমান ও সুখী। ধনবান এবং অভিজাত আমি। আমার মতো অন্য আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করব,

	দান করব, আনন্দ করব। এভাবেই জ্ঞান বিবর্জিত হয়ে বহুধা বিভ্রান্ত চিত্ত মোহজালে আবদ্ধ হয়ে কাম বা বিষয়ভোগে আসক্ত ব্যাক্তিগণ অশুচি নরকে পতিত হয়। [১৩-১৬]
১৭	আত্মাভিমান, অনম্রতা, ধন-মানের অহংকারে তারা দম্ভের সাথে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ না করে নামমাত্র যজ্ঞ করে।
১৮	অহঙ্কার, শক্তি, দর্প এবং কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করে তারা স্বীয় ও পরদেহে স্থিত আত্মরূপী আমার প্রতিও বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পোষন করে।

• **১৬.৬** জগতে দুই প্রকারের স্বভাববিশিষ্ট জীব আছে। দৈবী স্বভাববিশিষ্ট ও আসুরিক স্বভাববিশিষ্ট। অর্থাৎ ভাল ও মন্দ। দৈবী স্বভাব বিষয়ে ওপরে বলা হয়েছে। তাদের স্বভাব হচ্ছে দেবতাদের মতো। নির্মল, পবিত্র, সহজ-সরল। তারা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করেন। নিয়ম-বিধি মেনে চলেন। সাত্ত্বিকী গুণসম্পন্ন।

দেবতা ও অসুর সকলের জন্মই হয় প্রজাপতি থেকে। পার্থক্য হচ্ছে দেবতারা প্রদর্শিত পথ বা নিয়ম-বিধি মেনে চলেন কিন্তু অসুরেরা মানে না। যখন দৈবী সম্পদ হৃদয়ে কাজ করে তখন মানুষই দেবতা হয় এবং যখন আসুরিক সম্পদের বাহুল্য ঘটে তখন এই মানুষই অসুর রূপ ধারণ করে। মানুষ এই দু'টির একটি সম্পদযুক্ত হবে। দৈবী গুণ বিষয়ে বর্ণনা দেয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ এবার আসুরিকগণের স্বভাব বিষয়ে অর্জুনকে বলছেন।

• **১৬.৭** কোন কাজ করতে হবে এবং কোন কাজ থেকে নিবৃত থাকতে হবে আসুরিক ব্যাক্তিরা তা বুঝতে পারে না। তারা সেসব বিবেচনাও করে না। তাদের কর্মে তাই পবিত্রতা, সদাচার প্রকাশ পায় না। তাদের মধ্যে সততা বা সত্যতা নেই। তারা বিধি মেনে চলে না। খামখেয়ালীপনায় চলে। পশুর মতো। ইচ্ছেতে ছুটে চলে। ভাল-মন্দ বিবেচনা করে না।

• **১৬.৮** আসুরিকগণ মনে করে এ জগত মিথ্যে বা অলীক। এর পেছনে কোন কার্যকারণ তত্ত্ব নেই। জগত অবলম্বনহীন। এর কোন নিয়ন্তা বা ঈশ্বর নেই।

নারী-পুরুষের পরস্পরের কাম থেকে এ জগতের উৎপত্তি হয়েছে বলে তারা মনে করে। তারা মনে করে কাম ব্যাতিত জাগতিক জীবনে আর কোন লক্ষ্য নেই বলে।

তাদের মতে কোন কিছুর ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় ঘটনাচক্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তারা আত্মা বলে কোন কিছু আছে বিশ্বাস করে না।

• **১৬.৯** ওপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রদর্শিত পথে বিশ্বাসহীনতার কারণে তারা কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে যাচ্ছেতাই কর্ম ও আচরণ করতে পারে। তাই তাদের আত্মাকে নষ্ট-আত্মা বলা হয়েছে। স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন বিধায় তাদের বোধ-বিচার, বিবেক-বিবেচনা কাজ করে না। বিচার-বিবেচনা না থাকার কারণে তারা সাধারণত উগ্রকর্মা হয়। তারা জগতে সকল প্রকারের অহিতকর ও ধ্বংস-যজ্ঞের কর্ম করে থাকে। বলা যায় তাদের সৃষ্টিই হয়েছে জগতের ধ্বংস-যজ্ঞ করার জন্য। বস্তুত স্বল্প-জ্ঞানসম্পন্ন হলেও তারা নিজেদেরকে উন্নত মনে করে। তারা চরমভাবে জড় জগতকে ভোগ করতে চায়।

• **১৬.১০** এ ধরণের মানুষ কামকে আশ্রয় করে দম্ভ-মান এসবে মদমত্ত হয়। অথচ কাম বা বাসনা কখনই পুরণ হবার নয়। তারা মোহবশত শাস্ত্র বিরুদ্ধ মনগড়া কর্ম করে এবং অপবিত্র কাজে প্রবৃত্ত হয়। অসুরদের কাম মনোবৃত্তি কখনই পূর্ণ হয় না। তাদের জাগতিক সুখ ভোগের তৃপ্তিহীন বাসনাও তাই কখনই শেষ হয় না।

• **১৬.১১-১৬** ইন্দ্রিয় সুখ ভোগই হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য, কাম-ক্রোধ পরায়ন ব্যাক্তি তাদের নিশ্চিতজ্ঞানে এভাবে জেনে আশারূপ শত শত রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপরিমেয় দুঃশ্চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কাম উপভোগের জন্য অন্যায় উপায়ে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। অথচ বলা হচ্ছে,

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ কর না এবং জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে সম্পদের কিয়দংশ অসৎ পন্থায় শাসন বা বিচার কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।" (আল-কোরআন ২:১৮৮)

তারা ভাবে ইতিমধ্যে আমার দ্বারা এত এত লব্ধ হয়েছে। মনোবাসনা অনুসারে আমি আরও এত এত প্রাপ্ত হব। এত এত আছে, ভবিষ্যতে আমার আরও ধন-সম্পদ হবে। অমুক আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। অবশ্যই অন্য শত্রুদেরকেও হত্যা করা হবে। আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগকারী; আমি পরিশুদ্ধ, শক্তিমান ও সুখী। ধনবান এবং অভিজাত স্বজন পরিবেষ্টিত আমি। আমার সদৃশ্য কেউ নেই। আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আনন্দ করব। এভাবে তারা জ্ঞান বিবর্জিত হয়ে বহু প্রকার দুঃশ্চিন্তার

মোহজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। কামভোগে আসক্ত ব্যাক্তিরা পরিশেষে অশুচি নরকে পতিত হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"দূর্ভোগ প্রত্যেক পরনিন্দাকারীদের জন্য; যে তার সম্পদ স্তুপীকৃত করে এবং তা সাঁজাতে বা গণনা করতে থাকে। সে ভাবে তার সম্পদ তাকে অমরত্ব দান বা রক্ষা করবে। নিশ্চয়ই না; অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। হুতামা কি? এটি আল্লাহর সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যা মানুষের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাবে।" (আল-কোরআন ১০৪:১-৪)

তারা মনে করে যে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগই হচ্ছে জীবনের পরম লক্ষ্য। মৃত্যু অবধি তারা এ ভাবধারাই পোষন করে। জন্মান্তর বা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না। কর্ম অনুসারে ফল প্রাপ্তি ঘটে তা বিশ্বাস করে না। তাই পরিণাম বিবেচনা না করে কর্ম করে এবং যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। বলা হচ্ছে,

"কিন্তু না, নিশ্চয়ই! মানুষ সীমালঙ্ঘনকারী; সে নিজেকে আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যাতিতই আত্মনির্ভরশীল মনে করে। নিশ্চয়ই! তোমার প্রতিপালকের নিকটই প্রত্যাবর্তন; কর্মের জবাবদিহিতা ও কর্মফল প্রাপ্তির জন্য।" (আল-কোরআন ৯৬:৬-৮)

• **১৬.১৭** এ ধরণের মানুষের মধ্যে অহঙ্কার করার প্রবণতা বেশী। তাই অনম্র ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে। ধন-সম্পদের অহঙ্কার প্রদর্শন করে। সে কারণে শাস্ত্রের পরোয়া না করে নামমাত্র তথাকথিত ধর্মানুষ্ঠান পালন করে। ধর্ম প্রচারক সাজে। যজ্ঞ অনুষ্ঠান, পূঁজা ইত্যাদি করার ভান করে। মানুষকে ধোঁকা দেয়। নিজেদেরকে বড় ও মর্যাদাবান প্রমান করার চেষ্টা করে। কিন্তু বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সন্মান দেবার কেউ নেই। আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন।" (আল-কোরআন ২২:১৮)

• **১৬.১৮** ভগবানের মহাত্বের প্রতিও আসুরিকগণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষ পোষন করে। তাদের অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতা এগুলিই তাদের এমন মনোভাবের কারণ। তারা নিজেদেরকেই সবকিছুর হর্তাকর্তা মনে করে। সকলে তাদের মহাত্ম ও গুণগান করবে তারা তেমনটি আশা করে।

অহঙ্কার, শক্তি, দর্প, কাম, ক্রোধ তাদের এসব মনোবৃত্তির কারণে তারা অন্যদের প্রতি হিংস্র আচরণ করে। বস্তুত এ হিংস্র আচরণের মধ্য দিয়ে তারা সেইসব দেহে ও নিজদেহে স্থিত পরমাত্মার প্রতিও বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পোষন করে। কেননা অন্তর্যামীরূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তাই জানতে চেয়ে বলা হয়েছে,

"তোমাদের কি হল যে তোমরা আল্লাহর মহাত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে কামনা করছ না, যখন তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে বা বিভিন্ন ধাপে ধাপে?" (আল-কোরআন ৭১:১৩-১৪)

১৯	সেই বিদ্বেষী, ক্রুর নরাধমদের আমি এ সংসারে অনবরত অশুভ আসুরিক যোনিতে নিক্ষেপ করি।
২০	আসুরিক যোনি প্রাপ্ত হয়ে সেই মূঢ়গণ জনম জনম আমাকে না পেয়ে, হে কৌন্তেয়! তার থেকেও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।

• **১৬.১৯** ভগবানের ইচ্ছের প্রভাবে জীবাত্মা কোন বিশেষ দেহ প্রাপ্ত হয়। যারা আসুরিক প্রকৃতির ও ভগবান বিদ্বেষী তারা কর্ম অনুসারে ভগবান দ্বারা নির্ধারিত ফল লাভ করে। জীবের কর্মের বিচারের ভার বস্তুত ভগবানেরই হাতে। যেমন বলা হয়েছে,

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! যিনি ... বিচার দিবসের মালিক।" (আল-কোরআন ১:১-৩)

ক্রুর নরাধম ভগবান বিদ্বেষীগণ প্রতিবার সংসারে আসুরিক যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এভাবে তারা ক্রমশ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। নারকীয় জীবন লাভ করে। যেমন বলা হয়েছে,

"... যে তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তিনি তাকে সতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শাস্তিতে নিক্ষেপ করবেন।" (আল-কোরআন ৭২:১৭)

● **১৬.২০** আসুরিকগণ পরমেশ্বরের কৃপা বঞ্চিত হয়ে অধঃপতিত হতে হতে পূর্ব জন্ম অপেক্ষা আরও নিচু যোনি তথা পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের দেহও প্রাপ্ত হয়। যাকে নরক বলে। বলা হচ্ছে,

"নরক ওঁৎ পেতে প্রতীক্ষায় থাকবে যা কিনা সীমালঙ্ঘনকারী, আসুরিক মনোবৃত্তিসম্পন্নদের আবাসস্থল।" (আল-কোরআন ৭৮:২১-২২)

"তাদের সম্মুখে আছে নরক। তাদেরকে পূঁজ মেশানো পানি পান করান হবে।" (আল-কোরআন ১৪:১৬)

"তাদেরকে বলা হবে, শাস্তি এ কারণে যে তোমরা পৃথিবীতে অন্যায় কাজ সাধনের মাধ্যমে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে তোমরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে। অতএব প্রবেশ কর তোমরা নরকের দরজা দিয়ে চিরকাল বসবাসের জন্য। কতই না নিকৃষ্ট অহঙ্কারী ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের আবাসস্থল।" (আল-কোরআন ৪০:৭৫-৭৬)

উল্লেখ্য যে, অধঃপতিত হতে হতে সর্বনিম্ন পর্যায়ের জীব থেকে পুনরায় মনুষ্য প্রজাতিতে উপনীত হতে হলে লক্ষ লক্ষ যোনি অতিক্রম করে আসতে হবে। জীবের কোন জনমে কত যোনি অতিক্রম করতে হয় শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে। যেমন বলা হয়েছে স্থাবর জন্মে ২০ লক্ষ, জলচর ৯ লক্ষ, কূর্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ এবং বানর প্রজাতিতে ৪ লক্ষ যোনি অতিক্রম করে তারপর আবার মনুষ্য জন্ম লাভ করতে হবে। অতঃপর কর্ম সাধন দ্বারা দেব জীবন লাভ করার যোগ্য হতে পারে। বলা হচ্ছে,

"যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল আছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানা যোগে উড়ে বেরায় তারা সকলে তোমাদেরই মতো।" (আল-কোরআন ৬:৩৮)

জীবের এই অধঃগতি তথা নরক প্রাপ্তির কারণ কি? সেখান থেকে রক্ষা পাওয়ারই বা উপায় কি? বলা হচ্ছে,

২১	কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন আত্মা নাশকারী নরকের দুয়ারস্বরূপ। অতএব এই তিন পরিত্যাজ্য।
২২	হে কৌন্তেয়! তমঃ দ্বারের এই তিন দুয়ার থেকে মুক্ত হয়ে যে ব্যাক্তি শ্রেয়তর

	আচরণ করে সে পরম গতি লাভ করে।

• **১৬.২১-২২** এ জগতে মানুষ কাম চরিতার্থ করার চেষ্টা করে যা কিনা রজঃগুণ সম্ভূত। কামের অতৃপ্তিতে চিত্তে ক্রোধ ও লোভের সৃষ্টি হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ মানুষের ভেতরে আসুরিক প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। বিচার-বিবেককে নষ্ট করে। মন্দ কর্ম ও আচরণের কারণে জীব অধঃপতিত হয়। নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করে। পরিণতিতে আসুরিক যোনি প্রাপ্ত হয়ে নারকীয় জীবন লাভ করে। নরক গমনের প্রধান কারণ হচ্ছে এই কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনকে তাই নরকের দুয়ারস্বরূপ বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"বিভ্রান্ত! যারা শয়তানের পথে চলবে ... নিশ্চিতভাবেই নরক হবে তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান। এর সাতটি তোরণ আছে। প্রত্যেক তোরণের জন্য আছে সুনির্ধারিত অংশ।" (আল-কোরআন ১৫:৪২-৪৪)

সকল আসুরিক সম্পদ কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনের অধীন। এগুলি তমোগুণ সম্ভূত। তমঃ দ্বারের এই তিন দুয়ার থেকে মুক্ত হতে হবে। তার জন্য জ্ঞান বিশেষত আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে হবে। জ্ঞান লাভ করে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হতে হবে। তবেই শ্রেয়তর আচরণ করা সম্ভব হবে। সঠিক কাজ ও আচরণ মোক্ষ লাভে সহায়ক।

উল্লেখ্য যে, এ জীবনে যে নিজের চরিত্র বা প্রবৃত্তির দৈবী কিংবা আসুরিক যেমন সংস্কার সাধন করবে পরবর্তী জীবনের জন্য তার তেমন ফল প্রাপ্তি ঘটবে। তাই নরকের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনকে পরিত্যাগ করে শ্রেয়তর আচরণ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৩	কিন্তু যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে কাম কাতর হয়ে আবর্তিত হতে থাকে- সে না সিদ্ধি লাভ করতে পারে, না সুখ, না পরম গতি তথা মুক্তি বা মোক্ষ।
২৪	কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণস্বরূপ। অতএব এ সংসারে থেকে শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তা জেনে কর্মে প্রবৃত্ত হও।

• **১৬.২৩** শাস্ত্রের বিধি ভগবান প্রবর্তীত। যা মুক্তির উপায় প্রদর্শন করে। ভগবান কখনই মন্দ কাজের আদেশ করেন না। যেমন বলা হয়েছে,

"বল, আল্লাহ অবশ্যই মন্দ কাজের আদেশ দেন না। ... বল, আমার প্রতিপালক ন্যায় ও সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন।" (আল-কোরআন ৭:২৮-২৯)

শাস্ত্রবিধির অনুসরণ দৈবীগুণ অর্জনের সহায়ক। মুক্তির অনুকূল। কিন্তু কেউ যদি সে পথে না চলে অন্তহীন কামনা-বাসনা দ্বারা পরিচালিত হয় তবে সে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যা কখনই পূর্ণ হয় না। চিত্তকে অশান্ত করে তোলে। এ বন্ধনই সকল যন্ত্রনার কারণ। ফলে সুখ লাভ হয় না। পরম গতি বা মুক্তি লাভও হয় না।

সমস্ত বৈদিক বিধি-নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা। ভগবানকে জানলে তার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-ভক্তির উদয় হয়। তখন মানুষ তাঁর দেখান পথ অনুসরণ করে চলে। বস্তুত মন্দ পথ পরিহার করে ভাল পথে চলাই মানুষকে সিদ্ধি লাভের পথে নিয়ে যায়। মানুষ যন্ত্রনামুক্ত সুখী জীবন লাভ করে। কিন্তু যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে কাম কাতর হয়ে সংসারে আবর্তিত হতে থাকে তার না সিদ্ধি লাভ হয়, না সে পরম গতি বা মোক্ষ লাভ করে, না সুখ প্রাপ্ত হয়। তাই বলা হয়েছে,

"তার অনুগত হয়ো না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে বিস্মৃত করে দিয়েছি- যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার বিষয় পরিত্যাক্ত হয়েছে।" (আল-কোরআন ১৮:২৮)

"আল্লাহর দিক-নির্দেশনার পরিবর্তে যে ব্যাক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই! আল্লাহ পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" (আল-কোরআন ২৮:৫০)

• **১৬.২৪** দৈবী প্রকৃতি মানুষকে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহ দেয়। আসুরিকগণও তাদের বিবেচনায় কর্তব্য পালন করে। তাহলে প্রকৃত কর্তব্যকর্ম কোনটি? শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণস্বরূপ। অতএব শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তা জেনে কর্মে প্রবৃত্ত হও।

বলা হয় বদ্ধ জীব বিধি-বিধান রচনার অযোগ্য। কারণ তারা নিজ স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। নিজেদের স্বার্থের অনুকুলে তারা সুবিধাজনক বিধি প্রণয়ন করে।

বর্তমান সময়কালে সংসদগুলোর কার্যাবলীর দিকে দৃষ্টি দিলেও এর সত্যতা মিলে। মানব রচিত বিধি-বিধান ত্রুটিযুক্ত।

অপরদিকে শাস্ত্র হচ্ছে সেটি যা এসব ত্রুটি থেকে মুক্ত। কেননা শাস্ত্র মানব রচিত নয়। শাস্ত্রের বিধান ভগবান দ্বারা প্রবর্তিত। যেখানে সকলের জন্য সাম্যের বিবেচনা আছে, সৃষ্টির কল্যাণের বিবেচনা আছে, ন্যায্যতা আছে। অতএব শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে তা জেনে সে মোতাবেক কর্ম করাই যথাযথ। যেমন বলা হয়েছে,

“নিশ্চয়ই! ... চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, তাঁরই নির্দেশের কারণে আজ্ঞাধীন। অবশ্যই সমস্ত সৃষ্টি ও বিধান, সিদ্ধান্ত, নির্দেশনা তাঁরই। আল্লাহ মহিমাময়, জগতসমুহের প্রতিপালক।” (আল-কোরআন ৭:৫৪)

মানুষ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কি করতে হবে কি করতে হবে না এমন সিদ্ধান্তহীনতায় পতিত হয়, এমতাবস্থায় শাস্ত্রই এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করে চললে কর্তব্যকর্ম নির্ধারণে দ্বিধান্বিত হতে হয় না। নিশ্চিত জ্ঞানে কি করতে হবে শাস্ত্র পথ বলে দেয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, কর্মত্যাগের বিবেচনা যথাযথ নয়। সংসারে থেকে সংসারের বিধান অনুসরণ করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব অর্জুন যুদ্ধ কর। ক্ষত্রিয় হিসেবে সেটিই তোমার করণীয়। এটি তোমার জন্য শাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত কর্ম। স্ব-ধর্মের আচরণ কর। কর্ম কর। শাস্ত্র অনুসরণ করে চললে কর্তব্যকর্ম নির্ধারণে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না।

ভগবান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ ভগবান বা আল্লাহকে ও তাঁর মহাত্ম সম্পর্কে জানতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে তাই ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে ব্যার্থ হয়। বিশ্বাস না থাকার কারণে সংকটে বিচলিত হয়। কর্তব্যকর্ম নির্ধারণে দোদুল্যমান হয়। ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা মানবসমাজে তাই অধঃপতন টেনে আনতে পারে। মানুষকে অকর্মণ্য, দুর্বল, সংশয়প্রবণ ও ভীতু করে তুলতে পারে।

ভগবানকে জানতে হবে। তাঁর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। তাঁর দেয়া বিধান অনুসরণ করে চললে সকল সংশয় দুর করে যে কোন সংকট উত্তীর্ণ করা সম্ভব হবে।

সপ্তদশ অধ্যায় : শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ ও ওঙ্কার

(শ্লোক সংখ্যা ২৮)

সারকথা : দেহধারীদের প্রকৃতি বা স্বভাবের পার্থক্য অনুসারে বিশ্বাস বা ভক্তি পার্থক্যপূর্ণ হয়। একইভাবে যজ্ঞ, দান, তপস্যা সবকিছুই গুণভেদে পার্থক্যপূর্ণ হয়। এ পার্থক্য তিন প্রকারের হয়। এগুলি হচ্ছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। অতএব কর্মত্যাগ নয়, বিষয়গুলি ভালভাবে জেনে যথাজ্ঞানে কর্ম করলে যন্ত্রনামুক্ত জীবন বা মোক্ষ লাভ করা সম্ভব হয়।

সকল মহৎ কর্মের শুরুতে 'ওঁ তৎ সৎ' বা 'ওঁঙ্কার' উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও যৌক্তিকতাও অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

১	অর্জুন বলেন: হে কৃষ্ণ! শাস্ত্রের বিধান পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও যে ভক্তি সহকারে পূঁজা করে তার সে নিষ্ঠা কি প্রকৃতির? সত্ত্বঃ, রজঃ নাকি তমঃ?

● **১৭.১** যারা দিব্য গুণসম্পন্ন তারা পারমার্থিক বিষয়ে জ্ঞান রাখেন এবং শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করে চলেন। কিন্তু এমনও অনেক মানুষ আছেন যাদের শাস্ত্র কিংবা পারমার্থিক বিষয়ে অশ্রদ্ধা নেই। দৃঢ় বিশ্বাস ও অত্যান্ত ভক্তির সাথে তারা নিজ জ্ঞানে পরমেশ্বরের পূঁজা-অর্চনা করেন। জ্ঞানের অভাব বা আলস্য কিংবা যে কোন কারণেই হোক তারা শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করেন না। অর্জুন জানতে চান যে, পরমেশ্বরের প্রতি তেমন ভক্তিজনিত নিষ্ঠা কোন প্রকৃতির হবে- সাত্ত্বিকী, রাজসিকী নাকি তামসিকী?

মোক্ষ লাভ করতে হলে ত্রিগুনের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে হয়। কিন্তু ত্রিগুনের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে নিজেকে সাত্ত্বিকী গুণে গুণান্বিত হতে হবে। কর্ম হতে হবে সাত্ত্বিকী প্রকৃতির। অর্জুন জানতে চান যে শাস্ত্রের বিধান না মেনেও যদি কেউ ভক্তি সহকারে ভগবানের ভজনা করেন তবে কি তিনি মোক্ষ লাভ করতে পারবেন? এ বিষয়ে অর্জুন তাঁর নিজের ভেতরের সংশয় দুর করতে চান। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২	স্বভাবজাত কারণে দেহধারীদের ভক্তি তিন প্রকারের হয়ে থাকে। সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। এ বিষয়ে শোন।

৩	হে ভারত! সকলেরই ভক্তি তার নিজ অন্তঃকরণের প্রবৃত্তির অনুরূপ হয়। মানুষ শ্রদ্ধাময়। যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেরূপই হয়।
৪	সাত্ত্বিকী প্রকৃতির মানুষ দেবতাদের পূঁজা করেন। রাজসিকগণ যক্ষ ও রাক্ষসদের এবং তামসিকগণ ভূত-প্রেতাত্মার পূঁজা করে।

- **১৭.২** অর্জুনের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ত্রিগুণের পার্থক্যের কারণে স্বভাব অনুসারে দেহধারীদের ভক্তি তিনি প্রকারের হয়। এগুলি হচ্ছে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসীক। এ বিষয়ে বিস্তারীত তুলে ধরেন।

- **১৭.৩** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বস্তুত মানুষ শ্রদ্ধাময়। প্রতিটি মানুষই কাউকে না কাউকে বা কোন কিছুকে না কোন কিছুকে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু কে কাকে বা কোন বিষয়টিকে শ্রদ্ধা করবে এটি নির্ভর করে তার অন্তকরণের প্রবৃত্তির ওপর। অন্তকরণের প্রবৃত্তি আবার পূর্ব জনমে যে নিজের যেরূপ সংস্কার সাধন করেছে তদানুরূপ হয়। ফলে স্বভাব তার অন্তকরণের প্রবৃত্তির অনুরূপ সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসীক হয়। অন্তকরণে যে বিষয়টি প্রবল হয় ভক্তিও তদানুরূপ হয়। যে যেমন বিষয়কে শ্রদ্ধা করে সে সেদিকেই গমন করে। তার ভেতরে সে প্রবৃত্তি প্রবল হয়।

শাস্ত্রের বিধান সকলের জন্য এক। অতএব যখন কেউ বিধি অনুসরণ করে তখন তমঃ ও রজঃ গুণসম্পন্নরাও সাত্ত্বিকী গুণকেই অনুসরণ করে। কেননা শাস্ত্র সাত্ত্বিকগুণে অধিষ্ঠিত হতে উৎসাহিত করে। এতে তমঃ ও রজঃ গুণসম্পন্ন সকলের ক্রমোন্নতি হয়। কিন্তু অর্জুন বিষয়টি যেভাবে জানতে চাচ্ছেন তেমনটি তখনই হয় যখন কেউ শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ না করে নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

যখন বিধি অনুসরণ করা হয় না বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হয় তখন কোন একটি বিশেষ গুণের প্রতি মানুষ অনুরক্ত হয়। এমতাবস্থায় কেউ যদি নিম্নমানের রীতি অনুসরণ করে তবে মানুষ সিদ্ধি লাভের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। ফলে মোক্ষ লাভ হয় না। যেমন বলা হয়েছে,

"তুমি কি দেখেছ তাকে যে নিজের খেয়াল-খুশী অনুসারে স্বীয় উপাস্য স্থির করে? ... আল্লাহর পরে কে তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারে? তোমরা কি তবুও মনোনিবেশ করবে না?" (আল-কোরআন ৪৫:২৩)

● **১৭.৪** শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করা না হলে স্বভাবজাত ইচ্ছে বা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণে বিভিন্নজন বিভিন্ন কিছুর উপাসনা করতে পারে। যেমন পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে সাত্ত্বিকী হচ্ছে ভাল গুণের অধিকারীগণ। এ ধরণের মানুষ বিধি অনুসরণ না করলেও সাধারণত খারাপ কোন কিছুর আরাধনা করেন না। তারা দেবতাদের আরাধনা করেন।

রাজসিকগণ যক্ষ ও রাক্ষসদের পূঁজা করে। তারা কোন মহামানবকেও পূঁজা করে যদি তার দ্বারা লাভবান বা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তামসিকগণ স্বভাবজাত কারণে ভূত-প্রেতাত্মা এসবের পূঁজা করে। কেউ কেউ মৃত লোকের সমাধিতে পূঁজা করে। যেমন বলা হয়েছে,

"পরবর্তীতে এখন তাদেরই বংশের উত্তরসূরীরা উপাসনাকে বিনষ্ট করেছে। অতএব তারা তাদের পথভ্রষ্টতার ফল প্রত্যক্ষ্য করবে।" (আল-কোরআন ১৯:৫৯)

যারা বিধি অনুসরণ না করে নিজেদের ইচ্ছেমতো বিধি সৃষ্টি করেছে ওপরের উদ্ধৃতিটি তেমন কোন অবস্থার প্রেক্ষাপটে উদ্ধৃত হয়েছে। শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করা তাই উত্তম। তাহলে রজঃ তমঃ সকলের অন্তকরণের ক্রমোন্নতি ঘটবে। মানুষ যখন শাস্ত্রের বিধি অনুসরণ করবে তখন সকলে একই বিধি অনুসরণ করবে।

শাস্ত্র বিধি অনুসারে ভগবান বা আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র উপাস্য। বস্তুত মানুষ যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বায় অধিষ্ঠিত হয় তখন কেবল একজনারই আরাধনা করে। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমাদের উপাস্য এক; তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।" (আল-কোরআন ২:১৬৩)

"আল্লাহ নিজেই সাক্ষী যে তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং সুশিক্ষীত জ্ঞানী মানুষগণও এ বিষয়ে সাক্ষী।" (আল-কোরআন ৩:১৮)

৫	দম্ভ-অহঙ্কার ও কাম-রাগযুক্ত যেসব বিবেকহীন মানুষ দেহস্ত ভূতসমুহ ও অন্তরস্ত আমাকেও শাস্ত্র বহির্ভূত ঘোর তপস্যার মাধ্যমে ক্লিষ্ট করে তাদেরকে নিশ্চিতভাবে আসুরিক বলে জানবে। [৫-৬]

• **১৭.৫-৬** শাস্ত্রের বিধানে বলা আছে কাকে উপাসনা করতে হবে, কিভাবে উপাসনা করতে হবে। অর্জুনের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে কিছু মানুষ শাস্ত্রের বিধান যথাযথভাবে অবগত নয়। আবার কিছু মানুষ শাস্ত্রের বিধান জানা সত্ত্বেও তা অনুসরণ করে না। শাস্ত্রের বিধান পরিত্যাগ করে নিজেদের উদ্ভাবিত মনগড়া নানাবিধ নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে।

ইচ্ছেকৃত দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করাকে তপস্যা বলে। কঠোর তপস্যার নামে কেউ কেউ ভ্রান্তভাবে নিজ দেহকেও ক্লিষ্ট করে। তারা মনে করে যে বিধাতার কারণে তারা চরম কষ্টকেও বরণ করে নিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করছে না। এটি তাদের চরম ভক্তি ও ভালবাসার প্রকাশ বলে তারা মনে করে। ধারণা করে যে নিশ্চয়ই বিধাতা এতে তাদের প্রতি অধিক তুষ্ট হবেন।

তারা নিজেদের ভেতরে এভাবে একটা প্রতিযোগীতার ভাবও অনুভব করে। অর্থাৎ ভগবানের কারণে অন্য সকলের চেয়ে তারা অধিক ত্যাগী। সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ সবকিছু ত্যাগ করে তারা ভগবানকে পাওয়ার সাধনায় রত। এ কারণে তারা অহঙ্কারও বোধ করে।

বুঝতে হবে যে এ দেহের ভেতরে আরও দেহ আছে। আরও জীব আছে; আরও প্রাণ আছে। এমনকি অন্তরে পরমাত্মারূপে বিধাতা বসবাস করেন। বলা হচ্ছে,

"ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন।" (গীতা ১৮:৬১)

"আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তবর্তী হয়ে থাকেন।" (আল-কোরআন ৮:২৪)

শাস্ত্রের বিধানে বলা নেই অথচ কঠোর তপস্যার নামে যখন অপ্রয়োজনীয়ভাবে দেহকে ক্লিষ্ট করা হয়, তখন দেহাভ্যন্তরে সবকিছু এমনকি পরমাত্মাও কষ্টে পতিত হন। অথচ যেখানে শান্তি নেই সেখানে আত্মাও স্বরূপে জাগ্রত হন না।

এ ধরণের মানুষদেরকে আসুরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলে বলা হয়েছে। পূর্বের শ্লোকে কোরআনের উদ্ধৃতিতে তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে। তারা সকলের ওপরে অবিবেচনা প্রসূত পাশবিক নির্যাতন করে; এমনকি নিজের ও পরমাত্মার ওপরও। তাই যথাযথ দিক-নির্দেশনা তথা শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করে চলাই উত্তম। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৭	আহারও সকলের বিবেচনায় তিন প্রকারের প্রীতিকর বোধ হয়। যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের ক্ষেত্রেও তেমনই প্রভেদ। শোন।
৮	আয়ু, অস্তিত্ব, শক্তি, আরোগ্য, সুখ এবং প্রীতি বর্ধন করে এমন রসালো, স্নিগ্ধ, স্থায়ী ও তৃপ্তিকর খাবার সাত্ত্বিক লোকদের প্রিয়।
৯	কটু, অম্ল, লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, শুষ্ক ও প্রদাহকর দুঃখ-শোক ও রোগপ্রদ খাদ্য রাজসিকদের প্রিয়।
১০	অধিক পূর্বে রান্না করা খাবার, যার রসগুণ ফুরিয়ে গেছে, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন যে খাদ্য তা তামসিকদের প্রিয়।

● **১৭.৭** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, প্রকৃতি বা স্বভাবের তিনটি গুণের পার্থক্যের কারণে মানুষের কাছে সবকিছু তিনি রকমের প্রীতিকর বোধ হয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই প্রকারভেদ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এই তিন প্রকৃতির মানুষের স্বভাবের পার্থক্যের কারণে এমনকি আহারও তিন রকম প্রীতিকর বোধ হয়। কিংবা বলা যেতে পারে যে এক এক ধরণের মানুষের কাছে এক এক রকমের খাবার আকর্ষনীয় বোধ হয়। তেমনি যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের ক্ষেত্রেও এমন প্রভেদ রয়েছে। সে প্রসঙ্গে বিস্তারীতভাবে তুলে ধরেন।

● **১৭.৮-১০** সাধারণত সুমিষ্ট খাবার সাত্ত্বিক লোকদের পছন্দ। যেসব খাদ্যে চিত্ত তৃপ্ত হয় সেগুলি সাত্ত্বিক। কটু, অম্ল, লবণাক্ত, ঝাল মেশান খাদ্য রাজসিকদের প্রিয়। যদিও এগুলি রোগ উৎপাদক। তামসিক খাবার হচ্ছে যা টাটকা নয়। উল্লেখ্য যে, নিজের পছন্দের খাবার প্রত্যেকের কাছে সুমিষ্ট বা তৃপ্তিদায়ক বোধ হয়। তবে শ্রেষ্ঠ খাদ্য হচ্ছে যা ভগবানকে নিবেদন করা হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"খাদ্য হিসেবে সেটি গ্রহণ কর যার ওপরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।" (আল-কোরআন ৬:১১৮)

স্বভাবের তিনটি ধরণের কারণে দেহাভ্যান্তরে নানাবিধ রাসায়নিক গুণাগুণের পার্থক্য থাকতে পারে। সে পার্থক্যের কারণেও হয়তবা এক এক শরীর এক এক প্রকারের খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। এ আকর্ষন তাদের দেহ-মনের ধরণের কারণে হয়তবা যথোপযুক্তও হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়

হচ্ছে আর্থ-সামাজিক অবস্থা। তথাপি বিষয়গুলি মানুষের ধরণ ও খাদ্যের ধরণ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয়।

মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবনাচরণেও পরিবর্তন আসে। তেমনি খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আসে। ঠিক যেমন যথাযথ জ্ঞান আহরণ ও চর্চ্চার ফলে সকলেই মুক্তি লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। খাদ্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়ু বৃদ্ধি করা, মনকে পবিত্র করা, শরীরে শক্তিদান করা। সুস্থ্য দেহ ভগবানে মনোনিবেশের জন্য অপরিহার্য্য। বলা হচ্ছে,

"হে মানবজাতি! খাদ্য হিসেবে পৃথিবীতে সেটি গ্রহণ কর যেটি বিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত।" (আল-কোরআন ২:১৬৮)

১১	ফল প্রাপ্তির আকাঙ্খা না করে যজ্ঞ করা কর্তব্য মনে করে, শাস্ত্র বিধি অনুসরণ করে যে যজ্ঞ করা হয় তা সাত্ত্বিক প্রকৃতির।
১২	ফল প্রাপ্তির অভিসন্ধিতে দম্ভের সাথে যা অনুষ্ঠিত হয়, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞকে রাজসিক বলে জানবে।
১৩	শাস্ত্র-বিধিহীন, প্রাসাদান্নবিহীন, মন্ত্রপাঠহীন, দক্ষিণা ও ভক্তিবিহীন পালিত যজ্ঞ তামসিক বলে পরিচিত।

● **১৭.১১** মানুষ যখন কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় সে তখন তার থেকে একটি প্রাপ্তি আশা করে। অর্থাৎ সে কিছু একটাকে আশ্রয় করে কাজ করে। যেমন কাজের ফল প্রাপ্তিকে আশ্রয় করে সে কাজ করে। কাজ করলে কাজের থেকে আপনা আপনি একটি ফল এসে যায়।

যারা সাত্ত্বিক মনোবৃত্তিতে কাজ করেন তারা তাদের সেই কাজ ভগবানকে আশ্রয় করে করেন। ফলে তারা কাজের ফল নিজেরা পেল, নাকি অন্যে পেল সেটি বিবেচনা করেন না। তারা ভাবেন কর্তব্য হিসেবে ভগবানকে নিবেদন করে কাজ করে চলেছি। তিনি যাকে খুশী তাকে তার ফল প্রদান করবেন। তারা বোঝেন যে তিনি নিজেও অন্য অনেকের কর্মের ফল ভোগ করে চলেছেন। বস্তুত ভগবান সব বন্টন করেন। বন্টন বিষয়ে এভাবে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করে দিতেন, তবে নিশ্চিতভাবেই তারা পৃথিবীতে হিংসে-হানাহানি করত। তাই তিনি যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবে পরিমাণ নির্ধারণ করে প্রেরণ করেন। তিনি বান্দাদের বিষয়ে অবগত। তিনি সব দেখেন।" (আল-কোরআন ৪২:২৭)

এ জীবন এ জগত নিজের নয়। যে কাজটি করা হচ্ছে সে কাজটিও বস্তুত কারও নিজের নয়। যিনি জীবন দিয়েছেন, যিনি জগতকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, যার কারণে আজকে কাজের সৃষ্টি হয়েছে এ সবকিছুর প্রাপ্তি তাঁর। মানুষের কাজ কেবল তিনি যে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন কর্তব্য মনে করে যথাযথভাবে সেটি পালন করা।

সেই কাজের ফল তিনি দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন। অন্যকেও দিতে পারেন। সেটি তাঁর বিবেচনার বিষয়। এ অধিকার তিনিই রাখেন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ এমন উদার মনোভাব নিয়ে কাজ করেন।

তাদের অন্তরেও তাদের ত্যাগের কারণে ভগবানের বিবেচনাপ্রসূত কিছু প্রাপ্তির সুপ্ত বাসনা থাকে। অন্য কিছু না থাকলেও স্বয়ং ভগবানের সান্নিধ্য লাভের বাসনা থাকে। তথাপি কোন কিছু না পেলেও তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে যান না, আবার পেলেও অতি উচ্ছসিত হন না। তারা নিজের ওপর অবিচল হয়ে দৃঢ়চিত্তে প্রতিষ্ঠিত থাকতে জানেন। এটি তাদের স্বভাবের সবচাইতে আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট। ভগবানে পূর্ণ ভরসা রাখেন। এমন মনোবৃত্তিতে করা যজ্ঞ কর্ম সাত্ত্বিকী প্রকৃতির। তারা শাস্ত্র বিধি মেনে সকল কর্ম করেন।

● **১৭.১২** অপরদিকে ফল প্রাপ্তির বাসনা নিয়ে, দম্ভ প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয় সেই যজ্ঞকে রাজসিক বলে। মানুষের থেকে মর্যাদা ও প্রশংসা প্রাপ্তির বাসনা নিয়ে এমন যজ্ঞ করা হয়। তারা পার্থিব চাকচিক্য কামনা করে। ইহলোকে সবরকম ফল তারা এসব অনুষ্ঠান করার মধ্য দিয়ে প্রত্যাশা করে। এমন মনোবৃত্তিসম্পন্নদের বিষয়ে এভাবে বলা হয়েছে,

"যে পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদের কর্মের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব। তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না। ..

তারা এখানে যা কিছু করে সব নিরর্থক। আর যা কিছু অর্জন করে সব নিস্ফল।" (আল-কোরআন **১১:১৫-১৬**)

সাধারণত তাদের উপার্জন বিধিসম্মত হয় না বিধায় ওপরের উদাহরণে এভাবে বলা হয়েছে। রাজসিকগণ অধৈর্য্যশীল হয়। তারা দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি কামনা করে। সে কারণেই তারা যজ্ঞ পালন করে। অপ্রাপ্তিতে হতাশ ও পথচ্যুত হয়। প্রাপ্তিতে অহঙ্কারে উদ্ধত হয়। যেমন বলা হচ্ছে,

"যদি আমি মানুষকে আমার অনুগ্রহের কিছুটা আস্বাদন করাই, অতঃপর উঠিয়ে নেই তবে সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। যদি তার ওপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পরে সুখ ভোগ করতে দেই তবে ... অহঙ্কারে উদ্ধত হয়। তারা ব্যাতিত যারা ধৈর্য্যধারণ করে ও ভাল কাজ করে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও পুরস্কার।" (আল-কোরআন **১১:৯-১১**)

সাত্ত্বিক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষদের যজ্ঞ পালনের সাথে রাজসিকদের পালন করা যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও আচরণগত দিক থেকে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে।

• **১৭.১৩** যথাযথ বিধি অনুসরণ না করে পালন করা যজ্ঞ তামসিক প্রকৃতির। যজ্ঞ পালনের মূল কারণ তারা জানে না। অন্যদের অনুকরণ করে লোক দেখানো ধর্ম অনুষ্ঠান পালন করে। তাদের পালিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকে না। এ ধরণের অনুষ্ঠান আত্মাকে জাগ্রত করতে পারে না।

১৪	দেব, ব্রাহ্মন, আধ্যাত্মিক গুরু ও প্রাজ্ঞজনে পূঁজা এবং পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এগুলিকে শারীরিক তপস্যা বলা হয়।
১৫	অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর কথা এবং শাস্ত্র পাঠের অভ্যাস এগুলিকে বাচিক তপস্যা বলা হয়।
১৬	চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্য, মৌনতা, আত্মসংযম, ভাবের পরিশুদ্ধতা এগুলিকে মানসিক তপস্যা বলে।

• **১৭.১৪-১৬** তপস্যার তিনটি ধরণ উদ্ধৃত হয়েছে। এগুলি হচ্ছে কায়িক বা দৈহিক তপস্যা, বাচিক তপস্যা ও মানসিক তপস্যা। দেহ যেন সিদ্ধি লাভের পথে বাধা হয়ে

না দাড়ায় বা কোন বাসনার পেছনে না ছুটে অনুরূপ নিয়ন্ত্রিতভাবে দেহকে পরিচালনা করা বা গড়ে তোলা হচ্ছে কায়িক তপস্যা।

সংযত হয়ে কথা বলা, শ্রুতিমধুর কথা বলা ও অন্যকে আঘাত না করে কথা বলার চেষ্টা করা এগুলি হচ্ছে বাচিক তপস্যা। এগুলি কল্যাণকর। যেমন বলা হয়েছে,

“কথা বল বিষয়ের ওপর সুনির্দিষ্টভাবে, অর্থাৎ ভূল কিংবা মিথ্যে কথা নয়।” (আল-কোরআন ৩৩:৭০)

শাস্ত্র পাঠের অভ্যাস বাচিক তপস্যার অন্তর্ভূক্ত। যেমন বলা হয়েছে,

“তোমার পালনকর্তা তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছেন তা পাঠ কর।” (আল-কোরআন ১৮:২৭)

অন্তকরণকে শুদ্ধ করা, ভাল চিন্তা করা, আচার-আচরণ সঠিকভাবে গড়ে তোলা, মানুষকে সন্মান করা এগুলি হচ্ছে মানসিক তপস্যা। মন্দ ভাবনাকে ভেতরে প্রবেশ করতে না দেয়া, সবরকম ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ইচ্ছে থেকে মনকে মুক্ত রাখা, সত্যের পথে চিন্তাকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা, মানুষের মঙ্গল চিন্তা করা, আচরণে কপটতা না রাখা, ভগবানের চিন্তা থেকে কখনও বিচ্যূত না হওয়া, মৌন থাকা বা সর্বদা আত্মজ্ঞান লাভে মগ্ন থাকা এ সবই হচ্ছে মানসিক তপস্যা।

১৭	ফলাফল প্রাপ্তির আকাঙ্খা না করে ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত হয়ে মানুষ যখন পরম শ্রদ্ধা সহকারে এই তিন প্রকার তপস্যা পালন করে সেটি স্বাত্ত্বিকী হিসেবে পরিচিত।
১৮	এ জগতে ভক্তি, মর্যাদা ও পূঁজনীয় হওয়ার প্রত্যাশায় দম্ভের সাথে যে তপস্যা করা হয় যা অনিত্য ও অনিশ্চিত সেই তপস্যাকে রাজসিক বলে।
১৯	অবিবেচকের মতো নিজেকে কষ্ট দিয়ে কিংবা অপরের ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে যে তপস্যা করা হয় তাকে তামসিক বলা হয়।

• **১৭.১৭-১৯** ওপরোক্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যাসমুহ যখন পরম ভক্তি সহকারে পালন করা হয় এবং কোন প্রকার ফল প্রাপ্তির বাসনা নিয়ে করা হয় না তখন সেটি হচ্ছে সাত্ত্বিকী তপস্যা।

মানুষের ভক্তি বা মর্যাদা লাভ বা তাদের কাছে পূঁজনীয় হওয়ার প্রত্যাশা থেকে যখন এসব তপস্যা করা হয়, তখন সেটি রাজসিক প্রকৃতির তপস্যায় পরিণত হয়। এসবের ফল প্রাপ্তি অনিশ্চিত এবং পেলেও খুব ক্ষণস্থায়ী।

যে তপস্যা করা হয় নিজেকে কষ্ট দিয়ে কিংবা অপরের ক্ষতি করার মনোবৃত্তি নিয়ে সেগুলি তামসিক প্রকৃতির। এগুলি অবিবেচনা প্রসূত ও মুর্খতাজনিত কর্ম।

২০	দান করা কর্তব্য মনে করে কোনরূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে যথাস্থানে, যথাসময়ে ও যথাযথ পাত্রে যে দান করা হয় সেটিকে সাত্ত্বিকী বলে।
২১	কিন্তু যে দান কিছু প্রতিদান বা ফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অন্তরে অনুতাপ বা আক্ষেপ সহকারে দেয়া হয় তাকে রাজসিক বলে।
২২	অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার সাথে অ-স্থানে, অসময়ে ও অ-পাত্রে যে দান করা হয় তাকে তামসিক বলা হয়।

• **১৭.২০** দান করা কর্তব্য মনে করে, কোনরূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে যথাস্থানে, যথাসময়ে ও যথাযথ পাত্রে যে দান করা হয় সেটিকে সাত্ত্বিকী দান বলে। দান করা বিষয়ে নিচে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল।

“যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যায় করে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং নিজের অন্তকরণকে শক্তিশালী করার জন্য ... তা দ্বিগুণ ফসল দান করে।” (আল-কোরআন ২:২৬৫)

“যে সম্পদ দান করে ও কর্তব্যপরায়ন এবং সত্য ও সুন্দরে বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই! আমি তার পথকে সহজ সারল্যের দিকে আরও সহজ করে দেব।” (আল-কোরআন ৯২:৫-৭)

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে ভাল বস্তুটি ব্যায় কর ... দান করার ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট দ্রব্য ব্যায় করতে মনস্থ কর না, যখন তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নও।" (আল-কোরআন ২:২৬৭)

ফলের আকাঙ্খা না করে দান করা উচিত। যাকে দান করা হচ্ছে সে যেন দান প্রাপ্তির উপযুক্ত হয় সেটি বিবেচনা করতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"দান হচ্ছে অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য যারা আল্লাহর পথে তথা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণে এমনভাবে ব্যাপৃত যে জীবিকার সন্ধানে বের হতে পারছে না।" (আল-কোরআন ২:২৭৩)

"দান হল কেবল দরীদ্র, অভাবগ্রস্ত এবং যারা আদায় করে ও সত্যের পথে নবাগতদের জন্য এবং বন্দী বা দাসমুক্তি ও সত্যিকার ঋণগ্রস্তদের ঋণের বোঝা লাঘবের জন্য এবং যারা আল্লাহর পথে শ্রম ব্যায় করে ও মুসাফিরদের জন্য।" (আল-কোরআন ৯:৬০)

• **১৭.২১** কোন প্রত্যাশা বা প্রতিদান প্রাপ্তির বাসনা নিয়ে যে দান করা হয় সেটি হচ্ছে রাজসিক প্রকৃতির দান। এছাড়াও অনিচ্ছার সাথে করা দান কিংবা লোক দেখানর জন্য করা দান রাজসিক প্রকৃতির। এগুলি বর্জনীয়। যেমন বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের করা দানকে অর্থহীন করে দিও না, সে ব্যাক্তির মতো যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যায় করে লোক দেখানর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে না।" (আল-কোরআন ২:২৬৪)

• **১৭.২২** দান প্রাপ্তির উপযুক্ত নয় এমন কোথাও দান করা হলে সেটি তামসিক প্রকৃতির দান। অর্থাৎ জ্ঞান বিবর্জিত। অভক্তি নিয়ে করা দানও তামসিক প্রকৃতির। এগুলি বর্জনীয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে যা কিছু করণীয় যথা বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা সবই ভগবানকে উদ্দেশ্য করে করতে হয়। কিছুই নিজের প্রাপ্তির জন্য নয়। আমিত্ববোধ ও মূর্খতা বা অজ্ঞতা পরিত্যাগ করে কাজগুলি করা বাঞ্ছনীয়। এমনটিই শিক্ষা।

২৩	‘ওঁম তৎ সৎ’ ব্রহ্ম নির্দেশক এই ত্রিবিধ নাম শাস্ত্রে উক্ত হয়ে থাকে। এগুলি থেকেই অতীতকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছে।
২৪	সেজন্যই ‘ওঁ’ এভাবে উচ্চারিত হয়ে ব্রহ্মবাদীগণের দ্বারা শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করে সর্বদা যজ্ঞ, দান ও তপঃ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।
২৫	‘তৎ’ শব্দটি উচ্চারণ-পূর্বক মোক্ষ আকাঙ্খীগণ কোনরূপ ফল প্রাপ্তির অভিপ্রায় না করে বিবিধ যজ্ঞ, তপঃ ও দান ক্রিয়া করে থাকেন।
২৬	হে পার্থ! সদ্ভাবে ও সাধুভাবে বোঝাতে ‘সৎ’ এই শব্দটি প্রযোজ্য হয়। সেভাবেই কল্যাণমূলক কর্মসমুহের ক্ষেত্রেও ‘সৎ’ শব্দটি প্রযোজ্য হয়।
২৭	যজ্ঞ, দান, তপস্যায় নিষ্ঠাপরায়ন হয়ে থাকাকে সৎ বলে এবং এসবের জন্য যা কিছু কর্ম করতে হয় তাও সৎ বলে বিবেচিত হয়।
২৮	হে পার্থ! অশ্রদ্ধা ও অভক্তি সহকারে যজ্ঞ, দান, তপস্যা কিংবা যা কিছু করা হয় তাকে অসৎ বলা হয়। সে সমস্ত কাজ না ইহলোকে না পরলোকে ফলদায়ক হয়।

● **১৭.২৩** ‘ওঁ তৎ সৎ’ শব্দ তিনটি পৃথক পৃথকভাবে ব্যাবহৃত হয় আবার একত্রেও ব্যাবহার হয়। তিনটি শব্দের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। তবে সবভাবেই তা পরব্রহ্ম নির্দেশক। ব্রহ্মকে বোঝাতে প্রতীকীস্বরূপ শব্দ তিনটি ব্যাবহৃত হয়। বলা হচ্ছে যে এই শব্দব্রহ্ম থেকেই পুরাকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে?

‘ওঁ তৎ সৎ’ এই শব্দব্রহ্ম হচ্ছে জগত সৃষ্টির মূল। একটি শব্দ হচ্ছে একটি কমান্ডস্বরূপ। যেমন ‘হও’ একটি শব্দ। বললেই সব হয়ে যায়। বলা হচ্ছে,

“তিনি সমগ্র নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা! যখন তিনি কোন কিছু হতে নির্দেশ করেন, কেবল বলেন: ‘হও’! এবং হয়ে যায়।” (আল-কোরআন ২:১১৭)

জগত সৃষ্টি বা জগতের সকল কিছু সৃষ্টি হয়েছে এই ‘ওঙ্কার’ বা শব্দব্রহ্ম থেকে। জগত সৃষ্টির কারণে কর্ম বা যজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে। যজ্ঞ বা কর্মই জগতকে সচল বা চলমান রাখে। তাই বলা হয় ‘সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞের ওপর প্রতিষ্ঠিত’ [দ্রষ্টব্য গীতা ৩:১৫]।

যথাবিহিত যজ্ঞ পালনের বিধানস্বরূপ বেদের উৎপত্তি হয়েছে। বেদের ব্যাবস্থাপত্র ও যজ্ঞ রক্ষার ভার প্রধানত ন্যাস্ত হয়েছে ব্রাহ্মণের ওপর। তাই মানব সৃষ্টি হয়েছে। জগতের সকল কর্মযজ্ঞ সম্পাদনের পেছনে রয়েছে মানব বা ব্রাহ্মণ এবং বিধি বা বেদ। তাই ব্রাহ্মণ হচ্ছেন কর্তা এবং বেদ হচ্ছে কারণ। অতএব এই শব্দব্রহ্ম থেকেই ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছে।

● **১৭.২৪** যজ্ঞ, দান ও তপঃ ক্রিয়া যখন প্রতীকী 'ওঁ' শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে করা হয়, তখন সে ক্রিয়াগুলি শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করে ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে এর মাধ্যমে সে বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ ক্রিয়ার অন্তর্নিহিতে ভগবান ভাবনা রয়েছে এটি সেটি প্রকাশ করে। এভাবে ব্রহ্মের স্মরণ দ্বারা কর্ম শুরু করা হয়। 'ওঁ' বা হে ভগবান! বা সেই ভগবানই!

মুসলমানরাও 'পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর নামে' এভাবে উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সকল কর্ম শুরু করেন। বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত অর্থ একই। কিন্তু আমরা অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে চাই না। একে অন্যের দ্বারা উচ্চারিত শব্দকেও অপছন্দ করি। এগুলি মনোজাগতিক সমস্যা। সত্যের জ্ঞান অন্তরকে প্রসারিত করে।

● **১৭.২৫** একইভাবে যারা মোক্ষ লাভে প্রয়াসী তারা 'তৎ' ব্রহ্মবাচক এই দ্বিতীয় শব্দটি উচ্চারণের মাধ্যমে যজ্ঞ, দান ও তপঃ ক্রিয়া করে থাকেন। এর মাধ্যমে তারা কর্মের পেছনে ফল প্রাপ্তির অভিপ্রায় নেই সেটি প্রকাশ করে নিষ্কামকর্ম করেন। সকল কর্ম ও তার ফলাফল ভগবানে সমর্পন করেন। এভাবে বা এ নিয়তে কর্ম করে সকল কর্মের ক্ষেত্রে ফলাফলজনিত আসক্তি ও বন্ধন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়। বিশ্বাসীর মনোজগতে এসব ক্রিয়ার অনেক মূল্য আছে। বিষয়গুলি মুসলমানদের 'নিয়ত' প্রকাশের মতো। 'তৎ' বা তুমিই (লক্ষ্য)!

● **১৭.২৬** সদ্ভাবে ও সাধুভাবে কোন কর্ম করা হয়েছে সেটি বোঝাতে 'সৎ' এই শব্দটি প্রযোজ্য হয়। অর্থাৎ কর্মে অসৎ উদ্দেশ্য নেই এবং কর্মটি অসৎ ভাবেও করা হয়নি। পরমাত্মাকে প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সে কর্মই সৎ। কল্যাণকর সকল কাজে 'সৎ' শব্দটি ব্যাবহৃত হয়। 'সৎ' বা (তুমিই) পরম সত্য!

● **১৭.২৭** কর্ম যখন ব্রহ্মের ভাবনায় সম্পাদন করা হয় তখন ভক্তের সদ্ভাব বোঝাতে সৎ শব্দটি ব্যাবহৃত হয়। যজ্ঞ, দান, তপস্যায় নিষ্ঠাপরায়ন হয়ে থাকাকে সৎ বলে

এবং এসবের জন্য যা কিছু করা হয় তাও সৎ বলে বিবেচিত হয়। ভক্ত বা বিশ্বাসীর মনোজগতে এসকল প্রতীকী শব্দসমুহ উচ্চারণের কার্যকর প্রভাব আছে। যা তাকে সৎ নিয়তের পথে চলতে ও সৎ ভাবে ধরে রাখতে সহায়তা করে। চিত্তকে নিয়তের পথে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

- **১৭.২৮** জীবের সকল কাজ ভগবানের জন্য করণীয়। কিন্তু ভগবানেই যদি বিশ্বাস না থাকে, উপরন্তু অশ্রদ্ধা ও অভক্তি থাকে তাহলে যজ্ঞ, দান, তপস্যা যা কিছু করা হোক না কেন তা অন্তর থেকে ভগবানের জন্য করা সম্ভব হবে না। সেগুলি লোক দেখান হয়ে যাবে। নিজের মহাত্ম প্রচারের বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে। তেমন কাজের নিয়ত সৎ হবে না।

বস্তুত পারমার্থিক উদ্দেশ্য রহিত হয়ে যা কিছু করা হয় তার সবই অসৎ। সেগুলি কেবলই নিজের বাসনা পুরণার্থে করা হয়। তেমন কাজের উদ্দেশ্যও অসৎ। তেমন কাজ না ইহলোকে না পরলোকে ফলদায়ক হয়।

জগতের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা যখন পুরাকালে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তখন তিনি 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটি শব্দ উচ্চারণের দ্বারা ভগবানকে নির্দেশ করেন। কর্ম ভগবানকে উদ্দেশ্য করে করতে হয় এটিই শিক্ষা। এর মাধ্যমে এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে।

কেউ যখন শব্দ তিনটি উচ্চারণের মাধ্যমে কোন কর্ম শুরু করেন তখন বুঝতে হবে যে তিনি বিধি মোতাবেক কর্মটি করছেন। কর্মে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই। তিনি নিজের জন্য নয় বরং ভগবানের ভাবনায়, ভগবানের কারণে, ভগবানকে উদ্দেশ্য করে কর্ম করছেন। কর্মের উদ্দেশ্য সৎ। নিষ্কাম হয়ে ভগবানে সমর্পন করে কর্ম করেছেন। ভগবানে সমর্পনই হচ্ছে জগতের সকল মানুষের জন্য একমাত্র মনোনীত ধর্ম। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।" (আল-কোরআন ৩:৮৫)

অষ্টাদশ অধ্যায় : মোক্ষ ও সন্ন্যাসযোগ

(শ্লোক সংখ্যা ৭৮)

সারকথা : অধ্যায়ে নানা প্রকারের ধর্মের জটিলতা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র ভগবানে নিজেকে সমর্পন করতে বলা হয়েছে। এটিই হচ্ছে গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ উপদেশ এবং এটিই জগতের সকল মানুষের জন্য একমাত্র মনোনিত, নির্ধারিত ও গ্রহণযোগ্য ধর্ম। এতেই মুক্তি। স্থান, কাল ও পাত্র নির্বিশেষে ধর্ম হিসেবে সমর্পনই বিভিন্ন নামে পরিচিত।

১	অর্জুন বলেন: হে মহাবাহো! হে হৃষিকেশ! হে কেশিনিসূদন! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক পৃথকভাবে জানতে চাই।

[শ্রীকৃষ্ণকে এখানে মহাবাহো, হৃষিকেশ ও কেশিনিসূদন নামে সম্বোধন করা হয়েছে। ঋষীকেশ হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। যিনি মানসিক শান্তি লাভের জন্য সহায়তা করেন। কেশি হচ্ছে অত্যান্ত দুর্ধর্ষ অসুর স্বভাবের ব্যাক্তি। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করেছিলেন। তাই তাঁকে কেশিনিসূদন বলা হয়েছে। মহাবাহো হচ্ছে বাহুদ্বয় যার মহা শক্তিসম্পন্ন।]

● **১৮.১** মানব জীবনে চারটি আশ্রম ধর্ম আছে। এগুলি হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। যজ্ঞ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান তাই গৃহস্থদের জন্য সমধিক উপযুক্ত। ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমে মানুষের ব্যাক্তিগত খুব একটা ধন-সম্পদ থাকে না। তাদেরকে ভিক্ষে করে জীবন নির্বাহ করতে হয়।

কুরুক্ষেত্রের কুলনাশক সর্বনাশা যুদ্ধ না করে অর্জুন ভিক্ষে করে জীবন নির্বাহ করতে চেয়েছিলেন। ভিক্ষে করা বলতে এখানে ভিখেরীর জীবন নয়, বরং সন্ন্যাস জীবন বেছে নেয়াকে বোঝান হয়েছে। সন্ন্যাস হচ্ছে কর্ম পরিত্যাগ করে চতুর্থ আশ্রম ধর্ম অবলম্বন করা।

চারটি আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পূর্ণ যোগী হতে সহায়তা করা। এ চারটি আশ্রমকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যেন মানুষ ধাপে ধাপে পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে। বলা হয় সারাজীবন গৃহস্থ জীবনে থাকা উচিত নয়।

প্রচলিত অর্থে সন্ন্যাস বলতে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করাকে বোঝায়। সন্ন্যাস ব্যাতিত মোক্ষলাভ হয় না সমাজে এমন ধারণাও প্রচলিত আছে। অথচ মোক্ষ লাভের জন্য গীতার কোথাও সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। বরং কর্মের ফল ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। অর্জুন তাই সন্ন্যাস ও ত্যাগ বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায় সে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে বিশদভাবে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২	পন্ডিতগণ কাম্য কর্মসমুহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে জানেন এবং সকল কর্মের ফল প্রাপ্তির বাসনা ত্যাগ করাকে বিচক্ষণগণ ত্যাগ বলে থাকেন।
৩	কোন কোন মনীষীগণ বলেন কর্মই দোষযুক্ত তাই এটি পরিত্যাজ্য। কিন্তু অপর এক শ্রেণী বলেন যজ্ঞ, দান, তপস্যা এসব কর্ম পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়।

● **১৮.২-৩** বৈদিক রীতি-বিধি অনুসরণ করে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা এগুলি হচ্ছে কাম্যকর্ম। অর্থাৎ কামনা-বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়ে করা কর্ম। এর ফলে স্বর্গাদি লাভ কিংবা জাগতিক মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ হয়। কাম্যকর্ম হচ্ছে স্বকাম কর্ম। ফলভোগের বাসনায় এসব যাগযজ্ঞের কর্ম করা হয়।

পন্ডিতগণ বৈদিক এ সকল কাম্য কর্মসমুহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলেন। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে, কাম্যকর্ম ত্যাগ করা হলেও মনের ভেতরে বিষয় বাসনা থেকে যায়। এভাবে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন হয় না।

বিচক্ষণগণ তাই কেবল কাম্য কর্মের পরিত্যাগ নয়, বরং সকল কর্ম করা সত্বেও কর্মের ফল ভোগের বাসনা ত্যাগ করাকেই প্রকৃত অর্থে ত্যাগ বলেন। অতএব যিনি কর্মের ফল ভোগের বাসনা ত্যাগ করেন তিনি কর্ম করলেও প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী। শ্রীকৃষ্ণ এভাবেই সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য তুলে ধরেন এবং সন্ন্যাস সম্পর্কিত প্রচলিত ভূল ধারণার সংশোধন করে যথাযথ অর্থ তুলে ধরেন। নিষ্কাম কর্মই হচ্ছে সন্ন্যাস। কর্মযোগীই হচ্ছেন সন্ন্যাসী।

এক শ্রেণীর মনীষীগণ বিশেষত সাংখ্যগণ বলেন যে কর্মই দোষযুক্ত। কর্ম করলে কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটির সৃষ্টি হয়। অতএব দোষমুক্ত বা পবিত্র থাকতে হলে সর্বকর্ম

পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু অপর এক শ্রেণী বা মিমাংসকগণ বলেন যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা এসব কর্ম কখনই পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪	হে ভারত উত্তম! সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার কাছে নিশ্চিতভাবে শোন। হে ব্যাঘ্র পুরুষ! ত্যাগ তিন প্রকারের বলে কথিত আছে।
৫	যজ্ঞ, দান, তপস্যা এসব কর্ম পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়; এগুলি পালন করা কর্তব্য। যজ্ঞ, দান, তপস্যা এমনকি মনীষীগণের চিত্তকেও শুদ্ধ বা পবিত্র করে।
৬	তবে এ কর্মগুলিও আসক্তি ও ফল প্রাপ্তির বাসনা ত্যাগ করে অবশ্য কর্তব্য মনে করে করতে হবে। হে পার্থ! এটিই আমার নিশ্চিত ও উত্তম অভিমত।

• **১৮.৪-৫** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ত্যাগ তিন প্রকারের বলা হয়ে থাকে। এগুলি হচ্ছে কাম্যকর্মের ত্যাগ, কর্মফলের ত্যাগ এবং দোষযুক্ত বিবেচনায় সর্বকর্ম ত্যাগ। কাম্যকর্ম হচ্ছে শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্ম বা স্বধর্ম। এটিকে নিয়তকর্মও বলে। প্রশ্ন হচ্ছে, সন্ন্যাস করতে হলে কোন কর্ম ত্যাগ করতে হবে?

ত্যাগের বিষয়ে নানারকম মতবাদ পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং আজও আছে। শ্রীকৃষ্ণ এ বিষয়ে তাই তাঁর সুনিশ্চিত দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন যজ্ঞ, দান, তপস্যা এসব কর্ম কখনই পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়; এগুলি পালন করা কর্তব্য। যজ্ঞ, দান, তপস্যা সাধারণ মানুষ তো বটেই এমনকি মনীষীগণের চিত্তকেও শুদ্ধ ও পবিত্র করে। পারমার্থিক কল্যাণ সাধন করে।

বাস্তবেও দেখা যায় যে ব্যাক্তি ও সমাজ জীবনে এসব কর্ম ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। দুঃস্থ ও দরীদ্রদের সেবা ও কল্যাণে এসব কর্মের ভূমিকা আছে। মানুষের মনের ওপরও এসব কর্মের ইতিবাচক ভূমিকা থাকে। ব্যাক্তি, সমাজ ও পার্থিব কল্যাণে যে সকল কর্ম পালন করা হয় তা কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। যেমন বলা হয়েছে,

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর সেটি ভাল; তবে তোমরা যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দাও এটি হবে তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমাদের কিছু মন্দ

কর্মফলকে তা দুরীভূত করবে। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।" (আল-কোরআন ২:২৭১)

"তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহর প্রতি তোমাদের দায়িত্ব পালন কর। ব্যায় কর; এটি তোমাদের আত্মার জন্যও কল্যাণকর।" (আল-কোরআন ৬৪:১৬)

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালন কর। যারা এ দুনিয়াতে ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ভাল ফলাফল।" (আল-কোরআন ৩৯:১০)

● **১৮.৬** শ্রীকৃষ্ণের মতে সন্ন্যাস করলেও যজ্ঞ, দান, তপস্যা এসব কাজ পরিত্যাজ্য নয়। তবে অবশ্যই এ কাজগুলিও করতে হবে অন্তর থেকে কোন প্রকারের ফল বা বিনিময় প্রাপ্তির বাসনা ত্যাগ করে। কর্তব্য কর্ম মনে করে করতে হবে। ব্যাক্তিগত বা দলগত কোন প্রকারের লোভ-লালসা নিয়ে করা যাবে না। তাই বলা হয়েছে,

"বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসবাদ সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। আমি এটি তাদের জন্য নির্দেশ করিনি। কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটি অন্বেষন করেছে। তথাপি তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি।" (আল-কোরআন ৫৭:২৭)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত কর্ম মানুষের চিত্ত বা অন্তরকে পরিশুদ্ধ, পবিত্র ও প্রশান্ত করে, পারমার্থিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে, বাস্তবে দুঃস্থ মানবের কল্যাণে কাজে আসে সেসব কর্ম কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ এভাবেই এ বিষয়ে তাঁর সুনিশ্চিত অভিমত প্রকাশ করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে আন্তরীক হও এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে কঠোর পরিশ্রম কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আল-কোরআন ৫:৩৫)

কিভাবে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য তার পালন করবে? কিভাবে আন্তরীক হবে? কিভাবে তাঁর নৈকট্য লাভ করবে? কিভাবে কঠোর পরিশ্রম করবে?

কর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলেও ঈশ্বরের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালনরূপে সেটি বিবেচিত হবে না, আবার কর্ম করলেও হবে না। কর্ম করতে হবে কর্মের ফল ভোগের আসক্তি ও বাসনা পরিত্যাগ করে। নিজের ভাবনায় নয় ভগবানের প্রতি সকল কর্মের ফল সমর্পন করে কর্ম করতে হবে। সৃষ্টির কল্যাণে কর্তব্য বিবেচনা

করে কর্ম করতে হবে। তবেই সেটি ঈশ্বরের প্রতি যথাযথভাবে পালনকৃত কর্মরূপে বিবেচিত হবে এবং এতে কর্তার আন্তরীকতা ও সততাও প্রকাশ পাবে। এভাবেই ভগবানের নৈকট্য লাভ করা সম্ভব হবে। বলা যায় এমন ত্যাগই হচ্ছে সর্বোচ্চ কঠোর পরিশ্রম বা সাধনা। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৭	নিয়তকর্ম ত্যাগ করা যথাযথ নয়। বিভ্রান্তি বশতঃ তেমন কর্ম পরিত্যাগ করা হলে তাকে তামসিক বলে।
৮	দুঃখজনক মনে করে এবং শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কেউ যদি কর্ম ত্যাগ করে তবে সে ত্যাগ রাজসিক বলে বিবেচিত হয়। সে ত্যাগের কোন ফল লাভ হয় না।
৯	আসক্তি ও ফল প্রাপ্তির বাসনা ত্যাগ করে কর্তব্য মনে করে যে নিয়তকর্ম সম্পাদন করে, হে অর্জুন! সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক- এই আমার মত।

● **১৮.৭** মানুষ যে কাজই করুক না কেন প্রকৃতির সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের যে কোন একটি তার ওপরে প্রভাব ফেলে। ফলে মানুষ যখন কর্ম ত্যাগ করে সে ত্যাগও স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকারের হয়ে থাকে।

বলা হচ্ছে, নিয়তকর্ম ত্যাগ করা যথাযথ নয়। যথাযথভাবে বিচার-বিবেচনা না করে বিভ্রান্ত হয়ে মানুষ যদি নিয়তকর্ম বা স্ব-ধর্মারোপিত কর্ম ত্যাগ করে তবে সে ত্যাগ হচ্ছে তামসিক প্রকৃতির।

ত্যাগ যখন তামসিক প্রকৃতির হয় তখন সে ত্যাগ ব্যাক্তিক, সামাজিক ও পারমার্থিক কোন মূল্য বহন করে না এবং কোন সুফলও বয়ে আনে না। সকল দিক বিবেচনায় এমন ত্যাগ অর্থহীন এমনকি ক্ষতিরও কারণ হয়। মহাসংকটকালে অর্জুন তাঁর স্বভাব নিয়তকর্ম বা স্বধর্ম পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে সেটি তামসিক ত্যাগে পরিণত হত।

● **১৮.৮** কর্ম দুঃখকর বা শারীরিকভাবে কষ্টকর এমন মনে করে কেউ যদি কর্ম ত্যাগ করে তবে সেটি রাজসিক প্রকৃতির ত্যাগ। সেই ত্যাগের কোন ফল লাভ হয় না। ত্যাগের আবার ফল লাভ কি?

ত্যাগের ফল লাভ হচ্ছে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করা তথা পরম প্রশান্তি লাভ করা। রাজসিক ত্যাগে ত্যাগের ফল লাভ হয় না। এমন ত্যাগে কোন মহাত্ম নেই।

• **১৮.৯** আসক্তিরহিত হয়ে কর্মফল ত্যাগ করে কর্তব্যবোধ থেকে যখন শাস্ত্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্ম বা নিয়তকর্ম করা হয় তখন সেই ত্যাগ সত্যিকারের ত্যাগ বলে বিবেচিত হয়। এমন ত্যাগ মোক্ষের অনুকূল। এমন ত্যাগই সাত্ত্বিক প্রকৃতির ত্যাগ। এমন ত্যাগেই প্রকৃতপক্ষে কর্মের ফল ভগবানে বা আল্লাহতে সমর্পিত হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আমি দায়িত্ব ন্যাস্ত করেছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারী ও তোমাদের প্রতি যেন তোমরা সকলেই আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর।" (আল-কোরআন ৪:১৩১)

ভগবান বা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কি? নিজের ভোগ কিংবা প্রাপ্তির কারণে নয়, লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে সৃষ্টির কল্যাণে করা কাজই ভগবান বা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন। যথাযথভাবে বা সত্যের জ্ঞানের আলোকে ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে এভাবেই বিষয়গুলিকে বুঝতে হবে।

১০	সত্ত্ব গুণসম্পন্ন মেধাবী ও সংশয়হীন ত্যাগী দুঃখকর কর্মে দ্বেষ পোষন করেন না, আবার সুখকর কর্মেও আসক্ত হন না।
১১	দেহধারীদের পক্ষে সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। অতএব যিনি কর্মের ফল ত্যাগ করেন তিনিই ত্যাগীরূপে অভিহিত হন।
১২	পরলোকে অ-ত্যাগী বা স্বকাম কর্মীদের ভাল, মন্দ ও মিশ্র এই তিন প্রকার ফল প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের অর্থাৎ ফল ত্যাগীদের কখনও তেমন ফল ভোগ করতে হয় না।

• **১৮.১০** সত্ত্বগুণ সম্পন্ন কর্মফল ত্যাগী ব্যাক্তিগণকে সংশয়হীন ও মেধাবী বলা হয়েছে। কেননা তাঁরা জীবন ও জগতের গভীরের জ্ঞান রাখেন। তাই তাঁরা ব্যাক্তিক লোভ-লালসা ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে বিবেচনাপ্রসূত হয়ে, সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে কর্ম করেন।

এমন মানুষেরা দুঃখকর কাজে যেমন দ্বেষ পোষন করেন না তেমনি সুখকর কাজেও আসক্ত হয়ে যান না। পরিপূর্ণ জ্ঞানের কারণে তারা দ্বিধাহীন চিত্তে কর্মফল ত্যাগ করেন। তারা ভগবানের কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্যকর্ম পালন করেন।

● **১৮.১১** কোন মানুষ কখনই কর্মহীন থাকতে পারে না। প্রতি মুহুর্তে সে কিছু না কিছু করছে। যখন কিছু করছে না বলে মনে করছে তখনও তার মস্তিষ্ক ক্রিয়া করছে। যখন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তখনও সে ক্রিয়াশীল। ঘুমও একটি ক্রিয়া। অর্থাৎ দেহধারী কখনই কর্ম ত্যাগ করে থাকতে পারে না। এমনকি সে কোন কর্ম করতে না চাইলেও প্রকৃতির ত্রিগুণের কারণে কর্ম করতে বাধ্য হয়। তাহলে কাকে ত্যাগী বলে অভিহিত করা হবে?

বলা হচ্ছে, কেবল কর্ম ত্যাগ করলে ত্যাগী হওয়া যায় না। যিনি কর্মের ফল ত্যাগ করেন তিনিই সত্যিকার অর্থে ত্যাগী। কর্মের ফল ত্যাগ করা সহজ বা সাধারণ কোন বিষয় নয়। মানুষ কর্মের ফল ভোগ করতে চায়। সে প্রেরণাতেই সে কর্ম করে। তাই কর্মের ফল ত্যাগ করতে হলে ফলভোগের প্রেরণার চেয়েও উচ্চতর কোন প্রেরণার প্রয়োজন হয়। আর সেটি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান!

যারা ত্যাগী তারা সকল কর্ম করেন ভগবানের কারণে। সৃষ্টির কল্যাণে নিষ্কাম হয়ে করা কাজই ভগবান বা আল্লাহর কারণে করা কর্মরূপে বিবেচিত হয়। এরাই সঠিক পথ অবলম্বনকারী। বলা হচ্ছে,

"সঠিক পথ অনুসারীদেরকে নরক থেকে বহুদুরে রাখা হবে- যে তার সম্পদ দান করে তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়, বরং আত্মশুদ্ধি ও আত্ম-উন্নয়নের জন্য তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টির অন্বেষনে, সে অবশ্যই পরিতৃপ্ত হবে।" (আল-কোরআন ৯২:১৭-২১)

● **১৮.১২** সকাম কর্মীদেরকে তাদের করা কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। এমনকি এ জগতেও তারা কর্মের ভাল-মন্দ ফল পেয়ে থাকে। পরলোকেও তাদেরকে তেমনি কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। কর্ম অনুযায়ী এই ফল ভাল, মন্দ ও মিশ্র তিন প্রকারের হয়ে থাকে।

সন্ন্যাসীগণ যেহেতু কর্মের ফল ত্যাগ করেন তাই তাদেরকে সকাম কর্মীদের মতো কখনও তেমন ফল ভোগ করতে হয় না। সত্যি বলতে ফলত্যাগী মানুষেরা

নিজের কারণে কোন কর্ম করেন না। তারা নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করেন। নিঃস্বার্থভাবে বা সদুদ্দেশ্যে করা কর্ম সৃষ্টির কল্যাণার্থে হয়ে থাকে।

সৃষ্টি বা জন কল্যাণার্থে করা কর্মের ফল কখনও কোন কারণে মন্দ হয়ে গেলেও সাধারণত মানুষ তার জন্য কর্তাকে দোষারোপ করে না। কেননা কর্মের নিয়তটি ভাল বা সৎ ছিল। এমন কর্ম ভগবান বা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনরূপে বিবেচিত হয়। তেমন কর্মের কর্তা দোষত্রুটির উর্ধ্বে থাকেন। দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকেন। কর্মের কারণে তাঁকে এমনকি মন্দ ফলও ভোগ করতে হয় না।

অপরদিকে প্রাপ্তব্য ভাল ফল তো তারা নিজেরাই ভগবানের কারণে ত্যাগ করেন। ফলে সন্ন্যাসীদেরকে সকাম কর্মীদের মতো ভাল, মন্দ কিংবা মিশ্র কোন ফলই ভোগ করতে হয় না। না ইহজগতে না পরকালে। সেজন্যই বলা হয় নিয়তের উপরই কর্মের ফল নির্ভর করে।

সন্ন্যাসী সদুদ্দেশ্যে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করেন। এমন কর্ম ভগবানের কারণে করা কর্মরূপে বিবেচিত হয়। কেউ বলেন আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা বা আল্লাহর রাস্তায় কাজ করা। সন্ন্যাস হল চরম উৎকর্ষের অবস্থা। অন্য পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘তাকওয়া’ অর্জন করা। বলা হচ্ছে,

“যারা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করেছে তারা উদ্যানে প্রফুল্লতার মাঝে থাকবে।” (আল-কোরআন ৫২:১৭)

১৩	হে মহাবাহো! সাংখ্য বা বেদান্ত শাস্ত্রে সকল কর্ম সম্পাদনের পেছনে এই পাঁচটি কারণ আছে বলে বলা হয়েছে। আমার থেকে অবগত হও।
১৪	স্থান, কর্তা, উপায়, প্রচেষ্টা এবং এদের মধ্যে পঞ্চম হচ্ছে দৈব।
১৫	দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা যে কর্মই মানুষ করে তা ন্যায় কিংবা তার বিপরীতই হোক- এই পাঁচটি হচ্ছে তার কারণ।
১৬	বিষয়সমুহ এভাবে সংঘটিত হলেও যে দুর্মতি বুদ্ধির অভাবের কারণে কেবল নিজেকেই কর্তারূপে মনে করে, বিষয়সমুহকে সে যথাযথভাবে দর্শন করে না।
১৭	যে অহমবোধ দ্বারা তাড়িত নয়, বুদ্ধি যার কর্মফল ভোগে আসক্ত নয়- সে

	এই সমস্ত লোক সকলকে হত্যা করলেও হত্যাকারী নয় এবং সে সেই কর্মের ফল দ্বারা আবদ্ধও হয় না।

• **১৮.১৩** প্রতিটি কর্ম সম্পাদন হতে পাঁচটি বিষয়ের সম্পৃক্ততা থাকে। 'সাংখ্য' বা বেদান্ত শাস্ত্রে তেমনই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 'সাংখ্য' কথাটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের বৃন্ত এবং বেদান্তকে সকল পন্ডিতেরা জ্ঞানের চরম বৃন্ত বলে গ্রহণ করেছেন। তাই বেদান্ত শাস্ত্র থেকে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

• **১৮.১৪-১৬** কর্ম সম্পাদনের পেছনে উদ্ধৃত পাঁচটি বিষয় হচ্ছে- ১. স্থান- কোন একটি কর্ম সম্পাদন হতে স্থানের প্রয়োজন হয়। কাজটি যেখানে বা যে স্থানে সম্পাদিত হয় সেটিই হচ্ছে স্থান বা অধিষ্ঠান। দেহই হচ্ছে অধিষ্ঠান। ২. কর্তা- কর্তা হচ্ছে 'নিজ' বা আত্মা। যিনি কর্মটি সম্পাদন করে ফলাদি সৃষ্টি করেন। ৩. উপায়- কার্য সম্পাদনের সহায়ক হাতিয়ার বা সাধন যন্ত্রসমুহ হচ্ছে উপায়। যেমন ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে কাজ করার যন্ত্রবৎ বা উপায়। এদের সহায়তায় জীব নানাভাবে কাজ করে। ৪. প্রচেষ্টা- প্রতিটি কাজের জন্য নানা রকম প্রয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। যেটি কর্তা করে থাকেন এবং ৫. দৈব- দৈব হচ্ছে দেবতাদের মাধ্যমে সর্বশক্তি প্রেরণকারী ভগবান। সব কিছু নির্ভর করে পরমাত্মা বা ভগবানের ইচ্ছের ওপর। যেমন বহুবার বহুক্ষেত্রে এভাবে বলা হয়েছে,

"যদি তিনি ইচ্ছে করতেন তবে তিনি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করতেন।" (আল-কোরআন ৬:১৪৯)

"বল হে মোহাম্মদ, আল্লাহর ইচ্ছে ব্যাতিত নিজের ভাল কিংবা মন্দ করা বিষয়েও আমার কোন ক্ষমতা নেই।" (আল-কোরআন ৭:১৮৮)

"আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই করেন" (আল-কোরআন ২২:১৪)

"হে মোহাম্মদ, তুমি যাকে ভালবাস চাইলেও তুমি তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবে না, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (আল-কোরআন ২৮:৫৬)

পরমেশ্বর ভগবান বা আল্লাহর ইচ্ছে ব্যাতিত কোন কাজ সম্পাদন হয় না। দেহ, বাক্য ও মনের দ্বারা ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় যে কাজই করা হোক না কেন তা সংঘটিত হওয়ার জন্য এই পাঁচটি কারণ প্রয়োজন হয়।

প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র, কর্মের কর্তা, কর্ম প্রচেষ্টা ও কর্মেন্দ্রিয়সমুহ হচ্ছে জড় কারণ। পরম কারণ হচ্ছেন ভগবান। অতএব কেবল চারটি জড় কারণ নয়, পঞ্চম কারণ ভগবানকেও সকল কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে। এখানে সে বিষয়টিকেই গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

কর্ম সম্পাদনের পেছনে ওপরোক্ত সকল কারণগুলিকে বিশেষত দৈব কারণকে বিবেচনা না করে যে কেবল নিজেকেই সকল কর্মের হর্তাকর্তা বলে মনে করে সে যথাযথভাবে বিষয়গুলিকে দেখে না। পরমাত্মা হৃদয়ে উপস্থিত থেকে জীবের সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। বস্তুত সব ভগবান বা আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন। যেমন বলা হয়েছে,

“বল: ... কে সকল কর্মকান্ড পরিচালনা ও ব্যাবস্থাপনা করেন?” (আল-কোরআন ১০:৩১)

বলা হচ্ছে, “তিনিই নভোমন্ডল থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন।” (আল-কোরআন ৩২:৫)

● **১৮.১৭** অতএব যিনি নিজের লোভ-লালসা ও স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত নন এবং অহঙ্কার বা আমিত্ববোধ দ্বারাও তাড়িত নন, যিনি কর্মের ফল ভোগের বাসনা নিয়ে কর্ম করেন না- তিনি যখন কর্ম করেন সেই কর্মের ফল দ্বারা তিনি আবদ্ধ হন না। তেমন কর্ম তার জন্য ভাল-মন্দ কোন ফল উৎপাদন করে না।

এমন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ নিজেকে পরমাত্মায় সমর্পন করে ভগবানের ইচ্ছেতে বা কারণে কর্ম করেন। অন্তর্যামীরূপে তিনি যে নির্দেশনা দেন সেই নির্দেশনা অনুসারে কর্ম করেন। ভগবানের ভাবনায় কর্ম করলে সেই কর্মের দায় নিজের ওপর বর্তায় না।

যিনি পরমাত্মা বা ভগবানের নির্দেশনা মেনে বা তাঁর পরিচালনায় কর্ম করেন, যদি তিনি এই সমস্ত অর্থাৎ যুদ্ধের কারণে শত্রুপক্ষের সকল লোককে হত্যা করেন, তবুও তিনি নিজে হত্যাকারী বিবেচিত হবেন না। তিনি নিজে তেমন কর্মের দ্বারা

আবদ্ধ হন না এবং এ ধরণের হত্যার জন্য ফল ভোগ করেন না। তখন সবকিছু নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছের ওপর। যেমন বলা হয়েছে,

"জেনে রেখ, তোমরা মুসলমানগন শত্রুদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন।" (আল-কোরআন ৮:১৭)

এমনটি তখনই বলা হয় যখন ভগবান বা আল্লাহর কারণে কর্ম করা হয়। তেমন ক্ষেত্রে কর্তার আমিত্ববোধ থাকে না, তিনি নিজেকে ভগবানে সমর্পন করে দিয়ে ভগবানের কারণে তাঁর নির্দেশনায় কর্ম করেন। তিনি ব্যাক্তিগত লোভ-লালসা বা স্বার্থের কারণে কর্ম করেন না। কর্মফল ভোগের বাসনায়েও কর্ম করেন না। তেমন কাজ সৃষ্টি সুরক্ষায় জীবন ও জগতের বৃহত্তর কল্যাণে করা কর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। তেমন প্রেক্ষিতেই এভাবে বলা হয়েছে। এর দ্বারা যত্র-তত্র, কারণে-অকারণে হত্যা করাকে বোঝান হয়নি। সেটিও বুঝতে হবে।

সত্য হচ্ছে, দেহ তার স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করে। অহমবোধ শূণ্য আত্মা দেহমধ্যে নিঃসঙ্গ ও অকর্তা হয়ে থাকে। কিন্তু যে মনে করে যে আমিই কর্তা, আমি নিজেই সবকিছু করছি সে প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। এই অজ্ঞতার কারণে মানুষ কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিজেকে কর্মের সাথে একীভূত করে ফেলে। অথচ কর্ম করে দেহ এবং দেহ থেকে আত্মা পৃথক।

অহমবোধ শূণ্য, কামনা-বাসনা বর্জিত এমন মানুষদেরকে স্থিতপ্রাজ্ঞ, ব্রহ্মভূত, গুণাতীত বা নির্গুণ, জীবন্মুক্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এমন মানুষদের ক্ষেত্রে পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম, নীতি-অনীতির বিচার চলে না। তারা এসবের অতীত বা উর্ধ্বে বিচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

১৮	জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি হচ্ছে কর্মের প্রেরণা। ইন্দ্রিয়সমুহ, কর্ম ও কর্তা এই তিনটি হচ্ছে ক্রিয়ার আশ্রয় বা কর্মসংগ্রহ।
১৯	সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাকে গুণভেদে তিন প্রকারের বলা হয়েছে। এইগুলি সম্পর্কেও যথাযথরূপে শোন।

• **১৮.১৮** জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনটি হচ্ছে কর্মের প্রেরণা, প্রবর্তক বা কারণ। ইন্দ্রিয়সমুহ, কর্ম ও কর্তা এই তিনটি হচ্ছে কর্ম বা ক্রিয়ার আশ্রয় বা কর্মসংগ্রহ। কার্য সম্পাদনের উপাদানসমূহকে কর্মসংগ্রহ বলে।

কোন কর্ম শুরু করতে একটা প্রেরণা লাগে। তার জন্য জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনের প্রয়োজন। এই তিনে আমাদের দৈনন্দিন সকল কার্য সম্পাদিত হয়।

জ্ঞেয় হচ্ছে জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ যা জানতে হবে। এটি জ্ঞানের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে জানতে হবে এমন ধারণাটি হচ্ছে জ্ঞান এবং এই লক্ষ্য বা বিষয়ের ওপর যার জ্ঞান জন্মে তিনি হচ্ছেন জ্ঞাতা। অতএব জ্ঞান হচ্ছে কর্মের মূল প্রেরণা। সেখান থেকে কর্মের শুরু। আর কর্ম সম্পাদনের জন্য যা যা প্রয়োজন হয় তা হচ্ছে কর্মসংগ্রহ।

মন হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়সমুহের কেন্দ্র। যখন অনুপ্রেরণা আছে এবং কর্তাও আছে, তখন মন সহ ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে প্রকৃত কর্ম সম্পাদিত হয়। কার্য সম্পাদনের এই উপাদানগুলি হচ্ছে কর্মসংগ্রহ।

• **১৮.১৯** প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ। এই তিনটি গুণের যে কোন একটি মানুষের ওপর ভর করে। সে অনুসারে মানুষ আচরণ করে বা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, মানুষের আচরণ দেখে বোঝা যায় যে প্রকৃতি বা স্বভাবের কোন গুণ তার ওপর প্রভাব বিস্তার করছে।

সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে সত্ত্বগুণ হচ্ছে জ্ঞানোদ্ভাসিত, রজোগুণ হচ্ছে জড় জাগতিক ও বৈষয়িক এবং তমোগুণ হচ্ছে আলস্য ও কর্ম বিমুখতার প্রতীক। প্রকৃতির এই সবকটি গুণ হচ্ছে বন্ধনের কারণ। এমনকি সত্ত্বগুণের কারণেও মানুষ জাগতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিষয়গুলি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাকে গুণভেদে তিন প্রকারের বলা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

উল্লেখ্য যে গুণভেদে এখানে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা কেবল এ তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেননা জ্ঞাতা কর্তারই অন্তর্ভূক্ত এবং জ্ঞেয় জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। অপরদিকে ইন্দ্রিয়সমুহকে যন্ত্রবৎ বলা যায়। ফলে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও ইন্দ্রিয়সমুহের

পৃথক ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। তাই জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা এ তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২০	পরস্পর বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও যে জ্ঞান দ্বারা সকল জীবে এক ও অবিভক্ত অব্যয় ভাব দর্শন হয়- সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলে জানবে।
২১	যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক পৃথক ভূতসমুহে পৃথক পৃথক নানান ভাবের উদয় হয় সেই জ্ঞানকে রাজসিক বলে জানবে।
২২	যে জ্ঞানের দ্বারা কোন একটি দেহেই আত্মা সম্পূর্ণরূপে অভিনিবেশযুক্ত এমন ভাবের উদয় হয়- তত্ত্বজ্ঞানহীন অযৌক্তিক সেই তুচ্ছ জ্ঞান তামসিকরূপে কথিত হয়।

● **১৮.২০** গুণভেদে জ্ঞান তিন প্রকারের হয়। যে জ্ঞান দ্বারা সমগ্র জগত বা অসংখ্যের মধ্যে কেবল 'এক' এর দর্শন অনুভব হয় তাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলে। অর্থাৎ সমগ্র জগত ব্রহ্মময়, ভগবানময়, আল্লাহময়। এখানে আর কিছু নেই। যা কিছু আছে সব তাতেই।

পরস্পর বিভক্ত বা পৃথক হওয়া সত্ত্বেও যিনি সবকিছুর মধ্যে এক সত্ত্বাকে দেখেন এবং দেখেন যে ভগবান এক। তিনি সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। তেমন জ্ঞান হচ্ছে সাত্ত্বিক প্রকৃতির।

সাত্ত্বিক জ্ঞানই সাত্ত্বিক কর্তা বা কর্মযোগীর সাত্ত্বিক কর্ম তথা নিষ্কাম কর্মের প্রেরণা। এ বিষয়টি বোঝাতেই এখানে সাত্ত্বিক জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার প্রসঙ্গ এসেছে।

● **১৮.২১** যে জ্ঞান দ্বারা সকল জীবকে পৃথক বলে মনে হয় সেটি রাজসিক। রাজসিক জ্ঞান প্রতিটি সত্ত্বাকে পৃথক বা স্বতন্ত্র বলে মনে করে। মৃত্যুর সাথে সাথে প্রতিটি সত্ত্বা ও চেতনার বিলুপ্তি হয় এমন মনে করে। পরম কোন সত্ত্বা বা আত্মার সাথে দেহের কোন সম্পর্ক আছে তা মনে করে না। দেহ নিজস্ব আত্মাসম্পন্ন এবং দেহের বিলুপ্তির সাথে সাথে সব শেষ হয়ে যায়। ফলে সত্ত্বার চেতনাও সাময়িক। এমন ধারণাগুলি হচ্ছে রাজসিক।

এমন ধারণা থেকে সাধারণত প্রতিটি পৃথক সত্ত্বার অহমবোধ বা আমিত্ববোধের সৃষ্টি হয়। রাগ-দ্বেষ ও কাম্য কর্মের উৎপত্তি এই রাজসিক জ্ঞান থেকে হয়। এমন

জ্ঞান দেহসুখ ভোগ বা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকে উৎসাহিত করে। তবে এই জ্ঞান সংসার প্রবৃত্তির প্রেরণা। এটি রাজসিক জ্ঞান।

• **১৮.২২** যে জ্ঞানের দ্বারা কোন একটি দেহে আত্মা সম্পূর্ণরূপে অভিনিবেশযুক্ত এমন ভাবের উদয় হয়- তত্ত্বজ্ঞান ও যুক্তিহীন সেই তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসিক বলে।

কোন একটি বিষয়, বস্তু বা দেহে সম্পূর্ণ আত্মা আছে এমন ভাবনা তামসিক। ফলে এ জ্ঞান কোন একটি বিষয় বা বস্তুতে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত করে; অন্যকিছু ভাবতে পারে না। 'এখানেই সব' এমন মনে করে। যেমন কেউ একটি গাছকেই ঈশ্বর মনে করতে পারে। এখান থেকে আর সরে আসে না বা আসতে পারে না। এ জ্ঞান কোন একটি বিশেষ বিষয়ে অহেতুক আসক্তির সৃষ্টি করে।

যে মানুষ শাস্ত্র অনুশাসন মতে জ্ঞানের বিকাশ সাধন করেনি দেহ সম্পর্কে তার জ্ঞান সীমিত। তমোগুণ মানব সৃষ্টি, তার কারণ ও পরিণতি এসব নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দেহের উর্ধ্বে আত্মা সম্পর্কিত যে জ্ঞান তাকে বলা হয় 'সাত্ত্বিক জ্ঞান'। দেহস্থিত আত্মা সম্পর্কিত যে জ্ঞান তা হচ্ছে রজঃ গুণাশ্রিত এবং কোন একটি বিষয় বা বস্তুতেই আত্মা অভিনিবেশযুক্ত তেমন জ্ঞান হচ্ছে তমঃ গুণাশ্রিত।

২৩	আসক্তি রহিত হয়ে, রাগ-দ্বেষ বর্জন করে, ফল ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে কর্তব্যকর্ম মনে করে যে নিয়তকর্ম করা হয় তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়।
২৪	কিন্তু যে কাজ অহঙ্কারের সাথে ফল প্রাপ্তির আকাঙ্খা নিয়ে বহু চেষ্টা-সাধনা করে করা হয় সেটি রাজসিক বলে অভিহিত হয়।
২৫	হিংসা ও ক্ষতির কারণ হবে কিনা, নিজ সামর্থ ও ভবিষ্যত পরিণতির কথা বিবেচনা না করে মোহবশত যে কর্ম করা হয় তাকে তামসিক কর্ম বলা হয়।

• **১৮.২৩-২৫** ওপরে জ্ঞানের তিনটি রকম আলোচনা করা হয়েছে। তেমনি কর্মের ক্ষেত্রেও তিনটি প্রকার আছে। যে কাজ আসক্তি বর্জন করে, ফলভোগের বাসনা ত্যাগ করে ভগবানের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয় তেমন কর্মই সাত্ত্বিক কর্ম। এ

ধরণের কর্ম কর্তব্য মনে করে করা হয়। তাই রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয়। নির্মল বোধ থেকে করা কর্মই সাত্ত্বিক কর্ম।

কর্ম যখন অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শনের জন্য করা হয়, কাজের ফল নিজে ভোগ করার বাসনা নিয়ে বহু কষ্টসাধ্য করে করা হয় তেমন কাজ রাজসিক নামে অভিহিত হয়। রাজসিকগণও কর্তব্যকর্ম পালন করে তবে ফল ভোগের বাসনা নিয়ে।

তামসিক কর্ম হচ্ছে এমন কর্ম যা নিজের সামর্থ ও পরিণতি বিবেচনা না করে করা হয়। অবিবেচকের মতো বা মোহবশত করা হয়। হিংসা-বিদ্বেষ থেকে করা হয়। দায়িত্বজ্ঞানহীন এমন কাজ ধ্বংসাত্মক এবং ক্ষতির কারণ হয়। এ ধরণের কাজ নির্ধারিত কর্তব্য কর্মকেও বিনষ্ট করে।

২৬	আসক্তিহীন, অহংকারহীন, ধৈর্য্য ও উদ্যমশীল এবং সফলতা-বিফলতা বিষয়ে নির্বিকার কর্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়।
২৭	বিষয়াসক্ত, কর্মফল ভোগে প্রলুব্ধ, হিংসাপরায়ন ও অশুচী এবং হর্ষ ও বিষাদযুক্ত কর্তা রাজসিক বলে কথিত হয়।
২৮	অস্থিরচিত্ত, অভদ্র, অনম্র, প্রবঞ্চক, অপরকে হেয় প্রতিপন্নকারী, অলস, বিষাদযুক্ত, গড়িমসিকারী- তেমন কর্তাকে তামসিক বলা হয়।

• **১৮.২৬-২৮** যিনি জ্ঞানকে ধারণ করেন ও কর্ম সম্পাদন করেন তিনিই কর্তা। কর্তা যখন বিষয়ে আসক্তি রহিত হয়ে কর্ম করেন এবং কর্মের সফলতা-বিফলতা বিষয়ে নির্বিকার থাকেন এমন কর্তাকে সাত্ত্বিক কর্তা বলে। সাত্ত্বিক কর্তা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানে কর্ম করেন। কাজ করার ক্ষেত্রে এমন কর্তার মধ্যে অহমবোধ কাজ করে না। দায়িত্ববোধ থেকে নির্ধারিত বা নিয়তকর্ম করেন। বস্তুত ইনিই কর্মযোগী।

যে কর্তা জাগতিক কাজ-কর্মে অতি মাত্রায় আসক্ত এবং কাজের ফল ভোগে প্রলুব্ধ তেমন কর্তা হচ্ছে রাজসিক। এরা হিংসাপরায়ন হয় এবং স্বার্থের কারনে ন্যায়-অন্যায়ও বিবেচনা করে না। প্রাপ্তিতে অতি আনন্দিত হয় এবং না পেলে ভীষনভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

তামসিক কর্তা কি করা উচিত, কি করা উচিত না এসব বিষয় নিয়ে ভাবে না এবং অনুচিত কর্মেও প্রবৃত্ত হয়। এরা অলস প্রকৃতির হয়। তাই এদেরকে বিষন্ন বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

২৯	হে ধনঞ্জয়! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির যে তিনটি ভেদ আছে তা আমি বিস্তারীত ও পৃথকভাবে বলছি শোন।
৩০	যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, কার্য-অকার্য, ভয়-অভয় ও বন্ধন-মুক্তি যথাযথভাবে বোঝা যায়, হে পার্থ! সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী।
৩১	যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম-অধর্ম, কার্য-অকার্য অযথাযথভাবে বোঝে, হে পার্থ! সেটি রাজসিক।
৩২	অজ্ঞতা দ্বারা আবৃত যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সব বিষয়কে বিপরীত দেখে, হে পর্থ! সেই বুদ্ধি তামসিক।

● **১৮.২৯-৩২** প্রকৃতির গুণ অনুসারে কর্তার বুদ্ধি ও ধৃতিরও তিনটি প্রকারভেদ আছে। যে বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি অর্থাৎ কোন কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং কোন কাজ থেকে নিবৃত থাকতে, কর্তব্য-অকর্তব্য, কিসে ভয় কিসে অভয়, কিসে বন্ধন এবং কিসে মোক্ষ লাভ হয় এসব যথাযথভাবে বুঝতে পারা যায় সেটি সাত্ত্বিক গুণাশ্রিত।

অপরদিকে যে বুদ্ধি দ্বারা ওপরোক্ত বিষয়সমুহ যথাযথভাবে অবগত হওয়া যায় না সেটি রাজসিক এবং তমোগুণাশ্রিত বুদ্ধি অজ্ঞতা দ্বারা আবৃত থাকে। তাই অধর্মকেই ধর্ম মনে করে। তেমনিভাবে সব বিষয়ে বিভ্রমে পতিত হয় এবং সঠিক কাজটি করতে পারে না। তারা সব বিষয়ে যেটি সঠিক তার বিপরীতটাকে সঠিক বলে মনে করে।

৩৩	হে পার্থ! যোগবলে যে ধৃতি দ্বারা মন-প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সকল ক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত হয় এবং অবিচল একাগ্রতা থাকে সেটি সাত্ত্বিকী।
৩৪	হে অর্জুন! যে ধৃতি কেবল ধর্ম, অর্থ ও কামোপভোগেই একাগ্র থাকে এবং সেই সেই বিষয়ে ফলাকাঙ্খী হয় হে পার্থ! সেটি রাজসিক।

৩৫	হে পার্থ! যে ধৃতি দ্বারা জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন ব্যাক্তি স্বপ্ন বিভোরতা, ভয়, শোক, বিষাদ ও বিভ্রমতা পরিত্যাগ করতে পারে না- সেটি তামসিক।

- **১৮.৩৩-৩৫** 'যোগ' হচ্ছে পরমাত্মার সাথে সংযোগ বা সম্পর্ক স্থাপনের উপায়। যোগবলে যে ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য, সংকল্প বা একাগ্রতা দ্বারা মন-প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সকল ক্রিয়া নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরমেশ্বর ভগবানে অটল-অবিচল থাকে সেই ধৃতি হচ্ছে সত্ত্ব গুণাশ্রিত। কোন কার্যকলাপ দ্বারা তা ভঙ্গ হয় না।

যে ধৃতি ধর্ম, অর্থ ও কামোপভোগের পেছনে লেগে থাকে এবং এসব কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বদা ফলের আকাঙ্খা করে সে ধৃতি রজো গুণাশ্রিত। তাদের একমাত্র বাসনা হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করা। মোক্ষ লাভ তাদের লক্ষ্য নয়।

যে ধৃতি স্বপ্ন বিভোরতা, ভয়, শোক, বিষাদ ও বিভ্রমতা পরিত্যাগ করতে পারে না- অর্থাৎ এগুলোতে মানুষকে আবদ্ধ করে রাখে জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন সে ধৃতি হচ্ছে তামসিক।

ধৃতি হচ্ছে সেই মানসিক শক্তি যা দ্বারা মানুষ কোন কর্মে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। অর্থাৎ ধৃতি হচ্ছে সংকল্প, ধৈর্য্য, একাগ্রতা। অতএব যে ধৃতি দ্বারা মন-প্রাণ সাত্ত্বিকী বা নিষ্কাম কর্মে লেগে থাকে তা সাত্ত্বিকী ধৃতি। যে ধৃতি বা একাগ্রতা রাজসিক বিষয়ে লেগে থাকে তা রাজসিক ধৃতি এবং যে ধৃতি তামসিক বিষয়ে লেগে থাকে তা তামসিক ধৃতি। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৩৬	হে ভারতশ্রেষ্ঠ! এবার আমার কাছে তিন ধরণের সুখী অবস্থার কথা শোন।
৩৭	যে সুখে অভ্যাসবশত ক্রমে আনন্দ লাভ হয় এবং দুঃখের অবসান হয়; প্রথমে বিষের মতো মনে হয়, কিন্তু পরিশেষে অমৃততূল্য বোধ হয়; যা নির্মল আত্ম-উপলব্ধিজাত সে সুখ সাত্ত্বিক বলে কথিত হয়।
৩৮	ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে ফলে যে সুখ প্রথমে অমৃততূল্য বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে বিষাক্ত অনুভূত হয় সে সুখ রাজসিক বলে কথিত হয়।
৩৯	এবং যে সুখ প্রথমে এবং শেষেও আত্মার বা বুদ্ধির মোহজনিত কারণে নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয় সেটি তামসিক বলে উদ্ধৃত হয়।

৪০	পার্থিবীতে কিংবা স্বর্গে বা দেবতাদের মধ্যে এমন কোন সত্ত্বা বা অস্তিত্ব নেই যা প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত আছে।

• **১৮.৩৬** কর্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রথমে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা; অতঃপর বুদ্ধি ও ধৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার কর্ম থেকে প্রাপ্ত ফল তথা সুখের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে। জীব বস্তুত কর্মের মাধ্যমে সুখ ভোগ করতে চায়। প্রাপ্ত এই সুখের ধারণাও স্বভাবজাত গুণের কারণে তিন প্রকারের হয়ে থাকে। সে প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে।

• **১৮.৩৭** কিছু সুখ আছে যা সুখ হিসেবে পরে উপলব্ধ হয় কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় ক্লেশকর ও বিরক্তিকর বোধ হয়। যেমন আত্ম-উপলব্ধিবোধ জাগ্রতকরণের কথা বলা যেতে পারে। এমন জ্ঞান লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে এর জন্য কঠোর সাধনা করতে হয়। সংযম পালন করতে হয়। ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগকালে তাৎক্ষণিক যে সুখ-আনন্দ পাওয়া যায় এক্ষেত্রে তা তো পাওয়া যায়ই না উপরন্তু কষ্টকর বোধ হয়। জাগতিক অনেক আনন্দ এর জন্য পরিত্যাগ করতে হয়। সেজন্য বলা হয়েছে যে প্রথমে বিষের মতো মনে হয়। কিন্তু সাধনায় লেগে থাকলে, জ্ঞান সমৃদ্ধ হলে দুঃখের অবসান হতে থাকে এবং ক্রমে আনন্দ লাভ হয়। সফল হলে পরিণাম হয় অমৃততূল্য। এমন সুখ সাত্ত্বিক প্রকৃতির। এ সুখ বস্তুত আত্ম-উপলব্ধিজাত এবং নির্মল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

• **১৮.৩৮** ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সুখ অনুভূত হয় তা রাজসিক। এ ধরণের সুখ ভোগকালে অমৃততূল্য মনে হয় কিন্তু পরিণাম যন্ত্রনাদায়ক হয়ে দাড়ায়। এটি রাজসিক সুখ। এ সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং জাগতিক বন্ধনের কারণ। যেমন উদাহরণ হিসেবে যৌনসুখ ভোগের কথা বলা যেতে পারে।

• **১৮.৩৯** যে সুখ প্রথমে অর্থাৎ ভোগকালে এবং শেষে অর্থাৎ পরিণামেও নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয় সেটি তামসিক। অর্থাৎ আলস্য-নিদ্রার যে সুখ তাই হচ্ছে তামসিক সুখ। এতে শুরুতেও সুখ নেই পরিণতিতেও সুখ নেই। আত্মার মোহজনিত কারণে এমন সুখ উপলব্ধ হয়। এ ধরণের ব্যাক্তিরা মোহজনিত সুখে বিভোর থাকে বিধায় কর্তব্যকর্ম নির্ধারণ করতে পারে না। ফলে কর্মহীন জীবন প্রকৃত সুখের নাগাল পায় না। এমন জীবন বৃথাই জীবনধারণ।

• **১৮.৪০** বলা হচ্ছে, পার্থিব জগতে এমনকি স্বর্গ কিংবা সমগ্র মহাবিশ্বে মানুষ হোক কিংবা দেবতাই হোক, কোথাও এমন কোন অস্তিত্ব বা জীবসত্ত্বা নেই যা প্রকৃতিজাত এই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এমনকি জগতের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত কেউই এই ত্রিগুণের প্রভাবমুক্ত নয়। সকলে এই ত্রিগুণের দ্বারা জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে।

বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে এই ত্রিগুণের প্রভাবের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে হবে। যেন কোনভাবেই এই ত্রিগুণ নিজেকে আন্দোলিত বা বিচলিত করে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করতে না পারে। মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য সে সাধনা করতে হয়। ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে পারলে ব্রহ্মের নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। মনুষ্যত্বের পরবর্তী সোপানই হচ্ছে ব্রহ্মত্ব লাভ করা।

গুণাতীত বা এই ত্রিগুণের উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হতে পারলে দেহ-মন সব শান্ত হয়ে আসে। ব্রহ্ম ভাব চলে আসে। তখনই মানুষ আত্ম-উপলব্ধিবোধসম্পন্ন এবং ধীর-স্থির বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসে অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন মানুষ হচ্ছেন যথার্থ যোগী। গুণাতীত আত্মতৃপ্ত যোগীর জন্য কোন কর্তব্য কর্ম থাকে না। তিনি সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে বিচরণ করেন।

সাত্ত্বিক জ্ঞান হচ্ছে সর্বভূতে সমদর্শন ও ঈশ্বর বিষয়ে একত্বের ভাব অনুভূত হওয়া। সাত্ত্বিক কর্তা হচ্ছেন আসক্তিবিহীন। সাত্ত্বিক কর্ম হচ্ছে নিষ্কামকর্ম। সাত্ত্বিক বুদ্ধি হচ্ছে মোক্ষের অনুকূল। সাত্ত্বিক ধৃতি মোক্ষ লাভের অনুকূল কাজে একাগ্রচিত্ত হতে সহায়তা করে। এভাবে সাত্ত্বিক কর্মের অমৃত ফল লাভ হচ্ছে সাত্ত্বিক সুখ। রাজসিক ও তামসিকও তদানুরূপ ফল দেয়।

জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ এগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়। কিন্তু জীবের গুণের বা স্বভাবের পার্থক্যের কারণে এগুলিও পার্থক্যপূর্ণ হয় অর্থাৎ ত্রিবিধ হয়। তবে সাত্ত্বিক গুণ শ্রেষ্ঠ ও মোক্ষ লাভের অনুকুল। ওপরের আলোচনায় সে বিষয়টি উঠে এসেছে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণভেদে মানুষের কর্মও নির্ধারিত হয়। সেটিকেই স্বভাব নিয়তকর্ম, স্বকর্ম বা স্বধর্ম বলে। কিন্তু কার কি স্বভাব, কার জন্য কি কর্ম

নির্ধারণ করা হবে সেটি কিভাবে বোঝা যাবে? সেজন্য চতুর্বর্ণের ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪১	হে পরন্তপ! স্বভাবজাত গুণ অনুসারে ব্রাক্ষান, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্মসমুহের বিভাজন করা হয়েছে।
৪২	শম, দম, তপস্যা, পবিত্রতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম মনস্কতা এগুলি হচ্ছে ব্রাক্ষানদের স্বভাবজাত কর্ম।
৪৩	শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কর্ম দক্ষতা ও যুদ্ধে পলায়ন না করা, দানশীলতা, প্রভূত্বের ভাব এগুলি হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম।
৪৪	কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য স্বাভাবজাত বৈশ্য কর্ম এবং পরিচর্যা বা সেবামূলক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত।

- **১৮.৪১-৪৪** গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে মানব সমাজের চারটি বিভাগ বা বর্ণ বিভাজন ভগবান নিজেই সৃষ্টি করেছেন। এগুলি হচ্ছে ব্রাক্ষান, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

মনঃসংযম (শম), ইন্দ্রিয় সংযম (দম), তপস্যা, পবিত্রতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম মনস্কতা এগুলি হচ্ছে ব্রাক্ষানদের স্বভাবজাত কর্ম। যখন কারও স্বভাবে এসব গুণাবলী দেখা যায় বা নিরন্তর চর্চ্চা করার ফলে এমন ভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ব্রাক্ষাণ শ্রেণীভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন।

শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কর্ম দক্ষতা ও যুদ্ধে পলায়ন না করা, দানশীলতা, প্রভূত্বের ভাব এগুলি হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। যাদের মধ্যে এ ধরণের প্রবণতা বা যোগ্যতাগুলি পাওয়া যাবে তারা ক্ষত্রিয় শ্রেণীর বলে মনে করা যেতে পারে।

'ক্ষৎ' শব্দের অর্থ হচ্ছে আঘাত। 'ত্রায়'-তে ত্রাণকর্তা। অর্থাৎ আঘাত বা বিপদ থেকে যিনি ত্রাণ বা রক্ষা করেন তিনি হচ্ছেন ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়রা শত্রুকে যুদ্ধে আহবান করে এবং তার প্রাণ হরণ করতেও দ্বিধা করে না। তাদেরকে সেভাবেই গড়ে তোলা হয়।

অপরদিকে কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য বৈশ্য স্বাভাবজাত কর্ম এবং পরিচর্যা ও সেবামূলক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত। শূদ্র বলতে নিচু শ্রেণী বোঝায় না। আর্থ-সামাজিক

এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চাপের কারণে যথাযথ শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি থেকে অতীতে যারা বঞ্চিত হয়েছে তারাই এ দলভূক্ত হয়েছে।

ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তেজ, বৈশ্যের ধন ও শূদ্রের সেবা দ্বারা সমাজ রক্ষা, বিকাশ ও শৃংখলা বিধানের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার পালনকর্তা জানেন তুমি এবাদতের জন্য দন্ডায়মান হও ... তোমার সঙ্গীদের একটি দলও দন্ডায়মান হয়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ-বিদেশ ভ্রমন করবে এবং কেউ আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) সংগ্রাম বা জেহাদে লিপ্ত হবে।" (আল-কোরআন ৭৩:২০)

ওপরের উদ্ধৃতিটি একটু মনযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যাবে যে এখানেও কর্মের সেই একই প্রকারের বিভাজনের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"পার্থিব জীবনে আমিই তাদের জন্য জীবিকা বন্টন করি এবং একের মর্যাদাকে অপরের ওপর উন্নীত করি যেন একে অপরের থেকে সেবা নিতে পারে।" (আল-কোরআন ৪৩:৩২)

চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, 'গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে মানব সমাজের চারটি বিভাগ আমিই সৃষ্টি করেছি' [দ্রষ্টব্য গীতা ৪:১৩]। কর্ম বিভাজনের বিষয়টি প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত ব্যাক্তির স্বভাব, আগ্রহ, প্রবণতা বা ঝোঁকের ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ স্বভাবও আবার গড়ে ওঠে পূর্ব জনমে যে নিজের যেমন সংস্কার সাধন করেছে তার ওপর ভিত্তি করে। যদিও যথাযথ সাধনা বা প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমেও একেক জনকে একেক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়। সময়ের প্রেক্ষিতে এভাবে বলা হচ্ছে।

জোর করে কিংবা মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে দিয়ে কোন কাজ করান উচিত নয়। কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার ক্ষেত্রে গুণ ও কর্মের বিবেচনাটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে ন্যায়সম্মত। বিষয়টি মোটেও জন্মগত বিবেচনায় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিষয়টিকে জন্মগত করে ফেলা হয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে, যথাযথ পারমার্থিক জ্ঞান ও সাধনা ছাড়াই কেউ জন্মগতভাবে ব্রাক্ষন হয়ে যাচ্ছে। ভীতু ও যোদ্ধা মনোবৃত্তিহীন মানুষও ক্ষত্রিয় সেঁজে বসে আছে। জন্মগতভাবে বৈশ্য হলেও

সকলে ব্যাবসা করতে ইচ্ছুক নয়। আজও আমরা সঠিকভাবে বিষয়গুলিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণের ঘরে দুষ্কৃতকারী জন্ম নিতে পারে। আবার ক্ষত্রিয়ের ঘরে ভীরু-কাপুরুষের জন্ম হতে পারে।

বিধাতার নির্দেশনায় ত্রুটি নেই। মানুষ অনুধাবনে ব্যার্থ হলে বিধাতার নির্দেশনার প্রকৃত অর্থ উপেক্ষিত হয়। সমাজের মানুষের নির্জ্ঞানতা ও নিশ্চুপতা ত্রুটি-বিচ্যূতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

ধর্মীয় দিক-নির্দেশনাসমুহকে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবার মতো করে গ্রহণ করা হচ্ছে না। এগুলিকে মানুষ এক প্রকার ব্যাকরণের মধ্যে ফেলে দিয়ে সকলে পূণ্য লাভের পেছনে ছুটে চলেছে। পূণ্য কি সেটিও যথার্থভাবে বুঝছি না বা বুঝতে চাচ্ছি না বা কেউ কেউ বুঝতে দিতে চাচ্ছি না। বিভিন্নভাবে এগুলিকে সঙ্গায়িত করা হচ্ছে যা বাস্তব জীবনে পরিপূর্ণভাবে কাজেও লাগছে না। কল্পনায় ভর করে সবাই স্বর্গ লাভের আশায় পূণ্য লাভের পেছনে ছুটছে। তাই ব্রক্ষণ বললে মনজগতে এক ধরণের ছবি ভেসে ওঠে। অথচ সত্য হচ্ছে অধ্যাপনা থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী পর্যন্ত সকলে ব্রাক্ষ্যণ্য স্বভাবজাত। এগুলিও পূণ্যের কাজ। সেভাবেও বিষয়গুলিকে বুঝতে হবে।

তথাপি বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে জন্ম, বর্ণ এভাবে পালনেরও কিছু যৌক্তিক ভিত্তি আছে। সে বিবেচনাও ফেলে দেবার নয়। তবে সময়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টিগুলিকে ধীরে ধীরে যথাজ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়। যথাযথ শিক্ষা ভিন্ন কোন পরিবর্তনই যথাযথ বিবেচিত নয় সে বিষয়টিকেও স্মরণে রাখতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে, সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন ব্রাক্ষান শ্বেত বর্ণযুক্ত, রজঃ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় রক্তিম বর্ণ, কিংবা কল্পনার চোখে দেখা তমোগুণের শূদ্রকে কৃষ্ণ বর্ণরূপে দেখাও যথাযথ নয়। এভাবে বর্ণ প্রথা সৃষ্টি করা হয়নি। বর্ণ প্রথা সৃষ্টি করা হয়েছে কর্ম ও গুণের ভিত্তিতে। সত্য হচ্ছে মানুষ সকলেই সমান ও সমমর্যাদাসম্পন্ন। সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির বৈষম্যের কারণে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যথাযথ দিক-নির্দেশনাকে যখন এবং যেখানেই ভ্রান্ত পথে চালনা করা হয়েছে তখনই পরমেশ্বর ভগবান বা আল্লাহ নিম্নরূপ বার্তা প্রেরণ করেছেন। বলা হচ্ছে,

“বল, আমরা আল্লাহর রং বা বর্ণ ধারণ করেছি। আল্লাহর বর্ণের চাইতে উত্তম বর্ণ আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই উপাসনা করি।” (আল-কোরআন ২:১৩৮)

যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে এমনসব প্রথার প্রচলন ছিল যে মানুষকে গোসল করিয়ে পূত-পবিত্র করান হত। যেন তার সকল পাপ ধুয়ে-মুছে যায় এবং সে এক নতুন রং বা বর্ণ ধারণ করে। এমনকি নবজাতক শিশুদের ক্ষেত্রেও এভাবে পালন করার প্রচলন ছিল।

বস্তুত এসব নিয়ম-বিধির সাথে মুক্তি প্রাপ্তির কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মের ক্ষেত্রে এসব নিয়ম-কানুন আদৌ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ভাল কর্মই কেবল মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। তেমন কোন এক অবস্থার প্রেক্ষিতেই ওপরে উদ্ধৃত বাণীটি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সমগ্র গীতায়েও ভাল কর্ম সম্পাদনের ওপরই জোর দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"ভাল কর্মই মানুষকে উচ্চে উন্নীত করে।" (আল-কোরআন ৩৫:১০)

জ্ঞানের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের স্বভাব, আচরণ, সৃষ্ট পরিবেশ সব পরিবর্তন হয়। স্বভাব পরিবর্তন হলে বর্ণ পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন যদি সম্ভব না হত তাহলে কেউই কখনও মোক্ষ লাভের যোগ্য হয়ে উঠতে পারত না। যে যে বর্ণভূক্ত সে চিরকালই সেখানে পড়ে থাকত।

সাধনা বলে এক স্তর থেকে ধীরে ধীরে উন্নীত হয়ে উচ্চতর পর্যায়ে যাওয়ার জন্যই নানাবিধ শাস্ত্র নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এভাবে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মে লীন হওয়ার পর্যায়ে যে কেউ উন্নীত হতে পারে।

অর্জুন হচ্ছেন ক্ষত্রিয়। ন্যায়ের পক্ষে সময়ে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়া তথা যুদ্ধ বা জেহাদ করা তার জন্য স্বধর্ম। তাকে সেভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে। সন্ন্যাস তাঁর জন্য নয়। সংকটকালে যুদ্ধ পরিত্যাগ করা তাঁর জন্য মর্যাদা হানিকর এবং স্বধর্মের বিধি বিবেচনায় পাপের। উচ্চে উন্নীত হতে হলে তাঁকে ভাল কর্ম তথা স্বধর্ম পালন করতে হবে। সৃষ্টি সুরক্ষায় অংশ নিতে হবে। বলা হচ্ছে,

৪৫	নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্ম করে সকল মানুষই সিদ্ধি লাভ করতে পারে। স্বীয় কাজে যুক্ত থেকে যেভাবে সিদ্ধি লাভ করা যায়- তা শোন।
৪৬	যেখান থেকে সমস্ত জীবের প্রবৃত্তি বা কর্ম প্রচেষ্টার সূচনা; যার দ্বারা এই সমস্তকিছু পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে; মানুষ নিজ নিজ কর্মের দ্বারা তাঁর অর্চনা

	করে সিদ্ধি লাভ করতে পারে।

• **১৮.৪৫-৪৬** যে যে বর্ণভূক্তই হোক না কেন স্বধর্ম তথা নিজ নিজ কর্ম যথাযথতার সাথে পালন করার মধ্য দিয়ে সকলেই সিদ্ধি লাভ করতে পারে। কেন এবং কিভাবে স্বভাবজাত কর্ম করে সিদ্ধি লাভ হয় শ্রীকৃষ্ণ সে প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।

বলা হচ্ছে, 'যেখান থেকে সমস্ত জীবের প্রবৃত্তি বা কর্ম প্রচেষ্টার সূচনা' প্রশ্ন হচ্ছে কোনখান থেকে সমস্ত জীবের প্রবৃত্তি বা কর্ম প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছে? 'যার দ্বারা এই সমস্ত কিছু পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে' কারা দ্বারা এই সমস্ত কিছু পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে?

তিনিই হচ্ছেন ভগবান যার থেকেই সকল কর্মের শুরু এবং যার দ্বারা সমগ্র জগত পরিব্যাপ্ত। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, লালন-পালনকর্তা এবং সংহারকর্তাও তিনি। তিনিই সর্বোচ্চ। তাঁর উর্ধ্বে আর কেউ নেই, কিছু নেই।

তাঁকে পাওয়াই হচ্ছে জীবের লক্ষ্য। সে লক্ষ্য অর্জন করাই হচ্ছে সিদ্ধি লাভ করা। কিভাবে তাঁকে পাওয়া যাবে? ভগবানকে পেতে হলে তাঁকে তুষ্ট করতে হবে। কিসে তাঁর সর্বোচ্চ তুষ্টি অর্জন হয়? তাঁর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি-ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ জন্মাতে হবে। তাঁর পূঁজা-অর্চনা, এবাদত-উপাসনা এগুলি করতে হবে। তবেই তিনি তুষ্ট হবেন।

পূঁজা-অর্চনা, এবাদত-উপাসনা এগুলি আসলে কি? এগুলির মাধ্যমে আমরা কি করি? এগুলির মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি-ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ ঘটাই। তাঁকে স্মরণ করি। তাঁর মহাত্ম ঘোষণা করি। তাঁকে তুষ্ট করি। শুধু কি এগুলিই তাঁকে তুষ্ট করার একমাত্র ও গুরুত্বপূর্ণ উপায়?

তাঁর সৃষ্টিকে যে ভালবাসে তার প্রতিও তিনি তুষ্ট। সে তাঁর খুব প্রিয়। কে তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসে? কিভাবে বোঝা যাবে যে কেউ একজন তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসে?

যে তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে আগ্রহী সে তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসে। কে তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে আগ্রহী? তাঁর সৃষ্টিকে জানার আগ্রহ নিয়ে যে বা যারা সাধনা করে, ধ্যান-গবেষনা করে তারা অবশ্যই তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে আগ্রহী এবং এক্ষেত্রে তাঁরাই সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী। তাঁর সৃষ্টিকে জানার মধ্য দিয়ে তারা আসলে কি করে? তাঁর সৃষ্টিকে জানার মধ্য দিয়ে তারা প্রকৃতপক্ষে তাঁকে জানার বা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। তেমন মানুষ বস্তুত ভগবানে বিষয়ে অধিক আগ্রহী; তেমন মানুষ ভগবানে মনযোগী;

সে তাঁর প্রকৃত ভক্ত। সে সর্বক্ষণ তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকে। তাঁকেই সর্বক্ষণ স্মরণ করে। তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করে। যে তাঁকে স্মরণ করে, তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করে তিনিও তাকে ভালবাসেন। সে তাঁর কাছে অধিক প্রিয়।

শুধু স্মরণ ও পাওয়ার আগ্রহেই কি কারও প্রিয় হওয়া যায়? যায়, তবে প্রয়োজনের কালে আন্তরীকতার কিছু প্রমাণ বা বহিঃপ্রকাশও থাকতে হয়। সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কর্ম প্রদর্শন করতে হয়। যে তাঁর সৃষ্টি সুরক্ষায় কাজ করে, যে তাঁর সৃষ্টির পরিচর্য্যা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনে কাজ করে, সৃষ্টিকে ধ্বংসের সম্ভাবনার হাত থেকে রক্ষায় অংশগ্রহণ করে তারাই তাঁর অধিক প্রিয়। তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

স্বভাবের ভিত্তিতে মানুষের কর্মকে বিধাতা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যেটিকে বর্ণ প্রথা বলে জানি। এটি হচ্ছে ডিভিশন অব লেবার। সৃষ্টি সুরক্ষায় এ কাজগুলি প্রয়োজন। অতএব নিজ নিজ কর্ম ভালভাবে সম্পন্ন করে ভগবান বা আল্লাহর সৃষ্টিকে রক্ষায় প্রত্যেকে তাঁর সহগামী হয়ে তাঁরই প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারে। কাজগুলি উপাসনারই অন্তর্ভূক্ত বিষয়। উপাসনায় নিরবে-নিভৃতে যে নিয়তে কাজ করা হয় কর্মের মধ্য দিয়ে তারই বাস্তব প্রয়োগ ঘটে। উপাসনারই বাস্তব রূপ হচ্ছে স্বধর্মের আচরণ বা নিয়তকর্ম।

কেবল মসজিদ, মন্দির, গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করাই একমাত্র উপাসনা না। যথাযথভাবে নিয়তকর্ম পালন করা উপাসনার অন্তর্ভূক্ত বিষয়। সকলের সকল কর্মের মধ্য দিয়েই জগত পরমের দ্বারা সুচারুভাবে পরিচালিত হয়। সৃষ্টির সর্বোচ্চ সুরক্ষা হয়। যা জীবসমুহের নিজেদেরও টিকে থাকার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। তাই বলা হয় 'সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞের ওপর প্রতিষ্ঠিত' [দ্রষ্টব্য গীতা ৩:১৫]। এ কথার মর্ম অর্থ বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপাসনাস্বরূপ প্রতিনিয়ত যে সকল বিধি-বিধান আমরা সাধারণভাবে পালন করে থাকি তবে কি সেগুলি উপাসনা নয়? সেগুলি কি অপ্রয়োজনীয়? অবশ্যই না। সেগুলিও উপাসনা এবং প্রয়োজনীয়। তবে সেসব উপাসনা পালন করা হয় সাধারণ মানুষকে স্বভাবজাত গুণানুসারে যথাযথভাবে কর্মে প্রবৃত্ত করার জন্য; সমাজে শৃংখলা রক্ষার জন্য; কর্মীদের মাঝে সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করার জন্য; কর্মে সমন্বয় সাধনের সুবিধার জন্য; কমান্ড সিস্টেম ঠিক রাখার জন্য; সৃষ্টিকে রক্ষায় সকলকে নিজ নিজ

কাজে তথা স্বধর্মে যথাযথভাবে নিয়োজিত করার জন্য বা প্রবৃত্ত হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য এবং ইত্যাকার বহুবিধ এমনকি বহুবিধ মানসিক কারণেও সেসবের পরিপালন গুরুত্ব বহন করে।

জীবের নিয়তকর্মই জগতকে সঠিকভাবে চলতে সহায়তা করে। জগত পরিচালনাকারী জীবের স্বধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে করা কর্মে সবচাইতে বেশী তুষ্ট হন। কেননা সৃষ্টি সুরক্ষা ও রক্ষায় সেটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মাথা নিচু করে চিরকাল সেজদা বা নমস্কার করলেও বিধাতার তুষ্টি অর্জন করা যাবে না যদি না পরিশেষে প্রকৃত কর্ম ভাল হয়। অতএব ভাল কর্মই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। যেমন বলা হয়েছে,

"ভাল বাণী আল্লাহর দিকেই আরোহন করে এবং ভাল কর্মই মানুষকে উচ্চে উন্নীত করে। .." (আল-কোরআন ৩৫:১০)

"সঠিক কাজ শুধু এই নয় যে পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করা, বরং সেই সঠিক পথ অবলম্বনকারী .. যে আল্লাহকে ভালবেসে সম্পদ ব্যায় করে .. মানুষকে মুক্ত করার জন্য এবং গরীবের প্রাপ্য অংশ প্রদান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে এবং অভাবে, বিপদে-আপদে, চাপের মুখে ধৈর্য্যধারণ করে তারাই হল সত্যনিষ্ঠ।" (আল-কোরআন ২:১৭৭)

যে যে কর্মেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, যদি সে তার নিজ কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে পালন করে এবং কর্মের মধ্য দিয়ে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকে, তবে সেটি তাঁর উপাসনাস্বরূপ গণ্য হয় এবং কর্মের মধ্য দিয়েই ভগবানের অর্চনা করে সিদ্ধি লাভ করে।

অর্জুনের স্বধর্ম বা স্বভাবজাত কর্ম হচ্ছে ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ, সংগ্রাম বা জেহাদ করা। এর মাধমে তিনি কেবল রাজ্যই নয় বরং ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরম সিদ্ধিও লাভ করবেন। কেননা তাঁর নিয়তকর্ম বা স্বধর্ম পালন সৃষ্টিকে রক্ষা করার স্বার্থে অতীব প্রয়োজনীয়। অন্যথায় জগত সংসারে জীবাণুর আক্রমন হবে। অন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে। সৃষ্টি ধ্বংস হবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে এভাবেই বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। যেমন বলা হয়েছে,

“যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি একান্তই দয়াশীল।” (আল-কোরআন ২:২৫১)

যিনি ভগবান বা আল্লাহর কাজে সহায়তা করেন আল্লাহও তাঁকে সহায়তা করেন। তিনি হন পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র। তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করেন। নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্ম করে সকল মানুষ এভাবে সিদ্ধি লাভ করতে পারে।

পূর্ব জন্মে মানুষ যেমন তার সংস্কার সাধন করে সে ভিত্তিতে তার বর্তমান স্বভাবজাত কর্মের সূচনা হয়ে থাকে। বর্তমানেরটা ভবিষ্যতের সূচনা করবে। বস্তুত স্বভাবজাত কর্ম বিধাতা কর্তৃক নির্ধারিত হয়। কেননা সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে তিনি সেভাবে প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেটি বিধাতার প্রয়োজন সম্পন্ন করে। বলা হচ্ছে,

“নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে প্রত্যেকেই আল্লাহর সেজদায় পতিত হয় ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়।” (আল-কোরআন ১৩:১৫)

এর অর্থ হচ্ছে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, বুঝে কিংবা না বুঝে প্রত্যেকে ভগবান বা আল্লাহর কর্মই (Purpose serve) করে চলেছে। কেবল মাটিতে কপাল স্পর্শ করেই নয়, সকল কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ ভগবানের সেবা-অর্চনা করে চলেছে। সেভাবে সকল সৃষ্টিকর্ম বা সৃষ্টি কৌশল সাঁজানো রয়েছে। মানুষ নিজ নিজ কর্মের দ্বারা ভগবানের সেবা-অর্চনা করে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। বলা হচ্ছে,

৪৭	অনুৎকর্ষতার সাথে স্বধর্ম পালন করা উৎকর্ষতার সাথে পরধর্ম পালন করা অপেক্ষাও শ্রেয়। কেননা স্বভাব-বিহিত কর্ম করলে পাপ প্রাপ্ত হয় না।
৪৮	হে কৌন্তেয়! সহজাত কর্ম ক্রটিযুক্ত হলেও ত্যাগ করবে না। কেননা সকল কর্মই কিছু ক্রটি দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন অগ্নি আবৃত থাকে ধূম্র দ্বারা।

• **১৮.৪৭-৪৮** অর্জুন ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও স্বধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সব কাজেই কিছু না কিছু ক্রটি থাকে। যেমন অগ্নি ধূম্র দ্বারা আবৃত থাকে। কিছু ক্রটিযুক্ত হলেও নিজ কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা সেটি স্বভাববিহিত কর্ম, আগ্রহের জায়গা এবং সেটিতেই একজনের সর্বোচ্চ

দক্ষতা গড়ে ওঠে। মন-প্রাণ সে কাজের দিকেই ঝুঁকে থাকে। সে কাজ আগ্রহ ও আনন্দের সাথে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। ক্লেশকর বোধ হয় না।

স্বধর্মের কাজ সমাজের মানুষের দ্বারাও স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য হয়। এমনকি বিধাতার দ্বারাও সেটি স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য। কেননা এভাবে একজনের গড়ে ওঠার পেছনে দৈবেরও হাত থাকে। পূর্ব জনমের সংস্কারের সাথে এর একটা সম্পর্ক থাকে। যে বিধি বিধাতা সৃষ্টি করে রেখেছেন।

স্বধর্মের কাজ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেও সমাজের মানুষ সেটিকে বড় অপরাধ বলে গণ্য করে না। আর যদি আমিত্ববোধ ও কর্মের ফল ত্যাগ করে তেমন কর্ম ভগবানের কারণে করা হয়, তবে তো সেটিতে কোন দোষ বা পাপই হয় না। তাই সহজাত কর্ম কিছু ত্রুটিযুক্ত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়।

অপরদিকে অপরের কাজ ভালভাবে বা উৎকর্ষতার সাথে সম্পন্ন করলেও সেটিতে কোন মূল্য সংযোজন হয় না। কেননা সে কাজ তার কাছে কেউই প্রত্যাশা করে না। আবার করতে গিয়ে ত্রুটি হলে জগতের মানুষও দোষারোপ করতে ছাড়ে না। তাই উৎকর্ষতার সাথে পরধর্ম পালন করা অপেক্ষা অনুৎকর্ষতার সাথে স্বধর্ম পালন করাও শ্রেয় ও নিরাপদ।

কর্ম করলে ফল লাভ হয়। ফল লাভ হলে ফল ভোগ করতে হয়। ফল ভোগের জন্য দেহ ধারণ করতে হয়। দেহ ধারণ করলে আবার কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর জীবন চক্রে আবদ্ধ হতে হয়। অথচ আধ্যাত্ম জ্ঞানের মূল বক্তব্য হচ্ছে কর্মের এ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া বা জন্ম-মৃত্যুর এই জীবন চক্র থেকে নিবৃতি লাভ করা। কিন্তু সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয় ক্ষেত্রেই কর্ম করতে হয়। তাহলে মুক্তি লাভের উপায় কি? শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৪৯	সর্ববিষয়ে আসক্তিবিহীন, সংযতচিত্ত, নিস্পৃহ ব্যাক্তি সন্ন্যাস তথা কর্মফল ত্যাগ দ্বারা নৈষ্কর্মরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন।
৫০	হে কৌন্তেয়! নৈষ্কর্মরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে যেভাবে ব্রহ্মভাব লাভ হয় সংক্ষেপে আমার কাছে শোন। এটিই জ্ঞানের চরম পর্যায়।

● **১৮.৪৯-৫০** সর্ববিষয়ে আসক্তিবিহীন, সংযত চিত্ত এবং নিস্পৃহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয় আহরণে যিনি চেষ্টা করেন না তিনিই নিস্পৃহ; এমন মানুষই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কর্মের ফল ত্যাগ করেন। ফল ত্যাগ করে নৈষ্কর্মরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। নৈষ্কর্ম কি?

নৈষ্কর্ম হচ্ছে কর্মশূণ্য অবস্থা। কোন কর্ম সম্পাদন হলে সেখানে একটা ফল জন্ম নেয়। কিন্তু নৈষ্কর্ম হচ্ছে ফলহীন অবস্থা। কর্ম করা সত্বেও সেখানে কোন কর্ম হয়েছে বলে মনে হবে না। ফলে কর্ম হয় কর্মশূণ্য। এমন কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না। কেননা যেখানে কোন কর্ম নেই সেখানে কোন ফলও নেই। যেখানে ফল নেই সেখানে ফলভোগ বা বন্ধনও নেই। এই কর্ম শূন্য অবস্থাই হচ্ছে নৈষ্কর্মরূপ সিদ্ধি লাভ করা। জীবিতাবস্থায়ও নিষ্কামকর্ম করে এমন বন্ধনমুক্ত মানসিক অবস্থা লাভ করা সম্ভব।

নৈষ্কর্মরূপ সিদ্ধি লাভ হলে সাধক ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হন। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হচ্ছে জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়। এটিই জীবনের পরম লক্ষ্য বা গন্তব্য। সাধকগণ এ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টায়ই ছুটে চলেছেন। নৈষ্কর্মের অবস্থা থেকে কিভাবে ব্রহ্ম লাভ হয় সে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৫১	যথার্থ ও শুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তি ধৈর্য্যের সঙ্গে মনকে নিয়ন্ত্রন করে এবং শব্দ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমুহকে পরিত্যাগ করে, আসক্তি-দ্বেষ বর্জন করে, নির্জন স্থানে বাস করে, স্বল্প আহার করে, দেহ-মন ও বাক সংযত করে, সর্বদা ধ্যানযোগে যুক্ত হয়ে বৈরাগ্য আশ্রয় করে, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম-ক্রোধ এবং বস্তুগত বিষয়াদি গ্রহণের বাসনা ত্যাগ করে মমত্ববুদ্ধিশূন্য শান্তচিত্ত হয়ে ব্রহ্মভাব অনুভবে সক্ষম হন। [৫১-৫৩]

● **১৮.৫১-৫৩** একজন যথাযথ ও শুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তির পক্ষেই নৈষ্কর্মরূপ সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হয়। অতএব যিনি নৈষ্কর্মরূপ সিদ্ধি লাভ করেন তিনি শুদ্ধ, নির্মল ও যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হবেন। তেমন মানুষ মনকে ধৈর্য্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রনে রাখতে জানেন। সংযত চিত্ত তেমন মানুষ ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে নিজেকে পরিহার করে নেন। বিষয়ে আসক্তি বা অনুরাগাত্মক ভাব বর্জন করেন।

শম, দম, নির্জনাবাস, স্বল্পাহার, সংযত বাক এগুলি ব্রহ্মে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। অপরদিকে অহঙ্কার, দর্প, কাম-ক্রোধ, লোভ এসব বিষয় ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির পথে বাধাস্বরূপ। এমতাবস্থায় বৈরাগ্যের দ্বারা বিকারগুলি যখন লোপ পায় তখন চিত্তের অস্থিরতা দুর হয় এবং মন শান্ত হয়ে আসে।

সকল যোগ্যতাগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে ব্রহ্মকে জানার যোগ্যতা লাভ হয়। তেমন অবস্থায় সাধক যখন ধ্যানমগ্ন বা সমাধিস্ত হন তখন তিনি ব্রহ্মভাব অনুভবে সক্ষম হন। নৈষ্কর্মরূপ সিদ্ধি লাভ করে এভাবেই ব্রহ্মভাব লাভ হয়। এ অবস্থাকে জ্ঞানের চরম পর্যায় বলা হয়েছে। জ্ঞানের চরম পর্যায় এ কারণে যে, এ অবস্থা থেকে সত্যের বোধ ও সেখান থেকে আত্ম-উপলব্ধিবোধ জাগ্রত হয়। ব্রহ্মভাব লাভ হলে কি হয়?

৫৪	ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যাক্তি শোক বা অনুশোচনা করেন না, কোন কিছুর জন্য আকাঙ্খা করেন না। সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী হন এবং আমার প্রতি পরম ভক্তিভাব লাভ করেন।

- **১৮.৫৪** ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হলে চিত্ত শান্ত-প্রসন্ন ও নির্মল হয়ে আসে। সুস্থ্য চিন্তায় সত্যের জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ভগবানকে চিনতে শিখেন। নিজেকে চিনতে ও বুঝতে শিখেন। পারস্পরিক সম্পর্কগুলি অনুধাবনে সক্ষম হন। জীবনের লক্ষ্যকে জানতে পারেন। সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমদর্শী হন। মন্দকে মন্দ না ভেবে পরিবেশ-পরিস্থিতি ও জীবের অসহায়ত্বকে দেখেন। ভগবান প্রত্যেককে তার নিজ নিজ স্থানে যথাযথভাবে নিযুক্ত রেখেছেন বিষয়গুলিকে তেমন মনে করেন। প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে সমান বিবেচনা করেন। তারা উঁচু-নিচু অবস্থান বিবেচনা না করে সর্বাবস্থায় ভগবানকে ভক্তি করেন। ফলে সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হন।

সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে অহঙ্কার বা আমিত্ববোধ দুর হয়ে যাওয়া। নিজেকে অন্যদের থেকে পৃথক মনে না করা। যা কিনা জাগতিক যন্ত্রনার অন্যতম কারণ। এই আমিত্ববোধ দুর হয়ে যাওয়াই হচ্ছে ব্রহ্ম অনুভবের স্তর। এ স্তরকেই ব্রহ্মভূত অবস্থা বলে। এ অবস্থায় কোন বিষয়ে শোক বা অনুশোচনা আসে না। সব বিষয়ে সাধক ভগবানে ভরসাকারী হন।

বস্তুত এ ভাবের সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক আছে। জ্ঞান মানুষকে প্রসন্নচিত্ত করে, আবার শোক না করার অপ্রয়োজনীয়তাগুলিও বুঝিয়ে দেয়। তবে বুঝলেই সে ভাব অর্জন হয়ে যায় না। জ্ঞান অনেকের থাকে কিন্তু সকলে ব্রহ্মভূত স্তরে পৌঁছাতে পারে না। তার জন্য স্বয়ং ভগবানের কৃপা প্রয়োজন হয়। জ্ঞানের সাথে যখন অন্তরকে তিনি একাকার করে দেন কেবল তখনই অর্জন সম্ভব হয়। এ স্তরে যিনি পৌঁছাতে পারেন তিনি ভগবানের প্রতি পরম ভক্তির ভাব অনুভব করেন। তিনি ভগবানে তন্ময় হয়ে যান। এমতাবস্থায় জাগতিক সকল কিছু প্রাপ্তির আকাঙ্খা তাঁর দুর হয়ে যায়। কেবল ভগবানের স্মরণ আসে। তাঁকে পাওয়ার আকাংখা জাগে।

উল্লেখ্য যে, জ্ঞানমার্গে স্থিতপ্রাজ্ঞের লক্ষণ, কর্মমার্গে কর্মযোগীর লক্ষণ, ধ্যানযোগে যোগীর লক্ষণ, ভক্তিমার্গে ভক্তের লক্ষণ সবই মূলত এক। সবই ব্রহ্মস্থিতির লক্ষণ। অর্থাৎ যে যে পথই অবলম্বন করুক না কেন সিদ্ধাবস্থায় লক্ষণ সব একই। প্রাপ্তি একই। গন্তব্য একই।

৫৫	আমি যেরূপ কেবলমাত্র ভক্তই তত্ত্বত বা স্বরূপত আমাকে জানতে পারেন। তত্ত্বত আমাকে জানার পরেই আমার জগতে প্রবেশ করেন।
৫৬	সদা-সর্বদা সমস্ত কর্ম করেও আমাকে আশ্রয় করে আমার অনুগ্রহে শাশ্বত-অব্যয় অবস্থা প্রাপ্ত হন।

• **১৮.৫৫-৫৬** ভগবানকে কেউ জানতে বা বুঝতে পারে না। তিনি যোগমায়া বা সৃষ্টি কৌশল দ্বারা আবৃত থাকেন বা নিজেকে আবৃত করে রাখেন। যেমন বলা হয়েছে,

“কোন মরণশীলের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন কোন ওহীর মাধ্যম ব্যাতিত বা কোন পর্দার অন্তরাল অথবা কোন দূত প্রেরণ করার মাধ্যম ব্যাতিত, যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান সে বার্তা পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই! তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।” (আল-কোরআন ৪২:৫১)

ভগবান ভালবাসেন প্রকৃত ভক্তদের। ভগবানকে জানতে হলে প্রকৃত ভক্ত হতে হবে। তিনি সকলের কাছে প্রকাশিত নন। পান্ডিত্যের দ্বারাও তাঁকে পাওয়া সম্ভব না।

কেবল পরম ভক্তির মাধ্যমেই তাঁকে পাওয়া সম্ভব। ভক্তদেরকে তিনি নিজেই তাঁকে বোঝার জ্ঞান দান করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে, তিনি তাদেরকে স্বীয় ক্ষমা ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার জন্য সরল পথ প্রদর্শন করবেন।" (আল-কোরআন ৪:১৭৫)

"যারা সর্বদাই আমাতে আসক্তচিত্ত, প্রীতি সহকারে আমার ভজনা করে তাদেরকে আমি বুদ্ধি-জ্ঞান দান করি যেন তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।" [গীতা ১০:১০]

ভক্তির ফলে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। ভক্তির দ্বারা তত্ত্বকে জানা যায়। ভগবান কে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ কি, তাঁর কত রূপ, তাঁর প্রভাব-বৈভব, তাঁর নির্গুণত্ব, পরব্রহ্মরূপ তিনি, সগুণ ঈশ্বর, তাঁর বিশ্বরূপ, বিশ্বময় পরিব্যাপ্ততা, হৃদয়ে পরমাত্মারূপেও তিনি- এভাবে তাঁর সমগ্র স্বরূপ জানার মাধ্যমে তাঁর জগতে ভক্তের প্রবেশ ঘটে।

যারা সত্যিকার ভক্ত তারা সকল কাজের মাঝে থেকেও সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করেন। তাঁকে আশ্রয় করে চলেন। তারা কোন অবস্থাতেই তাঁকে ভূলে যান না। কথায়-কাজে সর্বদা তাঁকেই স্মরণ করেন। ভগবানও তাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হন। তাঁর অনুগ্রহে তারা ব্রহ্মভূত স্তরে পৌঁছাতে পারেন। এ অবস্থাটি একবার আয়ত্বে চলে এলে জ্ঞান থেকে কখনও হারিয়ে যায় না। তাই এ অবস্থাকে শাশ্বত ও অব্যয়-অক্ষয় অবস্থা বলা হয়েছে। জ্ঞানের যথার্থ সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের প্রতি ভক্তিময় হয়ে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পন করা। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে ইচ্ছে করেন তিনি তার জন্য তাঁর প্রতি সমর্পনের পথ প্রশস্ত করে দেন। ... তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে চির শান্তির আবাস।" (আল-কোরআন ৬:১২৫-২৭)

৫৭	অতএব অন্তর থেকে সকল কর্ম আমাতে সমর্পন কর। আমামুখী হয়ে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাথে সর্বদা আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও।
৫৮	আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হলে তুমি আমার অনুগ্রহে সকল সংকট উত্তীর্ণ হতে পারবে। তবে যদি অহঙ্কারবশত না শোন- বিনষ্ট হয়ে যাবে।

• **১৮.৫৭-৫৮** কর্ম করার এমনকি জগতে টিকে থাকার সবচাইতে উত্তম কৌশল হচ্ছে ভগবান বা আল্লাহতে নিজেকে সমর্পন করা। কাজে-কর্মে সর্বাবস্থায় তাঁর ওপর ভরসা করা। ভগবানের আশ্রয় ব্যাতিত এ জগতে টিকে থাকা দুরুহ। ভগবানে আশ্রয় অন্তরের সকল ভীতি দুর করে ভেতরে সাহসের সঞ্চার করে। সাহসই জগতে নির্ভিক চিত্তে চলতে সহায়তা করে।

সকল কর্ম ভগবানে সমর্পন করে, তাঁর আশ্রয়ে থেকে চিন্তামুক্ত হয়ে একাগ্র চিত্তে কেবল নিজের কর্তব্যকর্ম পালন করে যেতে হবে। অতএব নির্বুদ্ধিতায় নয়, যথাজ্ঞানে গভীরের রহস্য অনুধাবন করে ভগবানে নিবিষ্ট চিত্ত হতে বলা হয়েছে। তাহলে সকল সংকট অতিক্রম করা সম্ভব হবে। তাই বলা হয়েছে,

"যখন কোন কাজের সংকল্প কর তখন আল্লাহর ওপর ভরসা কর। আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা তাঁর ওপর ভরসা করে।" (আল-কোরআন ৩:১৫৯)

কর্ম করতে হবে ভগবানের কারণে। নিজের জন্য নয়। এটিই সমর্পন। এটিই যজ্ঞের কর্ম। এভাবে কর্ম করলে আমিত্বভাব থাকে না। নিজের ভাবনা থাকে না। তখন নিজের মধ্য দিয়ে ভগবানের কর্ম সম্পাদন হয়। ভগবানের কর্ম সৃষ্টি সুরক্ষায় সকলের মঙ্গলার্থে হয়ে থাকে। তেমন কর্মে বন্ধন হয় না। ভগবানের কর্মে পাপ হয় না। বলা হচ্ছে,

"হে বিশ্বাসী ভক্তগণ, ... মৃত্যুবরণ কর না নিজেকে আল্লাহর প্রতি সমর্পন না করে।" (আল-কোরআন ৩:১০২)

শুনতে যতই সহজ মনে হোক না কেন সত্যি বলতে সমর্পন বিষয়টি বোঝা খুব সহজ নয়। জ্ঞানের অপরিপক্কতার কারণে ভূল কাজ করেও সেটিকে সমর্পন ভাবা যেতে পারে। সমর্পনকে তাই যথাযথ জ্ঞান ও বুদ্ধির সাথে বুঝতে হবে। কোথায়, কার কাছে, কোন কারণে, কিভাবে সমর্পিত হতে হবে সেসব বুঝতে হবে। বিষয়গুলি বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভগবানকে কোথায় পাওয়া যাবে? কিভাবে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে হবে? বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তবর্তী হয়ে থাকেন।" (আল-কোরআন ৮:২৪)

"ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন।" (গীতা ১৮:৬১)

ভগবান বলি, আল্লাহ বলি কিংবা ঈশ্বরই বলি তাঁকে অনুভব করতে হয় হৃদয়ে। ঈশ্বরের বাণী ও নির্দেশনা হৃদয়ের গভীরে শ্রবন করতে হয়। সেখানেই তাঁর দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে। সে দিক নির্দেশনায় চলতে জানতে হবে। সেটিই ভগবান বা আল্লাহতে সমর্পন। তবে অবশ্যই সেটি যথাযথ জ্ঞানে করতে হবে। তাই এ বক্তব্যটি কেবলমাত্র জ্ঞান ও বোধসম্পন্নদের জন্য। সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। অধিকাংশের জন্য গ্রন্থের নির্দেশনা অনুসরণ করে চলাই যথেষ্ট, কিংবা কোন বোধসম্পন্ন মানুষের সুপরামর্শ অনুসরণ করে চলতে হবে। বলা হচ্ছে,

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে তাঁর ইচ্ছে ও নির্দেশনার প্রতি নিজেকে সমর্পন করা।" (আল-কোরআন ৩:১৯)

প্রশ্ন হচ্ছে, হৃদয়ের কোন বাণীটিকে ভগবানের ইচ্ছে বা নির্দেশনা বলে বিবেচনা করা হবে? কেননা অন্তর ভাল পথে মানুষকে চলতে বলে। অন্তর মন্দ পথেও মানুষকে আকর্ষন করে। বরং মন্দ পথেই অধিক আকর্ষন করে। যেমন বলা হয়েছে,

"মন্দ ও ভাল সমান নয়, যদিও অসংখ্য মন্দ তোমাকে আকর্ষন করে।" (আল-কোরআন ৫:১০০)

অন্তরে সমর্পন যথাযথ জ্ঞানে না হলে সমর্পন ভেবে মন্দ কাজ করাও সম্ভব হতে পারে। আসুরী ও দৈবী সম্পদ বিষয়ে সেজন্যই ধারণা দেয়া হয়েছে। আসুরী ও দৈবী সম্পদ বস্তুত অন্তকরণেরই দু'টি প্রবৃত্তি। দৈবী সম্পদ পরমদেব বা পরমাত্মার দিকে পথ প্রদর্শন করে। সেজন্য তাকে দৈবী বলা হয়। অসুর প্রবৃত্তি মন্দ পথে টেনে নিয়ে যায়। সমর্পনের পূর্বে তাই ভেতরের প্রবৃত্তিকে সংশোধন করে নিতে হয়। বিষয়টি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিক প্রবৃত্তি সঠিক পথ প্রদর্শন করে। যোগে অধিষ্ঠিত হয়ে সমাধিস্ত হলে সত্য ধারণার উপলব্ধি জন্মে। সেজন্যই যোগে অধিষ্ঠিত হতে বলা হয়। সত্যের জ্ঞান মানুষকে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ও দৈবীগুণে গুণান্বিত করে। মন্দ আকর্ষন ও চিন্তাগুলিকে জয় করা সম্ভব হয়। ভাল-মন্দের পার্থক্য ও সুফল-কুফল বুঝতে পারা যায়। তেমন মানুষের অন্তরে ভগবানের ভাব জাগ্রত হয়। দৈবী গুণে গুণান্বিত তেমন জাগ্রত হৃদয়ে সমর্পন যথাযথ হয়। তাই সমর্পনের পূর্বে নিজেকে যথাযথ গুণে বিকশিত করে নিতে

হবে। বিকশিত অন্তরের বাণী ও নির্দেশনাকে অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে সঠিকভাবে জ্ঞানের প্রয়োগ করতে পারার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনই হচ্ছে ভগবান বা আল্লাহতে সমর্পন। তাই বলা হয়েছে,

“মানুষকে পথ চলার ভিন্ন ভিন্ন দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি- ভাল (দৈবী প্রবৃত্তি) ও মন্দ (অসুর প্রবৃত্তি)। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি উন্নতর বা উচ্চতর পর্যায়ে আরোহনের।” (আল-কোরআন ৯০:১০-১১)

“সেই সত্যিকার অর্থে সফল যে আত্মাকে বিকশিত করে।” (আল-কোরআন ৯১:৯)

আসুরিক সম্পদপূর্ণ হৃদয়ে সমর্পিত হলে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই ভাল-মন্দের পার্থক্য জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা ইতিপূর্বে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। সে কারণেই এভাবে বলা হয়েছে,

“এই আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার শত্রুও।” [গীতা ৬:৫]

যদি সঠিকভাবে আত্মা বা নিজেকে গড়ে তোলা না যায় তবে হৃদয়ের বাণীর ভ্রান্ত উপলব্ধিবোধে সমর্পিত আত্মা শত্রুবৎ নিজের অপকারেই প্রবৃত্ত হয়।

অপরদিকে সত্য ধারণার উপলব্ধি সত্যের জ্ঞানের ওপর নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলে। নিজ উপলব্ধিতে চিত্ত তুষ্ট হয়। সন্তুষ্ট চিত্ত বিশ্বাসে অটল-অবিচল থাকে। এ বিশ্বাসই হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। নিজের ওপর বিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসীই ভগবান বা আল্লাহতে সম্পর্ক স্থাপনে সফল হয়।

আত্মবিশ্বাসী সকল সংকট থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করে নিতে পারে। যোগের ফলে মানুষ এ দৃঢ় অবস্থায় স্থিত হয়। তাই বলা হয়েছে, ‘আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হলে তুমি আমার অনুগ্রহে সকল সংকট উত্তীর্ণ হতে পারবে’। আত্মবিশ্বাস হচ্ছে যোগ সাধনা থেকে প্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ফল।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের কারণে বা নিজের ভাবনায় নয়, বরং ভগবানে সমর্পন করে ভগবানের কারণে কর্ম করতে বলছেন। এটিই যথোচিত কর্ম ও আচরণ। কিন্তু অর্জুন যদি যথাযথ আচরণের অন্যথা করেন, তবে সেটি হবে বুদ্ধি বা জ্ঞানের পরিপন্থী এবং এমন ভূল আচরণের কারণে জীবনের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সকল অর্জন বিনষ্ট হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৫৯	অহম বা আমিত্ববোধের কারণে তুমি এভাবে ভাবছ যে 'আমি যুদ্ধ করব না'। কিন্তু তোমার সে ভাবনা মিথ্যে বা ভূল। কেননা তোমার প্রকৃতি বা স্বভাবই তোমাকে এ কাজে প্রবর্তিত করবে।
৬০	হে কৌন্তেয়! মোহবশত এখন তুমি নিজে যা করতে ইচ্ছে করছ না, স্বভাবজাত হওয়ার কারণে তুমি সেই কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় অবশভাবেই তা করবে।

• **১৮.৫৯-৬০** যে কোন কাজের ক্ষেত্রেই সাধারণত মানুষ 'আমি করছি' এভাবে ভেবে নিয়ে কাজটি করে। অর্থাৎ সে ভাবে যে সে নিজে কাজটি করছে। কিন্তু গভীরের জ্ঞান তা বলে না।

মানুষের স্বভাব দেহকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো কর্মে প্রবৃত্ত করে। যে যেমন স্বভাবের সে তেমন কাজে আপনা থেকে জড়িয়ে যায়। তার স্বভাব তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে ফেলে।

অর্জুন ভাবছেন তিনি যুদ্ধ করবেন না। এটি তাঁর নিজ সিদ্ধান্ত। তিনি মোহ থেকে উদ্ভূত অজ্ঞতার কারণে এভাবে ভাবছেন। কেননা তিনি নিজেকেই কর্মের একমাত্র কর্তা ভাবছেন। কর্মের পেছনে অপরাপর আরও যে বিষয়গুলি ওপরে আলোচনা করা হয়েছে সে কারণগুলিকে তিনি বিবেচনা করছেন না। সেখানে দৈবী কারণও আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তোমার এমন ভাবনা ভূল বা মিথ্যায় পরিণত হবে। তোমার স্বভাব তোমাকে তোমার স্বভাবজাত কর্মে আপনা থেকে নিয়োজিত করবে। স্বভাবের দ্বারা তুমি জড় প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। যদিও তুমি ভাবছ যুদ্ধ করবে না; কিন্তু তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধে অবশভাবে নিয়োজিত করবে। বস্তুত যোগ মায়া বা সৃষ্টি কৌশলে পরমেশ্বর ভগবানই সবকিছু নিয়ন্ত্রন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৬১	হে অর্জুন! ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহন করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমন করান।
৬২	হে ভারত! সর্বতোভাবে তাঁর প্রতি সমর্পন কর। তাঁর অনুগ্রহে পরম শান্তি ও শাশ্বত আবাস লাভ করবে।

● **১৮.৬১** দেহ হচ্ছে যন্ত্রবৎ জড় বস্তু। ঈশ্বর সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহন করিয়ে মায়ার দ্বারা অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি কৌশলে এ জগতে ভ্রমন করাচ্ছেন। জীবের যে রূপটি আমরা দেখি সেটি আসলে যন্ত্রবৎ এক বহিরাবরণ। বাহিরের খোলসটিকে দেখি। কিন্তু সত্ত্বাটিকে আমরা চিনিনা-জানিনা।

জীবন বস্তুত একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান বা আল্লাহর সত্ত্বার। তিনি সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁর সাথে সংযোগে বা তাঁর পরশেই অপরাপর জীবসমুহ জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। সকল শক্তির উৎস তিনি। তাঁর স্পর্শহীনতাই মৃত্যু নামে পরিচিত।

সৃষ্টি কৌশলে তিনিই সবকিছু পরিচালনা করছেন। দেহ নামক যন্ত্র মধ্যে অধিষ্ঠিত থেকে জীব সংসারে ভ্রমন করছে। বিভিন্ন জড়দেহে আবদ্ধ থেকে জীব সর্বদা ভগবানের নিয়ন্ত্রনাধীন। যেমন বলা হয়েছে,

“পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যা আল্লাহর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়।” (আল-কোরআন ১১:৫৬)

জীব জড় দেহে আবদ্ধ হয়ে আছে। দেহরূপ যন্ত্র জীবের মুক্তির পথে অন্তরায়। যন্ত্র বা দেহ স্বভাবশত স্বয়ংক্রিয়ভাবে উজ্জীবিত হয়ে কর্ম করে। জীব কিছু করে না। যন্ত্রের সে কর্মের সাথে যে নিজেকে একাত্ম অনুভব করে সে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিষয়গুলি বুঝতে পারলে বন্ধন মুক্তির জ্ঞান উন্মোচিত হয়।

যিনি জড়দেহ ও নিজ সত্ত্বার পার্থক্য বিষয়ে অবগত এবং নিজেকে দেহ থেকে পৃথক ভাবতে জানেন তিনি বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কৌশলটি জানেন। দেহ দ্বারা কৃত কর্মের সাথে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন না। ফলে বন্ধনে আবদ্ধ হন না। নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ নগরে তিনি সুখে থাকেন [দ্রষ্টব্য গীতা ৫:১৩]।

● **১৮.৬২** দেহ ও আত্মার এ পৃথকত্ব বুঝতে হলে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এ জ্ঞান জড় ও জীবের পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে। মানুষ তখন বুঝতে পারে যে নিজের ভেতরের অহঙ্কার বা আমিত্ববোধই জড় জগতে তাকে আবদ্ধ করে রাখে। যার কারণে দেহের কর্মে সে নিজেকে যুক্ত ভেবে যন্ত্রনা ভোগ করে। মুক্তির জন্য তাই আমিত্ববোধ বর্জন করতে হবে। অর্থাৎ দেহ দ্বারা কৃত কর্মের সাথে আমার সম্পর্ক নেই এটি বুঝতে হবে। কিন্তু আমিত্ববোধ দুর করা সহজ বিষয় না।

সর্বদা ভগবানের স্মরণ নিতে হবে। এ স্মরণ ধীরে ধীরে বুঝতে সহায়তা করবে যে জীব সম্পূর্ণভাবে ভগবানের আয়ত্তাধীন। ভেতরে ভগবানের জ্ঞান প্রবেশ করলে আমিত্ববোধ দুর হবে এবং জীব নিজেকে ভগবানে সমর্পন করবে। ভগবানে সমর্পিত হতে জানলে নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ নগরে সুখে থাকা সম্ভব হবে এবং বন্ধন মুক্ত হওয়া যাবে। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে ইচ্ছে করেন তিনি তার জন্য তাঁর প্রতি সমর্পনের পথ প্রশস্ত করে দেন। ... আর সমর্পনই তোমার পালনকর্তার সরল পথ। ... তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে চির শান্তির আবাস। তিনি হবেন তাদের রক্ষাকর্তা তাদের কৃতকর্মের কারণে।" (আল-কোরআন ৬:১২৫-১২৭)

"যে কেউ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং ভাল কাজ করে তার পুরস্কার রয়েছে তার পালনকর্তার কাছে।" (আল-কোরআন ২:১১২)

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আত্মসমর্পনও সঠিক জ্ঞানে করতে জানতে হবে। তাই সমর্পনের সাথে প্রতিবার ভাল কাজের কথা বলা হয়েছে। অন্তরকে দৈবী সম্পদে সমৃদ্ধ করে জাগ্রত করতে হবে। সমর্পনের কথা বলে মন্দ কোন কাজ করা যাবে না। সুতরাং করণীয়-বর্জনীয় বোঝার জ্ঞান থাকতে হবে। সেজন্য আত্মসমর্পন কিভাবে করতে হবে সেটি বোঝাও অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টি বোঝা মোটেও সহজ না। জীবনভর নানান সাধনার পথ পাড়ি দিয়ে তেমন উপলব্ধির পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। অন্যথায় হৃদয়ে সমর্পনের নামে ভূল কিংবা মন্দ কাজ করাও সম্ভব হতে পারে। তাই বলা হয়েছে যে আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার শত্রুও [দ্রষ্টব্য গীতা ৬:৫]। তবে হৃদয়ে সমর্পনের এ ধারণাটি কেবলমাত্র জ্ঞান ও বোধসম্পন্নদের জন্য। সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। অধিকাংশ সাধারণ মানুষের জন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করে চলাই উত্তম। বিষয়গুলি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হৃদয়ের দিক-নির্দেশনাগুলিকে অনুভব করতে জানলে করণীয়-বর্জনীয় বুঝতে পারা যায়। এটি বুঝতে জানলে আর কোথাও যেতে হয় না। নিজের ভেতরে উপস্থিত হবে ধর্মের সমস্ত গ্রন্থ ও বাণী। ঈশ্বরের নিবাস এই হৃদয়ে। শান্তির অনুভবও এই

হৃদয়ে। ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাই হৃদয়ের অন্তস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার কাছে নিজেকে সমর্পন করতে হবে। এটিই ভগবানে সমর্পন। বলা হচ্ছে,

"যাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে তাদের অন্তরে গ্রন্থের বাণী সুস্পষ্ট নির্দেশনা।" (আল-কোরআন ২৯:৪৯)

ভগবানে সমর্পন করলে তাঁর অনুগ্রহে পরম শান্তির ধাম লাভ করা সম্ভব হবে। তার জন্য হৃদয়কে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং তাকে জাগ্রত রাখার জন্য নিয়মিত পরিচর্যাও করতে হবে। ভগবান বা আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। সাত্ত্বিক গুণে অধিষ্ঠিত হতে হবে। ভেতরে দৈবী সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে।

হৃদয়ের তাৎক্ষণিক বার্তাগুলিকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে জানতে হবে। সেটি বুঝতে অপারগ হলে নিয়তকর্ম বা স্বভাবজাত কর্ম বা স্বধর্ম পালন করে যেতে হবে। কেননা স্বধর্মের আরোপকরণও সৃষ্টি কৌশলে ভগবান কর্তৃক নির্ধারিত। যা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষত্রিয় হিসেবে অর্জুনকে তাই ভগবানে সমর্পন করে স্বধর্ম পালন তথা যুদ্ধ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

৬৩	এভাবেই আমার দ্বারা তোমার কাছে গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞান বর্ণিত হল। পরিপূর্ণরূপে বিচার-বিবেচনা করে যা ইচ্ছে কর।
৬৪	তুমি আমার খুব প্রিয়; তাই তোমার হিতার্থে সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম বিষয় পুনরায় বলছি- আমার উৎকৃষ্ট উপদেশ শোন।
৬৫	আমাতে চিত্ত সমর্পন কর, আমাকে ভক্তি কর, আমার উপাসনা কর, আমাকে সন্মান কর। তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি- তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে। কেননা তুমি আমার প্রিয়!
৬৬	সকল প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ কর। কেবলমাত্র আমাতে সমর্পন কর। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব। দুঃচিন্তা বা শোক কর না।

• **১৮.৬৩** শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে জ্ঞানের সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। অর্জুন শোকাহত হয়ে ও পাপবোধের কারণে যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলেন। শোক করার কোন যৌক্তিক কারণ নেই শ্রীকৃষ্ণ সে বিষয়টির ব্যাখ্যা নানাভাবে তাঁর কাছে তুলে ধরেছেন। গুরুজন

হত্যায় পাপ হবে অর্জুনের সে ধারণাও দুর করার চেষ্টা করেছেন। কিভাবে কর্ম করলে পাপ হয় না সেসবও তুলে ধরেছেন। কেবল শোক কিংবা পাপবোধ নয়, জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তাই যন্ত্রনা মুক্তির জন্য কর্ম ত্যাগ নয়, বরং কিভাবে কর্ম করেও বন্ধন মুক্ত হয়ে প্রশান্তি লাভ করা যায় তা আলোচনা করেছেন। ক্রমান্বয়ে তিনি গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞানের আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। অতঃপর নিজ বিবেচনায় অর্জুন কি করবেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। আলোচনার ধরণগুলি বস্তুত সকল গ্রন্থে একইরকম। যেমন বলা হয়েছে,

"আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি হে মোহাম্মদ একজন সুসংবাদদাতা ও একজন সতর্ককারীরূপে। বল, আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না; যার ইচ্ছে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।" (আল-কোরআন ২৫:৫৬-৫৭)

• **১৮.৬৪** অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অত্যান্ত প্রিয়। তাই সংকটকালে তিনি যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনরকম ভূল না করেন সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সর্বাপেক্ষা গোপন বা গুহ্যতম বিষয় পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন। কি সেই গোপন বিষয়?

• **১৮.৬৫** শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গুহ্যজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন। গুহ্যতর জ্ঞান বা পরমাত্মা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এবার গুহ্যতম বা ভগবানে সমর্পনের কথা বলছেন। সকল শাস্ত্রের এটি হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। প্রকৃত ধর্মের পথ।

বলেন, ভগবানে চিত্ত সমর্পন কর, ভগবানকে ভক্তি কর, ভগবানের উপাসনা কর, ভগবানকে সন্মান কর। তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করছি- তুমি ভগবানকেই প্রাপ্ত হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার উপাসনা কর এবং সৎ কাজ সম্পাদন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আল-কোরআন ২২:৭৭)

সর্বদা ভগবান বা আল্লাহকে স্মরণে রাখা, সর্বদা তাঁর চিন্তা করা, সকল কাজের মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা এবং সে অভ্যস্ততা সৃষ্টি করার প্রয়াসে উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। যিনি জীবনে তেমনভাবে অভ্যস্ত হতে পারবেন এবং

সত্যিকারভাবে ভগবানকে অন্তরে ধারণ করবেন তিনি হবেন তাঁর প্রিয়। তিনি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবেন। এ সবই ভগবান বা আল্লাহতে বিশ্বাস, ভক্তি, তাঁকে সন্মান, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

বলা হচ্ছে, ভগবানে চিত্ত সমর্পন কর। এটাই হচ্ছে জ্ঞানের গুহ্যতম অংশ। বিশ্বাস, ভক্তি, সন্মান, উপাসনা, স্মরণ এ সবকিছুই করা হয় মানবজাতিকে ভগবান বা আল্লাহতে সমর্পনের পথে চালিত করার জন্য। গীতার শ্রেষ্ঠ উপদেশ হচ্ছে হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মায় সমর্পন করা। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য, অতএব তাঁর প্রতি সমর্পন কর।" (আল-কোরআন ২২:৩৪)

ভগবানে কিভাবে সমর্পন করতে হবে সেটিও জানতে ও বুঝতে হবে। বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাথে যথার্থ বিবেচনার মাধ্যমে পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে চলতে জানতে হবে। তার জন্য পারমার্থিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভগবান বা আল্লাহকে যে সর্বদা অন্তরে স্মরণ করবে সে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবে। যেমন বলা হয়েছে,

"যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, ভাল কাজ করে এবং বলে, 'আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত যারা তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পন করে' তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে?" (আল-কোরআন ৪১:৩৩)

• **১৮.৬৬** শ্রীকৃষ্ণ বলেন, নানা প্রকারের ধর্মের নামে নানান জটিলতায় প্রবেশের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। সকল প্রকারের ধর্ম পরিত্যাগ কর। কেবলমাত্র ভগবানে সমর্পন কর। ভগবান বা আল্লাহতে সমর্পন কর।

মানুষ তো কিছু না কিছুতে কেবল পাপ-পূণ্যের চিন্তায় চিন্তাগ্রস্ত হয়। অথচ ভগবান বা আল্লাহতে চিত্ত সমর্পন করে কাজ করলে তথা তাঁর নির্দেশে কাজ করলে কোন পাপ হয় না। তিনি সব পাপ থেকে মুক্ত করে দেন। যেমন বলা হয়েছে,

"যে কেউ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং ভাল কাজ করে তার পুরস্কার রয়েছে তার পালনকর্তার কাছে; তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।" (আল-কোরআন ২:১১২)

সমর্পনকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে। বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভূলভাবে বুঝে মন্দ কাজ করে সমর্পন বললে হবে না। তাই যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

যিনি ভগবানে আত্মসমর্পন করেছেন তাঁর আর কোন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করার প্রয়োজন হয় না। কেননা সকল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় এই লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য। যিনি লক্ষ্যকে অর্জন করেছেন তার আর আনুষ্ঠানিক কর্মের প্রয়োজন কিসে? তেমন মানুষ অপরাপরদের সুপথে পরিচালনা করা, সৃষ্টি সুরক্ষা ও জন-মানব কল্যাণে কর্ম করেন এবং সে একই লক্ষ্যে দর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলিও পালন করেন।

আত্মসমর্পনের এ জ্ঞান হচ্ছে গুহ্যতম জ্ঞান। এটি গীতার সারমর্ম বা যে কোন ধর্মের সারমর্ম। যে মানুষ যে ধর্মের হোক না কেন কেবল ভগবান, গড, আল্লাহ কিংবা সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে সমর্পন করে কর্ম করলে তিনিই তাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেন। শ্রীকৃষ্ণ সে কথাই এখানে জোর দিয়ে উচ্চারণ করেছেন। যেমন বলা হয়েছে,

“নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পন করা।” (আল-কোরআন ৩:১৯)

“আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।” (আল-কোরআন ৩:৮৫)

“হে বিশ্বাসী ভক্তগণ, আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর যথার্থতার সঙ্গে এবং মৃত্যুবরণ কর না নিজেকে আল্লাহর প্রতি সমর্পন না করে।” (আল-কোরআন ৩:১০২)

“আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে ইচ্ছে করেন তিনি তার জন্য তাঁর প্রতি সমর্পনের পথ প্রশস্ত করে দেন। .. তাদের জন্যই তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে শান্তির আবাস।” (আল-কোরআন ৬:১২৫-১২৭)

৬৭	তপস্যা ও ভক্তিহীন ব্যাক্তি এবং যে শুনতে ইচ্ছুক নয় ও আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন- এই গোপনীয় জ্ঞান তোমার তাদের কাছে বলা উচিৎ নয়।
৬৮	এই পরম গোপনীয় জ্ঞান যে আমার ভক্তদের মাঝে উপদেশস্বরূপ বিবৃত

	করবে, আমার প্রতি পরম ভক্তির কারণে সে নিঃসংশয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।
৬৯	মানুষের মধ্যে তার থেকে অধিক প্রিয় আমার কাছে আর কেউ নেই, না তার থেকে এই ভূবনে আর কেউ আমার কাছে অধিকতর প্রিয় হবে।
৭০	যে আমাদের উভয়ের ধর্ম বিষয়ক এই কথোপকথন অধ্যায়ন করবে, জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা তাঁর কাছে আমি পূঁজিত হব- এই আমার অভিমত।
৭১	বিদ্বেষ পোষন না করে শ্রদ্ধার সাথে যে এ জ্ঞানের কথা শ্রবন করবে, সেও মুক্ত হয়ে পূণ্যবানদের শুভ লোকসমুহ প্রাপ্ত হবে।

• **১৮.৬৭** শ্রীকৃষ্ণ সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, তপস্যা ও ভক্তিহীন ব্যাক্তি যে এ বাণী শুনতে ইচ্ছুক নয়, এমনকি যারা ভগবানের প্রতিও বিদ্বেষভাবাপন্ন- এই অতি গোপনীয় জ্ঞান তাদের কাছে বলা উচিৎ নয়। কেননা তারা এ বাণীর গুঢ় রহস্য অনুধাবন করতে পারবে না।

কোন বিষয় অনুধাবনের জন্য যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন এবং সেটি পরিপালনে ভেতরে যে দৈবী প্রবৃত্তি থাকা প্রয়োজন তপস্যা ও ভক্তিহীন ব্যাক্তিদের তা নেই। বিষয়ে অনাগ্রহী ও যোগ্যতাহীন ব্যাক্তি বিষয়ের আদ্যেপান্ত মনযোগ সহকারে শ্রবন করে না। ফলে ভূল বুঝে। তাদের মাধ্যমে ভূল বার্তা ছড়াবার আশংকা থাকে।

অপরদিকে যারা বিদ্বেষভাবাপন্ন তারা আসুরিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়। ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও উচ্ছৃংখল আচরণের তেমন মানুষ কেবল ভূল নয়, ইচ্ছেকৃতভাবে বা হিংসের বশবর্তী হয়েও একটা ভাল বিষয়কে নষ্ট করে দেয়ার জন্য বিষয়ের অপব্যাখ্যাও করে; মিথ্যে রটনা করে। যা মূল বাণীর তাৎপর্য ও উপকারীতাকে বিনষ্ট করে দিতে পারে।

দৈবী গুণহীন ও আসুরিক মনোভাবাপন্ন মানুষের কাছে তাই এই গোপনীয় জ্ঞান প্রকাশ করা উচিৎ নয় বলে বলা হয়েছে। এতদ্বসত্বেও স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাথে সব কাজ করতে হবে।

• **১৮.৬৮** সূত্র হচ্ছে, যে যাকে ভক্তি করে এবং সর্বদা যাকে স্মরণ করে মৃত্যুকালেও সে তাঁকেই স্মরণ করতে পারে। অন্তিমকালে যে যে ভাব স্মরণ করে সে তাঁকে বা তাঁর ভাবই প্রাপ্ত হয়।

গীতার জ্ঞান স্বেচ্ছায় নিঃস্বার্থভাবে যে অপরের মাঝে ছড়িয়ে দেবে, বস্তুত তিনি এ জ্ঞানের মর্ম অর্থ নিজে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন। উপলব্ধ জ্ঞানের মহাত্বই তেমন মানুষকে জ্ঞানের সে আলো ছড়িয়ে দিতে অনুপ্রাণীত করেছে বলা যায়। তেমন একজন নিজেই সে বাণীর চরম ভক্ত। যে যার বাণীর ভক্ত বস্তুত সে তাঁরই ভক্ত। অন্তরেও সে তাঁকে স্মরণ করে। অন্তিমেও সে তাঁকে স্মরণ করতে পারবে। নিঃসন্দেহে সে যাকে স্মরণ করবে তাঁকে প্রাপ্ত হবে।

তাই বলা হয়েছে যে, এই পরম গোপনীয় জ্ঞান ভগবানের ভক্তদের মাঝে উপদেশস্বরূপ যে বিবৃত করবে, ভগবানের প্রতি পরম ভক্তির কারণে সে নিঃসংশয়ে ভগবানকেই প্রাপ্ত হবে।

• **১৮.৬৯** মানুষের মাঝে স্বেচ্ছায় এ বাণীর প্রচার-প্রসার তিনিই করবেন যিনি এ বাণীর যথাযথ অর্থ অনুধাবন করেছেন এবং সে কারণে এ বাণীর প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছেন। তেমন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সত্য সন্ধানী। সত্য অনুসন্ধানী তেমন মানুষ সত্যের জ্ঞানের উৎসেরও ভক্ত।

সত্যকে জানা ও বোঝা সহজ বিষয় নয়। মানুষের মধ্যে সকলেই এ ধরণের জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী হয় না। হাজারও মানুষের ভীড়ে যদি একজনও তেমন জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সত্যের প্রবক্তার কাছেও তাঁর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউই কখনও হয় না বা হতেও পারে না।

ভগবানের ভক্ত তাই ভগবানের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তাই বলা হয়েছে মানুষের মধ্যে না আর কেউ তার থেকে আমার অধিক প্রিয় আছে, না তার থেকে এই ভূবনে আর কেউ আমার কাছে প্রিয়তর হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী বা ভক্ত এবং যারা জ্ঞানসম্পন্ন আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।" (আল-কোরআন ৫৮:১১)

যারা এ জ্ঞান যথার্থভাবে নিজেরা অনুধাবন করতে পারবেন, জ্ঞানের সে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা সে বাণী মানুষের মাঝে যথার্থভাবে পৌঁছে দেবেন। যেমন বলা হয়েছে,

"আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ করেছেন- গ্রন্থ ও জ্ঞান, যা দ্বারা তিনি তোমাদের অনুপ্রাণীত করেন।" (আল-কোরআন ২:২৩১)

• **১৮.৭০** যে আমাদের উভয়ের ধর্ম বিষয়ক এই কথোপকথন অধ্যায়ন করবে, জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা তাঁর কাছে আমি পূঁজিত হব- এই আমার অভিমত।

এত নিশ্চিত ও দৃঢ়তার সাথে পূঁজিত হওয়ার কথা কেন বলা হল? সেটি বুঝতে হলেও এ কথোপকথন অধ্যায়ন করতে হবে। এর মর্ম উপলব্ধি করতে হবে। ধর্ম হচ্ছে শান্তি লাভের যথাযথ ও একমাত্র পথ। যা শাশ্বত, অব্যায়-অক্ষয় ও চিরন্তন বা সনাতন। বিধাতা কর্তৃক প্রবর্তিত। এর কোন বিকল্প নেই।

গভীরভাবে যারা জীবন ও জগত সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যা ও এসবের সমাধান বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন, তেমন মানুষই কেবল এসব বার্তার অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন এবং এটিও অনুধাবন করবেন যে, শান্তি লাভের যে পথ গীতায় প্রদর্শন করা হয়েছে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোন পথ নেই। এর কোন বিকল্পও নেই। শান্তি লাভের উপায় সম্পর্কিত যত মত ও পথ বর্তমান আছে এটি তার চূড়ান্ত পর্যায়।

কথাগুলি শুনতে, পড়তে ও বলতে যত সহজ বোধ হয়, সত্যিকারভাবে অন্তর থেকে তা গ্রহণ করে পরিপালন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব সহজ কাজ নয়। এমনকি অসম্ভবও বলা চলে। তবে প্রত্যেকে অসাধারণ হতে পারে যদি কেউ এ উপদেশ অন্তরে ধারণ করে মেনে চলতে পারে। এটিই জগতের সকল মানুষের জন্য মনোনীত ধর্মের পথ, নীতির পথ ও সত্যের পথ। বিধাতা কর্তৃক প্রবর্তিত একমাত্র ধর্মের পথ। শান্তি লাভের চিরন্তন ও শাশ্বত পথ। অপরাপর ধর্ম গ্রন্থসমুহের সাথেও যা সাংঘর্ষিক নয়। তবে সেটি বুঝতে হবে যথাজ্ঞানে ও মর্মার্থের আলোকে। ব্যাকরণের মতো করে নয়। উচ্চারণের শুদ্ধতা দিয়েও নয়।

গীতায় প্রদর্শিত পথের মহাত্ম যিনি অনুধাবন করবেন তিনি অভিভূত হবেন এবং তিনি এ পথের প্রবক্তার ভক্ত হবেন। তবে তার জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিষয়গুলিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। দোষদর্শী হলে কেউ কোনদিন কোন ধর্ম বা দর্শনই অনুধাবন করতে পারবে না। তাই নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে,

প্রকৃত সত্য সন্ধানীর কাছে তিনি পূঁজিত হবেন। প্রকৃত জ্ঞানী বিষয়গুলির গুঢ়ু অর্থ অবশ্যই অনুধাবন করবেন এবং জ্ঞানী জ্ঞানের আধার পূর্বসূরীকে শ্রদ্ধা ও সন্মান করবেই। যজ্ঞের পরিণামই হচ্ছে জ্ঞান। তাই নিঃসন্দেহে জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা তাঁর কাছে তিনি পূঁজিত হবেন। বলা হচ্ছে,

"দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিমান সমান নয়, সমান নয় অন্ধকার ও আলো, সমান নয় ছাঁয়া ও সূর্য্যের পূর্ণ উত্তাপ, সমান নয় জীবিত ও মৃত। সেই কর্ণপাত করে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন। ঠিক যেমন তুমি পৌঁছাতে পারবে না যারা কবরে শায়িত আছে তাদের কাছে।" (আল-কোরআন ৩৫:১৯-২২)

- **১৮.৭১** বিদ্বেষ পোষন না করে শ্রদ্ধার সাথে যে এ জ্ঞানের কথা শ্রবন করবে, সেও মুক্ত হয়ে পূণ্যবানদের শুভ লোকসমুহ প্রাপ্ত হবে। গীতার জ্ঞান মানুষকে জড় জাগতিক যন্ত্রনা থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। কিন্তু যে এ জ্ঞানে বিদ্বেষ পোষন করবে স্বভাবতই সে এ জ্ঞান অনুসরণ করে চলবে না। ফলে সে এখান থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে না। কিন্তু যিনি বিদ্বেষ পোষন না করে আগ্রহের সাথে জ্ঞানের কথা শ্রবন করবেন এবং জ্ঞান আহরণ ও অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন তিনি এর যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

মানুষ যখন কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করে তখন সে তা নিজের জীবনে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে পরিপালন করার চেষ্টা করে। সে চেষ্টাই তাকে মোক্ষ লাভের পথে নিয়ে যায়। যেমন বলা হয়েছে,

"যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শ্রবন করে, অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে; তাদেরকেই আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই উপলব্ধিবোধসম্পন্ন মানুষ।" (আল-কোরআন ৩৯:১৮)

বলা হচ্ছে, মুক্ত মানুষ পূণ্যবানদের শুভ লোকসমুহ প্রাপ্ত হন। যেমন পূণ্য অর্জন করে কেউ ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হন। ধ্রুব মহারাজ ভগবানের মহান ভক্ত ছিলেন; তিনি যে লোকে বা গ্রহে বাস করেন তাকে বলা হয় ধ্রুবলোক বা ধ্রুব তারা। তিনি সেই লোকের তত্ত্বাবধান করেন। যেমন বলা হয়েছে,

“নভোমন্ডলে তোমাদের জন্য আছে জীবনোপকরণ এবং প্রতিশ্রুত সবকিছু। নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের শপথ! এটি সত্য, যেমন সত্য এই যে তোমরা কথা বলছ।” (আল-কোরআন ৫১:২০-২৩)

৭২	হে পার্থ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে শ্রবন করেছ? হে ধনঞ্জয়! অজ্ঞতাজনিত মোহ কি তোমার দুর হয়েছে?
৭৩	অর্জুন বলেনঃ হে অচ্যূত! তোমার কৃপায় আমার মোহ দুর হয়েছে। আমি সম্বিত ফিরে পেয়েছি। সংশয় দুর হয়ে আমি স্থির হয়েছি। এবার তোমার উপদেশ মতো কাজ করব।

● **১৮.৭২-৭৩** সবকথা শেষে অর্জুন উপদেশ বাণী মনযোগ সহকারে শ্রবন করেছেন কিনা এবং তার যথাযথ অর্থ অনুধাবন করতে পেরেছেন কিনা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে জানতে চান। অর্জুন বলেন, সব শ্রবন করে অজ্ঞতাজনিত মোহ তাঁর দুর হয়েছে। তিনি যেন সম্বিত ফিরে পেয়েছেন। মনের ভেতরের সকল দ্বিধা-সংশয় তাঁর দুর হয়েছে। তিনি স্থিতিতে ফিরে এসেছেন। এবার তিনি তাঁর উপদেশ মতো কাজ করবেন। যথাযথ জ্ঞানে একাগ্র হয়ে যুদ্ধ করবেন।

মানুষ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করে তখন সে বুঝতে পারে যে সে নিজে আসলে কিছুই না। সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রনাধীন। ভগবান সব করেন ও করান। নিজের ভেতরের অহমবোধ বা আমিত্বভাব তখন দুর হয়ে যায়। মানুষ নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পন করে।

অর্জুন যখন বুঝতে পারলেন যে অনাবশ্যক জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য ভগবানের এমন পরিকল্পনা ছিল [দ্রষ্টব্য গীতা **১১:৩২**], তখন তিনি তাঁর ইচ্ছে অনুসারে যুদ্ধ করতে সম্মত হন। গীতার ওপরোক্ত সকল আলোচনা সঞ্জয় অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করছিলেন। সঞ্জয় বলেন,

৭৪	এভাবেই আমি মহান বাসুদেব ও পার্থ দু’জনের এই অদ্ভূত ও রোমহর্ষক কথোপকথন শ্রবন করেছি।
৭৫	ব্যাসদেবের অনুগ্রহে এই পরম গোপনীয় যোগশাস্ত্রের জ্ঞান আমি সরাসরি

	স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শ্রবন করেছি।
৭৬	হে রাজন! কেশব ও অর্জুনের এই পবিত্র ও বিস্ময়কর কথোপকথন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমি ক্ষণে ক্ষণে হরষিত হচ্ছি।
৭৭	হে রাজন! হরির সেই অদ্ভূত বিশ্বরূপ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমি অতিশয় বিস্ময়াভিভূত হচ্ছি এবং বারবার রোমাঞ্চিত হচ্ছি।
৭৮	যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্ধর পার্থ সেখানেই ঐশ্বর্য্য, বিজয়, প্রবৃদ্ধি, চিরসত্য ও নীতি বর্তমান- এই আমার অভিমত।

- **১৮.৭৪** গীতা শাস্ত্রের যত কথা ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে তার সবই সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করছিলেন। সেভাবেই গীতা মানবসমাজে উঠে এসেছে। সঞ্জয় বাসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও পৃথা পুত্র অর্জুনের এ রোমহর্ষক কথোপকথন নিজে শ্রবন করেছেন।

- **১৮.৭৫** ঋষি ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। সঞ্জয় হস্তিনাপুরের রাজ দরবারে বসে কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত দুই মহান ব্যাক্তিত্বের কথোপকথন দিব্যদৃষ্টির কল্যাণে নিজে শ্রবন করেন এবং অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। যোগ শাস্ত্রের এ গোপন জ্ঞান তিনি সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শ্রবন করেছেন। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানের কল্যাণে বর্তমান সময়েও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রেই তেমন প্রযুক্তি ব্যাবহৃত হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগেশ্বর। অর্থাৎ যোগের ঈশ্বর। তিনি নিজে যোগ সাধনা করেন এবং অপরকেও শিক্ষা দিতে সক্ষম। যোগ হচ্ছে উপায়, পন্থা বা কৌশল। গীতায় কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবই হচ্ছে জাগতিক যন্ত্রনা থেকে মানুষের মুক্তি লাভের এক একটি পন্থা বা কৌশল। অন্যকথায় পরমেশ্বরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উপায়। যা অন্তরে প্রশান্তি এনে দিতে পারে। নিজের ভেতরে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে। সকল প্রকারের ভীতি দুর করে একজনকে সাহসী করে তুলতে পারে। যিনি যোগেশ্বর তিনি হচ্ছেন যোগের তেমন লক্ষ্য অর্জনে শ্রেষ্ঠ কৌশলী। তিনি প্রেরণাদায়কও। সেটিও কৌশলের অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

● **১৮.৭৬-৭৭** সঞ্জয় দুই মহান ব্যাক্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বিস্ময়কর কথোপকথন স্মরণ করে বারবার হরষিত হচ্ছেন। কেননা এমন জ্ঞানের কথা কেউ আগে কখনও শোনেনি। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন ব্যাসদেবের দেয়া দিব্যদৃষ্টির কল্যাণে তিনি নিজেও সে রূপ দর্শন করেন। সেই রূপ স্মরণ করে সঞ্জয় পুনঃ পুনঃ পুলকিত হচ্ছিলেন। সঞ্জয় ছিলেন ব্যাসদেবের ভক্ত।

● **১৮.৭৮** শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগেশ্বর। শ্রেষ্ঠ কৌশলী। লক্ষ্য অর্জনের কৌশল তাঁর জানা আছে। অর্জুন হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধার। সুতীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্যভেদে পারদর্শী। তাঁর আছে ক্ষিপ্রতা। যেখানে কৌশল আছে, লক্ষ্যভেদের সক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতা আছে সেখানেই বিজয় নিশ্চিত। যেখানে বিজয় সেখানেই সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য।

যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আছেন সেখানে বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তারা উভয়ে সত্য ও নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে নীতি-ধর্ম-সত্য বর্তমান সেখানেই বিজয়। অতএব বিজয় তাদেরই।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সন্তানদেরকে অধিক ভালবেসে প্রশ্রয় দিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজেও যে ভূল করেছেন, তাঁর এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি সে কথা ধৃতরাষ্ট্রের সামনে তুলে ধরেন, যা কিনা সঞ্জয়ের পক্ষে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সরাসরি বলা কখনও সম্ভব ছিল না।

[বিঃ দ্রঃ- ভগবৎ তত্ত্ব হচ্ছে প্রকান্ড এক বিজ্ঞানময় বিষয়। বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার উদ্ভব বস্তুত এখান থেকে। গীতাকে ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বলা হয়। তথাপি এটি এতই নিখুঁত যে এর মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়। বেদসমুহ হচ্ছে এ বিষয়ে জ্ঞানের মূল উৎস। বেদের সার হচ্ছে বেদান্ত বা উপনিষদ। উপনিষদের সার হচ্ছে গীতা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ব্যাসদেব মহাভারতের ভীষ্মপর্বে গীতা লিপিবদ্ধ করেন।]

একটি উপসংহার

পরিশেষে প্রসঙ্গক্রমেই কিছু অপ্রাসঙ্গিক ধারণার অবতারণা করি। জীবের দেহ ও আত্মা এক নয়। দু'টো পৃথক বিষয়। দেহ হচ্ছে জড় বস্তু যা বিনাশশীল। একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আত্মা হচ্ছে জীবন্ত ও চেতনাসম্পন্ন। আত্মার ধ্বংস নেই। যা কিছু অবিনাশী তাই শাশ্বত, চিরন্তন। যা কিছু চিরন্তন তাকেই সনাতন বলে। আত্মা হচ্ছে সনাতন।

জগতে যখন কিছুই ছিল না তখনও আত্মা বিদ্যমান ছিল। আত্মা হচ্ছে সবচেয়ে আদি বা পুরাণ। আত্মার ধর্মই হচ্ছে সবচেয়ে আদি বা পুরাণ ধর্ম।

ধর্ম হচ্ছে কোন কিছুর ভাব বা স্বভাব। অর্থাৎ কোন কিছুর চরিত্র, বৈশিষ্ট ও গুণাগুণই হচ্ছে তার ধর্ম। যেভাবে বা যে নিয়মে সে স্বাভাবিকভাবে চলে সেটিই হচ্ছে তার ধর্ম। মানুষের ধর্ম হচ্ছে আত্মার ধর্ম। কেননা দেহ নয়, আত্মাই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। বলা হচ্ছে,

'আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক আত্মা থেকে।' (আল-কোরআন ৪:১)

মানুষের ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে আদি ধর্ম। আত্মার ধর্ম। চিরন্তন বা সনাতন ধর্ম। ধর্ম, বর্ণ, স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে জগতের সকল মানুষের আত্মা একইরকম। অতএব সকল মানুষের ধর্মও এক। চিরন্তন আত্মার ধর্ম। সে অর্থেই সকল মানুষের ধর্ম সনাতন ধর্ম। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই! তোমাদের জাতি-ধর্ম একই জাতি একই ধর্ম।" (আল-কোরআন ২১:৯২)

সকল মানব একই জাতি। মানবজাতি। একই তাদের ধর্ম। আত্মার ধর্ম। কিন্তু অজ্ঞতা কিংবা হিংসে-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মানুষ নিজেরা তাদের ধর্মকে বিভক্ত করেছে। তাই বলা হয়েছে,

"মানুষ তাদের ধর্মকে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। অতএব তাদেরকে তাদের অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকতে দাও কিছুকালের জন্য।" (আল-কোরআন ২৩:৫৩-৫৪)

সনাতন ধর্ম মতে আদি ও চিরন্তন ধর্ম হচ্ছে সনাতন ধর্ম। সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য ধর্ম। একমাত্র সত্য ধর্ম। অপরদিকে ইসলাম বলে ইসলামই আদি বা সর্বপ্রথম ধর্ম। চিরন্তন ও একমাত্র সত্য ধর্ম। সকল মানুষের জন্য মনোনীত ধর্ম। কোরআনে বলা হয়েছে,

'ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।' (কোরআন ৫:৩)

প্রশ্ন হচ্ছে, একই মানবজাতির জন্য মনোনীত ধর্ম আসলে কোনটি? সনাতন ধর্ম নাকি ইসলাম ধর্ম?

সকল মানুষ এক আত্মা থেকে সৃষ্ট। সেই আত্মার ধর্মই হচ্ছে সকল জীবাত্মার প্রকৃত ধর্ম। সেই আত্মা কোন আত্মা? সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা ভগবান বা আল্লাহ হচ্ছেন সকল কিছুর উৎস। প্রতিটি জীবাত্মা পরমাত্মা ভগবান বা আল্লাহর গুণেই গুণান্বিত। তাঁরই ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্বর্ণের একটি কণাও যেমন স্বর্ণ তেমনি পরমাত্মার অংশ প্রকাশরূপে জীবাত্মাও তাঁরই গুণে গুণান্বিত। পরমাত্মা ভগবান বা আল্লাহর ধর্মই সকলের ওপর আরেপিত হয়ে আছে।

তবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য আছে। জড় প্রকৃতিতে পতিত বা আবদ্ধ হলে জীবাত্মা জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে নিজ ধর্ম থেকে তার বিচ্যূতি ঘটে। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। কিন্তু পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে স্থিত থাকা সত্ত্বেও জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি জড় গুণসমুহের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি নির্গুণ। অব্যায়-অক্ষয়, বিকারহীন বা অপরিবর্তনীয়। সর্বদা স্বরূপেই বিরাজ করেন। এমনই তাঁর ধর্ম। পরমাত্মার স্বভাব বা স্বরূপ থেকে জীবাত্মার এই বিচ্যূতি হচ্ছে ধর্মচ্যূতি বা অধর্ম।

জীবাত্মাকে তাই পরমাত্মা বা ভগবানের ভাব, স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করতে হবে। অর্থাৎ ভগবানকে পেতে হবে। গীতায় সে কথাই বারংবার বলা হয়েছে। ব্রহ্মভাব লাভ করার কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা এ সবই ভগবানের এক একটি প্রকাশ।

অপরদিকে ইসলাম ধর্ম বলে আল্লাহকে পেতে হবে। আল্লাহর প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বা সমুন্নত থাকতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"তুমি সমুন্নত থেকে নিজেকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটিই আল্লাহর স্বভাব বা প্রকৃতি যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। .. এটিই সঠিক ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।" (আল-কোরআন ৩০:৩০)

জানতে চেয়েছিলাম মানবজাতির জন্য মনোনীত ধর্ম আসলে কোনটি? সনাতন ধর্ম নাকি ইসলাম ধর্ম?

সনাতন ধর্ম বলে পরমাত্মা ভগবানের ভাব বা স্বভাব লাভ করতে হবে। ভগবানকে পেতে। ইসলাম ধর্ম বলে আল্লাহর প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে বা আল্লাহকে পেতে। এটিই ধর্মের পথ। সত্য হচ্ছে, সনাতন ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম একই কথা বলে।

ধর্ম বলতে সমাজে আমরা যে সকল নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান পরিপালিত হতে দেখি যেমন পূঁজা-অর্চনা করা, উপবাস থাকা কিংবা তীর্থ দর্শন করা অথবা নামাজ পড়া, রোজা রাখা কিংবা হজ্বব্রত পালন করা ইত্যাদি কার্যকলাপসমুহ প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নয়। এগুলি হচ্ছে মানুষকে ধর্মে তথা আত্মার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখার উপায়, পন্থা, মাধ্যম বা কৌশল। এগুলি হচ্ছে এমন কিছু প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম বা বিধি যার অব্যাহত চর্চা ও যথাযথ পরিপালন মানুষকে তথা স্বতন্ত্র জীবের আত্মাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখে, স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে এবং বিচ্যুতি থেকে স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে।

সামাজিক শৃংখলা ও বৃহৎ জনগোষ্ঠির পরিচালনার স্বার্থে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম রক্ষার প্রয়োজন আছে। যদিও কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মই কোন কিছু অর্জনের একমাত্র উপায় নয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক পথও আছে।

ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে কিংবা ভগবানের ভাব বা আল্লাহর প্রকৃতিতে সমুন্নত থাকতে হলে ভগবান বা আল্লাহর ইচ্ছে ও নির্দেশনায় চলতে হবে। এটিকেই সমর্পন বলে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র জীবাত্মার পরম আত্মায় সমর্পন। সনাতন ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের দর্শন একই। বলা হচ্ছে,

"সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ কর। কেবলমাত্র ভগবানে নিজেকে সমর্পন কর।" (গীতা ১৮:৬৬)

“নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পন করা।” (আল-কোরআন ৩:১৯)

“আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।” (আল-কোরআন ৩:৮৫)

ঈশ্বরে সমর্পনই হচ্ছে জগতের সকল মানুষের জন্য মনোনীত একমাত্র ধর্ম। সে অর্থেই সকল মানুষের ধর্ম এক। সনাতন ধর্ম যে কথা বলে ইসলাম ধর্মও সে একই কথা বলে। ধর্মসমুহের মর্মবাণী এক। মানবজাতির প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ঈশ্বরে সমর্পন।

প্রাসঙ্গিকভাবেই পরবর্তী প্রশ্ন এসে যায় যে ঈশ্বরকে কোথায় পাব? কিভাবে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পন করতে হবে? বলা হচ্ছে,

“আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তবর্তী হয়ে থাকেন।” (আল-কোরআন ৮:২৪)

“ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন।” (গীতা ১৮:৬১)

ঈশ্বর জীবের হৃদয়ে স্থিত। অতএব হৃদয়ের বাণী শ্রবন করতে জানতে হবে। হৃদয়ের ইচ্ছে ও নির্দেশনা বুঝে চলতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

“যাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে তাদের অন্তরে গ্রন্থের বাণী সুস্পষ্ট নির্দেশনা।” (আল-কোরআন ২৯:৪৯)

বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝাও খুব একটা সহজ না। হৃদয় ভাল পথে চলতে বলে; হৃদয় মন্দ পথেও চলতে অনুপ্রাণীত করে। অতএব যত্রতত্র নয়, দৈবী সম্পদসমৃদ্ধ হৃদয়ে সমর্পন করতে হবে। সমর্পনের পূর্বে তাই নিজ প্রবৃত্তিকে দৈবী সম্পদসমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় হৃদয়ের অসুর প্রবৃত্তি ধ্বংসের পথেও নিয়ে যেতে পারে। তাই বলা হয়েছে আত্মাই আত্মার বন্ধু, আবার শত্রুও [দ্রষ্টব্য গীতা ৬:৫]। গীতায় দৈবাসুর সম্পদ বিষয়ে সে কারণেই ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। বাইবেল ও কোরআনে ভাল-মন্দের পার্থক্য জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

হৃদয়ে সমর্পনের উদ্ধৃত এ ধারণাটি তাই জ্ঞান ও বোধসম্পন্নদের জন্য। যারা ভাল-মন্দকে বুঝতে শিখেছেন। সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়। অধিকাংশ সাধারণ মানুষের জন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করে চলাই উত্তম। বিষয়গুলি পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বরে সমর্পনের এ ধর্মকেই বিভিন্নজন বিভিন্ন নামে জানে। কেউ বলেন সনাতন ধর্ম, কেউ বলেন ইসলাম ধর্ম। সনাতন ধর্ম ভগবানে সমর্পন করতে বলে; ইসলাম ধর্ম আল্লাহতে সমর্পন করতে বলে। বস্তুত সকলেই দৈবী সম্পদ সমৃদ্ধ আপন হৃদয়ে সমর্পন করতে বলে।

সনাতন ধর্মীদের জন্য কোন পৃথক স্রষ্টা বা প্রভূ নেই। মুসলিমের জন্যও কোন পৃথক স্রষ্টা বা প্রভূ নেই। সকল মানুষের স্রষ্টা ও প্রভূ এক। যিনি ভগবান তিনিই আল্লাহ। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ আমাদেরও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা।" (আল-কোরআন ৪২:১৫)

এ বিষয়ে যত রকমের মতপার্থক্য তার পেছনের কারণ হচ্ছে মানুষের অজ্ঞতা। মানুষের অজ্ঞতার কারণে সৃষ্ট নানান জটিলতা ও বিভাজনে আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর কিংবা গডের কিছুই আসে-যায় না। মানবের নিজেদের অজ্ঞতাকে নিজেদেরকেই দুর করতে হবে।

ঈশ্বরে সমর্পন হচ্ছে জগতের সকল মানুষের জন্য একমাত্র মনোনিত ধর্ম। গভীরের জ্ঞান বলে সনাতন ধর্মই হচ্ছে ইসলাম ধর্ম; ইসলাম ধর্মই হচ্ছে সনাতন ধর্ম। আত্মার ধর্ম। মানুষের ধর্ম। সবচাইতে আদি ধর্ম। চিরন্তন সত্য ধর্ম।

সকল ধর্মের মর্ম কথাগুলি এক। নামগুলি ভিন্ন। যেমন কেউ বলেন ইব্রাহীম, কেউ বলেন আব্রাহাম। ব্যাক্তি কিন্তু একজনই। ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহ, গড এগুলি হচ্ছে নামের পার্থক্য। ভাষাগত বা কিছু অর্থ ও সঙ্গাগত পার্থক্যও আছে যা মানুষের নিজেদের সৃষ্টি করা। স্রষ্টা বা লালন-পালনকর্তা কিন্তু একজনই। বোধসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই সেটি বোঝেন এবং অন্তরের গভীরে নিশ্চয়ই স্বীকারও করেন।

ধর্মীয় বিষয়ে কিছু নাম, কিছু দার্শনিক ব্যাখ্যা, কিছু নিয়ম-রীতি, বিধি-বিধান, কিছু ক্রিয়াকলাপ ও আচার-অনুষ্ঠানে ভিন্নতা আছে। স্থান, কাল ও পাত্রের ভিন্নতার কারণে কিছু পার্থক্য তো থাকবেই। যেটা পানি সেটাই জল। কিন্তু একে অন্যের দ্বারা উচ্চারিত শব্দটিকে পর্যন্ত আমরা গ্রহণ করে নিতে পারি না।

বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক নাম ব্যাবহার করেন। তারা পানিও বলেন না, জলও বলেন না। বলেন H_2O। তারা শাস্ত্রের ভাষায় অব্যাক্ত কিংবা বাতিন বলেন না। বলেন ডার্ক

মেটার (Dark Matter)। কিংবা প্রলয় না বলে ব্ল্যাক হোল (Black Hole) ও তার কার্যাবলি নিয়ে গবেষনা করেন।

সময় এসেছে ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহ, গড এসব ক্ষেত্রেও একই সাইন্টিফিক নাম ব্যাবহার করার। তাতে মানুষের চিন্তাগত, ধারণাগত মানসিক বাধাগুলি হ্রাস পেতে পারে, অজ্ঞতার কারণে একে অন্যের প্রতি প্রদর্শিত বিদ্বেষভাব কমে আসতে পারে এবং স্বার্থের কারণে সুযোগ সন্ধানিদের সুযোগ নেয়ার সুযোগ হয়তবা ধীরে ধীরে কমে আসতে পারে।

জীবন, জগত, সৃষ্টি, আল্লাহ, খোদা, ভগবান, ঈশ্বর, পরমেশ্বর, গড এসব বিষয়ে বস্তুত সঠিক বা নিশ্চিতভাবে আজও কেউই কিছু জানে না। যদি জানত তাহলে এত এত মতবাদ ও এত আলোচনার প্রয়োজন হত না। সত্যকে না জানার কারণে এত ধারণার উৎপত্তি ঘটেছে। এগুলি এক একটি দর্শন। যার যেমন বিশ্বাস। এক এক জন এক এক দর্শনে বিশ্বাসী। তাও আবার অধিকাংশই জন্মগত কারণে যে যেমন প্রচলিত অর্থের ধর্মের সংস্পর্শে এসেছে সে তেমন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েছে।

ভগবান মানুষের প্রতি দয়াশীল। তাই তিনি মানুষকে আলোর পথ প্রদর্শন করেছেন। শাস্ত্রগ্রন্থ প্রেরণ করেছেন। বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন। মুক্তি লাভের উপায় অবহিত করেছেন।

ভগবান চান অফুরন্ত অনুগ্রহ দানের কারণে মানুষ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক। তাঁর প্রতি ভক্তি-ভালবাসার কারণে জগতের সকল আকর্ষনকে তুচ্ছ জ্ঞান করুক। প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন করে তাঁর কাছে ফিরে আসুক। তিনি মানুষের ভেতরে ভালবাসার সে শক্তি সঞ্চার করে দিতে চান। একমাত্র ভালবাসার শক্তিতেই তাঁকে পাওয়া সম্ভব। তিনি অকৃত্রিম ভক্তি-ভালবাসা চান। আর কিছুই চান না। বলা হচ্ছে,

"ভক্তি সহকারে যে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দান করে তেমন বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যাক্তির ভক্তি প্রদত্ত সেই উপহার আমি প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" (গীতা ৯:২৬)

"উৎসর্গীকৃত পশুর মাংশ ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না; পৌঁছায় তোমাদের অন্তরের ভালবাসা।" (আল-কোরআন ২২:৩৭)

যুগে যুগে যারাই ভগবানের বাণীর মর্ম অর্থ অনুধাবনে ব্যার্থ হয়ে ভূল পথে চলেছে, কিংবা দম্ভ ও অহঙ্কার প্রদর্শন করেছে তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনি

সমুলে তাদেরকে উৎপাটন করেছেন এবং অন্যদেরকে তাদের স্থলাভিসিক্ত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে,

"... যদি তোমরা আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তারা তোমাদের মতো হবে না।" (আল-কোরআন ৪৭:৩৮)

"আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি (নুহ, আ'দ, সামুদ, মাদাইয়ান) যার অধিবাসীরা ছিল অন্যায়কারী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি। .. তাদেরকে বলা হল, .. তোমরা ভোগ-বিলাসীতায় মত্ত ছিলে .. তোমাদেরকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।" (আল-কোরআন ২১:১১-১৩)

"যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছে করি তখন সেখানকার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার প্রেরণা দেই এবং তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়। তখন সে জনগোষ্ঠীর ওপর আমার কমান্ড, নির্দেশনা বা প্রেরীত বাক্যের প্রয়োগ সম্পাদিত হতে থাকে। অতঃপর আমি তাকে ধ্বংস করি এক পরিপূর্ণ ধ্বংসস্তুপে।" (আল-কোরআন ১৭:১৬)

"অবিশ্বাসীরা যেন মনে না করে যে নেতৃত্বের যে ক্ষমতা আমি তাদেরকে প্রদান করি তা তাদের জন্য কল্যাণকর। আমি তাদেরকে কেবলমাত্র এ কারণেই নেতৃত্ব প্রদান করি যেন তারা পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়। অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" (আল-কোরআন ৩:১৭৮)

ক্ষমতা ভোগ করার বিষয় নয়। দম্ভ প্রদর্শনের জন্যও নয়। ক্ষমতা হচ্ছে কারও প্রতি ভগবান প্রদত্ত আশীর্বাদ। একটি সুযোগ বা অর্পিত দায়িত্ব। একইসাথে ভূল পথে চলার কারণে ক্ষমতাবানকে অপসারণের একটি গুপ্ত কৌশল। বিষয়টি নির্ভর করে ক্ষমতাবান কেমন আচরণ করে তার ওপর। বলা হচ্ছে,

"আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হলে তুমি আমার অনুগ্রহে সকল সংকট উত্তীর্ণ হতে পারবে। তবে যদি অহঙ্কারবশত না শোন তবে বিনষ্ট হয়ে যাবে।" (গীতা ১৮:৫৮)

"তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে তোমাদের মধ্যে কর্ম ও আচরণে কে শ্রেষ্ঠ!" (আল-কোরআন ১১:৭)

একটি উপসংহার

মহাভারতে মানবজাতির জন্য বহুবিধ শিক্ষার সমাবেশ রয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তেমনই এক উদাহরণ। ক্ষমতা লাভ করে যুগে যুগে যারাই অহমিকা প্রদর্শন করেছে, চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে, যথাযথ দায়িত্ব পালন না করে ভোগ-বিলাসে মত্ত থেকেছে কিংবা ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে, অথবা ক্ষমতার অপব্যাবহার করে অন্যায় কাজ করেছে তারা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

দুর্যোধনের ক্ষমতার লোভ ও নীতিবিরুদ্ধ কর্মকান্ড সামান্য ও স্বল্প ব্যাবধানের মানব জীবনে সকলের সকল আনন্দ ও সম্ভাবনাকে ধুলিস্মাৎ করে দিয়েছে। যারা তার সহযোগী হয়েছে নিজেদের বিবেচনা বহির্ভূত কর্মকান্ডের জন্য তারাও একই পাপে পাপী; একই দোষে দোষী। সকল ধর্মের মর্ম কথাগুলি এক!

➢ যেসব গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে

- শ্রীমদ্ভগবদগীতা - জগদীশচন্দ্র ঘোষ
- শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ - প্রভুপাদ
- শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথার্থ গীতা - অড়গড়ানন্দজী
- কোরআন বাংলা - এ জেড এম আলমগীর